সূচি

মঁসিয়ো হুলোর হলিডে

গল্পগুজব

ভালোবাসা কারে কয়

তিনকন্যার হাতে
নন্দনা
অন্তরা
রাধারাণী
আদরনীয়াসু

মঁসিয়ো হুলোর হলিডে

"জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

আমি একবার, একটিবারই মাত্র, ঈশ্বরের সেবায় লেগেছিলাম। কালীপুজোর তখনও দিন পাঁচ-ছয় দেরি, একদিন রাত্তিরে খেয়েদেয়ে মেয়েদের ঘুম পাড়াতে গিয়ে শুনতে পেলুম ঠিক কানের কাছেই বেড়াল কাঁদছে। বেড়াল! আমাদের বাড়ি তো ইঁদুরের স্বপ্নপুরী—এখানে বেড়াল কাঁদবে কোত্থেকে! ভূতটুত নয় তো! ভূতেরা যে মাঝে মাঝেই বেড়াল সেজে দেয়ালের ভেতর থেকে কাঁদে—একথা পো-সাহেব লিখে রেখে গেছেন। কান্না ক্রমেই বাড়ছে। নাঃ, এ ভূত নয়, সাক্ষাৎ কোনো জলজ্যান্ত-হুলো। ঘরে ঢুকলো কখন! আলো জ্বাল-আলো জ্বাল্ খোঁজ্ খোঁজ্ ধর ধর তোলপাড় তন্নতন্ন। নাঃ, বেড়াল বেরুলো না, উলটে দুই মেয়ে উঠে পড়ে মহা হুটোপাটি জুড়ে দিলে। বড় বললে—"জানলার বাইরে," ছোট বললে—"ঘুলঘুলির ভেতরে", আমার তো মনে হচ্ছে তোশকের তলায়। এদিকে ঘরখানা দোতলায়, জানলার বাইরে ফাঁকা আকাশ ধুধু অন্ধকার হু-হু বাতাস। বাইরে বেড়াল কোথায় থাকবে! আর ঘুলঘুলিতে যদিও চড়াইপাখির সংসার, তাতে বেড়াল ঢোকবার ফাঁক নেই। তবু কান পেতে শুনি—সত্যিই তো। জানলার বাইরে, ঘুলঘুলির দিক থেকেই কান্নাটা আসছে। ঘুলঘুলির ওপরে একটা কার্নিশ আছে বটে।

কিন্তু ওখানে বেড়াল আসবে কোত্থেকে। ছুট ছুট ওপরে। তিনতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখি, তাই তো কার্নিশে একডেলা অন্ধকার জট পাকিয়ে আছে, আর তারই মধ্যে দুটো বিশ ক্যারেটের পান্না জ্বলছে। "কে ওখানে!" বলতেই কান্না বন্ধ হয়ে গেল। উলটে এক প্রবল ধমক এলো—"এ্যায়াও।" কী সর্বনাশ! মেসোমশাই যে। মেসোমশাই সিমলিপালের সেই পোষা বাঘিনী খৈরীর ঠিক উলটো। সাইজে বলো, সেকসে বলো, স্বভাবে বলো। রং মিশমিশে কালো। আসুরিক বলশালী। সম্পূর্ণ বন্য উদ্দাম, স্বেচ্ছাচারী। সাইজে লেজসমেত পৌনে তিন ফুট মতো হবেন। ইয়া কেঁদো! চলাফেরা করেন, ওহ্ যেন আলেকজাণ্ডার! সে কী স্টাইল! দেখলেই মনে হয় পিছনে একগাদা সৈন্যসামন্ত আসছে, দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। আমরা তাঁর সামনে লোক তো নই, পোক। প্রত্যেকদিন ফিক্সড টাইমে এসে সামনের বাড়ির অ্যালসেশ্যান সীজারকে 'এ্যায়াও' বলে দাঁত খিঁচিয়ে তার দৈনিক বরাদ্দ মাংসটুকু খেয়ে যান।

সীজারের দিনকে দিন হাড় বেরিয়ে পড়ছে। সেদিন কলতলায় হুমমম "ফৌওসস" বলে টিনের চাল থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের রাঁধুনীকে বেদম ভয় পাইয়ে দিয়ে তার চোখের সামনেই জ্যান্ত মাগুর মাছটাকে মেরে তুলে নিয়ে গেছেন।

আমাদের কারুর মনেই সন্দেহ নেই, যে উনি রয়্যাল বেঙ্গল কুলীন কুটুম্ব। তা, মেসোমশাই এই অজায়গায় এলেন কী করে! কখন থেকে! রাঁধুনী তখন কাঁচুমাচু মুখে জানালে—পরশুদিন যখন মেসোমশাই আবার মাগুর মাছ ধরতে ছাদে এসেছিলেন, তখন বিনু ঝি আর রাঁধুনী দুজনে মিলে তাঁকে এমনি এক রামতাড়া মেরেছে—যে তিনি সত্যিই "পালাতে পথ পাননি", যেদিকে দু'চোখ যায় ঝাঁপ দিয়েছেন। নেহাত কপালগুণে পড়েছেন কার্নিশে। রাঁধুনী তাকে উদ্ধার করতে পারেনি, ভয়ে কাউকে কিছু বলেওনি। কিন্তু কেষ্টর জীব, তাই তাকে দুবেলা দুধে ভেজানো রুটি আর মাছের কাঁটা উৎসর্গ করেছে। সেই খেয়ে তিনি গত দুদিন ধরেই ওই কার্নিশে নিঃশব্দে কালাতিপাত করেছেন। এখন অরুচি ধরেছে। এবং বন্দীদশার ভয়ে সারাদিন বাদে "সোচ্চার" হয়েছেন।

ওকে তো নামাতেই হয়। শিবু বললে, "কুছ পরোয়া নেই, মাসিমার ডবলবেডের মশারিটা আমরা উঠোনে চারজনে চারকোণা ধরে দাঁড়াই, আর দিদি, আপনি ওকে ঝুলঝাড়ুটা দিয়ে ঠেলতে থাকুন। সার্কাসের কায়দায় আমরা ওকে মশারির চালে লুফে নেবো।"

মা বললেন, "না বাপু, ও সেই পঞ্চাশ সালের মশারি, অত উঁচু থেকে পড়লে অমন দশ সেরি বেড়ালের ভার সইবে না। বেড়ালও যাবে মশারিও যাবে। তার চেয়ে নতুন বেডকভারটা ধর।" আমি ভয় পেলুম, ঠেলাঠেলিতে বেড়াল যদি বেডকভারের বাইরে পড়ে যায়! তার চেয়ে মইটা নামিয়ে দিই, বেড়াল তো গরু নয়, দিব্যি গাছে উঠতে পারে। উঠে আসুক নিজে নিজে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মই নামিয়ে দিয়ে আমরা ঘরে এসে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি। "বলিছে দেওয়াল ঘড়ি টিক টিক টিক।" কিন্তু বেড়াল আর ওঠে না। বেড়াল কেবলই কাঁদে। ইনিয়ে বিনিয়ে সে কি মরাকান্না। বিনু ঝি শাস্ত্র আওড়ালে—এ কান্না নাকি বাড়ির পক্ষে ভয়ানক অমঙ্গলের—এক্ষুনি বন্ধ করা দরকার। মা বললেন, ভয়ে ওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। ওর এখন ওপরে ওঠার টেকনিকই মনে নেই। ওকে কোলে করে তুলতে হবে। এখন এ কি আমাদের পোষা বাঘ-সিংহী? যে কোলে করে তোলা যাবে? এ হলো আদ্যিকালের হিংস্র পশু, বুনো হুলো। এর জন্যে চাই বাঘা উদ্ধারকর্তা —কোনো হিংস্রতর জীব। শিবু বললে—"ও বাবা! তেতলার কার্নিশে? আমি? মাথা ঘুরে পড়েই যাব।" বিনু ঝি হুকুম করলে রাঁধুনীকে নামতে। রাঁধুনী বলে—"বিনুদিদি, তার চেয়ে তুমিই যাও।" শুনেই বিনুদিদির ফোকলা মুখে ভয়ানক চালভাজা ছোলাভাজা ফুটতে লাগলো দেখে আমি বললুম—"থাক থাক, আমিই নামছি।" এ আর এমন কি? আমি হলুম একদার ম্যাটারহর্নের অভিযাত্রী, আমি কি ডরাই কভু

সামান্য কার্নিশে? কোমরে আঁচল জড়িয়ে এলোচুলে শক্ত করে ঝুঁটি বেঁধে আমি তো একসেকেণ্ডে রেডি। এবং স্টেডি। 'গো' বললেই নেমে পড়ব। কেবল যদি মেসোমশাই আঁচড়ে কামড়ে দেন তাই একটা কম্বল দেওয়া হোক, তাই সুদ্ধু ওকে জাপটে ধরব। বলবামাত্র দুপাশ থেকে গোঁ-গোঁ শব্দে আমাকেই সবেগে জাপটে ধরলো আমার দুই সাহসী কন্যা।—“না। মা নামবে না।” গালগলা ফুলিয়ে যত বোঝাই—“আরে মা কি যে সে? আমি হলুম গিয়ে...” তত তারা বলে—“না, মা যাবে না। মা পড়ে যাবে।” যত বলি—“সেই যে মনে নেই, সেবার যে রেইনওয়াটার পাইপ বেয়ে তিনতলায়”—মেয়ে বললে—“এ তো পাইপ নয়, এ কেলোহুলো। তোমাকে ঠেলে ফেলে দেবেই।” কী করি? জ্যান্ত কাঁঠাল গাছের মতো নিরুপায় দাঁড়িয়ে রইলুম। দুহাত ধরে দুই মেয়ে ঝুলতে লাগলো। মেসোমশাই এখন খুব করুণ সুরে কান্নাকাটি করছেন। মাছের কাঁটা শুঁকেও দেখছেন না। মেসোমশায়ের লক্ষণ সত্যি ভালো নয়। কী করি? বসতবাড়ির ভেতর, এই বছরকার সময়ে, একটা জ্যান্ত জীবকে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে দিতে পারি না? বাড়িতে পুঙ্গব বলতে তো কেবল শিবু আর রাঁধুনী। রাত দশটা বেজে গেছে। কোথায় যাই? কাকে পাই? হঠাৎ মনে হলো—আরে, পাড়াতেই তো রয়েছে—দমকল আপিস! সেদিনই কাগজে পড়েছি বেড়ালদের নাকি ভার্টিগো হয়, বম্বেতে একটা ফ্যাকটরীর ছাদ থেকে দমকল ডেকে বেড়াল নামাতে হয়েছে। শিবু দৌড়ালো দমকল আপিসে। ফিরলো মুখ হাঁড়ি করে।—“আপনি বলে দেখুন দিদি, আমি বললে আসবে না।” “ওদের ফোন নম্বর?” “দিলো না।”

গভীর রাতে দমকল মেন অপিসের ফোন বেজে উঠলো। কাতর স্ত্রীকণ্ঠে অনুনয় এলো—আপনাদের অমুক রাস্তার দমকল অফিসের ফোন নম্বরটা একটু দিতে পারেন দয়া করে?—“কোথায় আগুন লেগেছে”—“আগুন নয়, অন্য একটা বিশেষ জরুরী কাজে”—“কাজটা কী?”—“মানে আমাদের কার্নিশে না, ইয়ে পড়ে গেছে”—“কে পড়ে গেছে? কোথায় পড়ে গেছে? দেখুন, জলে ডোবার কেস আমরা আর করি না।”

(নেপথ্যে শিবুর আকুল উপদেশ—দিদি, বলুন পোষা, পোষা না বললে আসবে না)—“জলে ডোবেনি, কার্নিশে পড়ে গেছে।” “কতবড় বাচ্চা?”—

(নেপথ্যে শিবু—বলুন, পোষা) “মানে,—ভীষণ পোষা কি না।” “কি বললেন? পোষা বাচ্চা?”—“বাচ্চা কে বললে? বেড়াল।” “দেখুন, এটা দমকলের অফিস। এটা বেড়াল ধরবার অফিস নয়।”—“না না, সে তো বটেই, সে তো বটেই, আপনারা যে কত ব্যস্ত থাকেন তা কি জানি না? কিন্তু ধরুন, দুদিন ধরে এই বেড়ালটা, মানে বেজায় পোষা কিনা, একটা আন-অ্যাপ্রোচেবল কার্নিশে পড়ে আছে, আমরা উদ্ধার করতে পারছি না। এখন মরণদশায় এসেছে”—“খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু বেড়ালের জন্য দমকলকে ব্যস্ত করা উচিত নয়। মানুষ যদি পড়ে যেত, তা এক্ষুনি

ছুটে যেতাম।"—"কিন্তু অন্য দেশে তো যায়। দমকলই তো যে-কোনো দুরবস্থায় একমাত্র উপায়।"—"সে বিলেতের কথা ছাড়ুন মশাই। এটা বিলেত নয়।" "বিলেত কেন?—বম্বেতেই তো হয়। সেদিন কাগজ পড়েননি? একটা ছাদে উঠে একটা বেড়াল—শেষে পাড়ার লোকেরা দয়া করে দমকল ডেকে—"

"সে হয়তো চিমনি-টিমনি ব্লক করেছিল। দয়া-মায়া ছাড়াও কোনো জরুরী প্র্যাকটিক্যাল কারণ ছিল নিশ্চয়"—"দাদা, আপনারা একটু দয়াই করুন, হিন্দুবাড়িতে বেড়াল মারতে নেই, জানেন তো এতে খুব অলক্ষণ হয়, নিজেই নামতুম, মই নামিয়েছি, কিন্তু মেয়েরা কেঁদে খুন হচ্ছে, আমাকে নামতে দিচ্ছে না"—"দেখুন দিদি, এটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এই কালীপুজোর মুখে, ধরুন কোথাও বিরাট একটা আগুন লাগলো, আর তখন আমাদের ছেলেরা আপনার কার্নিশে বেড়াল নামাচ্ছে—সেটা কি উচিত? কত কি এমার্জেন্সি হতে পারে এত বড় শহরে"—"মশাই, বম্বে কি মফঃস্বল শহর? লণ্ডন, নিউইয়র্ক কি পাড়াগাঁ? তাদের দমকলরা যখন পারে...তাছাড়া আমাদের রাস্তার আপিসে তিন চারটে গাড়ি বসে থাকে, একসঙ্গে কখনোই সবকটাকে বেরুতে দেখিনি ইহজীবনে—"

—দমকল আপিসের রাস্তায় আপনার বাড়ি?

—এক্কেবারে পাশেই—

—তবে চলেই যান না? কিংবা ভাইটাই কাউকে পাঠিয়ে দিন—

—ভাই তো গিয়েছিল, ওরা বলেছে বড় অফিসের হুকুম চাই—

—দেখুন—আমার পক্ষে এমন একটা অর্ডার অফিশিয়ালি দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন যদি পার্সোনালি একটা ফেভার করেন কেউ—ওঁদের ফোন নম্বরটা হচ্ছে—

—অজস্র ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ।

—হ্যালো, এটা কি অমুক রাস্তার দমকল অফিস?

—হ্যাঁ। বলুন? আবার উপরের আলোচনার পুনরাবৃত্তি। এই অফিসারের কর্তব্যনিষ্ঠা আরো প্রগাঢ়।—দেখুন, বেড়ালের জন্য আমি আমার ছেলেদের প্রাণ-সংকট করতে পারব না।—ছি ছি, প্রাণ-সংকটের কথা ওঠে কেন? আগুন তো নয়—বিড়ালই তো। তায়...পোষা।

—দিদি, ধরুন, একটা ছেলে যদি পা ফসকে পড়ে যায়? মানুষ বাঁচাতে গিয়ে মরলে সেটার মানে হয়। তা বলে একটা তুচ্ছ বেড়ালের জন্যে—

—বালাই ষাট। মরবে কেন? কার্নিশটা বেশ চওড়া, তাছাড়া ওতে শ্যাওলাও নেই। কিন্তু বেড়ালকে তুচ্ছ বলা...(মেসোমশাই কী বস্তু তা তো আপনি জানেন না।)—জানি জানি, পোষাপ্রাণী সন্তানতুল্য হয়ে যায়, কিন্তু একটা ছেলের যদি পাও মচকায়, আমি তো তারও রিস্ক নিতে পারি না? আপনিই বলুন, একটা বেড়ালের জন্যে—...ওই শুনুন! শুনতে পাচ্ছেন? মরণ কান্না? ইতিমধ্যে রিসিভারটা হেঁচড়ে

জানলার ধারে নিয়ে গিয়েছি—ওই আর্তনাদ আর কতক্ষণ শুনবো বলুন দেখি? পাগল হয়ে যাচ্ছি তো।

—কী? শুনতে পাচ্ছেন?—হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে বৈকি? আপনার অবস্থা আমি খুবই বুঝতে পারছি। কিন্তু—

—মশাই, ঝট করে কেউ দমকল ডাকে? মেয়ে হয়ে? এতো রাত্তিরে? শেষ পন্থা হিসেবেই না আপনাদের বিরক্ত করা? চোখের সামনে, ভিটের ওপর, ষষ্ঠীর জীবটা...দিদি, আমি, মানে, আপনি ঠিক বুঝছেন না। এর জন্যে অফিশিয়াল অর্ডার দেওয়া সম্ভব নয়—

—তবে আনঅফিশিয়ালিই দিন না? হিউম্যানিটারিয়ান গ্রাউণ্ডসে? আমিই তো নামছিলুম, নেহাত আমার মেয়েদুটো ভারি ভীতু, আর মা বেজায় নার্ভাস প্রকৃতির...নইলে আমি কখন তুলে ফেলতুম—ইতিমধ্যে আমার চোখে সত্যি জল এসেছে।—খবরদার শাড়ি পড়ে নামতে যাবেন না, ভয়ানক রিস্কি—না নেমেই বা করব কি, আপনাদের ওখানে তো কোনো মহৎপ্রাণ, উদার হৃদয়, জীববৎসল তরুণ নেই, যিনি জীবে দয়া করে—সত্যি বলতে কি দিদি তেমন মহৎপ্রাণ, উদার হৃদয়, কি জীববৎসল কেউই হয় না আজকাল, তবু আমি বলে দেখছি, একবার, অবিশ্যি মনে হয় না, জীবে দয়ার দিনকাল কি আর আছে দিদি? ইতিমধ্যে টেলিফোনে সজোরে কেলোহুলোর মরণ ক্রন্দন এবং আমার চাপা ফোঁসফোঁস—অধীর হয়ে ও-পক্ষ বললেন, ঠিক আছে, দিন তবু ঠিকানাটা একবার। কোন বাড়িটা? ওঃ, ও তো দু মিনিটের পথ!

মিনিট কুড়ি কেটে গেছে। রাত গভীর। ক্ষুধায় মরণাপন্ন মার্জার এখন প্রায় মানুষের গলায় একরকম শব্দ করে উঠছে। দমকল আসবে না বোঝা গেছে। আপত্তিরত মেয়েদের ঠেলে ফেলে দিয়ে কার্নিশে নামতে উদ্যত হয়েছি। মা বললেন, শাড়িটা নয়, বরং একটা পেণ্টুলুন পরে নাম—সেই পরম দৃশ্য দেখবার ভয়ে, এতক্ষণ জীবে দয়ায় যা হয়নি, তাই হলো। রাঁধুনী বামুন কাতরভাবে বলে উঠল—থাক থাক দিদি, আমিই নামছি। কে বলে শিভালরির দিন গেছে? যেই না নামা, অমনি নাটকীয় টাইমিং-এ একটা দমকলের গাড়ি এসে থামলো নিচে, সমবেত কণ্ঠের কলরব উঠলো —"লোক নেমেছে! লোক নেমেছে!"

—কম্বল জড়িয়ে জড়ভরত মেসোমশাইকে সদ্য তুলে দেওয়া হয়েছিল আমার কোলে—ঠং ঠং করে হঠাৎ দমকলের ঘণ্টাটা বেজে গেল কেমন করে, আর দুদিন ধরে স্নায়ুতাড়িত হতবুদ্ধি মরণাপন্ন বেড়ালের তাতে কী যে হলো, সে তড়াক করে লম্ফ দিয়ে উঠে কম্বল ভেদ করে বেরিয়ে ঝপাং করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো তিনতলার জানলা গলে অন্য এক সুদূরতর কার্নিশে। এবারে ঘরোয়া মইয়ের নাগাল ছাড়িয়ে। ঘরে এবং রাস্তায় সমস্বরে হা হা রব উঠল—হায় হায়! গেল গেল! আবার গেল!

তারপর?

অবিলম্বে ঝুপঝাপ নেমে পড়লেন, একজন-দুজন নন, পাঁচ সাতজন স্মিতানন, মহৎপ্রাণ, উদারহৃদয়, জীববৎসল তরুণ কর্মী, ত্রিতল মই উঠে গেল ঊর্ধ্বপানে চক্ষের নিমেষে, রেডি, স্টেডি, তারপর সেই মৌল প্রশ্ন! কে উঠবে? এ তো আগুন নয়, এ যে...ইতস্তত ভাব দেখে আমি বললুম—আমিই উঠে পড়ি বরং। মুখ থেকে কথাটা পড়েছে কি না-পড়েছে অমনি ধড়ফড় করে উঠে গেছেন যে কেউ একজন দোতলা পর্যন্ত। তারপর মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন—আঁচড়ে-কামড়ে দেয় না তো? বললুম...কি জানি, ভয়ানক নার্ভাস হয়ে আছে তো? বরং একটা মোটা তোয়ালে জড়িয়ে ধরাটাই সেফ হবে...বলতে না বলতে ঝুল বারান্দাগুলো থেকে ঝপাঝপ দুচারটে টার্কিশ তোয়ালে পড়লো। ভদ্রলোক মই থেকেই কায়দা করে একটা লুফে নিয়ে ওপরে উঠলেন। এদিকে তেতলার কার্নিশের মতো বেড়ালোচিত স্থানে হঠাৎ মানুষ দেখে হুলোমশাই সন্দিগ্ধচিত্তে ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন এ-মাথা থেকে ও-মাথা। সে কি উত্তেজনা। একেবারে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলার মতো। ক্রমাগত চিয়ার্স উঠছে রাস্তা থেকে। চললো বেড়ালে-মানুষে চোর পুলিশ খেলা। তারপরে —পড় পড় পড় পড়বি চাপা ধপ, ধর ধর ধর ধরবি হুলো খপ। পাড়া-ফাটানো হাততালির মধ্যে তখনি কপাস করে লোডশেডিং হয়ে গেল। অমনি চারিদিকে রব উঠলো: সাবধান! সাবধান! আর নিচে ঝলসে উঠলো পাঁচ-সাতটা জোরালো দমকলের টর্চলাইট।

অন্ধকারে দৈববাণীর মতো, শূন্য থেকে বিজয়গর্বে সমুজ্জ্বল কণ্ঠে উদ্ধারকর্তা ঘোষণা করলেন—ধরেছিঁ দিদি, কিচ্ছু ভাববেন না, বাছাধনকে আপনার কোলে না দিয়ে আর ছাড়ছি না বাবা। হুঁ হুঁ। ভীষণ ভয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললুম, থ্যাংক ইউ ভাই, ওকে বরং ওই গ্যারাজের ছাদটাতেই ছেড়ে দিন—মানে—তাই কখনো হয়? নামতে নামতে নায়ক বললেন—সে কাজটি আমি করছি না মশাই। রাস্তায় তখন মহতী জনসভা। রাত দেড়টা, তাতে কি হয়েছে? রিটায়ার্ড রিকশাওলা, বাড়িমুখো ভিখিরি, নিষ্কর্মা পাহারোলা, ব্যতিব্যস্ত কুকুর, ঝিমন্ত ষাঁড় ও রগুড়ে বাচ্চা-বুড়োয় উঠোন ছাপিয়ে রাস্তা ভরপুর। প্রত্যেক বাড়ির বারান্দা ও জানালা থেকে মোমবাতির আলো উদ্বেগ এবং উপদেশ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সব বাচ্চারা ফ্রীডম পেয়ে গেছে জেগে ওঠার, পাখি ডাকার মতো কলরব হচ্ছে। এরই মধ্যে হঠাৎ এতক্ষণ পরে, চোখ কচলাতে কচলাতে আবির্ভূত হলেন আমাদের নতুন প্রতিবেশী ব্যোমকেশবাবু। ব্যাপারটা টের পেয়েই তিনি ঘুমভাঙা ভারী গলায় বলে উঠলেন —ও বুঝেছি, এ সেই প্রকাণ্ড ভয়ংকর, কালো কুচকুচে...আর যায় কোথায়? আমি মরিয়া হয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যোমকেশবাবুর আধাঘুমন্ত বাঁ-হাতখানা খামচে ধরেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বিষম জোরে কেটেছি এক রামচিমটি। আমি তো জানি কী সর্বনেশে বাক্য উনি উচ্চারণ করতে চলেছেন—সেই...কালো কুচকুচে অতি বদরাগী, হামলাবাজ, বেজায় পাজি হুলোটা? যেটা রোজ আমাদের মাছ দুধ খেয়ে যাচ্ছে?—না, সেই

বাক্যটি এই মুহূর্তে, এই পবিত্র জীবে-দয়ার পটভূমিতে, ওঁকে বলতে দেওয়া অসম্ভব। সেই সর্বহারা নিঃসীম অন্ধকারে, চরাচরব্যাপী বেনিয়মের মধ্যে, দমকলের তিনতলা জোড়া স্বর্গের সিঁড়ির নীচে, এ হেন আশাতীত অত্যাকস্মিক আক্রমণে ব্যোমকেশবাবু দিশাহারা হয়ে পড়লেন। যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁর আর বাক্যস্ফূর্তি হলো না। বেড়াল বগলে নেমে এসে হাস্যবদন হিরো বললেন—ধরুন দিদি। আপনার সাধের পুষ্যি। ব্যাটাকে দুদিন ধরে বন্ধ করে রাখুন দিকি, আবার না পালায়—চোরের মতো শেষ চেষ্টায় বললুম—ওকে উঠোনেই ছেড়ে দিন না,—পাগল হয়েছেন? ফের কোন স্বর্গরাজ্যে লাফ মারবে, ফের পাড়াসুদ্ধ তোলপাড়? নিন ধরুন আপনার দস্যি ছেলে—টার্কিশ-তোয়ালে জড়ানো সদ্যোজাত সন্তানকে যেমন বাড়িয়ে দেন ওস্তাদ ডাক্তার, আর অনভ্যস্ত হাত বাড়িয়ে যেমন তাকে সন্তর্পণে গ্রহণ করেন অতি-নার্ভাস নবীন পিতা—তেমনি সন্ত্রস্ত হৃদয়ে বাঘের মেসো হুলোমশাইকে যথাসাধ্য কৃতজ্ঞ মুখে আমি সভয়ে বুকে সাপটে ধরলুম। পারফেকট টাইমিং দিয়ে এই সময়েই ইলেকট্রিসিটি ফিরল। হৈ-হৈ করে উঠল উপস্থিত পাবলিক। আর আমি ছুট লাগালুম। ইচ্ছে, উঠোনের কোণটা ঘুরেই মেসোকে পথে ছেড়ে দেব, লোকচক্ষুর অন্তরালে। ব্যোমকেশবাবুর দিকে চাইবার সাহস ছিল না, তাঁর সঙ্গে আমার এখনও ফর্মাল পরিচয় হয়নি, সবেমাত্র এ-পাড়ায় এসেছেন ওঁরা। ছুট তো লাগিয়েছি, কিন্তু তোয়ালের ভেতরে মঁসিয়ো হুলো তখন টাইফুনের মতো উত্তাল ফুঁসছেন, কোণটা ঘুরতেই তোয়ালে ভেদ করে নখদন্তসমেত নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং সবলে আমার হাতে আঁচড়ে এবং কামড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে নেমে মুহূর্তেই অদৃশ্য। হাত থেকে ঝুঁজিয়ে রক্ত পড়ছে —সে লজ্জা মোটা তোয়ালেতে লুকিয়ে ফেলে কনুই পর্যন্ত জড়িয়ে বেড়ালের মতো করে ধরে একগাল কৃতার্থ হেসে অশ্রুছলছল চক্ষে আমি ভাগ্যক্রমে এ দৃশ্য দেখতে না পাওয়া সরলমতি দমকল বাহিনীকে কৃতজ্ঞ কান্নায় গদগদ গলায় তখন বলছি —"আপনারা এই অবোলা প্রাণীর জন্যে যা করলেন, এর জন্যে ঈশ্বর আপনাদের শতগুণ করে"...বলতে বলতে হাতের যন্ত্রণায় ও চোখের জলে আমার বাক্যরোধ হয়ে গেল। রীতিমতো টাচড হয়ে তরুণটি বললেন—"ছিছি, এজন্যে ধন্যবাদের কি আছে দিদি, গেরস্থঘরের পুষ্যি, সে তো ছেলেপুলেরই সমান"—ঠং ঠং করে ঘণ্টা বেজে গেল, ঝটপট গাড়িতে লাফিয়ে উঠলেন উদারহৃদয়, মহাপ্রাণ, জীববৎসল তরুণের দল, লাল-টুকটুকে পক্ষীরাজটি যেন উড়ে বেরিয়ে গেল একগাড়ি সত্যিকারের রাজপুত্র পিঠে নিয়ে।

হুলোমশাই তখন পাশের বাড়ির পাঁচিলে বসে কৃতঘ্নচিত্তে গোঁফে তা দিচ্ছেন। আর ব্যোমকেশবাবু? তখনও হতবাক, মধ্যরাত্রের ফাঁকা উঠোনে, একা। বাঁ হাতের ফুলো জায়গায় ডানহাত বোলাতে বোলাতে অতি বিচিত্র দৃষ্টিতে একবার হুলোমশাইকে আর একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর সেই অভিব্যক্তির কাছে মার্সেল মার্সোর মূকাভিনয়ও নস্যি।

অনেকগুলো ইনজেকশন নিতে হয়েছিলো আমায়। 'পোষাপ্রাণী'টির মায়ার চিহ্ন এখনও হাতের মাংসে বিদ্যমান। আর সেই থেকে কেন জানি না হুলোমশাইও যেমন, ব্যোমকেশবাবুও তেমন আমাদের বাড়িটাকে বিষবৎ পরিহার করে চলেন, অথচ ঈশ্বরের সেবায় সেই একবারই মাত্র লেগেছিলুম আমি।

[নীতিকথা : দমকলকে অকারণে বিরক্ত করবেন না। করলে হাতে-নাতে তার প্রতিফল পাবেন। "ধর্মের কল" ইত্যাদি মনে থাকে যেন]।

প্রজেক্ট চর্মচটিকা

আর যাই করুন আপনারা, খবর্দার চামচিকে পুষবেন না। চামচিকেরা বড্ড দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া, বিশ্বাসঘাতক, অবিমৃষ্যকারী, নেমকহারাম, স্বার্থকেন্দ্রিক, কৃতঘ্ন এবং কুপোষ্য প্রাণী। একেই তো ইঁদুর না পাখি তার নেই ঠিক। দিব্যি চকচক করে মায়ের দুধ খায় আবার কুচকুচ করে ফলটল খায় দাঁত বসিয়ে। ওদিকে পালক-টালকহীন চামড়ার ন্যাড়া ন্যাড়া ডানা মেলে চটাং চটাং করে উড়ে বেড়ায় আমাদের মাথার ওপরে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, কোনোটারই জাতকুলের বিচার হয় না। চামচিকের চেয়ে তিমি মাছ পোষাও ঢের ভালো। এইজন্যেই তো তিমি সংরক্ষণের একটি সমিতি আছে পৃথিবীতে, কিন্তু চামচিকের জন্য নেই। এবং না থাকাই উচিত। মানুষের কত মমতা সুন্দরবনে 'প্রজেক্ট টাইগার' পর্যন্ত আছে, ব্যাঘ্র-সংরক্ষণ সমিতি। (অথচ বাঘেরা কেউ কেউ যখন 'প্রজেক্ট ম্যান' গড়ে তোলে...তাদের উদ্দেশ্য 'মনুষ্য সংরক্ষণ' হয় না)। মানুষের বুকে অশেষ মমতা।

একবার ওই মমতাপরবশ হয়েই আমাদের বাড়িতে 'প্রজেক্ট চর্মচটিকা' অর্থাৎ চামচিকে সংরক্ষণ সমিতি খোলা হয়েছিল। ('চর্মচটিকা' মানে কিন্তু 'চামড়ার চটি' নয়। কেন যে নয়, তা আমিও বুঝি না)। ওয়ানম্যান কমিশন। অর্থাৎ আমিই চেয়ারম্যান, আমিই মেম্বার, আমিই সেক্রেটারি। আজ আপনাদের কাছে সেই সমিতিরই কার্যনির্বাহের ধারাবিবরণী পেশ করছি। উদ্দেশ্য, জগৎবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া : চামচিকে হইতে সাবধান। মমতা করতে গেলেই ওরা আপনাকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করে ছেড়ে দেবে। ওঃ! কী বিপদেই ফেলেছিল আমাকে! যেমন বাড়িতে, তেমনি কলেজে...প্রাণ ওষ্ঠাগত করেছিল ওই চামচিকে। বেশ ক'বছর আগের কথা, কিন্তু এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

আমার দোষ, আমি মাঝে মাঝে এধারে ওধারে চামচিকে কুড়িয়ে পাই। ভদ্রলোকেরা পথেঘাটে কী কী জিনিস কুড়িয়ে পান? হয় বেশ গাব্দাগোব্দা বাঘসিংগির বাচ্চা, এলসা কি খৈরীর মতন, নইলে রোগা মিষ্টি পাখির ছানা-টানা, কিংবা অসহায়া অবলা নারী, নিদেনপক্ষে মনিব্যাগট্যাগ। আর আমি কী কী কুড়িয়ে পাই?...বাসা-ভাঙা কাগের ছানা, খসে-পড়া চামচিকের বাচ্চা, গাড়িচাপা-পড়া খোঁড়া বেড়াল, পিচুটিপড়া, লোম-ওঠা, টেকো কুকুরছানা। একবার অবিশ্যি ইয়া মোটা ল্যাজওলা একটা কাঠবেড়ালির ছানাও পেয়েছিলুম। সে মাত্র একটিবারই। কিন্তু চামচিকে? দু'দুবার। দু'জায়গায়। দু দুটো ছানা-চামচিকে এত জায়গা থাকতে ঠিক আমারই পায়ের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধুলোয় লুটোপুটি যায় কেন? প্রথমটাকে পেলুম কলেজ যাবার পথে, বাসস্টপে বকুলতলায়। প্রথমে ভেবেছি ধুলোকাদামাখা একটা ছেঁড়া বেলুনের টুকরো বুঝি, বাতাসে নড়াচড়া করছে। হঠাৎ দেখি, না তো? এ তো বাতাসে নড়া নয়। এ অন্যরকম নড়াচড়া। তখন নিচু হয়ে বসে দেখি...ও মা! ইনি যে মিনি-চামচিকে? ইঞ্চিখানেকের মধ্যেই তার ছোট্ট ছোট্ট মুণ্ডু, ধড়, ডানা, থাবা সব কিন্তু আছে, মায় নখ সুদ্ধু। আহাহা, তাকে কুড়িয়ে না নিয়ে পারে কেউ? বেচারা জ্যান্ত যে! এক্ষুনি পথের কুকুর-বেড়ালের ফুচকা-ভেলপুরীতে পরিণত হবে। কী করি? অগত্যা কলেজ যাওয়া স্থগিত রইল, জীবে দয়া করা নিশ্চয় বেশি জরুরী। রুমালে জড়িয়ে বেচারা চামচিকে শাবকটিকে সযত্নে বাড়িতে নিয়ে এলুম। পরদিন, বললে বিশ্বাস করবেন না, আমাদের হলদে ঘরের কোণে (আমাদের বাড়িতে ঘরগুলোর নাম রাখা হয়েছে মেঝের রং-এর নামে : হলুদ ঘর, লাল ঘর, সবুজ ঘর ইত্যাদি)। আলনার পাশে বাবার জুতোর মধ্যে রহস্যজনকভাবে দ্বিতীয় চর্মচটিকার আবির্ভাব ঘটল। দেখতে পেলুম কিন্তু আমিই আগে। বাবা জুতোয় পা-টি একবার ঢোকালে তাঁর এবং চামচিকে শিশুর কী যে দশা হতো, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। ঘরের ভেতরে যে কোত্থেকে চামচিকের ছানা এল, তা কেউ জানে না! ঘুলঘুলিতে তো চড়াইগিন্নির চাঁদের হাট। তাঁদের কিচিমিচিতে সদাই ঘর মুখরিত। কিন্তু এটা কোত্থেকে এল? কে আনল?

গোলমালটা বাধলো খাওয়ানো নিয়ে। এরা কি সোজা পুষ্যি, চর্মচটিকা বলে কথা। এ কি আপনার বাঘসিংগি পেয়েছেন যে "আঃ আঃ তুউউ"...করলেই ল্যাজ নাড়তে নাড়তে দৌড়ে আসবে, হাত থেকে দুধুভাতু খাবে? নো স্যার। এরা খাস ভ্যাম্পায়ারের ডিরেক্ট বংশধর, এদের পোষ মানাবে কার সাধ্যি? এত তো সার্কাস দ্যাখেন, চামচিকের সার্কাস কেউ দেখেছেন কখনো? হুঁ বাবা, সেটি পাবেন না। লায়নটেমার হয়, গোখরো সাপ পর্যন্ত দাঁত না ভেঙে খেলানো যায়, কিন্তু চামচিকে-টেমারের কথা কেউ শুনেছে? তিমি মাছ পোষা কি সোজা? চামচিকেও ঠিক তিমি মাছের মতো। কেন? কেননা তিমিও ম্যামাল, চামচিকেও তাই। তিমিও অবসেশনগ্রস্ত ঘোর মানসিক রুগী, ভুল করে নিজেকে মাছ বলে ভাবে অথচ মোটেই মাছ নয়

সে, তবু জোর করে জলে বাস করে, এবং সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়ায়। চামচিকে বেচারীও অবসেশনগ্রস্ত প্রবল মানসিক রুগী, মনে মনে নিজেকে পাখি ভাবে, যদিও সে পাখি নয়, ডিম পাড়ে না, পালক পর্যন্ত নেই, তবুও জোর করে হাতদুটোকে ডানা বানিয়ে উড়ে বেড়াবেই। তিমি যেন হাফ-জলহস্তী হাফ-মাছ, চামচিকে যেন হাফ-পাখি হাফ-ইঁদুর। বকচ্ছপের মতো, জীবজগতে এভলিউশনের মাঝরাস্তায় ওরা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির করুণ শিকার। ইঁদুরও ওদের আপনার ভাবে না, পাখিও না। ওদিকে তিমি আর চামচিকে যে স্বজাতি-স্বঘর সেকথাই বা ওদের কে বোঝাবে? ওদের নিজেদেরই জ্ঞাতগোত্র কিচ্ছু খেয়াল নেই। ম্যামাল হিসেবে দুজনেরই হওয়া উচিত স্থলচর প্রাণী, কিন্তু মনের ভুলে একজন জলচর আরেকজন খেচর হয়ে গেছে। হয়ে কিন্তু দিব্যি সুখেই আছে। এ হেন বেয়াড়া জন্তু পোষা কি মুখের কথা? অবশ্য ক্যালিফর্নিয়ার মেরিনল্যাণ্ডে দুটো পোষা ক্ষুদে জাতের মিনি-তিমি আছে, শুশুকদের সঙ্গে মিশে মিশে ওরাও আজকাল খেলা দেখায়। কিন্তু কোনো ওয়ানডারল্যাণ্ডেই চামচিকের খেলা দেখানো হয়নি। আমি সেই চামচিকে পুষতে গিয়েই অতো কষ্ট পেলুম। হ্যাঁ, আপনারা আমাকে বলতে পারেন..."কেনই বা পুষতে গেলেন? কেউ কি আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল, লক্ষ্মীটি, যাও তো একটু চামচিকে পোষো গে, নইলে কিন্তু মনে ভীষণ দুঃখ পাব? নাকি কেউ আপনাকে অভিশাপ দিয়েছিল —অনুতাপে দগ্ধ হবি, চামচিকে পুষে মরবি?" কেউ না। কেউ না। দায়টা সব আমারই। অমন কচি নধর কালো-কালো দুটি ডানাযুক্ত ইঁদুরছানা, ঠিক যেন রবারের তৈরি পুতুল, কুড়িয়ে পেলে আপনিও না পুষে পারতেন না। ওরা, অত কালো কুচ্ছিত বলেই, যেন ওদের ওপর বড্ড মায়া পড়ে যায়। যেমন মায়া পড়েছিল আমার ওই কাগের ছানাগুলোর ওপরে। উঃ, কী কুচ্ছিত। কী কুচ্ছিত। সাধে কি ওদের বাবা-মা ওদের বাসা থেকে ফেলে দিয়েছিল?

মায়া মানেই পোষা। পোষা মানেই পরিশ্রম। উপরন্তু মায়ের বকুনি। যেমন ধরুন...প্রথম দিন প্রথম বাচ্চাটাকে আনার পরে। যেহেতু সে তখন একেবারেই কচিবাচ্চা, চুমুক দিয়ে খেতে জানে না...চুমুক দেবেই বা কিসে? সমগ্র জীবটিই তো আমাদের হাতের কড়ে আঙুলের সমান। অতএব মানুষ বাচ্চার বোতলে ওদের দুধ খাবার প্রশ্ন নেই। নিপ্লটাই ওর দেহের সমান বড়। তাই আমি একটা চায়ের প্লেটে অল্প দুধ ভালো করে ছেঁকে ঢেলে, নরম গোলাপী তুলোর সলতে পাকিয়ে সেই সরু সলতে ওই দুধে ভিজিয়ে নিয়েছি, তারপর ফর্সা রুমাল দিয়ে কুচকুচে এবং কিঁচকিঁচে চামচিকের বাচ্চাকে সাবধানে চেপে ধরে সেই দুধের সলতে তার ক্ষুদে মুখখানার চারপাশে একমনে বুলিয়ে যাচ্ছি ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছানোর মতো...কেননা শ্রীমুখখানি তাঁর এতই ক্ষুদ্র এবং এমন ঘোর কালো যে খাবার ফুটোটি অর্থাৎ হাঁ-টি যে কোন অঞ্চলে অবস্থিত তাই আবিষ্কার করতে পারিনি। এক সময়ে কালো আলপিনের মাথার মতো দুটি চকচকে বিন্দু আমার নজরে এল। আন্দাজ

করলুম ঐ দুটো হলো চোখ। সেক্ষেত্রে হাঁ-টা হবে একটু নিচে, মাঝামাঝি। কিন্তু নাকের ফুটো কৈ। এই পরম দুর্ভাবনার মুহূর্তে যখন শত চেষ্টাতেও দুধের সলতে প্লাস চামচিকের হাঁ-য়ের একটা সংযোগ ঘটাতে পারছি না...সেই দুঃসময়ে পান চিবুতে চিবুতে মা-জননীর অকুস্থলে আবির্ভাব।

—খুকু, ওখানে কি কচ্চিস রে? কলেজ যাসনি?

—না মা। এই চামচিকে...

—সে কিরে! কলেজ না গিয়ে চামচিকে নিয়ে খেলা করচিস?

—খেলা নয় মা, খাওয়াচ্ছি।

—এঃ হে, ম্যাগোঃ, ওই খাবার টেবিলেও চামচিকে তুলেচিস নাকি? ওটা না আমাদের খাবার জায়গা? খুকু!

—খাবারই তো খাচ্ছে।

—খাবারই তো খাচ্চেন? ঐ বিশ্রী ময়লা রাস্তার চামচিকেটাকে নিয়ে এক্কেবারে খাবার টেবিলে? ওরে, তোর কি ঘেন্নাপিত্তি নেই?

—এতে ঘেন্নার কি আছে মা? খাচ্ছে তো দুধ...

—আবার দুধ নষ্ট করা হচ্ছে?

—বা, দুধ না দিলে হয়? ও ও-তো ম্যামাল, আমাদেরই স্বজাতি...

—দূর দূর! আমার স্বজাতি কক্ষনো নয় চামচিকে! (মা ঝনঝনিয়ে দুহাত নাড়েন বিরক্তিতে চুড়ি বাজিয়ে) তোর স্বজাতি অবিশ্যি হতেই পারে। যেমন তোমার রুচি বুদ্ধি...

বেগতিক বুঝে আমি সুর পালটে ফেলি।

—দ্যাখো না চেয়ে মা, আহা বেচারী কত্তোটুকুনি প্রাণী, চোখটোকও ফোটেনি বোধহয়। দুধের সলতেটা পর্যন্ত দেখতেই পাচ্ছে না...

চোখ কি তোমারই ফুটেচে মা? দুধের গেলাসটা কি তুমিই কখনো দেখতে পাও? তাছাড়া দৃষ্টি থাকলে কি কেউ ঐরকম বিচ্ছিরি কুচ্ছিরি জিনিসটাকে ঘরে এনে তোলে? গুণনিধি। গুণনিধি...। শিগগির টেবিল ক্লথটা ডেটলে কেচে দাও, আর এই নোংরা জন্তুটাকে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এস। ছি ছি ছি...

এবার আমার রাগ হয়ে যায়।

—কেন অমন ছি ছি করছ মা? নোংরা জন্তু মোটেই নয়...মন্দিরের ভেতরেই তো ওরা বাসা বেঁধে বাস করে। দেখলুম না আমরা? রামেশ্বর, মাদুরা, পুরী, ভুবনেশ্বর, সব জায়গায়। ঠাকুরের পাশেই থাকে ওরা। ওদের তো কেউ তাড়িয়ে দেয় না? অথচ তুমি কেন...

—তাই থাকুক না বাবা, ঠাকুরের পাশে, পুরী-টুরীতে গিয়ে, এটা তো দেবমন্দির নয় মা, এটা মানুষের বাড়ি।

—এ বাড়ি বুঝি মন্দিরের চেয়ে বেশি পবিত্র? কেন তবে লোকে মন্দিরে শুদ্ধবস্ত্রে

যায়, জুতো খুলে ঢোকে? সেখানেও যদি চামচিকে অ্যালাউড হতে পারে, তবে তুমি কেন...

—এটা তো মন্দিরের মতো অতটা পবিত্র ঠাঁই নয় বাছা যে ঝুলটুল ঝাড়া হবে না, চামচিকেরা বাসা বেঁধে ঝুলে থাকবে ছাদের গা থেকে? এ হলো গেরস্থের সংসার—ঐ যে। ঐ যে। আরে আরে। মা। মা! ধরেছে। ধরেছে। সলতে ধরেছে। এই যে সলতে এঁটে গিয়েছে মুণ্ডুতে—উঃফ কী বুদ্ধিমান!

—ঈশ! বুদ্ধিমান না আর কিছু। বলতে বলতেই মা প্লেটটা লক্ষ করে প্রায় কেঁদে ফেললেন—

খুকু! ওটা আমার চায়ের কাপের পিরিচটা বলে মনে হচ্ছে না? ওরে—শেষটায় চামচিকের এঁটো বাসনে তোরা চা খাওয়াবি আমাকে?

এই তো অবস্থা বাড়িতে। পরের দৃশ্য কলেজে। ইতিমধ্যে নাম্বার-টুও এসেছেন। আমার রাস্তা থেকে তুলে আনা পুষ্যিদের খবরদারি রাগারাগি করতে-টরতে হলেও মা-ই করেন। কিন্তু চামচিকেদের বেলায় মাকে রাজী করানো মহা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। না, "ওই নোংরা, কালো কুচ্ছিত, আর হিংস্রমূর্তি" প্রাণীদের মা তুলোয় করে দুধ খাওয়াতে পারবেন না। অতটুকু বাচ্চাদের "হিংস্রমূর্তি"টা যে কোথায় তা মাকে কে বোঝাবে! বাবা অবিশ্যি বার দুই আমার পক্ষ নিয়ে—"আহা মেয়েটা অত করে বলছে" বলে বাক্য শুরু করেছিলেন, ঠাণ্ডা গলায় মা দুবারই—"তাহলে তুমিই খাওয়াও না"—বলায় আর তৃতীয়বার মুখ খোলেননি। আমিই 'একা কুম্ভ' হয়ে ওদের রক্ষাকার্যে নেমেছি।

ছোট একটা বিস্কুটের টিনে খবরের কাগজ বিছিয়ে ওদের বাসা করে দিয়েছি। নিশ্বাস নেবার জন্যে ঢাকনিতে পেরেক ঠুকে ঝাঁঝরা করে তৈরি হয়েছে ঘুলঘুলি। তেমন কিছু ঝামেলা নেই, কেবল খিদে পেলেই উদ্দাম কিঁচকিঁচ শব্দ জুড়ে সারা বাড়ি মাথায় করে। অতটুকু শরীরে এতজোর গলা। মা কেবলই বলেন—"অতিষ্ঠ করে মারলে এগুলো। দেবো একদিন টিনসুদ্ধ ডাস্টবিনে ফেলে। বাড়ি তো নয়, এমনিতেই একটা চিড়িয়াখানা এটা। কুকুর-বেড়াল-কাঠবেড়ালী, পালে পালে খরগোশ, ঝাঁকে ঝাঁকে লাল মাছ, খাঁচা খাঁচা চিনিয়া মুনিয়া বদ্রীগড়...বাবারে, এততেও মেয়ের আশ মিটল না, আবার চামচিকেও জুটল? এমনিতেই লোকে বলে বাড়িতে চিড়িয়াখানার গন্ধ। নাঃ, বাড়িখানা আর মানুষ বসতের যুগ্যি রইল না। একমাত্র সন্তান যেন জগতে কারুর আর হয়নি—এ তো গান্ধারীর সংসার হয়ে দাঁড়িয়েছে"—এক-একদিন সত্যি সত্যি চামচিকেগুলো ভয়ানক বিরক্ত করে—জানি না ওদের কী যে হয়, বড্ড বেশী বেশী চিকচিক করে। সেদিন মার মাথা ধরেছিল খুব, চামচিকেরা চেঁচানোয় তা আরো বেড়ে গেল। মা রেগেমেগে বললেন—"যাক খুকু আজ কলেজে বেরিয়ে, দিচ্ছি তোমাদের বিদায় করে। গুণনিধি।"

ওই "গুণনিধি" ডাকেই আমার বুকের ভেতর রক্ত শুকিয়ে গেল। আমি জানি

এবার কি হবে। অস্থির হয়ে উঠলে মা ঐভাবে গুনিয়াভাইকে (আমাদের ঠাকুর, প্লাস ঝি, প্লাস নায়েব, প্লাস গার্জেন, প্লাস দারোয়ান, প্লাস জন্তুদের জমাদার, প্লাস জন্তুদের জহ্লাদ) ডাকে। তার পরেই গুনিয়া আমার আনা খোঁড়া বেড়াল, প্যারালাইজড কুকুর ইত্যাদিকে রিকশা করে বন্দেল রোডে জন্তুদের হাসপাতালের উঠোনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে। শেষটায় এমন হলো যে গুনিয়াভাইকে হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে দেখলেই ওখানকার ডাক্তার নার্স কম্পাউণ্ডার জমাদার সক্কলে মিলে পেন্সিল, পেপারওয়েট, টুথব্রাশ, ঝাঁটা, লাঠি, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ—যে যা হাতে পায় তাই নিয়েই রৈ রৈ করে ক্ষেপে তেড়ে আসে..."সর্বনাশ। আবার কিছু রুগী ছাড়তে এসেছে রেঃ!" এই বলে। কিন্তু চামচিকেদের কপালে বন্দেল রোড নেই। ওরা, বেশ বোঝা গেল, ডাস্টবিনেই যাবে। অর্থাৎ কুকুর বেড়ালের পেটে। তা তো হতে দেওয়া যায় না। অগত্যা চামচিকের টিনটা ঝোলাব্যাগে ভরে বইখাতার সঙ্গে কলেজে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ মনে করলুম। আলাদা একটা সিগারেটের টিনে রইল দুধে ভেজানো এক ডজন তুলোর সলতে। ক্লাসের ফাঁকে এক সময়ে খাইয়ে আনবো।

আমি কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম কৃষ্ণের জীব হয়ে ওরা এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে? মানুষ ছাড়া আর কোনো পোষা প্রাণী যে কৃতঘ্ন হতে পারে, তা কে জানতো।

খুব মন দিয়ে আমরা তখন ইয়োরোপের রোমান্টিক কবিতা বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করছি, হেনকালে ক্লাসের মধ্যে মৃদু কিঁচকিঁচ শব্দ।

স্যার এদিকে তাকান ওদিকে তাকান, চোখ সরু করে ঘুলঘুলির দিকে তাকান, কোনো হদিস পান না! এদিকে কিঁচকিঁচ শব্দ আর মৃদু থাকছে না। ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল। স্যার এবারে শব্দভেদী দৃষ্টি আমার দিকেই নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অথচ আমি তো ভেন্ট্রিলোকুইস্ট নই, শব্দটার উৎস স্পষ্টতই আমি না। স্যারের জোড়াভুরু যতই প্রশ্নচিহ্নের আকৃতি নিতে থাকে...চশমার নিচে, গোঁফের তলায়, আমার বন্ধুদের চোখ আর ঠোঁটগুলো ততই চাপা হাসিতে চকচক করতে থাকে। তারা তো জানে এ শব্দ-শৃঙ্গার উৎস কোথায়। চিকচিক্কারে অস্থির হয়ে ঠিক করলুম ক্লাসের শান্তিবিধানের জন্য ওদের একটু দুধ খাওয়ানো দরকার। নিশ্চয় তাতে চুপ করবে। ক্লাসকে বড্ড ডিসটার্ব করছে ওরা। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সেকেণ্ড বেঞ্চে বসে আছি, দরকারী কাজটা সেখানে গোপনে সেরে নেওয়া কিছুই না। খুবই সোজা। প্রণালীটা এইরকম—(১) ঝোলাব্যাগ থেকে সিগারেটের টিন বের করে (২) তা থেকে দুধে ভেজানো তুলো বের করে (৩) ঝোলাব্যাগ থেকে চামচিকের টিন বের করে (৪) একটি ঢাকনি ফাঁক করে (৫) তার ভেতরে ওই দুধের সলতেটা গুঁজে দিতে হবে। এখন ওরা নিজেরাই দিব্যি খেতে শিখেছে তুলো চুষে চুষে। খাইয়ে দিতে হয় না।

প্রথম কর্মটি, অর্থাৎ ঝোলাব্যাগ থেকে সিগারেটের টিন বের করা, নির্বিঘ্নেই

সমাধা হলো স্যারের চোখের অন্তরালে। এবারে যেই ঢাকনিটা খুলে তুলো বের করব, বিশ্বাসঘাতক ঢাকনি হাত ফসকে মেঝেয় পড়ে গেল ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎ। তার পরমুহূর্তেই ট্যাং-ট্যাং-ট্যাং...ট্যাং করে মহাউল্লাসে কাঁসরঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চাকার মতো গড়িয়ে চলল কোণাকুণি মেঝে পেরিয়ে সোজা স্যারের দিকেই। স্যারের টেবিলের নিচে দিয়ে গলে গিয়ে পিছনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। স্যার বই থেকে মুখ তুললেন। আমি বইতে মুখ নামালুম। কাতর। উদ্বিগ্ন।

—কী হলো? কী পড়ল ওটা?

—কিছু না স্যার।

—কিছু না মানে? কী পড়ল শব্দ করে?

—ঢাকনিটা, স্যার।

—কিসের ঢাকনি?

—টিনের।

—সে তো শব্দেই মালুম হচ্ছে। টিনটা কিসের?

—সিগারেটের।

স্যারের ভুরু জট পাকিয়ে গেল।

ঘরে দু'মিনিট শোকপালনের স্তব্ধতা। তারপরেই স্যারের কণ্ঠস্বরটি একেবারে অচেনা হয়ে এসে কানকে আঘাত করল—

—আই সী। ক্লাসের ভিতরেই আজকাল সিগারেটের টিন...

—আরে না না স্যার...ছি ছি ছি...য্যাঃ...তাই কখনো হয়? সিগারেট কেন হতে যাবে, ওটা তো তুলোর টিন। বলে ফেলে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু তুহিনশীতল একটি কণ্ঠ ভেসে আসে, হাড়ের ভেতরে কাঁপুনি জাগিয়ে দেয়—

—সিগারেট কেন হবে, তুলোর টিন? ডিড ইউ সে, তুলো?

—এ্যাঁ, হ্যাঁ, না স্যার, মানে, ঠিক তুলো নয়, আসলে ওটা হচ্ছে দুধের টিন।

যাক বাবা, সত্যি কথাটা জানিয়ে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু স্যার যেন হঠাৎ হিমশৈল হয়ে আর্কটিক ওশ্যানে ডুবে যান। কেবল চুড়োটুকুই ভেসে আছে, বাকীটুকু সমুদ্রের গভীরে। খুব শান্ত গলায় ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলেন—

সিগারেট মানে তুলো তার মানে দুধ? ক্লাসে ওটা দুধের টিন? টেল মী নবনীতা, হোয়াট ডু ইউ থিংক আই অ্যাম? অ্যান ইডিয়ট?

—ছি ছি ছি, এসব কী বলছেন স্যার? বিশ্বাস করুন দুধেরই তুলো। দুধের তুলো সিগারেটের টিনে। হেনকালে নেপথ্যে প্রবল কীঁ-ই-ঈ-চ কীই-ঈ-চ। স্যার চমকে ওঠেন।

—অমিয়, বেশ কিছুক্ষণ এই শব্দটা পাচ্ছি। কিসের শব্দ ওটা বল তো?

আমিই তাড়াতাড়ি বলে উঠি—ও কিছু না স্যার।

—তুমি চুপ করবে কাইগুলি? অমিয়, বল তো কিসের শব্দ ওটা?

অমিয় চুপ। সমস্ত ক্লাস নিস্পন্দ। কপাল থেকে ঘামের ফোঁটাটি টেবিলে ঝরে পড়লে, তারও প্রতিধ্বনি উঠবে। এমন সময়ে নিস্তব্ধতা চিরে খুব জোরে অধীর শব্দ হয়—

—কীঁঈ ঈচ, কীঁ-চ কীঁ—চ...

স্যার অস্থির হয়ে পড়েন—"কিসের শব্দ? কিসের শব্দ ওটা?"—আমি আর থাকতে পারি না।

—এই ছানাতেই শব্দ করছে স্যার। এই যে এখানে আমার কৌটোর মধ্যে। একটু দুধ দিলেই থেমে যেত স্যার।

—"ছানার শব্দ? টিফিন কৌটোর মধ্যে ছানা অমন শব্দ করছে? দুধ দিলে সেটা থামত?"

স্যার খুব গম্ভীর হয়ে যান।—লুক হিয়ার ইয়ং লেডি, দিস ইজ অ্যান এডুকেশন্যাল ইনসটিটিউশন। অ্যাণ্ড দেয়ার শুড বি আ লিমিট টু এভরিথিং।

মনে মনে যেন শুনতে পেলুম—'এটা কি নাট্যশালা?' চোখের জল অতিকষ্টে আটকে রাখতে রাখতে আকুলকণ্ঠে ব্যাখ্যা করি—"এ ছানা সে ছানা নয় স্যার। এ চামচিকের ছানা—"

—চামচিকে? এই সদ্য তৈরি নতুন বিলডিঙে চামচিকের বাসা? কখনো চামচিকে থাকতে পারে এখানে? এখনও চুনকাম শেষ হয়নি—

—আছে স্যার, আছে। (নেপথ্যে কীঁঈঈচ)।

—কে শব্দ করছো, হাত তোলো। হাত তোলো বলছি, তিন মিনিট সময় দিচ্ছি।

কোনো হাত উঠল না। কিন্তু স্যারের হঠাৎ চীৎকারে কীচকীচ আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল।—"থ্রি-মিনিটস ওভার কী? কেউ হাত তুললে না কেন?"

—ওদের যে হাতই নেই স্যার।—আমি বলে ফেলি।

—উইল ইউ কীপ কোয়ায়েট? ফর হেভেন্স সেক।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল চিকচিক্কা। এবারে স্যার কান খাড়া করে শব্দ সন্ধান করেন।

—তোমরা কি বলতে চাও এ ঘরে সত্যি সত্যিই চামচিকে ঢুকেছে?

স্যারের ফর্সা মুখ রাগে লাল। কথা সরছে না। বয়সে বড়ো বলে তরুণই এ ক্লাসের সর্দার পোড়ো। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—

এবারের মতো নবনীতাকে মাপ করে দিন স্যার, ছেলেমানুষ না বুঝে একটা দোষ করে ফেলেছে, আর করবে না। আস্তে করে স্যার বললেন, না বুঝে? না বুঝে নিজে আওয়াজ করে বলছে চামচিকের ছানা? না বুঝে ক্লাসের মধ্যে টিন পেটাচ্ছে?

এবার ক্লাসসুদ্ধ প্রতিবাদ করল, ও টিন বাজায়নি স্যার, ঢাকনিটাই তো পড়ে গেল।

প্রণবেন্দু বললে, খাঁটি চামচিকের বাচ্চাই ডাকাডাকি করছে, ভালো করে শুনুন —নকল নয়।

—সত্যি সত্যি এখানে চামচিকে হয়েছে নাকি? স্যার এবারে মনে হয় বিশ্বাস করলেন। সন্দেহ ভঞ্জন করতে ভবানীদাকে ডাকেন—ভবানীদা এ ডিপার্টমেন্টের বেয়ারা এবং গার্জেন।

—ভবানী, এই ক্লাসরুমে নাকি একটা চামচিকে ঢুকেছে?

—এট্টা না ছার, দুইডা। এক্কেরে দুগ্ধ পোইষ্য। এই এত্তটুকু দুইডা। সস্নেহ হেসে ভবানীদা আমার দিকে তাকায়, যেন আমিই এত্তটুকুনি দুগ্ধপোষ্য চামচিকে। স্যার অবাক হয়ে ভবানীদা যে ইংরিজি জানে না সেটা ভুলে যান—

—ইউ মীন টু সে দেয়ার ইজ আ ফ্লিটার মাউস...

ফ্লিট? ফ্লিট দিয়া কী অইব? ফ্লিট দিলে তো চামচিকা যায় না। আর এ দুইডা তো দিদিমণির ব্যাগেই আছে। ওনার পোইষ্য পুত্র।

তরুণ বলে—ফ্লিট নয়, ফ্লিটারমাউস। যাক বাবা, একটা নতুন নাম শেখা হলো। চামচিকের ইংরিজি কি কেউ জানতে?

স্যারের গলার স্বর এখন বদলে গেছে। এমনিতেও স্যার রাগী নন, বেশ ভালোমানুষই। তবে খামখেয়ালী।

—নবনীতা, তোমার কাছে চামচিকে আছে?

—আছে স্যার।

—সব সময় তুমি হ্যাণ্ডব্যাগে চামচিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও?

—সব সময় না স্যার। আজই কেবল। মা কিনা বলছিলেন ওদের ফেলে দেবেন, সেই ভয়ে—আমার চোখের জল আর রাখা যাচ্ছে না, গলা বুজে গেল।

—ক্লাসের ছেলেরা তখন—"কই? কই? দেখি দেখি কই চামচিকে? কোথায় চামচিকে? একটু দেখি স্যার? একবারটি দেখব স্যার?" ইত্যাদি বলে বেজায় হট্টগোল বাধিয়েছে। পড়ার বারোটা বেজে গেছে। স্যার অনুমতি দিলেন—

—ও. কে, লেট আস সী দেম। ভয়ে ভয়ে কম্পিত হস্তে ঝোলা থেকে বিস্কুটের কৌটো স্যারের টেবিলে রাখা হয়। এবার খোলা হবে। অল্প ফাঁক করতেই হঠাৎ জোরসে ডানা ঝটপটিয়ে তেড়ে বেরিয়ে এল ক্ষুধার্ত দুটো হতকুচ্ছিত ভূতের মতো প্রাণী, বীভৎস আওয়াজ করতে করতে সারা টেবিলে হামা টেনে গড়িয়ে বেড়াতে লাগল কালো কালো ডানা ছড়িয়ে।

সেই ভয়াবহ দৃশ্যে ক্লাসসুদ্ধ আঁতকে উঠল, সমবেত নিশ্বাসটানার আঁক করে একটা কোরাস আর্তনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্যারের চেয়ার ঠেলবার কাঁচক্যাচাৎ শব্দ হলো—তিনি চেয়ারসুদ্ধ স্লিপ করে পিছিয়ে সড়াৎ করে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে ঠেকে গেলেন।

—গুড গ্রেশাস। হোয়াট আ সাইট। ফেলে দাও, এক্ষুনি ফেলে দাও। এই

নাকি কোনো তরুণী মেয়ের হ্যাণ্ডব্যাগে রাখার জিনিস? অ্যাঁ?

ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে ক্লাসের মধ্যে, সবাই যে যার জায়গা ছেড়ে উঠে স্যারের টেবিলের চারিপাশে জড়ো হয়ে চামচিকের ছানা দেখছে, এমন সময়ে ঘণ্টা পড়ে গেল। আমিও বাঁচলুম স্যারও বাঁচলেন। বেরুবার সময়ে তর্জনী তুলে আমাকে বলে গেলেন—আর কোনোদিন ওসব বিশ্রী জিনিস আনবে না। এক্ষুনি ফেলে দাও ওগুলো।

আমি ততক্ষণে আর চোখের জল চাপতে পারিনি। একঘর বন্ধুর সামনে হাপুস নয়নে ক্রন্দনে যত লজ্জা, তত অপমান—প্রেস্টিজ বলে কিছু রইল না। অতঃপর ঝোলাঝুলি কৌটোবাটা গুটিয়ে চক্ষু মুছে স্বগৃহে চম্পট, সেদিনের মতো ক্লাসে ইস্তফা। প্রতিজ্ঞা করলুম, এই অকৃতজ্ঞ জন্তুদের আর কোনোদিন কোথাও সঙ্গে করে নিয়ে যাব না।

কলেজের করুণ কাণ্ডকারখানা শুনে মারও দয়া হলো। মা ওদের খাবার দাবার দিতে রাজী হয়ে গেলেন। দিনে দিনে চিকা আর ফ্লিটার দিব্যি বেড়ে উঠল, বিস্কুটের টিনে আর আঁটে না, খাঁচায় ট্রান্সফার করা ঠিক হলো। পাকা কলা, পাকা পেয়ারা এইসব খায় এখন। ভাবছি ওদের গলায় দুটো কলার পরানো যায় কিনা, বেশ রংচঙে দেখে। সময়ে একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি, যেখানে ওদের বাক্সটা থাকতো সেখানে পরিষ্কার কাগজ পাতা। ফাঁকা। কী হলো? খাঁচায় চলে গেল নাকি? কে ঢোকাল?

জিগ্যেস করতেই মা হৈ-হৈ করে উঠলেন :

—ওরে বাবারে, খুকু, তোর পুষ্যিরা আজ আমাকে অ্যাটাক করেছিল। যেই ঢাকনাটা খুলেছি খেতে দেব বলে, অমনি দুজনে ডানা ঝটপটিয়ে তেড়ে এল। আমি তো হাত থেকে টিন-ফিন ফেলে দিয়েছি ভয়ে, আর অমনি চটপট উড়ে পালিয়ে গেল দুটোতে। যতই যত্ন কর, চামচিকে বলে কথা! ওরা কখনো পোষ কি মানে? দুঃখু করিস না তুই।

আমিও বুঝলাম, ম্যামাল হয়েও যে উড়ে বেড়ায়, যার ডানা আছে কিন্তু পালক নেই, সে কখনো বিশ্বাসী হতে পারে? আর এমন কৃতঘ্ন প্রাণীকে সংরক্ষণ করেই বা কী লাভ? মাকে যে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়নি সেই রক্ষে।

আমাদের বাড়িতে প্রজেক্ট চর্মচটিকার সেইদিনই মহাপরিনির্বাণ ঘটে গেল।

এর পরেও কি আপনারা কেউ চামচিকে পুষতে চাইবেন? ওরা সত্যি-সত্যিই মনুষ্যেতর, অর্থাৎ মানুষের চেয়েও ইতর প্রাণী। জগতে যা দুর্লভ।

প্রাণবিন্দুবাবুর খরগোশ

খরগোশ পোষা সহজ নয়। চাঁদের নাম শশধর। চাঁদের বুকে বিধৃত আছে যে জীব, তার মতো প্রমিনেন্ট আর কে? স্বয়ং ঈশ্বর তার ফোটো তুলে ফ্রেমে বাঁধিয়ে, লাইট ফিট করে, আকাশে টাঙিয়ে রেখেছেন। খরগোশ কি আর এই পৃথিবীর যোগ্য জীব? আজকের কবি তো তার উদ্দেশেই গেয়েছেন—"ঠোঁট দেখলেই বুঝতে পারি...এ পৃথিবী বিদেশ তোমার!" খরগোশ, বিশেষ করে অবিবাহিত একা খরগোশ—সত্যি সত্যি এক আশ্চর্য জীব। সে তো অন্য খরগোশ দেখতে পায় না, ডেজার্ট আইল্যাণ্ডে বেড়ে ওঠার মতো, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মতো, সে ইনোসেন্ট থাকে। দ্যাখে কেবল কুকুর-বেড়াল, কাক-চড়ুই, গাড়ি-টেলিফোন, আর মানুষ। আর নিজেকে কখনো ভাবে এটা, কখনো বুঝি ওটা। ওদের কথা ভেবেই তো শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে —"আত্মানং বিদ্ধি," know thyself ইত্যাদি। কিন্তু খরগোশ কি শাস্ত্র জানে? জানে না। তাই ওরা—এই গৃহপালিত, নিঃসঙ্গ, স্বজাতিচ্যুত, আত্মপরিচয়হীন খরগোশেরা —সর্বক্ষণ একটা অস্তিত্ববাদী সমস্যায় জর্জরিত হয়। অথচ জোড়া-খরগোশ পোষার মতো সাহস ক'জনের থাকে?

গরু পুষলে গরু দুধ দেয়, কুকুর পুষলে কুকুর বাড়ি পাহারা দেয়, বেড়াল পুষলে বেড়াল ইঁদুর তাড়িয়ে দেয়—খরগোশ পুষলে? খরগোশ আরো খরগোশ দেয়। এত খরগোশ দেয় যে শেষ পর্যন্ত খরগোশের বাড়িতেই মানুষরা বাস করতে থাকে। তাই জোড়া খরগোশ পোষা বড় ডেনজারাস। আর একা-খরগোশ পুষলেই সে একটা নিউরোটিক কেস হতে বাধ্য। হয় সে পাগল, নয় সে জিনিয়াস। নিউরোটিক পাগল খরগোশ আমি জীবনে অনেক দেখেছি। কিন্তু জিনিয়াস খরগোশ দেখেছি মাত্র একটিই।

জগতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাতঃস্মরণীয় সেই খরগোশ হলেন কবি প্রাণবিন্দুবাবুর পোষা খরগোশ 'সোনা'। তাঁর বয়স এখন সাত। এই সাত বছর ধরে তিনি যে কত কীর্তিই করলেন—তার সঠিক হিসেব বউদিও দিতে পারবেন না। বউদির নয়নমণি হলেন প্রথমে এই খরগোশ—এবং তারপরেই নেক্সট প্রাণবিন্দুবাবু। কবি হলেও, প্রাণবিন্দু লোক খারাপ নন—কেননা তিনি ভীষণ বেশি কুঁড়ে। মাছের কাঁটা বৌদি বেছে না দিলে শুধু ঝোল দিয়েই ভাত খান, নস্যিটা নিয়ে ভুঁড়ি থেকে গুঁড়োটুকু ঝাড়েন না, কথাবার্তা খুবই কম বলেন (তাই পরনিন্দাও করা হয়ে ওঠে না), কেননা তাতেও কিছু কায়িক পরিশ্রম হয়ই, জিভ নড়ে, ঠোঁট নড়ে, চোয়াল নড়ে। তাঁর খরগোশ ঠিক এর বিপরীত। সে সদা-সর্বদাই নড়ছে। তার সূক্ষ্ম নাক নড়ছে, লেজ নড়ছে, চক্ষুতারকাদুটি নড়ছে, খুদে খুদে পায়ের সরু সরু আঙুলগুলো নড়ছে, তার সর্বাঙ্গ সর্বক্ষণ নড়নশীল। কর্মচঞ্চল, সদাসক্রিয় এই দুর্দান্ত শশকের তুল্য কুকুর-বেড়াল কি গরু-ছাগল কেন, ওরাংওটাং, গরিলা, ডলফিন, চামচিকে কিছুই আমি দেখিনি।

আপনি ভাবছেন বুঝি খরগোশ অকর্মণ্য? খরগোশ বাড়ি পাহারা দেয় না? এই খরগোশ দেয়। প্রাণবিন্দুবাবুর বাড়িতে একদিন গেলেই বুঝবেন। প্রথমে খরগোশই আপনার কাছে আসবে। রক্তচক্ষু মেলে, গোলাপী নাসিকা কুঞ্চিত করে, অতিথির আদ্যোপান্ত সে ঘুরে-ফিরে নেচে-কুঁদে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে। যতক্ষণ না আপনি হয় ভয় পাচ্ছেন, নয় আদর করছেন। ভয় পেলে, ফাইন। নো প্রোবলেম। সেটাই তো সে চায়। তাতে তার অহং তৃপ্ত হয়, ইগো-র স্যাটিসফ্যাকশন ঘটে। ভয় পেয়ে "বাপরে-মারে-গেছি রে" করলেই সে খুশি হয়ে স্থানত্যাগ করবে। কিন্তু "ওমা, কী মিষ্টি," বলে যদি কোলে নেন? সর্বনাশ। অমনি সে কুটুশ করে আপনাকে কামড়ে দিয়ে পুটুশ করে পালিয়ে যাবে। কেননা আপনার আদর খাওয়া নয়, আপনাকে ভয় খাওয়ানোই তার উদ্দেশ্য। তখন সে নিজেকে অ্যালসেশিয়ান কিংবা বুলডগ ভাবছে। এই কারণেই তো প্রাণবিন্দুবাবুর বাঁ তর্জনীর নোখসুদ্ধ প্রথম কড়টি আলগা ঝুলে পড়েছিল বছর কয়েক আগে। সেই এই খরগোশের প্রথম এক্সপেরিমেন্টাল কামড়। নটা স্টিচ দিতে হয়েছিল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণবিন্দুবাবুকে। আর ওরকম হয় না অবশ্য। কেননা বউদি নেলফাইলটা দিয়ে উকো ঘষে ঘষে ওর থোঁতা দাঁত ভোঁতা করে দিয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে আর বাড়ির কত্তাকে কক্ষনো কামড়ায়নি। তারপর থেকে কেবল বাইরের লোকদেরই কামড়ায়। তা বলে ভোঁতা দাঁতেও সে দিব্যি ভেলকি খেলাতে পারে। সেবারে যখন কলকাতায় খুব ডেঙ্গু হচ্ছিল, বাড়িতে অতিথিপত্তর তেমন আসছিল না কিছুদিন, ও তখন কামড় প্র্যাকটিস করতে করতে গোটা রেফ্রিজারেটরটাই বিকল করে ফেলেছিল। এত্তোবড়ো টেন কিউবিক ফিট জর্মন মেশিন, যেটা ছজন কুলি মিলেও নড়াতে বেগ পায়, অতটুকু প্রাণীর সেটা ভাঙতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগলো। ডেভিডের যেমন গোলিয়াথকে মারতে। কী, বিশ্বাস হলো না? প্রাণবিন্দুবাবুকে ফোন করে জেনে নিন (৭২–২০২৫ নম্বরে) সত্যি কিনা। একটা আস্ত রেফ্রিজারেটর নষ্ট করতে একটা খরগোশ অনায়াসেই পারে। রেফ্রিজারেটরের যেমন হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করে, তেমনি তার একটি ল্যাজও লটকানো থাকে যে দেয়ালে! প্লাগের সঙ্গে। বউদির আহ্লাদী সোনামণি কামড়ে কামড়ে সেই তারটাকে কিমা বানিয়ে ফেলেছিল। আসলে সেই সময়টা দিয়ে কিছুদিন সোনা নিজেকে কুকুর না ভেবে "উই আর ইঁদুরের" সগোত্র বলে ভেবেছিল। ওকে ফ্রিজের পেছনে খুটখুট করতে দেখেছে সকলেই, কিন্তু কেউ কল্পনাও করেনি ওখানে কী ধরনের সাংঘাতিক সাবোটাজ কার্য সংঘটিত হচ্ছে। অবশেষে অপরাধী ধরা পড়লো। কুচি কুচি তার মেঝেময় ছড়ানো, ঠিক যেন খরগোশে কপিপাতা কুচিয়েছে। কোথায় ধমক লাগাবেন, তা নয়, বউদি খরগোশ কোলে করে হাপুস নয়নে কাঁদতে বসলেন..."ভাগ্যিস তখন লোডশেডিংটা ছিলো। নইলে ওরে আমার ছোট্ট সোনাটারে, ওরে আমার বুদ্ধু বোকাটা রে, এতক্ষণে তুই কোথায় থাকতিস? এই অলুক্ষুণে সব্বোনেশে এ. সি. এরিয়ায়? একি আমার ডি. সি.

কারেন্ট বাপের বাড়ি, ভবানীপুর, যে মনের সুখে ইলেকট্রিকের তার কুচোবি?" আর সেই দস্যি খরগোশ? সে ব্যাটা দিব্যি "বড্ড বেঁচে গিয়েছি বাবা" মুখটি করে গুটিশুটি কোলের মধ্যে বসে রইলো, যেন কিছুই করেনি।

এহেন খরগোশের আর ত্রিভুবনে অসাধ্য কী আছে? যার কল্যাণে লোডশেডিংটাও একটা ধন্যবাদের বস্তু হয়ে ওঠে?

জিনিয়াস হলেই যা সাধারণত হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এ খরগোশ লোক মোটেই ভালো নয়। নিজের প্রতি পরম আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও সোনা বড় পর-অপকারী, হিংস্র এবং হিংসুটেও। তাছাড়া রাগী। এবং লোভী এবং পরের ব্যাপারে তার অতিরিক্ত কৌতূহল। সব-কিছুতেই গোলাপী প্রকম্প্র নাকটুকু গলানো চাই। আবার অভিমানীও আছে। উপরন্তু তার সাংস্কৃতিক রুচি অরুচিও টনটনে। কেবল সে যে জাতে আসলে খরগোশ, এইটাই তার জানা নেই। ফর্ম্যাল নাম যদিও 'সোনা', ঐ নামকে সে মোটেই পাত্তা দেয় না। যতই ডাকুন, "সোনামণিটা কই?" ভবি ভুলবে না। কিন্তু যদি বলেন..."খরগোশটাকে তো দেখছি না?" অমনি পড়ি কি মরি করে সোনা হাজির। ওর ধারণা, 'খরগোশ' ওর ব্যক্তিগত পরিচয়, ওরই একান্ত নিজস্ব নাম। খরগোশ বলে যে একটা জাতি আছে প্রাণিজগতে, এ সংবাদ ওকে কেউ দেয়নি। বউদি অবশ্য খরগোশকে খরগোশ বলে ডাকা বা কবিকে কবি বলে ডাকা বা খঞ্জকে খঞ্জ বলা, পছন্দ করেন না।

অবশ্য সোনার নামটা সোনা না হয়ে বিচ্ছু হলেই যথাযথ হতো। বিচ্ছু বলে বিচ্ছু!

একে একে বলি।

এত হিংসুটে খরগোশ আমি আর দেখিনি। বাড়িতে কোনো বাচ্চা এলে বউদি তাকে কোলে নিলে আর রক্ষে নেই। খরগোশও ছুটে এসে কোলে উঠে জুড়ে বসবেই। তবে কেন জানি না, ছোটদের ও ক্ষ্যামাঘেন্না করে কামড়ায় না। শুধু কি চোখে দেখেই হিংসে? কানে শুনেও। টেলিফোনে কথা বলেন? খরগোশ অমনি টের পাবে। সে হয়তো আপনমনে বারান্দায় টবে উঠে ডালিয়া ফুলের নিচু ডালের কুঁড়িগুলি কুচিয়ে খাচ্ছিল...পড়ি কি মরি করে ছুটে আসবে ফোন করা হচ্ছে বুঝতে পারলেই। আর ফোনযন্ত্রের ওপরে ঝপাৎ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে 'ডু অর ডাই' স্টাইলে। ফোনযন্ত্রের সঙ্গে বউদির যোগাযোগ সে একদম সইতে পারে না। খরগোশকে আগে মোড়াচাপা দিয়ে রেখে, তবে ফোন করতে হয়। নইলে খরগোশ ফোনটাকে সবেগে আক্রমণ করে। আঁচড়ে কামড়ে নিজেরই নাকমুখ ছেঁচে ফেলে। ফলে ফোনের জন্যেই একটা খাঁচা বানিয়ে দিতে হয়েছে। খরগোশের কোনো খাঁচা নেই।

হ্যাঁ, ছেলেবেলায় অবশ্য ছিল। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেও যখন তারের জাল কাটতে পারলো না তখন অভিমানের চোটে জালে নাকটি ঘষে ঘষে রক্তগঙ্গা করলো। দুঃখে গদগদ হয়ে বউদি ওর জন্যে পাটকাঠি দিয়ে স্পেশাল খাঁচা বানিয়ে দিলেন।

সেই ভেলভেটের মতো নরম কাঠিতে নাক ঘষলেও রক্ত পড়বে না। খরগোশ তো এদিকে ভীমভবানী, গোবরবাবু। পাটকাঠির খাঁচা পেয়ে সে দু মিনিটেই খাঁচা-টাঁচা ভেঙে বেরিয়ে বিজয়ী বীরের মতো মার্চ করে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যেন প্রেসিডেন্সি জেল ভেঙে বেরিয়েছে!

সেই থেকে সোনা ছাড়াই থাকে। রাত্রে বউদির খাটে উঠে ঘুমোয়। ইদানীং ফোনের প্রতি তার হিংসে এত বেড়েছে যে ফোনের সময়ে সে যে অপকম্মোটি করে, সেটি লেখনযোগ্য নয়। ফোন বাজলেই হলো অথবা ডায়াল ঘোরানোর শব্দ হোক, অমনি খরগোশ দৌড়ে এসে বউদির শ্রীচরণে গরম গরম এক চামচ চরণামৃত ঢেলে, আবো দৌড়ে পালিয়ে যাবে। এই হচ্ছে তার শেষ অহিংস প্রতিবাদ—এবং দৃষ্টি আকর্ষণের শেষ পদ্ধতি। ধর্না ঘেরাও ফেল করলে ছাত্র-শ্রমিকরাও এ পদ্ধতিটা হয়তো ট্রাই করবেন ভবিষ্যতে। একে জিনিয়াস ছাড়া কীই-বা বলা যায়?

সোনার কল্পনার শেষ নেই। বিকেলে চারটে বাজলেই সোনা চায়ের টেবিলে ঘুরঘুর করতে থাকে। প্লেটে করে তাকে একটু চা ঢেলে না দিলে সে প্রাণবিন্দুবাবুর কাপের ওপরেই হামলে পড়ে। জানে কিনা, যে তিনি মানুষটি কুঁড়ে...অত কষ্ট করে খরগোশ-টরগোশ তাড়িয়ে চা খাবার মতো পরিশ্রমে অপারগ। প্রাণবিন্দুবাবুর চা-টি খেয়ে নিয়েই সে সোজা আলমারির কোণে চলে যায়। এবং তারপরেই ফুলঝাড়ু খাওয়ার খচর মচর শব্দ হতে থাকে সেখানে। চা দিয়ে ফুলঝাড়ু খাওয়ার ওর একটা শৌখিন অভ্যেস। নেশাই বলা যায়। নেশায় মানুষ কি না করে? নেশার কবলে পড়ে মানুষই মানুষের সর্বনাশ করে ফ্যালে, আর এ তো সামান্য খরগোশ। ও যে নেশার ঘোরে মানুষের সর্বনাশ করবে এ তো সোজা কথা। লোকে কেবল মদের নেশার কথাই শোনে...কিন্তু চায়ের নেশাও যে কতদূর সর্বনেশে হতে পারে, আমরা তা বুঝলুম এই খরগোশকে দেখে। প্রাণবিন্দু-বউদির ছোট বোনের অত চমৎকার সম্বন্ধটি ভাঙলো কেন? এই নেশাড়ু খরগোশের জন্যেই তো।

মেয়ে দেখতে এসেছিলেন পাত্রের কাকা-কাকিমা আর দিদি। বউদি, বউদির বোন, প্রাণবিন্দুবাবু, সকলেই উপস্থিত আছেন, আমরাও রান্নাঘরের কাছাকাছি ঘুরেফিরে উপস্থিত আছি, যেহেতু প্রাণবিন্দুবাবুর মা, জেঠিমা সেই ঘরে খুব ব্যস্ত, নানারকম প্রাণমাতানো দরকারী গন্ধ বেরুচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব বেশ জমেছে, এমন সময়ে বউদির বিয়ের দান-এ পাওয়া শৌখিন বিলিতি টী-সেটে সোনার বর্ণ চা এলো। পাত্রের কাকা চায়ের কাপটি মুখে তুললেন, কাকিমা চা হাতে নিয়ে গল্প করছেন, ঠিক মুখে তুলবেন, এমন সময়ে সোনা কোথা থেকে তেড়ে এসে ভীমবিক্রমে তাঁর কাপের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। মোড়াচাপা দিয়েই রাখা হয়েছিলো তাকে...এই অসময়ে তার বেরুনোর কথা নয়। কিন্তু তালেগোলে কে কখন মোড়াটা সরিয়ে ফেলেছে। আর যায় কোথায়? সোনা সোজা চায়ের টেবিলে। খরগোশের এই ব্যাঘ্র ঝম্পনে বরের কাকিমার হাত থেকে বিলিতি কাপ মেঝেয় পড়ে ঝনঝন

করে ভেঙে গেল। ভাঙবার আগে খানিক চা ছলকে পড়ল পাত্রের দিদির ঢাকাই জামদানিতে।

সঙ্গে সঙ্গে তিন দফা প্রচণ্ড হায়-হায় হা-হা রব—আর এক দফা ঝর্ণার মতো খিলখিল হাসি শোনা গেল। আমরা দরজার কাছে দৌড়ে এলুম। কী ব্যাপার?

ব্যাপার চাররকমের : এক = বউদি তাঁর বিয়ের বিলিতি কাপ ভাঙার দুঃখে ডুকরে উঠলেন (পাত্রপক্ষের সামনে এটা ভুল ট্যাকটিস হয়ে গেল)।

দুই = পাত্রের দিদি তাঁর ঢাকাই জামদানিতে চা পড়ে দাগ লেগে যাবার শোকে বিলাপ করে উঠলেন।

তিন = পাত্রের কাকিমার পায়ে গরম চায়ের প্রবল ছ্যাঁকা লাগলো বলে তিনি যন্ত্রণায় কাতরে উঠলেন।

এবং চার = পাত্রীটি নিতান্তই ছেলেমানুষ, হঠাৎ এই খরগোশের কীর্তিকলাপে, এবং ত্রিমূর্তির কোরাস-হা-হুতাশে সে খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়লো টেবিলের ওপরে। আর তাকে কিছুতেই থামানো গেল না। হাসতে হাসতেই সে ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে এলো আমাদের কাছে। আর সোনা? লাফিয়ে লাফিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে প্রত্যেকের কাপ থেকে নিরপেক্ষভাবে চা চেখে বেড়াতে লাগলো, যেন সে মকাইবাড়ির মহামান্য টী টেস্টার। বলাবাহুল্য শাঁসালো সম্বন্ধটা সেই যে ভেঙে গেল, চায়ের কাপের সঙ্গে সঙ্গে—আর জোড়া লাগলো না।

এহেন সর্বনেশে ধানীলঙ্কা খরগোশ কী না পারে? জার্মান ফ্রিজ, বিলিতি কাপ, বাঙালীর ঘটকালি এসব তো সে চকিতেই ভাঙতে পারে, কিন্তু দোতলা থেকে পড়ে গিয়েও নিজের মাথাটি ভাঙে না। অথচ পুপলুর অত সুন্দর বিলিতি খরগোশটা তেতলা থেকে পড়ে গিয়ে মরেই গেল। সে ছিল ক্ষীণজীবী! আর সোনা, ক্ষণজীবী। খরগোশদের ভি. আই. পি. সে।

—সোনা হলো খরগোশদের বিদ্যেসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ।

একবার প্রাণবিন্দুবাবুদের বাগানে জোড়া কেউটে ধরা পড়েছিল। বৌদি দোতলার বারান্দা থেকে সাপ-মারা দেখছেন, সোনাও রেলিঙে চড়ে সাপ-মারা দেখতে গেল। এবং বেশি ঝুঁকতে গিয়ে মোটা শরীর, ক্ষুদে ক্ষুদে সামনের পা নিয়ে তাল সামলাতে না পেরে ঝপাং করে সাপ-মারা ভিড়ের ঠিক মধ্যিখানে, কালসর্পের মুখের সামনে গিয়ে পড়ল। বউদি 'গেল গেল' বলে আর্তনাদ করে চোখ বুজলেন। চোখ খুলে দেখলেন সোনা তাঁর পাশে। যেন খোদ হুডিনি কিংবা পি. সি. সরকার। আবার যথাপূর্বম রেলিঙে উঠে এসে বাগানে সাপ-ঠ্যাঙানোর দৃশ্য দেখছে মন দিয়ে। একই পোজ। যেন কিছুই ঘটেনি। অথচ খরগোশ তো আর বিড়াল নয়, তবু দোতলা থেকে পড়েও তার কিছু হলো না! এই আজব দৃশ্যে কেউটে সাপ দেখার চেয়েও বেশি করে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল আমাদের। কেউটেরাও ঐ শক-এর জন্যই বোধহয় এক-একঘায়েই খতম হয়ে গেল।

এই সোনার নন-কনফরমিস্ট জৈব প্রকৃতির দাপটে সারাটা পাড়া সরগরম। বাচ্চারা দিলে, সে চকোলেট খায়। চিকলেট খায় না। বড়োরা দিলে, সে হুইস্কি খায়। তবে একচুমুকের বেশি না। মাতলামিও করেনি কখনো। রাম-বিয়ার ছোঁয় না। মাছ-মাংসে অবশ্য একদম রুচি নেই সোনার। একবারই কেবল প্রাণবিন্দুবাবুর মাগুর মাছের ঝোল থেকে বেড়ালের দেখাদেখি বেগুনটা তুলে খেয়েছিল, এক্সপেরিমেণ্ট হিসেবে। গাঁদালপাতাটা বাদ দিয়ে। আর ওসব ছোঁয়নি। সাধারণভাবে আমরা সবাই তো জানি যে খরগোশরা মূকপ্রাণী, অবোলাজীব, বোবা জানোয়ার। সাত চড়ে 'রা' কাড়ে না। একদিন ঐ কুঁড়ে প্রাণবিন্দুবাবু ছুটে ছুটে এলেন আমাদের বাড়িতে—অসম্ভব উদ্বিগ্ন, বিচলিত। কী ব্যাপার? না বউদি বাড়ি নেই—ইতিমধ্যে, খরগোশ ওঁর টেবিলে উঠে নতুন লেখা কবিতাটা খাচ্ছিল, কবিমশাই আর না পেরে বিরক্ত হয়ে হাতের টিপে ধরা নস্যির গুঁড়োটাই ছুঁড়ে ওকে মেরেছেন। ফলে খরগোশ ঠিক মানুষের মতো গলায় বিকট আর্তনাদ করে উঠেছে। প্রাণবিন্দুবাবু ওকে এই একই অপরাধের জন্য আগে আগে বেশ কয়েকবার কলম ছুঁড়ে, খাতা ছুঁড়ে এবং একবার নস্যির ডিবে ছুঁড়ে মেরেছেন (অবশ্যই বউদির আড়ালে), তাতে ওঁরই কলমের নিব ভেঙেছে, খাতার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে এবং রুপোর ডিবেটা তুবড়ে গেছে। কিন্তু খরগোশের কিস্যু হয়নি। খরগোশেও যে শব্দ করতে পারে, এমন কথা প্রাণবিন্দুবাবু কস্মিনকালেও শোনেননি। সোনার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ভীষণ ভয় পেয়েছেন তাই। আবার সেই সপ্তাহেই গ্লোবে না লাইট হাউসে ওঁরা একটা ভূতে-পাওয়ার ইংরিজি সিনেমা দেখে এসেছেন। প্রাণবিন্দুবাবু যদিও জানেন মানুষদের ভূত নেই, বা থাকলেও কিছু এসে যায় না—তবু কি জানি, খরগোশদের বেলায় তো কিছু বলা যায় না। খরগোশদের প্রেতচর্চা তো কোনো মানুষেই করেনি। এই খরগোশ কি তবে 'পজেসড'? একি ভূতে-পাওয়া খরগোশ? এই স্বর কি প্রেত-আরোপিত কণ্ঠ? একে কি ওঝা ডেকে ঝাড়ানো উচিত? অনেক ভেবে-চিন্তে শেষকালে আমি ওঁকে বললুম—"মূকং করোতি বাচালম" শ্লোক শোনেননি? তবে অতো ভয় কিসের? —ওটা ভূতে পাওয়া নয়—ওটা আসলে ভগবানে পাওয়া। পরমানন্দ মাধবের কৃপা হয়েছে সোনার ওপর। 'ভর-হওয়া' বলে না? ওর বোধহয় তাই হয়েছে। যখন মনে হলো এই ব্যাখ্যাটা প্রাণবিন্দুবাবুর কবিমনে প্রায় ধরেছে, ঠিক এমনি সময়ে বাজার করে বৌদির প্রত্যাবর্তন। ব্যাপার শুনে একটুও না চমকে বউদি চোখ পাকিয়ে বললেন—"আহা হা, মরে যাই। সোনার অমন কচি নাক, তাইতে ঐ কড়া নস্যির ঝাঁঝ গেলে হেঁচে দেবে না বেচারা? একটু হাঁচবারও যো নেই? অমনি ভূত-ভগবান নিয়ে টানাটানি শুরু করেছো?"—সাপের হাঁচি যেমন বেদেয় চেনে খরগোশের হাঁচি বউদিতে।

শুধু কি তাজা কবিতাতেই সোনার রুচি? উঁহু, আরো আছে। সোনার কালচারাল অ্যাকটিভিটির দিকটা মোটেই ফ্যালনা নয়। প্রাণবিন্দুবাবু আর্ট ক্রিটিক, ছবির কদর

আছে ওঁর কাছে। বাড়িভর্তি ওরিজিন্যাল ছবি ঝুলছে। সোনার ওদিকে আজকাল তেমন নজর নেই। আগে ছিল, যথেষ্টই। একবার একজন অল্পবয়সী শিল্পী তাঁর কিছু ছবি রেখে গিয়েছিলেন প্রাণবিন্দুবাবুর কাছে বেচে দেবার ব্যবস্থা করতে। সোনারই দৌলতে তার দুটি ছবি প্রথম দিনেই বিক্রি হয়ে যায়। সোনার খুবই পছন্দ হয়েছিলো। মাটন রোলের মতো করে গোটানো ছবিদুটি সুস্বাদু লেগেছিল—প্রাণবিন্দুবাবু যখন ধরে ফেললেন, তখন আর তাঁর ছবিদুটো কিনে নেওয়া ভিন্ন গতি ছিল না, উচ্ছিষ্ট ছবির ছিবড়েয় টেবিলের তলা ভরে উঠেছে। সেই থেকে, ছবি-টবি থেকে সোনাকে দূরে দূরে রাখা হয়।

কিন্তু গান-বাজনায় সোনার উৎসাহ এখনও অপরিসীম। বউদি কোন বইতে যেন পড়েছিলেন লাল-চোখো খরগোশরা বধির হয়। সোনার চক্ষু রক্তবর্ণ হলে কি হবে, সে মোটেই বধির নয়। সেই থেকে বউদি আর ছাপার হরফে কিছু লেখা দেখলেই সেটাকে অবিশ্বাস করেন। রেকর্ডের ভোক্যাল অর্থাৎ মানুষে গাওয়া গান সোনা মোটে সহ্য করতে পারে না, কিন্তু যন্ত্র-সঙ্গীত শুনতে খুব ভালোবাসে। যতক্ষণ রেকর্ড চলবে, হিজ মাস্টার্স ভয়েসের ছবির মতো গ্রামোফোনের সামনে নিষ্ঠাসহকারে পিছন ফিরে বসে থাকবে, সোনা, সমাধিস্থ হয়ে। যেন ভবতারিণীর সামনে রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি। প্রাণবিন্দুবাবু আর বৌদি দুজনেই এই দৃশ্যটা অতিথিদের দেখিয়ে মজা পান। "একটা মজা দেখবেন?" বলে গ্রামোফোনে যাহোক একটা বাজনা লাগিয়ে দেন—রবিশংকর অথবা পাবলো কাসালস যাই হোক, অমনি সোনা যেখানেই থাকুক ছুটতে ছুটতে এসে যোগাসনে বসে যাবে। কিন্তু অতিথির অবাক হবার আরো কিছু বাকী আছে—মাঝপথে ঐ বাজনা তুলে নিয়ে, প্রাণবিন্দুবাবু ম্যাজিশিয়ানদের মতো পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে বলেন—"এবার দেখুন!" তারপর ভোক্যাল লাগান। সাইগল যেই বলেন—"একটুকু ছোঁওয়া লাগে", অমনি শিউরে উঠে একলম্ফে সোনা পগার-পার। অবশ্য এ ব্যাপারে শচীনকর্তা, কি লতা মুঙ্গেশকর, বব ডিলান, কি মরিস শেভালিয়ের সবাই সোনার কাছে সমান। হয়তো এমন হতে পারে যে যন্ত্র থেকে যন্ত্রসঙ্গীত বেরুচ্ছে এটা তার কাছে স্বাভাবিক লাগে, কিন্তু যন্ত্র থেকে অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর বেরুচ্ছে—এতে তার ভয় করে। তা কারণটা যাই হোক, স্পষ্টতই সঙ্গীত বিষয়ে সোনার স্বকীয় মতামত আছে। নস্যি ঝাড়তে ঝাড়তে প্রাণবিন্দুবাবু মৃদুমন্দ হাস্য করেন আর বলেন—"ওর বেশ পছন্দ আছে। কী বল?" বউদি তাই শুনে চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে বলেন—"যততো আদেঁখলেপনা!"

দুদিন হলো প্রাণবিন্দুবাবুর চশমাটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বউদি খুঁজছেন, কেষ্ট খুঁজছে, ঠাকুর খুঁজছে, ঠিকে-ঝিও খুঁজে গেল, আমরাও যে-ই যখন যাচ্ছি, যে যেমন করে পারছি সারা বাড়িটা ঘেঁটে-ঘুঁটে চশমা খুঁজছি।—কতো কি হারানো-জিনিস বেরিয়ে পড়লো, না দেওয়া ইলেকট্রিক বিল, পাঁচ বছর আগে আমাদের বাড়ি থেকে ধার করা তিনখানা গল্পের বই, প্রাণবিন্দুবাবুর ঠাকুর্দার হিসেবের খাতা—

কিন্তু চশমা আর বেরোয় না। চশমাবিহনে প্রাণবিন্দুবাবু বিনা খরচেই চোখে দার্জিলিং দেখছেন। চারদিকে মেঘ মেঘ কুয়াশা কুয়াশা মনে হচ্ছে। প্রথম বউদিই লক্ষ্য করলেন —খরগোশ দুদিন ধরে মাঝে মাঝেই ভারী কেবিন ট্রাঙ্কের পিছনে সরু হয়ে হয়ে গলে ঢুকে যাচ্ছে। কেন রে বাবা? কী হচ্ছে ওখানে? ঐ দুরমুশ ট্রাঙ্কের পিছনে হাতও যায় না, চোখও যায় না, কেবল ওই সর্বনেশে খরগোশই যেতে পারে, ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। কেষ্টতে আর ঠাকুরে মিলে ট্রাঙ্কটা টেনে হিঁচড়ে সরালো। সরাতেই সেখান থেকে পাঁই পাঁই করে ছুটে বেরুলেন—কে? একদলা ধবধবে পশমের বল, সোনা। কিন্তু সিংগল খরগোশে তো বাসা বাঁধে না? ব্যাপার কী? কী করছিল ওটা ওখানে? ট্রাঙ্কের পিছনে জমে থাকা ধুলো ময়লা ঝুলের স্তূপের মধ্যে প্রাণবিন্দুবাবুর চশমার খাপ। হংকং থেকে আনা সিল্ক-ব্রোকেডের তৈরি খাপটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে খরগোশ লুকিয়ে লুকিয়ে নিষ্ঠাভরে কুচি কুচি করছিল। চীনে ব্রোকেড বোধহয় খেতে ভালো! কী ভাগ্যি, ভোঁতা বলে চশমা পর্যন্ত তখনো দাঁত পৌঁছায়নি। তারপর বউদি একটা হাঁক পাড়লেন—"সোওনা—হ", কেউ এল না। বৌদি বললেন, "নচ্ছার খরগোশটাকে এক্কেবারে ছুঁড়ে ফেলে দেব হাওড়ার ব্রীজ থেকে—আমাকে জ্বালিয়ে মারলে এই খরগোশ।" অমনি সাদা বিদ্যুতের মতো একটা কিছু খাটের তলা থেকে বেরিয়ে "শশব্যস্তে" বারান্দায় পালালো। বউদিও ছুটলেন পিছু পিছু। "আয়, আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন!" খরগোশ একবারটি কেবল মুখ ফিরিয়ে বৌদির দিকে চাইল—সেই লাল চোখ ভর্তি কেবল অভিমান—তারপর ঝপাং করে ঝাঁপ দিল। বৌদি হায় হায় করে উঠলেন। কিন্তু ততক্ষণ খরগোশের সুইসাইড করা কমপ্লিট।

হলে কি হবে, রাখে কেষ্ট, মারে কে? ঠিক তখনই নিচে শাড়িতে মাড় দিয়ে দুজনে দুকোণ ধরে টানটান করে ঝেড়ে নিচ্ছেন কাকিমা আর জ্যেঠাইমা। সোনা গিয়ে পড়লো ঠিক সেই শাড়ির মধ্যিখানে। যেন দোলার ওপরে জগন্নাথ! তারপরই একলাফে মাটিতে। তারপর কে জানে কোথায় উবে গেল। একেবারে জেমসবণ্ডের মতন।

চশমা খোঁজার পালা শেষ হয়ে অতএব ও-বাড়িতে শুরু হলো খরগোশ খোঁজার পালা। সত্যি! গেল কোথায় ব্যাটা? তিনদিন কেটে গেল। প্রাণবিন্দুবাবু ঘন ঘন নস্যি নিয়ে জামাকাপড় নস্যিবর্ণ করে ফেলেছেন। বউদি শয্যা নিয়েছেন। আমরা ও-বাড়ি গেলে চা-টা কিছু পাচ্ছি না। আমি ভাবছি এবারে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো —"সোনা, যেখানেই থাকো, ফিরে এসো, বউদি তোমাকে হাওড়ার ব্রীজ থেকে ফেলে দেবেন না—।" এমন সময়ে কেষ্ট একদিন সকালে ছাদে গিয়ে দ্যাখে ছাদভর্তি খরগোশের সদ্যকৃত প্রাতঃকৃত্য। যেন গোলমরিচের বন! তারপরেই দ্যাখে চিলেকুঠুরির গোল নর্দমা দিয়ে সোনা তড়বড়িয়ে ঘরের মধ্যে পালালো।

ছুটতে ছুটতে নিচে এসে খবরটা ঘোষণা করে দিতেই শয্যাত্যাগ করে কপিপাতা

হাতে বউদি ছাদে ছুটলেন। খরগোশের বিষ্ঠা দেখে কোনো মানুষের কখনো এত আনন্দ হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

—এই তো! আমার সোনা এইখানেই আছে! সোনা। সোনা।

সোনা মোটেই বেরুলো না। তার বুঝি মান-অভিমান নেই? অগত্যা চিলেকুঠুরির তালা খুলে ঢোকা হলো। কিন্তু জিনিস-পত্তরে এমনই ছাদ পর্যন্ত ঠাসা সেই ঘর, যে তার ভিতর থেকে একমুঠো একরত্তি একটা খরগোশকে খুঁজে বের করা ফেলুদারও অসাধ্যি!

দু ঘন্টা বাদে বউদি যখন কপিপাতা আর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কান্না কান্না গলায় বললেন—"বাছা আমার তিনদিন কিছু খায়নি—শুকিয়ে রয়েছে! হায়রে! খরগোশটাকে আর বোধ হয় ধরে রাখতে পারলুম না"—অমনি লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল সোনা। এসেই সোজা বউদির কোলে। তার মুখময় প্রচুর তুলো লেগে আছে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো দেখাচ্ছে। চিলেকুঠুরিতে তোলা এক্সট্রা বালিশ বিছানাগুলো তিনদিন ধরে খেতে খেতে ও তখন ক্লান্ত। অরুচি ধরে গেছে। এখন বউদির হাতের গরম গরম এক কাপ চা নইলে আর চলছে না। আর তারপরই চাই প্রাণবিন্দুবাবুর হাতের টাটকা দু পীস কবিতা। আ—হ!

ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা

আচ্ছা, ছোট একটা প্রাণের কথা আমাকে গোপনে বলবেন? কাগজটা মেললে যেই চোখে পড়ে কেউ "বিশেষ আমন্ত্রণে এতদিনের জন্য বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন", অমনি বুকের ভেতরে একটা বিশ্রী জ্বালা জ্বালা ভাব হয় না? অন্তত যৎসামান্যও? এই সব বিশিষ্ট আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ছবিও ছাপা হয় মাঝে মাঝে। রাগী-রোগা-বদহজমী-গান্ধী টুপি কিংবা ট্যারা-টেকো-টাইবাঁধা হাসি হাসি—ইত্যাদি। তলায় আবার ব্রাকেটে কখনো কখনো কীসব রহস্যময় নম্বরও লেখা থাকে A-1234 ইত্যাদি। (লক্ষ করে দেখেছি সিরিয়াল নম্বরটা সর্বদাই 'A'-তে আটকে থাকে, কদাচ 'B' হয় না)। জগতের যাবতীয় হরিদাস পালেরাই এখন "প্রসিদ্ধ ব্যক্তি", যদিও তাঁদের নাম তাঁদের পাশের বাড়ির লোকেদের পর্যন্ত জানা নেই। এঁরাই অনবরত "বিশেষ আমন্ত্রণে বিদেশ যাত্রা" করেন। কী আর বলব লজ্জার কথা, এই শ্রীমতীও সেই অধম যাত্রীদের একজন। নাঃ, বিদেশ যাত্রার আর মান সম্মান রইল না।

শুনেছি নাকি আমন্ত্রণকর্তা যদি কেজিবি কিংবা সিয়া হন, তাহলে ভ্রমণটা

নির্ঝঞ্ঝাটে সারা হয়। কিন্তু যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকে কনফারেন্সে যায়-টায়? তাদের দুঃখু-কষ্টের বাপ-মা নেই। যেসব 'ঢাউস' ভ্রমণ কাহিনী আমরা পড়ি (চোদ্দ দিনে চব্বিশ ফর্মা) তাতে এসব অকাব্যিক দিকগুলো লিখে, জায়গা নষ্ট করা হয় না। সেখানে কেবলই জয়ধ্বজা আর পুষ্পবৃষ্টি। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো প্রতি পদক্ষেপেই অক্ষয় প্রেমের প্রস্ফুটন। দিব্য বিভায় উদ্দীপ্ত সেসব কাহিনী পড়ে আপনারাও হয়তো আমার মতোই মোহ-মাৎসর্য ইত্যাদি রিপুতাড়িত হয়ে বৃথা যন্ত্রণা ভোগ করেন। কেননা আসল খবরগুলো কেউ জানতেই পারে না। তাই ঠিক করেছি পিওর হরিদাস পালেদের বিদেশ যাত্রার একটা বাস্তব চিত্র আপনাদের কাছে পেশ করব। খাঁটি নির্ভেজাল সত্য তথ্য মশাই। ট্রুথ ইজ লাইভলিয়ার দ্যান ফিকশন। অনেকগুলো দরকার নেই, ডক্টর দেবসেনের যে-কোনো একটা ট্রিপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ একবার শুনলেই ওই বুক-জ্বালা-করা ব্যারামটা একেবারে সেরে যাবে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এর পরে স্বস্তিপূর্ণ গৃহাবস্থানের সাত্ত্বিক আরাম উপলব্ধি করবেন দেহে মনে, কাগজের "বিদেশ যাত্রা" সংবাদ আপনার শান্তিভঙ্গ করতে পারবে না, কথা দিচ্ছি।

১

শুরুটা ঠিক কীভাবে করব বুঝতে পারছি না। সেবারের ফ্রান্সে আর কানাডায় যাবার বেলাটায় বলি। বেশি বেশি ভ্রমণ, তাই বেশি বেশি দুর্ঘটনা। সালটা ১৯৭৩, কানাডায় কম্পারেটিভ লিটারেচার কনফারেন্স, প্যারিসে ওরিয়েন্টালিস্টস কংগ্রেস, আর লণ্ডনে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একশ ষাট বছর পূর্তির সেমিনার। প্রথম দুটিতে ডক্টর দেবসেন আমন্ত্রিত বক্তা হয়ে। তৃতীয়টিতে শ্রোতা হবার নিমন্ত্রণ।

যাবার ঠিক পাঁচদিন আগে, যখন সব স্থির, ভিসা-টিসা হয়ে গেছে, পেপার-টেপার তৈরি, হঠাৎ পাসপোর্টটা হারিয়ে গেল।

ব্রিটিশ হাইকমিশনে একটা ফর্ম ভরতে দিয়েছে, কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে সবাই সেই ফর্ম ভরছি এক-একজন করে। হাতের পাসপোর্টটা আমার ঠিক পিছনের ভদ্রলোকের হাতে একবার ধরতে দিলুম, যতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখছি। এমন সময় কানে এল আমার নাম ডাকা হচ্ছে, অমনি আমি ফর্মটর্ম সুদ্ধ শাঁ করে Entrance লেখা দরজা দিয়ে সবেগে ঢুকে গেলুম। কাজ চুকে যেতে Exit লেখা দরজা দিয়ে বেরিয়ে, দে-দৌড় সোজা যাদবপুর। তক্ষুনি এম.এ. ফাইন্যাল ইয়ারের ক্লাস। পড়াতে পড়াতে আচমকা মনে পড়ল— "আমার পাসপোর্ট?" ঘণ্টা পড়তে তখনও, তারপরেও পুরো পনের মিনিট দেরি। সেই শেষ পনেরো মিনিট যেন দ্রৌপদীর শাড়ি হয়ে উঠল। অফুরন্ত কাল। শ্রীরাধিকা যেন কেঁদে বলে গেছেন একে ডেকে —হে পিরিয়ড, তুমি পোহায়ো না, হে ঘণ্টা, তুমি বাজিয়ো না। ঘণ্টা যখন শেষ অবধি বাজল, আমি ছুটে গেলুম ফোনের ঘরে। না, ব্রিটিশ হাইকমিশনে আমার পাসপোর্ট জমা পড়েনি।

তার পরের দুদিন ধরে বিশুদ্ধ বকুনি। শুভার্থী আত্মীয়-স্বজন বললেন—"ছি ছি ছি, জানো না আজকাল স্মাগলিঙের জন্য কী রকম পাসপোর্ট চুরি যাচ্ছে? আর তুমি কিনা চোরের হাতে ওটা ধরিয়ে দিয়ে এলে?"—বন্ধুরা টিটকিরি দিল —"তুই তোর যোগ্য কর্মই করেছিস। তোর কাছে এর চেয়ে অন্য আর কী আশা করা যায় বল? টিকিটটাও কাউকে গছিয়ে আসিসনি তো, ভালো করে ভেবে দ্যাখ।" কেবল মা বললেন—"যে যাই বলুক, ও হারাবে না। ঠিক পাবি। তুই বাক্স গুছো।" তিন দিনের দিন বি. ও. এ. সি. এয়ারলাইন্স থেকে ফোন এল, তাদের এক যাত্রী ওটি ওদের হাতে জমা দিয়ে বিলেত চলে গেছেন। যৎপরোনাস্তি ধন্যবাদ দিয়ে পাসপোর্ট ফেরত আনতে গেলুম।

সেখানে গিয়েও বকুনি আর বকুনি। প্রত্যেক কর্মচারীই এসে কোনো-না-কোনো অজুহাতে একবার করে আমাকে দেখে যাচ্ছেন; পাসপোর্ট-দাত্রী এমন কলির কর্ণকে কে না দেখতে চায়? সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই একটা করে "ফ্রী ফ্রেণ্ডলি অ্যাডভাইস" দিতে ছাড়ছেন না, এমন কি চা দিতে এসে বেয়ারাটি পর্যন্ত বলে গেল—"দিদিমণি, আপংকরু পাসঅ পরঅটঅ কিমিতি ভুলি গলা পরা?" চোরের ওপর লোকে যেমন হাতের সুখটা মিটিয়ে নেয়, পাসপোর্ট-খুইয়ের ওপর তেমনি জিবের ঝালটা ঝেড়ে নেয় সবাই। অন্তর্নিহিত ভাবখানা: এমন একটা গুড ফর নাথিং জরদগবকে পাসপোর্ট দেওয়াই বা হয় কেন, তারা বিদেশেই বা যায় কেন? জগতে এত শত স্মার্ট লোকেরা যেতে পাচ্ছে না যখন? একেই বলে অবিচার।

২

যাক, পাসপোর্ট তো পাওয়া গেল, নেক্সট হারালো আমার দ্বিতীয় পেপারটি। একটু আগেই টাইপিস্ট দিয়ে গেছেন। সারাবাড়ি তোলপাড়, খুঁজতে খুঁজতে আমার ক্লাস সিক্সের অঙ্কের খাতা পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল কিন্তু পেপার বেরুল না। তখন মা বললেন—"রাফ কপিটাই নিয়ে যা, ওখানেই টাইপ করিয়ে নিবি।" রওনা হচ্ছি, এমন সময়ে পিকোলো আমার মেয়ে, দুই হাতে একটি ছেঁড়া খাম উঁচু করে তুলে, "দেব না, দেব না" বলতে বলতে ছুটে এল। 'স্প্যান'-এর ঐ ছেঁড়া খামে ভরেই আমার পেপারটি দিয়ে গেছেন টাইপিস্ট। বাজে কাগজ বলে বুঝতে পেরে বাড়ির কাজের লোকটি ওটাকে পুরনো কাগজের স্তূপে নিক্ষেপ করেছিল। যাক, সেকেণ্ড ক্রাইসিস ওভার। এবার দুর্গা দুর্গা বলে রওনা। সারা প্লেনে আকুলচিত্তে জপ করতে করতে চললুম হে মা সরস্বতী, কনফারেন্সের আগে যেন পেপারদুটো হারিয়ে না যায়। বিদেশে বড্ড বেইজ্জতি হবে মা।

৩

থার্ড এবং ফোর্থ ক্রাইসিস বম্বেতে। বম্বেতে আমার এক বন্ধু পতিসমেত আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা করতে এলো। তাদের মহা অভিমান—"এতদিন পরে দেখা,

বম্বেতে কেন একটা দিন হল্ট করে গেলে না?" আমারও খুব আফসোস হতে লাগলো। সত্যি। কেন যে সময় নিয়ে এলুম না! হাতে একটা দিন? এত ভালোবেসে কেই-বা আমাকে ডাকবে? জীবনে তো আন্তরিকতার সুযোগ বেশি আসে না। যে করে হোক পরের বারে বম্বেতে থামতেই হবে। এদিকে প্লেন ছাড়বার সময় হয়ে এল তবু কেন যেতে ডাকছে না? খোঁজ করতে গিয়ে শুনি অদ্য যাত্রা নাস্তি। যান্ত্রিক গোলযোগ। কাল ভোর পাঁচটায় আসতে হবে। আমার এ খবর শুনে একটুও দুঃখু হলো না—বরং আনন্দ হলো—যাক, ঈশ্বর আছেন। আমার বন্ধুরা ঠিক যা প্রার্থনা করছিল, তাই পূরণ হলো। একগাল হেসে ছুটে এসে ওদের সুখবরটি দিলুম —"যাক ভাই, তোমরা ভালোবেসে যা ইচ্ছে করেছিলে তাই হলো। চলো, এবার তবে তোমাদের বাড়ি যাই। লাকিলি প্লেনটা খারাপ হয়ে গেছে।" —খবর শুনেই যেন বন্ধুর মুখে দপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। জিভ থেকে সরস্বতীও বিদায় নিলেন। বিব্রত স্বরে বন্ধুর স্বামী তোতলাতে শুরু করলেন— "না, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যেতে চাও তো চলো না, তাতে আর কি হয়েছে, তবে, ঐ আর কি..." —তার পরের কাহিনী ঠিক কিন্তু ভ্রমণ বইতে যেমনটি লেখা থাকে, তেমনটি হলো না। যা হলো তা বলবার নয়! (ভোলবারও নয়)।

৪

পরদিন ভোর পাঁচটায় এয়ারপোর্টে হাজিরা। বাক্স জমা দিয়ে কাস্টমসে ঢুকেছি। দেশ ছাড়বার সময়ে সঙ্গের বিলিতি জিনিসের একটা এক্সপোর্ট ক্লিয়ারেন্স করিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আমার হাতে ছিল একটা বিলিতি ঘড়ি। সেটার কাগজ সই করতে করতে ভদ্রলোক বললেন—"আপনার হাতের ঐ আংটিটার জন্য ক্লিয়ারেন্স নিয়েছেন?" —আংটি? তাইতো। হাতে একটা আংটি আছে বটে! কিন্তু ওটা তো বিলিতি নয়, নতুনও নয়—বারো বছর ধরে পরে রয়েছি। —এখন হঠাৎ আবার ক্লিয়ারেন্স কেন? ভদ্রলোক বললেন—"না মশাই, ওটা হীরে, শেষে ফিরে এলে ডিউটি লেগে যেতে পারে।" —তারপরে তর্জনী তুলে দেখালেন—"গয়নার জন্য ঐ কাউন্টার।" ডিউটি লাগা, শব্দটাতেই একটা জাদুকরী ভীতি আছে। আমি চটপট ঐ কাউন্টারে চলে যাই। কিন্তু সেখানে দুর্ধর্ষ এক কিউ। দেখা গেল কুয়াইটের বাসিন্দাদের বউরা সকলেই সোনায় মোড়া স্বর্ণসীতা। সেই ঠাসা গয়নার মূল্যায়ন চলেছে। অফিসার ভদ্রলোক ঘেমে-নেয়ে উন্মত্তপ্রায়। একে একে আমার প্লেনের যাত্রীরা সবাই বেরিয়ে গেলেন —এদিকটা ফাঁকা হয়ে গেল। আংটির দায়ে ও ডিউটির ভয়ে আমি বন্দী—ভদ্রলোক আর তাকান না। অবশেষে মরিয়া হয়ে আমি যখন যারপরনাই কাতর, তিনি তখন নজর দিলেন।

—"কী চাই?"

—"এই আংটিটি যদি—" নেড়ে চেড়ে উলটে পালটে সার্টিফিকেট লিখে দিলেন,

চোদ্দশো টাকা। চো-দ্দ-শো! মুহূর্তেই আমার চলন-বলন পালটে গেল। চোদ্দশো টাকার এককুচি পাথর আঙুলে থাকলে যেরকমটি শোভা পায় ঠিক তেমনি পদস্থ চরণে দরজা দিয়ে প্রায় ভেসে বেরোই। যাতে আমাকে যেই দেখবে সেই বুঝবে—হ্যাঁ, এ-মেয়ের একটা ব্যাপার আছে বটে। (পরে জেনেছি মাত্র চোদ্দশো টাকা একটা ভালো হীরের পক্ষে মোটে কোনো দামই নয়)।

লাউঞ্জ গড়ের মাঠের মতো ফাঁকা দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠল— সহযাত্রীরা কই? হঠাৎ শুনি দৈববাণীতে নিজের নাম ধ্বনিত হচ্ছে— ডক্টর দেবসেনকে এয়ার ইণ্ডিয়া ডাকছে। কাউন্টারে গিয়ে টুপি পরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেটিকে যেই চোদ্দশোর উপযুক্ত ধীর গম্ভীর স্বরমাহাত্ম্যে বলেছি, "আমিই ডক্টর দেবসেন—" অমনি সে লাফিয়ে উঠে আমার কাঁধটা আচমকা খামচে ধরে বিনা সম্ভাষণে হিড়হিড় করে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল গেটের দিকে। এয়ার ইণ্ডিয়ার এই অসংযত আক্রমণে আমি ক্রমে হতচকিত, তথা হৃতবাক এবং কারাটে-কুংফু কিছুই না জানায় আত্মরক্ষায় অপারগ হয়ে কাতর। এইবারে এক জব্বর গুঁতো মেরে লোকটি আমাকে একটা ছোট সাদা জীপে তুলে দিল এবং নিজেই জীপটা বোঁ বোঁ করে চালিয়ে নিয়ে চলল এয়ারপোর্টের নির্জন মাঠ-ঘাটের মাঝখান দিয়ে। দূর দিগন্তে দাঁড়ানো বোয়িংটার পেটের দরজা বন্ধ। গায়ে সিঁড়ি ঠেস দেওয়া নেই। কেবল সামনে পাইলটের মই ঝুলছে। সেই কন্দর্পকান্তি যমদূত আমাকে হ্যাঁচকাটানে নামিয়ে এনে পৃষ্ঠদেশে বলদের পিঠে চাষা যেমন ঠেলা মারে তেমনি এক রামঠেলা লাগিয়ে ঐ মইতে উঠিয়ে দিয়ে গগনভেদী হাঁক পাড়ল, "হিয়ার শী ই-জ।"

ওপরে উঠে দেখি জায়গাটা ককপিট। নানা সুইচবোর্ড, যন্ত্রপাতির পটভূমিতে সারি বেঁধে তিনজন কর্তাব্যক্তি সবিনয়ে দণ্ডায়মান —যেন আমাকেই গার্ড অব অনার দিচ্ছেন। দাঁতে দাঁত চেপে রহস্যময় হেসে ক্যাপ্টেন বললেন—"ডক্টর দেবসেন, আই প্রিজিয়ুম?" এটা তো আফ্রিকার জঙ্গল নয়, আমিও লিভিংস্টোন সাহেব নই। তাই অবাক গদ্গদচিত্তে প্রশ্ন করি—"হাউ ডিড য়ু নো?" একগাল তিক্ত মধুর হেসে কো-পাইলট উত্তর দেন—"বিকজ উই আর নিয়ারলি টু মিনিটস ডিলেইড ফর ইয়ু ম্যাম! দ্যাটস হাউ!" সর্বংসহা ধরিত্রী এতে দ্বিধা হলেন না, বরং আকাশকেই দ্বিখণ্ডিত করে আমাদের জেট প্লেন উড়ে গেল।

৫

দুটি পেপারের কল্যাণে দুটি হপ্তা ফ্রী। প্যারিসে প্রথম হপ্তাটি এবং কানাডায় শেষ হপ্তা রাজকীয় যত্নে কাটবে দুটি কনফারেন্সের কর্তৃপক্ষের আতিথ্যে। কিন্তু দুটির মাঝখানের যে তিনটি সপ্তাহ ফাঁকা আছে। ফার্স্ট পিরিয়ড আর লাস্ট পিরিয়ডে ক্লাস থাকলে, মাঝখানের নিরালম্ব ফ্রী পিরিয়ডগুলোর মতো, মহা ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে। এই তিন হপ্তার খরচ চলবে কী উপায়ে? এক বন্ধু ইউনাইটেড নেশন্সে

সদ্য কাজ পেয়ে মহৎ এবং উদার বোধ করছেন—তিনি একটি চেক লিখে দিলেন। এটি ভাঙিয়ে নিলেই মোটামুটি চলে যাবে। ইংলণ্ডের বন্ধুদের কাছে আর লস এঞ্জেলসে ছোট বোনের কাছে গিয়ে ভাগাভাগি করে সময়টা কাটাবো। ওটুকু খরচ ওরাই চালাবে।

এদিকে প্যারিসে পৌঁছে "শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে"— সরকারের দেওয়া আট ডলার পথেই শেষ। ওই চেকটি প্যারিসে কিছুতেই ভাঙানো গেল না। ওটি ইউনাইটেড নেশন্সের বাড়ির যে ব্যাংকের চেক, কেবলই সেই ব্যাংকেই ভাঙানো যাবে। প্যারিসের বন্ধুবর্গ বললেন—"যাও, সোজা জেনিভা চলে যাও না। মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের তো মামলা। ভাড়াও বেশি না।"

—সে কি? জেনিভা যাই কী করে? হাতে তো আছে শূন্য মানিব্যাগ আর দুখানি প্লেন টিকিট। প্যারিস-লণ্ডন, আর লণ্ডন-মন্ট্রিয়ল।

—"কেন, প্যারিস-লণ্ডনটাকেই প্যারিস-জেনিভা করে নেবে? তারপর টাকা পেলে জেনিভা-লণ্ডন টিকিটটা কিনে নেবে।" —তাই তো? এ তো খুবই সহজ ব্যাপার। যেমনি বুদ্ধি, তেমনি কাজ। চলো জেনিভা। পরের প্লেনেই! পঞ্চাশ মিনিট বাদেই পঞ্চম এবং মোক্ষম ক্রাইসিসটি উৎপন্ন হলো।

জেনিভায় সুরেন্দ্র-কৃষ্ণারা আছে, ভেবেছি নেমেই একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যাব ওদের বাড়ি। কিন্তু বেরুতে গিয়েই মুশকিল বাধলো।

—"ভিসা? আপনার ভিসা কই?"

—"আরে? মনে ছিল না তো?"

—"সে কি! ভিসা নেই? তা হলে তো বেরুতে পারবেন না এয়ারপোর্ট থেকে!"

—"করে দিন না মঁসিয়, অনুগ্রহপূর্বক, আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে একটা ট্রানজিট ভিসা?"

—"আগে আপনার টিকিট দেখান! এখান থেকে কোথায় যাচ্ছেন?"

—"লণ্ডন।"

—"কিন্তু জেনিভা-লণ্ডন টিকিট কই?"

—"এই দেখুন, এই চেকটা ভাঙাতে এখানে এসেছি, টাকা পেলে তবে তো টিকিট কিনবো। এক্ষুণি টিকিট পাব কোথায়?" ইমিগ্রেশন অফিসারের চোয়াল শক্ত হয়।—"ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার মানে যার হাতে অনওয়ার্ড রিজারর্ভেশন আছে। এটা তো টার্মিনাল টিকিট। ভিসা আপনি পেতে পারেন না।"

—"টার্মিনাল মানে? এই দেখুন দেড়হপ্তা পূর্বেই আমার লণ্ডন-মন্ট্রিয়ল চাটার্ড ফ্লাইট রিজার্ভেশন রয়েছে। আমি কি থাকতে এসেছি?"

—"ওতে হবে না। জেনিভা-লণ্ডন টিকিট চাই।"

—"বলছি তো টাকা পেয়েই কিনবো। কালই।"

—"তা হয় না। তুমি বাছা এক্ষুনি প্যারিসে ফিরে যাও, নইলে মুশকিলে পড়বে।"

—"বাঃ! টাকা কই, যে প্যারিসে যাব? টাকা থাকলে তো লণ্ডনেই চলে যেতুম।"

—"আরে বাবা তুমি জেনিভায় কেন এসেছো তা কি আমরা জানি না, মা শেরি?"

—"কেন এসেছি বলুন তো?"

—"প্রত্যেক গ্রীষ্মেই তো তুমি এখানে আসো, কলেজের ছুটি হলে রেস্তরাঁয় ঝি-গিরি করে উপরি দু পয়সা কামাতে। তোমাদের আমরা চিনি না? কিন্তু মাদ্‌মোয়াজেল—ভিসাটা যে—"

—এবার চোখে জল এসে গেছে—"কী! আমি আমি...ঝি-গিরি করতে এসেছি? মোটেই না। ইনফ্যাক্ট...আমি...তো...সরবনে কলেজ দ্য ফ্রান্সে বক্তৃতা দিতে এসেছিলাম।" একথা বলার সময়ে আমার গলা এমনই কাঁদো-কাঁদো করুণ হয়ে কেঁপে-টেপে গেল, যে আমার নিজের কানেই কথাটা বিশ্বাস হলো না।

—"বক্তৃতা?" ইমিগ্রেশন অফিসাররা হো-হো করে হেসে ওঠেন। —"ওরে —বক্তৃতা দিতে এসেছে রে! হাঃ হাঃ। কোথায়? রেস্তরাঁয় রেস্তরাঁয় বক্তৃতা, নাকি চার্চে চার্চে?" —আমার গায়ে আগুন ধরে যায়—

—"ইয়ারকি রাখুন। আমি সত্যিই আপনাদের এই অসভ্য দেশে থাকতে আসিনি।"

এবার ওদের মুখ একটুখানি গম্ভীর হয়।

—"নাকি? বেশ। বেশ। চলুন, রাগারাগি করে কাজ নেই, আজ লক-আপেই শুয়ে থাকুন তাহলে। কাল সকালে দেখা যাবে বক্তৃতা-টক্তৃতার কী ব্যবস্থা করা যায়—", ইতিমধ্যে পাসপোর্টটা উলটে পালটে একজন পুলিস দেখে নিয়েছে যে আমি সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করি। সে এসে সবিনয়ে বলল—

"সরি প্রফেসর, মাফ করুন, ওদের কথায় কিছু মনে করবেন না, ফরেন স্টুডেন্টরা সত্যিই এ-সময়ে আসে কিনা ছুটিতে কাজ খুঁজতে..., তাই...ওরা ভেবেছে আপনিও হয়তো ফরেন স্টুডেন্ট—রাতটা অবশ্য লক-আপেই থাকতে হবে—কান্ট বি হেল্পড—একটু কষ্ট হলেও... আশা করি কালই সব ঠিক হয়ে যাবে—"

—"লক-আপ মানে? পুলিস লক-আপে? এই জেনিভাতে? কেন? আমার অপরাধটা কী?"

—"বিনা ভিসায় আপনি ট্রেসপাস করেছেন সুইটজারল্যাণ্ডে। এবং ইউ আর রিফিউজিং টু লীভ দ্য কান্ট্রি। ইল্লিগাল এন্ট্রির জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।" বারে মজা! কোথায় এলুম ব্যাংকে, টাকা ভাঙাতে, আর আইন ভাঙার দায়ে যাচ্ছি কিনা জেলে! না, এ হতেই পারে না।

—"আমি আমার বন্ধুদের ফোন করতে চাই। ইউনাইটেড নেশন্সে।"

—"কর না।"

—"পয়সা নেই।"

—"আমরা পয়সা দিতে পারব না।" হঠাৎ মনে পড়ল পুলিসে ধরলে সর্বদাই উকীলকে ফোন করার রাইট থাকে। কৃষ্ণাই তো ব্যারিস্টার। বাঃ!

—"আমি ল'ইয়ারকে ফোন করব।"

—"ল'ইয়ারকে? অফিসারদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি হয়।"

—"জেনিভায় তোমার ল'ইয়ার আছে?"

—"আছে বৈকি। এই নম্বর: ভেরসোয়া ৫৫-২৬-১৯; ডেকে দাও। কৃষ্ণা আহুজা প্যাটেল, বার অ্যাট ল'।" আমি গম্ভীর হই। গম্ভীর না হলে এরা মানবে না।

আমার ফোন পেয়ে প্রথমে কৃষ্ণা বেজায় খুশি। তারপরেই তো মাথায় হাত! —"আয়—ওয়ানডারফুল—কোত্থেকে? কদ্দিন পরে এলে! অ্যাঁ! কী সর্বনাশ! পুলিস লক-আপে?" —হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল দুজনেই। —ইউনাইটেড নেশন্সের ডিপ্লম্যাটিক ছাড়পত্রের জোরে ইমিগ্রেশনের নিষিদ্ধ আঁচলের ভিতরে ঢুকে এসে ওরা আমার সঙ্গে দেখা করল। প্রথমেই মাতৃভাষায় কৃষ্ণা কিছু ধারালো, বাছাই করা খাস পাঞ্জাবী গালাগালি ছাড়ল একনিশ্বাসে, আগে থেকে ওদের খবর না দেবার জন্য এবং বিনা ভিসায় ন্যালাক্ষ্যাপার মতন বিদেশে আসার জন্য। অথচ ভ্রমণকাহিনীতে পড়েছি, বন্ধুদের আনন্দে বাক্যহারা হয়ে জড়িয়ে ধরবার কথা এসব ক্ষেত্রে। যদি ওরা এখন জেনিভায় না থাকত? কী হাল হতো আমার? তারপরে নিজেরা জামিন দাঁড়িয়ে আমাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল অবশ্যি। আমার পাসপোর্টটা কেবল জমা রইল ইমিগ্রেশন পুলিসের থানায়। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আরেক প্রস্থ বকুনি, ও প্রচণ্ড আদরযত্ন হলো। ওদের বাড়ির নরম বিছানার গরম আরামে শুয়ে শুয়ে রাত্রে ভাবলুম, আহা, পুলিস লক-আপটা কেমন জানা হলো না। দিব্যি দেশে গিয়ে চাল মারা যেত।

৬

পরদিন ইউনাইটেড নেশন্সে চেক ভাঙাতে গিয়ে পুনরায় কেলেঙ্কারী। বিদেশে চেক ভাঙাতে হলে সর্বদাই সই প্রমাণ করতে পাসপোর্টের সঙ্গে মেলাতে লাগে। পাসপোর্ট জমা দিয়ে আসার সময় সেটা মনে ছিল না। ব্যাংক ম্যানেজার মশাই যেই শুনলেন আমার পাসপোর্ট পুলিস হেফাজতে, অমনি তাঁর হাসিমুখের ওপরে একটা বলী-রেখাবিলে দুশ্চিন্তার মুখোশ চড়ল, তিনি একটা বেল টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুজন সিক্রেট পুলিস মাটি ফুঁড়ে আমার দুপাশে উপস্থিত হলেন সবিনয়ে। কী মুশকিল! আবার পুলিস? সুরেন্দ্র কই? এরা আমাকে ভেবেছে কী? জালিয়াৎ? জোচ্চোর? ধরে ও কৃষ্ণা!

পুলিসের কাছে আরেকবার নিজে জামিন দাঁড়িয়ে, শেষ পর্যন্ত আমার চেকটা

সেদিনই সুরেন্দ্র ভাঙিয়ে দিলে, তবে অতি কষ্টে। আর কোনো পরিচয়পত্র আইডেণ্টিফিকেশন আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই আমি জোরে জোরে মাথা নাড়ি। না, নেই। সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করে —"কেন, তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স? সঙ্গে নেই?"

—"তাই তো! আছে, আছে। ইণ্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সই সঙ্গে আছে।"

"ব্যাস! ওতেই হবে! বাঁচা গেল।" সুরেন্দ্র হাঁপ ছাড়ে। "ওতে ছবিও আছে, সইও আছে। আর, পাসপোর্টের ডিটেইলস্ ইমিগ্রেশনে ফোন করলেই চেক করে নিতে পারবেন আপনারা। তা ছাড়া আমি এখানে স্থায়ী চাকুরে, আমিও ওকে আইডেণ্টিফাই করছি, জামিন হচ্ছি। এই মহিলা খাঁটি, জাল ব্যক্তি নন।"

নিশ্বাস ফেলে তক্ষুণি ছুটলুম জেনিভা-লণ্ডন টিকিট কিনতে, বাব্বাঃ—কী ফাঁড়া, কী ফাঁড়া! নিরীহ মাস্টার মানুষ বক্তৃতা করতে এসে শেষকালে বিদেশ বিভুঁয়ে থানা-পুলিস আর জেল-হাজত শুরু হলেই হয়েছিল আর কী? এক্ষুণি, পালাতে হবে এদেশ ছেড়ে, দুগ্গা, দুগ্গা! কী কপালই করেছি! মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের মাঝখানে জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ পেশ করতে এলুম, এসে কিনা কেবলই চুরি-জোচ্চুরি, জাল-জালিয়াতের দায়ে ধরা পড়ছি? আমার এই ছিঁচকে টাইপ চেহারাটাই হয়েছে যত পাণ্ডিত্যের পরিপন্থী। আর জীবনে আসছিনে বাবা বিদেশ বিভুঁয়ে বক্তৃতা দিতে। যে যতই ডাকুক। হ্যাঁ!

৭

কিন্তু পালাবো বললেই কী পালানো যায়? বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা বিশেষ আমন্ত্রণে বিদেশ যাত্রার বরমাল্যটি। পরবর্তী বজ্রটি নিপাতিত হলো কানাডার বিমানবন্দর মনট্রিয়লে পা দিয়ে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ওখানে নেমেই আমার প্লেন বদল করার কথা। যাবো সোজা যুক্তরাষ্ট্রে লস্ এঞ্জেলেসে। সেখানে সাতদিন ছোট বোনের কাছে কাটিয়ে, আবার মনট্রিয়লে আসবো সভা-টভা করতে। কিন্তু ঘটনা অন্যতর হলো।

জেনিভায় পেয়েছি ভিসা না করার কুফল, আর এ-যাত্রায় জুটলো উলটো বিপত্তি, সাত-তাড়াতাড়ি ভিসা করানোর কুফল। ভিসা পাবার ত্রিশ দিনের মধ্যেই ঢুকে পড়তে হয় মার্কিন রাজ্যে। আমার এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঠিক বত্রিশ দিন হয়ে গেছে। আর রক্ষে নেই। জগতের সব দেশেই তো এ-ব্যাপারে "শিবঠাকুরের আপন দেশ!" কি উন্নত, কি অনুন্নত, একুশে আইনের অভাব নেই কুত্রাপি।

আমেরিকার প্লেনে আমাকে উঠতেই দিল না। ইমিগ্রেশনে আটকে দিল। হা ঈশ্বর। আবার ভিসাবিহীন? এখানে তো সুরেন্দ্ররা নেই! ডক্টর দেবসেনের সব স্মার্টনেস মুহূর্তে উপে যায়।— "এবারে কি লক-আপে যেতে হবে তাহলে?" আমার

বিনীত প্রশ্নে ভয়ানক অবাক হয়ে যান তরুণ ইমিগ্রেশন অফিসার।

—"লক-আপে? সে কি কথা? কী জন্যে?"

—"ভিসার যে মেয়াদ—মানে ট্রেসপাসিং হয়নি?"

"দুর, ওই মার্কিন ভিসা তো কালই করিয়ে নেবেন। দু' মিনিট লাগবে।"

খসখস করে একটা ঠিকানা, একটা নাম ও ফোন নম্বর লিখে আমার হাতে দেন—"সকালেই চলে যাবেন। আর এখানে ট্রেসপাসিং মানে? কানাডায় তো আপনার ঢুকতে বাধা নেই। বেআইনটা কোথায়?"

"ওঃ! তাই তো, এটা তো, এটা তো কানাডা! ঘুরতে ঘুরতে কি মাথার ঠিক আছে ভাই।" বোকা হাসি হেসে হাঁপ ছেড়ে অগত্যা রাত্রিবেলা চলে গেলুম সেই একটিমাত্র জানা ঠিকানায়, যেখানে কনফারেন্সের সময়ে এসে আমাদের থাকার কথা আট-দিন বাদেই। এছাড়া কিছু মাথায় এল না। ঠিকানাটা ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের। সুপারিনটেনডেনট আণ্ডারওয়ার পরে বেরিয়ে এলেন, হাতে আবার এক টিন কোকাকোলা। পরিচয় দিতেই দৃশ্যত তাঁর মাথায় যেন বজ্রপাত হলো।

"সে কী? কম্পারেটিভ লিটরেচার কনফারেন্স? তার তো এখনও আটদিন দেরি আছে। ম্যাডাম, আপনি কি এখন থেকেই...? মানে এমনিতে এটা তো ছেলেদের হস্টেল? তাই...।"

হায়! এই কি কানাডার "বিশিষ্ট" অতিথিকে বরণ করার উপযুক্ত বাক্য? যার মানে যাই হোক, অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতেই ঠাঁই পাওয়া গেল। কিন্তু "বিশিষ্ট ভ্রমণকারী" পর্যায়ের কার্যক্রম অনুযায়ী নয়, আমার তো সন্দেহ, আশ্রয়টা মিলেছিল "সহায়হীনা নারী" পর্যায়ের কার্যক্রমেই। নারী-মুক্তি আন্দোলন তখনও এতটা চালু হয়নি, তাই। হলে কী হতো, বলা যায় না।

খুকুকে ট্রাংককল করে খবর দিতেই একচোট বকুনি খেলুম— "দিদিভাই, তোমার আক্কেলটা কবে হবে? অতদিন আগে থেকে ভিসা করিয়ে রাখে কেউ? কী করে যে এতদূর এসে পৌঁছোলে!" তাও তো খুকু কিছুই জানে না। পাসপোর্টের কথাটা, পেপারের কথাটা। বম্বের পাইলটদের কথাটা, জেনিভা এয়ারপোর্টের পুলিস, ব্যাংকের সিক্রেট পুলিস—কোনো কথাই তো খুকুকে বলিনি।

৮

পরদিন সেই হোস্টেল সুপারিনটেনডেনট ছেলেটারই সহায়তায় ভিসা-টিসা সব হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা লস এঞ্জেলেসের দিকে রওনা দিলুম। আমি নামতেই খুকু আর বঙ্কু দৌড়ে এল—"বাববা রে। চব্বিশ...ঘণ্টা লেট? কই, তোমার বাক্স-প্যাটরা কই?"

—"তাই তো? আমার সুটকেস?" ওটা তো কালই চলে এসেছে, প্লেন থেকে

প্লেনে সোজাসুজি, বিনা ভিসাতেই। ব্যাগেজ অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখি বাকস আসেনি।

— "সে কী? এল না কেন?" ব্যাগেজ সুন্দরী বললেন—"রাত ঢের হলো। আজ বাড়ি যান। কাল এসে জেনে যাবেন বরং কেন আসেনি।"

—"বাঃ! 'আজ বাড়ি যান' মানে? কাপড় বদলাতে হবে না? কী পরে শোবো? দাঁত মাজবো কী দিয়ে? কোথায় গেল আমার স্যুটকেস?"

"সেজন্যে এই ওভারনাইট কমপেনসেশান নিয়ে যান না, দশ ডলার। কাল খবর নেবেন কী হলো বাক্সের।"

—"কী কইলেন? কত কইলেন?"

রুংকু হঠাৎ বাঙাল ভাষায় তীব্র ঝাপটে ওঠে। ব্যস্ত হয়ে মার্কিনী মেম বলে ওঠেন— "বেশ তো, দশে না পোষালে পঁচিশই নিন? ওটাই ম্যাকসিমাম।" বলে একটা ছাপা কাগজ টেবিলের এপাশে ঠেলে দিলেন। তাতে লেখা আছে— "ওভার নাইট কমপেনসেশান হিসেবে যাত্রীর পাওনা একসেট রাত্রিবাস; একসেট অন্তর্বাস; দুটো (বড়ো ও ছোট) তোয়ালে; একটা শার্ট; একসেট দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম; চিরুনী; চুলের বুরুশ; মাজন; দাঁতের বুরুশ; সাবান; পাউডার; একটা রুমাল; একটি টাই;এক জোড়া মোজা; যাত্রীর উক্ত বাবদে মোট পঁচিশ ডলার পর্যন্ত প্রাপ্য।" খুকু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—"তালিকাটি কি 'পাইওনীয়ার'-দের জন্যে তৈরি হয়েছিল? যখন প্রথম রেলটেল বসছিল?"

—"তার মানে?" সুন্দরীর ভুরু জট পাকিয়ে যায়।

—"মানে এই যুগে ওই তালিকা তো ওই টাকাতে ঠিক—"

ব্যাগেজ ক্লার্ক হেসে ফেলে বলেন—"আমরাও নিরুপায়, নিয়ম, নিয়মই, রাত্রিবাস আর মাজন বুরুশটা তো কিনতে পারবেন? নিয়ে নিন টাকাটা, কোম্পানি যখন দিচ্ছে।"

অগত্যা বাকসের বদলে পঁচিশ ডলার নিয়েই ঘরে যাই।

৯

পরদিন ক্লোদস-ক্রাইসিস। খুকু বা রুঙ্কুর কোনো জামাটামাই আমার হয় না। কী পরি? কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমাকে নিয়ে ওরা মুশকিলে পড়ে যায়। আমার ভারী দক্ষিণী সিল্ক লস এঞ্জেলেসের ওই ভ্যাপসা বিদঘুটে গরমে পরে থাকা অসম্ভব। (স্ট্রোক হয়ে যাবে)। আমার কাছে টাকাকড়িও যৎসামান্য। খুকু-রিঙ্কু দুজনেই ছাত্রী, দু-জনের অবস্থাই 'টেনে-টুনে'। খুকু বললে—কুছ পরোয়া নেই। চলো "ফাইভ ডলার স্টোর্সে", সেটা স্যালভেশন আর্মির দোকান। ওদের সব ভিক্ষালব্ধ জিনিসপত্র ওখানে সস্তায় বিক্রি হয়। ছ্যে-ছ্যে-আনা ছে-আনা, যা-লেবে-তো-ছে আনা। অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ ডলার। একটা ধোলাই-ঝোলাই শার্ট আর একটা ঢলঢলে বিপুল কোমর-ওয়ালা লিভাইস (ব্লু জীনস) কেনা হলো। কিন্তু বেল্ট? সেও পাঁচ? না বাবা, বেলটে কাজ নেই।

যাকগে খুকু, ঘরে পাড়টাড়ও নেই রে?"

—"কী যে বল দিদি, এখানে পাড় থাকবে কী করে? সুতী কাপড় কেউ পরে?"

পাড় না থাকে দড়িটড়ি একটা যোগাড় করে নেব এখন, বলতে না বলতেই দেখি ফুটপাতে কেউ একটা কাগজের প্যাকিং খুলে ফেলে দিয়েছে, তার পাশেই একটি চমৎকার মোটাসোটা নাইলনের লাক লাইন দড়ি! বা, বা, ভগবানের কী সুব্যবস্থা। "এই তো! পেয়েছি, পেয়েছি!" —চীৎকার করে উঠলেন ডক্টর দেবসেন, আর্কিমিডিসের মতো মহোল্লাসে। তারপরেই ফুটপাতে ডাইভ দিয়ে পড়ে আবর্জনার পাশ থেকে ছোঁ মেরে দড়িটা তুলে নিলেন। তারপর থেকে পোশাক নিয়ে ভাবতে হলো না বাকী ছ-দিন। কোমরে দড়ি থাকলে পাছে জেল-পালানো কয়েদী ভাবে, তাই শার্টটা কেবল ওপরে ঝুলিয়ে রাখা হলো।

১০

সুটকেস উদ্ধারই লস এঞ্জেলেসে আমার প্রধান প্রোগ্রাম হয়ে দাঁড়ালো। হয়তো আরও টুরিস্ট স্পট ছিল শহরটিতে। আমি কেবল দেখলুম এয়ারপোর্টের ব্যাগেজ অফিসটাই। তারা অবশ্য আমার একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলো, বহু বিচিত্র বাক্য-সমাচার সাপ্লাই দিয়ে।

প্রথম দিন লজ্জিত মুখে বললো: অত্যন্ত দুঃখিত, খবরটা এখনো পাইনি।

দ্বিতীয় দিন কড়া মেজাজে বললো: তোমার ব্যাগ তো লণ্ডনই ছাড়েনি এখনও, আমরা দেব কোত্থেকে?

তৃতীয় দিন পিঠ চাপড়ে বললো: ব্যাগ মন্ট্রিয়লে এসে পৌঁছেছে। আর তোমার ভাবনা নেই। এইবারে এসে পড়বে।

চতুর্থ দিনে সান্ত্বনা দিয়ে বললো: একদিন ডিলেইড হয়ে গিয়েছে, আনঅ্যাকম্প্যানিড তো, ওরকম হয়ে যায়। কালকেই আসবে। ডোণ্ট ইউ ওয়ারি।

পঞ্চম দিনে সকালেই একটা ফোন এলো—"ডক্টর দেবসেন?" ভদ্র, বিনীত, কবোষ্ণ পুং কণ্ঠ—"এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। আপনার ঐ সুটকেসটার খবর পেলেন কিছু?"

"আপনারা পেয়েছেন?"

—"হ্যাঁ, ধন্যবাদ, আজই আসবে মন্ট্রিয়ল!"

—"মন্ট্রিয়ল থেকে? ও! আচ্ছা, একটা কথা ছিল—ওটা যে মন্ট্রিয়লেই আছে আপনি এ খবরটা পেলেন কোথায়?"

—"কেন? কাল আপনারাই তো বললেন—"

—"আমরা? মানে আমি? না-না, আমি নিশ্চয়ই বলিনি। আমাকেই তো আপনি এইমাত্র বললেন! আমার কাছে খবর তো অন্যরকম ছিল।"

—"সে কি? অন্য খবরটা আবার কী রকম?"

—"আপনার বাক্স ভুল করে টরোন্টোতে নেমে গেছে!"

—"সুটকেস আবার ভুল করে নেমে যাবে কী? সুটকেসের কি ভুল করার ক্ষমতা আছে? ভুল তো কেবল মানুষই করে—শেক্সপীয়র বলেছেন।"

—"দেখুন ডক্টর, শেক্সপীয়র অনেক পুরোনো লোক, উনি যাই বলুন, কান দেবেন না। এখনকার দিনকালে সব পাল্টে গেছে। উনি এয়ারলাইন্সের ব্যাপার কিছুই জানতেন না। সুটকেসের এরকম ভুলভ্রান্তি হামেশাই হয়ে থাকে। এই সেদিনই একটা সুটকেস— তার জাপান থেকে ব্রাজিল যাবার কথা, টোকিও-টু-রিও, চলে এল নর্থ আমেরিকা, লস এঞ্জেলেস। এরকম ভুল খুবই স্বাভাবিক।"

—"তা সুটকেস নিতে কি আমাকে টরোন্টো যেতে হবে?"

—"ছি ছি, সে কি কথা। আমরা তো আপনাদের সেবাতেই সদা-সর্বদা! যাত্রীদের ঝামেলা বাধানো আমাদের পলিসি বিরুদ্ধ। আপনার বাক্স এসে যাবে। কাল-পরশু নাগাদ একটা ফোন করে দেখবেন।"

—"কালই আমি মন্ট্রিয়ল ফিরে যাচ্ছি। আমার পরশু থেকে কনফারেন্স শুরু। পরনে একটা ভদ্রস্থ পোশাক নেই আমার। আপনাদের যাত্রীসেবার ফলে।"

—"কেন, এখন কি পরে রয়েছেন?"

—"দশ টাকা দামের দু-খানা স্যালভেশন আর্মির ভিক্ষে পাওয়া শার্টপ্যান্ট। এটা পরে আন্তর্জাতিক সভায় পেপার দেওয়া যায় কি?"

—"সে তো বটেই! সে তো বটেই! নিশ্চয়ই না! ছি, ছি, কী কাণ্ড। কিনে ফেলুন!"

—"আপনারা তার টাকা দিলেন কই? আমাদের হাতে ফরেন এক্সচেঞ্জই নেই!"

—"ছি ছি, অতি বাজে সরকার তো আপনাদের? কিপ্টে, অবিমৃষ্যকারী, দেশবাসীর কথা চিন্তা করে না!"

—"অকারণে আমাদের সরকারকে গাল দিয়ে নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকবার চেষ্টা করবেন না—বুঝলেন?"

—"অকর্মণ্যতা? দেখুন, আমরা সদাসর্বদাই যাত্রীদের সেবায় নিযুক্ত। নতুবা আপনাকে ফোন করছি কেন? বলুন, এই ফোনটা কে করেছে, আপনি, না আমি?

—"তা তো বটেই। সুটকেসটা কে হারিয়েছে? আমি? না আপনি? উল্টো-পাল্টা খবরগুলোই বা কে সাপ্লাই দিচ্ছে? আমি? না—"

—"দেখুন, লেটস বি ফ্রেণ্ডস। রাগারাগি বড়ই অস্বাস্থ্যকর। আপনিই তো বললেন শেক্সপীয়র বলেছেন ভুল মানুষ মাত্রই করে। আমরাও তো মানুষ, তাই না? উমম?" কবোষ্ণ কণ্ঠটি প্রগাঢ় রকম মানুষী হয়ে উঠছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি বলি:

—"ঠিক আছে, যাবার আগে কাল একবার খোঁজ করব নিশ্চয়ই। নইলে বাক্সটা আসবামাত্রই মন্ট্রিয়লে পাঠিয়ে দেবেন—সেই ইনস্ট্রাকশনই লিখে রাখুন।"

—"কালই আপনার হাতে বাক্স তুলে দেবার মহৎ সৌভাগ্য হবে আমাদের, —কথা দিচ্ছি আমি আপনাকে। দেখে নেবেন আপনি।"

পরদিন সারা সকাল ধরে এয়ারপোর্ট তোলপাড় করে ফেলে অনেক খুঁজে-পেতে নানা অফিসে ঠোক্কর খেতে খেতে শেষে ধূ-ধূ তেপান্তরের মধ্যস্থিত এক ব্যারাকঘরের গুমোট মালগুদোমে পৌঁছুই।

—"আপনারা কেউ ফোন করেছিলেন আমাকে?"

উত্তর না দিয়ে কর্মরত তিনমূর্তি চোখ তুলে কেবল আমাদের আপাদমস্তক নীরবে পর্যবেক্ষণ করেন। সেই নিরীক্ষার নিচে আমার শার্টের তলা থেকে লাক লাইন দড়িটা বাইরে ঝুলছে বুঝতে পেরে, চট করে আমি ওটা কোমরে গুঁজে নিই। এসবে আবার ইম্প্রেশন খারাপ হয়ে যায় কিনা! যথাসাধ্য গম্ভীরভাবে তাই এবারে উচ্চারণ করি:

—"আমিই ডক্টর দেবসেন।"

—"সুখী হলাম। তা কী করতে পারি আমরা আপনার জন্য?" নিরাসক্ত উত্তর আসে।

—"আমার সুটকেসটা কি কালকে টরোন্টো থেকে এখানে এসেছে?"

তিনমূর্তি একসঙ্গে মাথা নেড়ে জানালেন,—"সুটকেস? কোনো সুটকেস আসে-নি।" সত্যিই, ঘরভর্তি দেখা যাচ্ছে কেবল প্যাকিং বাক্স।

হঠাৎ তর্জনী উচিয়ে রুংকু চেঁচিয়ে ওঠে—"দিদিভাই, ওটা নয় তো?"

দেখি ঘরের এক কোণে, বড় বড় প্যাকিং বাক্সের মাঝখানে, চেড়ীবেষ্টিত সীতার মতো ধূলিমলিন, অযত্নলাঞ্ছিত, স্বজনবিহীন, একটি নীলাভ নাইলনের সুটকেস অসহায় পড়ে আছে। "ওই তো, ওই তো আমার সুটকেস!" সিকি মুহূর্তেই প্যাকিং বাকসোগুলির ওপর এক লম্ফে উঠে পড়ে, পড়ি-মরি করে সেগুলি মাড়িয়ে দুড়দাড় দৌড়ে পদভরে ধরণী কম্পিত করে, আকুলভাবে আপন বাক্সের বুকে সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েন ডক্টর শ্রীমতী দেবসেন।

ভাবখানা—"অনেক সাধায়ে অনেক কাঁদায়ে দরশ মিলালি মোরে, বঁধূ আর না ছাড়িব তোরে।" তাঁর মুখে হারামাণিক পাওয়ার দিব্যবিভা, সর্ব অঙ্গে দুর্গম গিরি কান্তার মরু লঙ্ঘনের বিমল জ্যোতি। আর গুদামঘরে প্রবল ধুলো উড়তে থাকে তাঁর আকস্মিক দাপাদাপির ফলে। প্রস্তরীভূত তিনমূর্তির একজন স্তব্ধতা থেকে কষ্টেসৃষ্টে নিজেদের উদ্ধার করে বলেন:

"কী আশ্চর্য, আপনি তো বললেন, টরোন্টো থেকে আপনার সুটকেস গতকাল আসার কথা। ওটা তো গত এক সপ্তাহ ধরেই এখানে মন্ট্রিয়ল থেকে এসে অবধি আনক্লেইমড পড়ে রয়েছে।"

শুনেও মনে আরাম হলো। আঃ! যেন মাতৃভূমিতে আছি। এই নাকি মার্কিন এফিশিয়েন্সি, যা প্রবাদে পরিণত? এ তো ঠিক আমার দেশের মতোই! মালের টিকিট নম্বর, ভাঙাচোরা, টোল-তোবড়ানো সব লক্ষণ মিলে গেল। এবার কাস্টমস

চেকিং হবে। বিপুল হাতব্যাগটা হাতড়ে কোথাও চাবি মিলল না। হাতব্যাগটা মেঝেয় উপুড় করে ঢেলে ফেলি। দেশ-বিদেশের খুচরো পয়সা, গলা-পচা লজেঞ্চুস, প্লেনে চুরি করা খুদে সাবান, অ্যানাসিন বড়ি, হাঁপানির বড়ি, ধুলো ধুলো এলাচ-সুপুরি, লিপস্টিক, চুলের কাঁটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। চাবির চিহ্ন নেই। খুকু-রিংকুর চাবিগুলো সব একে একে ট্রাই করি। লাগে না। এবার কাস্টমসের তিনমূর্তি আসরে নামলেন। প্রথমে একগুচ্ছ পরচাবি নিয়ে। কিন্তু এইসা শক্তপোক্ত বৃটিশ গা-চাবি, মার্কিন পরচাবির কোনোটাতেই সুটকেস খুললো না। তারপর ওঁরা একটা চুলের ক্লিপ চাইলেন, এবং পটাং।

তারপর সাহ্লাদে শাড়ি-ব্লাউজ-শালের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েন কর্তব্যপরায়ণ তিন সাহেব। এক সময়ে কোণ থেকে কী যেন বেরিয়ে পড়লো। দুটো ছোটো প্যাকেট, শাড়ির ভাঁজে ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া পাল্টে যায়। হলদে সিলোফেনে মোড়া দুটো চার বাই তিন বাই দুই ইঞ্চি প্যাকেট, ভেতরে ঘন-কালচে ব্রাউন বস্তু—বেশ ভারী। ঘরে যেন এইমাত্র কারো মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। ছুঁচ পড়লেও শব্দ হবে। ব্যাপারটা কী ?

বাণ্ডিল যিনি বের করলেন, তিনি ঝড়ের আগের আকাশ—নিবাতনিষ্কম্প, মোটা সঙ্গীকে নির্বাক ইশারা, মোটা সঙ্গী এগিয়ে এসে প্যাকেট নিরীক্ষণ করেন। তিনি প্রবলতর গাম্ভীর্যে নিটোল হয়ে কালো সঙ্গীকে ইশারা করলেন। কালো সঙ্গী এসে এক নজরে জিনিসটি লক্ষ করেই নিশ্চিত, "দ্যাটস ইট !" ভয়াবহ নৈঃশব্দ্য। হাতঘড়ির টিকটিক শব্দ যেন মাইক্রোফোনে বাজছে, আমাদের দিকে তাকালেন তিনজন বিচারক, নেত্রপাতে মৃত্যুদণ্ড।

আস্তে আস্তে কথা বলেন বড়কর্তা—"এইবার বুঝে গেছি সুটকেস কেন আনঅ্যাকম্প্যানিড আসে। কেন আনক্লেইমড হয়ে মাল ট্রেন-গুদোমে পড়ে থাকে। কেন চাবি থাকে না কাছে। কেন এমন আলুথালু ভাব, মন্ট্রিয়ল না বলে টরোন্টো বলা হয় কেন ? সাতদিন আগে না বলে বলা কেন হয় কাল, এইবার সব বুঝে গেছি !"

ভালো কথা, কিন্তু আমি তো বুঝিনি। এ আবার কীরকম কথাবার্তা ! এবারে মোটাকর্তা প্রশ্ন শুরু করেন (একেই বোধকরি "জেরা" বলে)।

—"এটা কার মাল ?"

—"আমার।"

—"পাসপোর্ট কই ?"

—"এই যে।" নিয়ে খুব ভালো করে দ্যাখেন তিনজনে, উল্টে-পাল্টে। তারপর বুক পকেটে রাখেন একজন। (কেনরে বাবা) ?

—"এ বস্তুদুটোও তোমার ?"

—'নিশ্চয়ই—"

—"দেখি", সবগুলোই হাতিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলেন মোটাকর্তা। বড়কর্তা তর্জনী নির্দেশে প্যাকেটদুটি দেখান।

—"সুইটস।"

তিনজনে চোখাচোখি হয়। কালোকর্তা বলেন—"ওদের খবর দিই?"

মোটাকর্তা বলেন—"নিশ্চয়ই।"

বড়কর্তা বলেন—"শিট?"

মোটা বলেন—"শিওর। শিট।"

কালো বলেন—"ইয়াঃ, শিট।"

আশ্চর্য অসভ্য তো! তিন-তিনটে মেয়ের সামনে অকারণে মুখ খারাপ করা! কী শিট শিট করছে! আমার কথাটা বিশ্বাস হলো না? বুলশিট? গুল? "বিশেষ আমন্ত্রণে" এসেছি বাবু পরের দেশে; সেধে সেধে নয়; তার মানে কি পদে পদে এমনি আপমান?

রাগে ঝনঝন করে বলি—"অফকোর্স নট, সব সত্যি কথা, ওটা মিষ্টান্ন।"

আবার চোখোচোখি। স্বর্গীয় মোলায়েম হাস্য তিনটি মুখেই বিছিয়ে যায় নিঃশব্দে। তাতে হাড়ের মধ্যে হিম হিম ভাব হয়। সিনেমায় ভিলেনরা যেভাবে হাসে আর কি। আমার রাগ বেড়ে যায়।

—"নাও বন্ধ কর আমার বাকস, ঢের হয়েছে। আমার প্লেনের সময় হয়ে যাচ্ছে।"

—"এখন তো যাওয়া হবে না। আগে অন্য ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা আসুক। তোমাদের দেখাশুনো তারাই করবে। বাকস-টাকস আজ ছাড়ছি না। পাসপোর্টও রইল।"

এই সময়ে খুকু হঠাৎ যেন স্বপ্নোত্থিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "নো, নো, নো গুড গ্রেশাস! ইটস নট শিট। ইটস নট শিট। ইটস... ইটস, ও দিদি, আমসত্ত্বের ইংরিজিটা...শিগগির...ওরা এগুলোকে গাঁজাটাজা চরস-টরস ভেবেছে। 'শিট' হলো মারিহুয়ানার স্ল্যাং—এই বোকাগুলো ভেবেছে তুমি বুঝি..."—হুই হুই করে হেসে উঠছি আমরা তিনজনে, ও হরি! তাই বল! এইজন্যে এত শিট-শিটুলি। তিনজনের এইজন্যে ওই গোমড়া আনন আর চোয়াড়ে বচন? হায় রে! এই তোমাদের কাস্টমসের ট্রেনিং?

এও ছিল "বিশিষ্ট অতিথি"'র কপালে? ঝি-গিরির দায় থেকে শুরু করে শেষটায় গাঁজা চুরির দায়েও পড়লুম? হায়, নারকটিক্স স্মাগলিং। ঈদৃশ সসম্ভ্রম গূঢ়কর্ম কি আমাদিগের ন্যায় অগ্রপশ্চাৎ অবিবেচনাকারী ভেতো মাস্টারের ক্ষুদ্রবক্ষের পাটায় সম্ভবে? তোরা কী লোকও চিনিসনে বাছারা? গাঁজা না হয় নাই চিনলি। ওসব জিনিস যে একটুখানি পুড়িয়ে ছাই করে নাকে শুঁকে দেখতে হয় সেও জানিসনে? গন্ধেই তো টের পাবি কী বস্তু। ওদের ইনএফিশিয়েন্সিতে মুগ্ধ, দয়ার্দ্র, বিগলিত

করুণা, জাহ্নবী যমুনা হয়ে বলি: "দিস ইজ নট ইওর স্টাফ, প্লীজ রিল্যাক্স, জাস্ট স্মেল ইট—"

একটি প্যাকেট ওদের হাতে তুলে দিই। কালোকর্তা শোঁকেন। ভুরু কুঁচকে যেন ধাঁধায় পড়ে যান, বলেন—"স্মেলস ফ্রুটি!" মোটাকর্তা শোঁকেন—গম্ভীর হয়ে বলেন, "পারফিউমড।" বড়কর্তা শোঁকেন, বজ্রগম্ভীরে বলেন—"ইয়াঃ! পারফিউমড।"

আমি রাগ করে প্যাকেটটা কেড়ে নিই, "দূর-ছাই, পারফিউমড হবে কেন, ম্যাংগো। ইটস রিয়্যাল ম্যাংগো। ম্যাংগো ক্যানডি"—বলতে বলতে পাতলা কাগজ ছিঁড়ে একপরত আমসত্ত্ব তুলে নিই এবং কামড় বসাই—"লুক, ইটস এভিডেন্টলি এডিবল।" আমসত্ত্বের সুরভিতে বিচলিত বোধ করে, "ছি! দিদি! কি রকম স্বার্থপরতা হচ্ছে ওটা?", বলতে বলতে খুকু আমার মুখ থেকে চট করে বাকিটা আমসত্ত্ব কেড়ে নেয় এবং "অ্যাণ্ড ইন ফ্যাক্ট ইটস মোস্ট ডিলি-শস!" বলে চোখ বুজে মুখে পুরে ফেলে। রিংকুটা ঠাণ্ডা মানুষ। ও অন্য প্যাকেটটা তুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুলে একটি পরত বের করে ধীরেসুস্থে চোষে, তারপর আরেকটিও বের করে। মোটাকর্তাকে বলে—"উড ইয়ু লাইক সাম?" মোটা তাকায় বড়র দিকে, বড় তাকায় কালোর দিকে। কিঞ্চিৎ দ্বিধার পরে কালোকর্তা মনে বল পায়। হাত বাড়িয়ে আমসত্ত্ব নেয়। "থ্যাংক্স" বলতেও ভোলে না। তারপর কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালের সল্ট টেস্টিংয়ের মতো সন্তর্পণে একটুখানি জিবে ঠেকায়। প্রতীক্ষায় ঘরের বাতাস এত অধৈর্য, যেন নিশ্বাস ফেললেও টং করে শব্দ হবে।

তারপরেই দৃশ্যপটের ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তন। মুখে শৈশবের স্বর্গীয় হাসি, চোখে প্রথম প্রেমের উজ্জ্বলতা, সর্ব অবয়বে টেনশন মুক্তির তরল আরাম নিয়ে গুদোম ফাটিয়ে হেসে ওঠেন কালোকর্তা। সঙ্গে সঙ্গেই বাকী দুজনে হাত বাড়িয়ে খাবলে-খুবলে এক এক টুকরো আমসত্ত্ব খামচে ছিঁড়ে নেন এবং মুখে পুরে ফেলেন। প্রথম প্যাকেটটা ওদের মোক্ষম থাবায় চলে যায়। অন্যটা আমি চট করে ব্যাগে ভরে ফেলি। কোণে ঠেলে নিয়ে গেলে খরগোশেও কামড়ে দেয়। তাই, রিংকু হঠাৎ —"খুকুরে—হ্যাংলা ব্যাটারা আমাদের আমসত্ত্ব যে রাখলে না"—বলতে বলতে সাহেবের থাবা থেকে এক ঝটকায় অন্য প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেয়। তক্ষুণি খুকু বলে ওঠে—"দেখুন, আপনাদের মহামান্য নারকটিকস স্কোয়াডকে কিন্তু আমাদের এই অমূল্য ম্যাংগো ক্যানডি খাওয়াতে পারব না। পাসপোর্ট-টাসপোর্টগুলো এবার বরং দিয়ে দিন, দিদির ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে।" সলজ্জভাবে আমসত্ত্ব চাটতে চাটতে ওদিকে তিন কর্তা আড়ে আড়ে তাকান, ঠারে ঠারে হাসেন। বিনয়ে দু'ভাঁজ হয়ে পড়ে, বড়কর্তা বলেন—"উই আর রিয়্যালি সরি। ইট ওয়াজ আ জেনুয়াইন মিসটেক!" ঝাঁকুনির চোটে আমার হাত প্রায় গুঁড়িয়ে যায়!

পরিশিষ্ট: এইবারে টের পেলেন তো হরিদাস পালেদের বিদেশ যাত্রা কেমন ধরনের হয়? প্রাণের আরাম? আত্মার শান্তি?

ভার্জিনিয়ার ফরেস্ট রেনজার রয় সালিভ্যান ছ' ছ'বার বজ্রাহত হয়েও বহাল তবিয়তে বেঁচে থেকে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছেন বলে পড়েছি। আর এই বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ বিদেশে যেতে গিয়ে শতবার বজ্রাহত হয়েও বহাল তবিয়তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং তারপরেই বরমাল্য ও করতালির অমর কাহিনীটি লেখা হয়ে যায়। এই যেমন ডক্টর দেবসেনেরটা এইমাত্র পড়লেন। যাত্রায় যত দুর্যোগই আসুক না কেন, এমনকী ভ্রমণটাও যদি ফসকে যায়, আপনার কপালে কাহিনীটি তাই বলে ফসকাবে না! হ্যাঁ! সেটি পাবেন।

[কিন্তু যে যাই বলুন দুর্ঘটনায় বাস্তবের কাছে কল্পনা দাঁড়াতে পারে না। এখানে বর্ণিত প্রত্যেকটি ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, প্রতি ক্ষেত্রেই বহু সাক্ষী বর্তমান আছেন, যদিও, তাঁরা না-থাকলেই বেশি ভালো হতো]!

মেসোমশায়ের কন্যাদায়

ভদ্রমহিলার পাতে মাছটা প্রায় দেওয়া হয়েই গিয়েছে, হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসে পড়লেন মেসোমশাই—

—"তুইল্যা ফ্যালাও, তুইল্যা ফ্যালাও!" পাতের ঠিক এক ইঞ্চি ওপরে তখন রুইমাছের পেটি ত্রিশঙ্কু—

—"ওনারে জিগাইসিলা?"

—"না তো।"

—"ওই তো দোষ। পরিবেশনের একটা রুলস আছে না? জিগাইয়া লইয়া তবে দিতে হয়। পয়লা কইতে হয়—'আপনি কি মাছ নিবেন?' মহিলা এই সময়ে বললেন—"হ্যাঁ।" মেসোমশাই সেটা কানে তুললেন না। আমাকে বললেন—"বল? রুন্টু বল? আপনি কি মাছ নিবেন?" মহিলা পুনরায় স্পষ্ট গলায় বললেন—"হ্যাঁ!" আমি আর না পেরে ঝুলন্ত মাছটা ওঁর পাতে দিয়ে ফেলি। মেসোমশাই যারপরনাই হতাশ মুখে বললেন—"আইজকালকার ইয়ংম্যানদের মেইন ডিফেক্ট তো এই! ঠিক যেইটা কইলাম তার অপোজিটটা করলা তো? না জিগাইয়াই দিলা। এইভাবেই ওয়েইস্টেজ হয়। সরকার তো এইটাই মানা করে। যেমন সৌম্য ডিসওবিডিয়েন্ট, তেমনই তার বন্ধু!" আমি এবারে আরো বোকার মতো, ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করে বসি—

—"আপনি কি মাছ নেবেন?" মহিলা আবার বললেন—"হ্যাঁ!" মেসোমশাই অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে ওঠেন।

—"রাইট ! জাস্ট লাইক দিস ! জিগাইয়া লইয়া তবে সেনা পাতে দিতে হয় ! দ্যাও দ্যাও ওনারে আরো দুইখান মাছ দাও দেহি —মনে হয় মাছটা উনি ভালোই খান। মাছ যারা ভালো খায়, তারা আবার অনেকেই খাসির মাংসটা তত ভালো খায় না।"

মহিলা বললেন—"আমি কিন্তু মাংস খেতেও ভালোবাসি।"

এবার জিভে একটা অধৈর্য শব্দ করে মেসোমশাই অভয় হস্ত উত্তোলন করেন—

—"আহাঃ আপনের কথা হয় নাই। জেনারেল ডিসকাশান হইতাসে। আপনের লাইগ্যা মাছ-মাংস সবই আছে, ভয় নাই, তাড়াহুড়া কইরা লাভ কি ? অল ইন গুড টাইম। মাছটা খাইয়া লন, মাংসও ঠিকই পাইবেন। আরে ও সৌম্য, চিংড়িমাছটা এইধারে আনস নাই ?" হাঁকতে হাঁকতে ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে যেতেই পথিমধ্যে মাসিমার সঙ্গে মুখোমুখি। ফুটন্ত কেটলির মতো মাসিমা বললেন—

—"কী বলছিলে তুমি ? কী উচ্চারণ করলে এইমাত্র ?"

—"কইতাসি যে চিংড়িমাছটা—"

—"চিংড়িমাছ ? চিংড়িমাছ হয়নি, তা জানো না ?" মেসোমশায়ের মাথায় হাওড়া ব্রীজ ভেঙে পড়ে।

—"হয় নাই ? স্ট্রেইনজ। সেইদিন যে মেনু হইল ?"

—"মেনু হলো, খাওয়াও তো হলো। খেলে না সেদিন ইয়া বড় বড় গলদাচিংড়ি ? চিনুর পাকাদেখার দিনে ? বিয়েতে চিংড়িমাছের কথা কবে হলো ?"

"আলবৎ কথা হইসিল।"

—"কক্ষণো হয়নি।"

—"সার্টেনলি হইসিল।"

—"কখনো হয়নি। হয়নি। হয়নি।"

—"ইউ শাট আপ।"

—"কেন, কিসের জন্যে আমি শাট আপ ? তুমিই বরং একদম মুখ খুলবে না আজকে ! ছি ছি গুলিখোর-গাঁজাখোরের মতো কী বলতে কী যে বলছ ! কী লজ্জা কি লজ্জা।"

—"ক্যান ? লজ্জার হইলটা কী ? শুনি ? চিংড়িমাছ খাওয়াইতে না পারলেই লজ্জা ? এইয়ার মধ্যে লজ্জার আছেটা কী ?"

"লজ্জার এই যে, তোমার বাক্যি শুনে সকলে ভাবলো যে মেনুতে চিংড়ি থাকা সত্ত্বেও আমরা ইচ্ছে করেই এই ব্যাচে ওটা দিলুম না। এটাই ভাবলো সকলে। ছি ছি—"

—"অত ছি-ছি-য়ের কী আছে ? মোটেই কেও তা ভাবে নাই। সকলেই জানে আমি সার্ভিস করি, সার্ভিস। বোঝলা ? আমি কি বিজনেস করি, যে হোর্ডিং করুম ? হোর্ডিং করা আমাগো নেচার না।"

বোধহয় ঐ "হোর্ডিং করা" শব্দটাতে মাসিমার ইংরিজি হোঁচট খায়। তিনি বলেন—"ওসব জানি না বাপু, লোকে যা ভাবার তাই ভাবলো। বাস। সে তোমার নেচার যেমনই হোক।"

—"আরে, ভাবে নাই, ভাবে নাই। আর যদি ভাইবাই থাকে, আমি অহনই যাইয়া অগো কইয়া দিতাসি, যে, মশয়, আইজ কিন্তু চিংড়িমাছ হয় নাই।"

এই সময়ে বুড়োদা এসে মা-বাবার মধ্যস্থলে দাঁড়ান, বাফার স্টেট হয়ে। বুড়োদা মধ্যপ্রাচ্যে শাঁসালো চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। বছর দুই বাদে এই তাঁর প্রথম ঘরে ফেরা। মাত্র তিন হপ্তার ছুটিতে, বোনের বিয়ে উপলক্ষে। প্রচুর সাড়া জেগেছে, আত্মীয় মহলে ("বুড়ার ঘড়িটা দেখসস?" "বুড়া কোন-দিকে?") রমরমা পড়ে গেছে। কিন্তু মেসোমশাই কিছুতেই ঠিকমতো বুড়োদাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। যেন কোনোদিনই বাইরে যায়নি ছেলে, ভাবখানা এমনি। বুড়োদার সেটা সহ্য হচ্ছে না। তাই চান্স পেলেই তিনি বাবার কাছে জোর করে ইম্পর্ট্যান্স আদায় করছেন। বাবা-মায়ের মধ্যবর্তী হয়ে বুড়োদা বললেন:

—"থাক, বাবা, লেট ইট এনড হিয়ার। ডোণ্ট ক্রিয়েট আননেসেসরি কমপ্লিকেশনস।" অবশ্য বুড়োদা বিন্দু-বিসর্গও জানেন না বর্তমান সমস্যাটা কী। অথবা সমস্যা আদৌ আছে কি নেই।

—"বুড়া, তুমি থামো তো দেহি। কমপ্লিকেশন কি আমি করি? নেভার। হেইডা যে করার সেই করসে। তোমার গর্ভধারিণী।" মাসিমা চোখ কপালে তুলে বিপুল এক হাঁ করতেই বুড়োদা তাঁর কাঁধটা খামচে ধরে সাদরে একটি গুল সার্ভ করেন —"চলো মা, ও ঘরে চলো, চিনু তোমায় খুঁজছিলো।" সাপের ফণায় মন্ত্রপড়া জল পড়লো। মাসিমা ছটফটিয়ে কনের কাছে চলে যান।

সৌম্যর বাবা, আমাদের পড়শী এই মেসোমশাইয়ের দেশ পূর্ববঙ্গে, আর মাসিমা খাস ঘটি। চল্লিশ বছর একটানা কলকাতায় বাস করার ফলে মেসোমশাই এখন নির্ভীকভাবে সর্বত্র এক জগাখিচুড়ি বাঙলাভাষা বলেন। কিন্তু তাতে মাসিমার মুখের মিঠে শান্তিপুরী বুলির নড়চড় হয়নি। পাড়ায় যখন ঘটিবাঙালের ঝগড়া হতো, চিনুদি আর মিতুন নিতো ঘটি পক্ষ; ওরা মামারবাড়ির আঁচলধরা মোহনবাগান সাপোর্টার —কিন্তু বুড়োদা আর সৌম্য বাপ-ঠাকুরদার বংশমর্যাদা রক্ষা করতে, ফরএভার ইস্টবেঙ্গল! সেই চিনুদির বিয়ে আজ! সৌম্য বলল—"রণ্টু, তুই বাবাকে আজ একটু চোখে-চোখে রাখিস রে—আমি তো নানাদিকে ব্যস্ত থাকবো; বাবা ওদিকে ফিলড খালি পেলে হেভী কেলেংকারী করবেন।" এ কাজটা পাড়াসুদ্ধ সকলেরই অভ্যেস আছে। পাড়াতে যখনই কোনো সামাজিক কাজ হয়, কাউকে না কাউকে তখন মেসোমশায়ের দিকে 'চোখ' রাখতে হয়। মেসোমশাই কী করতে কী করে বসেন? আর আজ তো এক্কেবারে চরম সামাজিক মুহূর্ত সমাগত—স্বয়ং মেসোমশায়েরই কন্যাদায়! অথচ মহামান্য কন্যাকর্তা হিসেবে মেসোমশাই নিজের ডিউটিটা সম্বন্ধে

কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছেন না। সম্প্রদান করবেন কনের জ্যাঠা, নিমন্ত্রণপত্রেও তাঁরই নাম। রান্না-বান্নার, 'খাওন-দাওনের' চার্জে আছেন কনের করিতকর্মা সেজকাকা। কেনাকাটার দিকটা সম্পূর্ণ দেখছেন কনের বড়লোক মামা-মাসীরা, বাড়িভাড়া, বাড়িসাজানো বুড়োদার, বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কনের ছোটকাকা এবং কাকীদের দেখার কথা। রিসেপশানের দিকে আছেন কনের পিসিরা। উৎসব বাড়িতে মেসোমশাই কিছুতেই একটা নিজস্ব ভূমিকা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই বলে তিনি যে অলস, অক্ষম, অথবা এলিয়েনেটেড, অর্থাৎ কিনা পার্টিসিপেশনে নারাজ—তা একেবারেই না। অতএব চর্কীবাজির মতো সারা বাড়ি ঘুরে তিনি "কন্যাকর্তার যোগ্য" কাজ নিজেই যোগাড় করে নিচ্ছেন। এবং এখানেই সকলের উদ্বেগের কারণ।

আপাতত মেসোমশাই বিয়েবাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরে ভাঙাচেয়ার, এবং ফরাসপাতানো ইন্সপেকশন করছেন। একটা ঘরের ফরাসের ওপরে গোটাকয়েক বাচ্চা আপনমনে খেলছিল। হেনকালে মেসোমশায়ের আকস্মিক প্রবেশ। ঢুকেই তিনি বাচ্চাদের বললেন—"তোমরা মনু, অই ঘরটায় বস গিয়া। ঐ ঘরে কিনা ফরাস নাই, দেখবা ক্যাবল চেয়ার আর শতরঞ্চ।" তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখটা টিপে—

—"অ্যাতগুলো কাসসা বাসসা—দুই-চারিটা প্রসসাব কইরা দিলেই হইল ?—বাস ! সাধের বিয়াবাড়ি ফিনিশ !" এত্ত অপমান ? মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চারা সব উঠে অন্যত্র পালায় ! বছর বারো-তেরোর ধুতি-পাঞ্জাবি—চন্দনকাঠের বোতাম-পরা দুটো পাকা ছেলে কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে উঠে গেল না। মেসোমশাই তাদের বললেন— "তোমরাও মনু উইঠ্যা ঐঘরে যাও। এই ঘর ফর এডাল্টস ওনলি।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে, "পোলাপানগো কথা। কওন তো যায় না। প্রসসাব কইরা দিতে কতক্ষণ ?" গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলেগুলি এবারেও উঠে দাঁড়ালো না। একটা সম্মুখ সমরের প্রস্তুতি হব-হব দেখে আমি কেটে পড়তে চাইছি, এমন সময়ে হৈ-হৈ করে দই মিষ্টি এসে পড়লো। সামনেই মেসোমশাই।—"বাবু মিষ্টি কোথায় রাখবো ?" মেসোমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন—"সো-ও-জা উপরে তিন তলায় লইয়া যাও, স-ব অ্যারেনজমেন্ট করাই আছে। রুন্টু, তুমিও সাথে সাথে যাও।"

সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে দেখি সেখানে ছাদে প্যাণ্ডেল বাঁধা, ছাঁদনাতলা সাজানো হচ্ছে, মিষ্টি রাখার কোনো ব্যবস্থাই নেই। কিন্তু সেখানে অন্য সমস্যা— ছাঁদনাতলার জন্য কলাগাছ কিনতে ভুল হয়ে গেছে।

মিষ্টির ঝুড়িওলাদের নিয়ে আবার নিচে এলাম, মেসোমশাই সেখানে ভাঙা চেয়ারের ডাঁইয়ের পাশে একটি আস্ত চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের মুখ দেখেই বললেন—"জাগাটা পাইলা না বুঝি ? যাও তবে ভাড়ারেই লইয়া যাও।"

—"ভাঁড়ারটা কোনদিকে ?"

—"সেইটাও আমারেই কইয়া দিতে লাগবো ? এই বাড়িটা কি আমি প্ল্যান কইরা

বানাইসি? এইখানে তুমিও যেই, আমিও সেই। দুইজনাই আউট-সাইডার। এট্টু কমনসেন্স ইউজ করবা তো রুন্টু? কমনসেন্স লাইফে খুবই দরকার হয়। যাও, তোমার মাসিমারে জিগাও গিয়া।" মাসিমা যেন এখানে আউট-সাইডার নন। যদিও প্রত্যেকেই আজ সকালে একইসঙ্গে এ বাড়িতে প্রথম পদক্ষেপ করেছি। মিষ্টিওয়ালাদের নিয়ে আবার ওপরে উঠছি, মেসোমশায় আরেকজনকে ডাকলেন—

—"এই যে লম্বোদর শুইন্যা যাও।" গণেশ সৌম্যর আরেক বন্ধু। —"তুমিও যাও, গিয়া মিঠাইটা গার্ড দাও গা। তুমি তো মিষ্টান্নটা ভালোই বোঝ, এই ডিউটি তোমারেই ঠিক স্যুট করবো, ভাড়ারঘরের সামনাটায় খাড়াইয়া থাকবা, হাতে একটা ছড়ি লইয়া। কেও যান চুরি কইরা খায় না, মেকুর-বিরাল, কি পোলাপান—বি কেয়ারফুল, বোঝলা? খুব সাবধান! যাও!"

খানিক পরে একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলল—"রুন্টুদা, তোমাকে গণেশদা শিগগির ডাকছে।" গিয়ে দেখি ভাঁড়ার ঘরে সারি সারি দই মিষ্টির হাঁড়ি-থালার সামনে করুণ বিষণ্ণ গণেশ ছড়ি-হাতে দণ্ডায়মান। যেন জ্বলন্ত জাহাজের ডেকের ওপরে কাসাবিয়াঙ্কা। একবার বাঁ পায়ে ভর দিচ্ছে, একবার ডানপায়ে। আমাকে দেখেই বলল—"যা তো রুন্টু, সেজকাকার কাছে, শিগগির একটা তালা নিয়ায়, এটা কি মানুষের কাজ? এতগুলো টাটকা মিষ্টির সামনে...এভাবে...মোস্ট ইনহিউম্যান সাইকিক টরচার!"

গণেশের নাম গণেশ নয়, ধ্যানেশ। বেচারী খেটে-টেতে একটু বেশি ভালোবাসে। এই বয়সেই দিব্যি একটি ভুঁড়ি বানিয়ে ফেলেছে বলে মেসোমশাই ওকে আদর করে ডাকেন "গণেশ।" সেটাই পাড়ায় চালু হয়ে গিয়েছে।

সেজকাকা তো শুনে অবাক।—"মিষ্টির সামনে ছড়ি হাতে লোক পাহারা? এ্যাঁ? এটা কি ক্ষেত, না খামার?" তালা মজুতই ছিল হাতে, সেজকাকা নিজে যখন তালা মারার তোড়জোড় করছেন অর্থাৎ টেকনিকালি গণেশের ডিউটি অফ হয়ে গিয়েছে, সেই সূক্ষ্ম কয়েকটি মাত্র সেকেণ্ডের মধ্যেই লুকিয়ে গোটা চারেক সন্দেশ সটাসট সেঁটে ফেলল গণেশ। এত ফাইন এবং ফাস্ট ওয়ার্কার সচরাচর দেখা যায় না, এবং গণেশের মতে, এতে নীতিগত কোনো বিরোধও নেই।

এই সময়ে ওদিকে একটা গোলমাল শুনে ছুটে গেলাম।

—"আঃ হা—কলাগাছ আনে নাই তো হইসেটা কী?" মেসোমশায়ের গলা। —"চাইর চাইর খানা কলাগাছ দিয়া হইবোটা কী? জানবা যে আমাগো ফেমিলিতে ছাঁদনাতলায় কলাগাছ লাগে না, নেভার। আমাগো গুরুর মানা। বোঝলা? কলাগাছের লাইগ্যা বাজারে গিয়া কাম নাই, সিধা ছাদে চইল্যা যাও, চাইর কর্নারে চারিখান ইটা লাগাইয়া দ্যাও। ব্যস! ফার্স্ট ক্লাশ।" উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মেসোমশাই প্রায় কনভিন্স করিয়ে ফেলেছেন, গণেশ আর আমি ইঁট খুঁজতে যাব, এমন সময়ে সৌম্যর ছোটকাকা হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির, দুই বগলে চারটে কলাগাছ! —"এই যে, খোকন,

হে-ই যাইয়া কলাগাছ কিইন্যা আনছস? যেইটার দরকার নাই ঠিক সেইটাই! টোটালি আননেসেসারি ওয়েইস্টেজ!" বলতে বলতেই দ্রুত স্থানত্যাগ করছিলেন মেসোমশাই, কেননা ওদিক থেকে মাসিমার 'মঞ্চে প্রবেশ' ঘটছে। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। মাসিমা মৃদু ডাক দিলেন—"কই? শুনছো?" আর না শুনে উপায় আছে? মেসোমশাই দাঁড়িয়ে পড়েন।

—"তুমি নাকি বলেছো ছাঁদনাতলায় কলাগাছ লাগাতে হবে না? তোমাদের গুরুর বারণ?"

—"আরে ধুর! কে কইল? আমি তো কইলাম 'ক্যান— কলাগাছে কামডা কী? এইডা কি মা দুর্গার পুত্রের বিবাহ, যে কলাগাছ না হইলেই ওয়েডিং ক্যানসেল? জামাই-বাবাজী কি গণেশ ঠাকুর? নাকি এইডা বৈষ্ণবের কালীপূজা? অরা পাঠার বদলি কলাগাছ বলি দেয়, থোড় দিয়া ভোগ রান্না করে কইরা শুনসিলাম। অগো লেইগ্যা কলাগাছ ইনডিসপেনসিবল। কিন্তু আমাগো ঘরে তো চিনুই আছে।" মাসিমা এবার বললেন—

—"হ্যাঁগা, তোমার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দেব?" লম্বা জিভ কেটে মেসোমশাই তাড়াতাড়ি বলেন—"তুমি আর ফাঁস দিবা ক্যামনে? তুমি নিজেই তো ফাঁস। আমি তো তোমারেই গলায় পইরা ফাঁসি লাগাইসি। দরির কি গলায় দরি হয়? হয় না!" এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক মেসোমশাইকে বাইরে ডাকলেন। মেসোমশায়ের মুখটি মলিন হয়ে গেল।—"অহনই আইতাসি,"—বলে উপরে উঠে গেলেন হন্তদন্তভাবে। যাবার আগে মাসিমার কান বাঁচিয়ে আমাকে সিঁড়িতে ডেকে এনে বলে গেলেন—"দ্যাখলা তো? মেজো ভাইরা। গাড়ি-ড্রাইভার ধার দিসে কিনা, তাই তখন থিক্যা কাজ নাই কাম নাই আমারে ডাইক্যা ডাইক্যা ক্যাবল ফালতু কথা কইতাসে। য্যান সেই আইজ কন্যাকর্তা। কতবড় ভি. আই. পি. লোক। হুঃ। আমি আর যামুই না নিচে!" বলে, সোজা ছাদে পালালেন, যেখানে কলাগাছ লাগানো হচ্ছে। খানিক বাদে আমিই ওপরে গেলাম মেসোমশাইকে ভাত খেতে ডাকতে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সৌম্যর বড়মামার সঙ্গে দেখা। পান চিবুতে চিবুতে উঠছেন। মেসোমশাই হঠাৎ ভদ্রতার অবতার হয়ে হাত জোড় করে বললেন— "খাওনদাওন ঠিকমতো হইসে তো?" সৌম্যর মামা ঢেঁকুর তুলে বললেন,—"ব্যবস্থা তো চমৎকার, কেবল ডালে নুনটা একটুখানি বেশি পড়ে গেছে, ওটা"—

"তাইলে আপনি এট্টু ঠাকুরগো লগে থাকলেই পারতেন? খাইবেন তো আপনারাই! ডাইলে লবণটা আপনের স্বহস্তে দিয়া দিলেই ঠিক হইতো!" হতবাক শ্যালকের মুখটি কালো করে দিয়ে বীরদর্পে মেসোমশাই নেমে আসেন।

কলকাতার বনেদী বড় ঘর সৌম্যর মামারবাড়ি। উদ্বাস্তু মেসোমশাইকে ভালো ছাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সৌম্যর দাদু। কিন্তু মেসোমশাই নিজের শ্বশুরবাড়িকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তাদের অপরাধ, তারা একেই ধনী, তায়

ঘটি।—"কলকাতার কায়েত তো," প্রায়ই বলেন তিনি মাসিমাকে—

—"তোমাগো প্যাটে প্যাটে প্যাঁচ। জিলাবীর প্যাঁচ। বোঝলা? ওইটারে তো ভদ্রতা কয় না, কয় কুটিলতা!" চান্স পেলেই তিনি শ্বশুরবাড়িকে ডাউন দ্যান। নিচে আসামাত্র আবার মাসিমার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম দুজনে। সাক্ষাৎমাত্রেই প্রেমালাপ। মেসোমশাই এবারে ট্যাকটিক্স বদল করেছেন। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স।

—"এই যে আইলেন! তোমাগো লাইগাই যত না গোলমাল। খালি হই হই! খালি হই হই!"

—"আমি আবার হৈহৈটা কী করলুম শুনি? গোলমালের রাজা তো তুমি? তোমার বাধানো গোলমাল সামলাতে সামলাতেই"...

—"কী? কী বলেছো তুমি কৃষ্ণার ভাইকে?"

—"কী আবার কইলাম? কৃষ্ণার ভাইডা আবার কেডা?"

—"জান না? জান না তো অত কথা বলা কেন? কাজের বাড়িতে, একবাড়ি কুটুম-বাটুমের মধ্যে—ছি-ছি-ছি! কী লজ্জা, কী লজ্জা। ঘরে বসেছিল, তাকে তুমি বসতে দাওনি, ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছ, আবার বলেছ কিনা ফরাসে নাকি হিসি করে দেবে?"

—"কে কইল? আরে—সমস্ত বাজে কথা। কী কইতে কী যে কয়। বাদ দ্যাও বাদ দ্যাও। আমি তুইল্যা দিমু ক্যান? আমি তো ক্যাবল কইলাম কাসসাবাসসা গিশগিশ করতাসে, কওন তো যায় না? প্রসসাব কইরা দিতে কতক্ষণ? ফরাসটা শ্যাষ কইরা দিত কি না, তুমিই কও? অ্যাকসিডেন্টালি, পোলাপানগো কথা কওন তো যায় না?"

"অ্যাকসিডেন্টালি? কৃষ্ণার ভাই ক্লাস এইটে পড়ে। সে অ্যাকসিডেন্টালি ফরাসে হিসি করে দেবে? এটা একটা কথা হলো? বেচারী কৃষ্ণা খুবই দুঃখ পেয়েছে, —তার ভাই তো আর জানে না তুমি কী বস্তু? নতুন কুটুম—ছিছি"—কৃষ্ণা সৌম্যর ছোটকাকীমার নাম, কাকার নতুন বিয়ে হয়েছে—এখনও বছর ঘোরেনি। মেসোমশাই সত্যিই এবার লজ্জা পেলেন বলে মনে হলো।

—"আমি কী কইরা জানুম সে ছ্যামরা কুটুমবাড়ির পোলা? সবকয়ডা এগুাগ্যাগুই তো আসে দেহি তোমার বাপের বাড়ি থিক্যা। আমি তাই—"

—"ও আমার বাপের বাড়ির লোক ভেবে তুলে দিয়েছিলে? এবারে বোঝা গেল!"

—"না, না, না, ঠিক তাও না—একচুয়ালি—সইত্য বলতে কি—"

এমন সময়ে বুড়োদার আবির্ভাব, তাঁর দীর্ঘদেহ নিয়ে, বাবা-মার ঠিক মধ্যস্থলে। দুজনের চাইতেই একমাথা ওপর থেকে বুড়োদা বললেন,—"এটা কিন্তু খুবই সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি কথাবার্তা হচ্ছে বাবা। প্রথমত, আমি স্পষ্ট শুনেছি যে তুমি বলেছিলে—" অমনি মাসিমা ফুঁপিয়ে ওঠেন—

—"দেখলি তো বুড়ো, দেখলি তো, তোর বাবা কী করেন? আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলেন চিরটাকাল।" মায়ের কাঁধে হাত রেখে বুড়োদা সস্নেহে বলেন, —"যাক গে, বাবার কথা বাদ দাও মা, চলো, এবার তুমি খেতে না বসলে—"

খেয়েদেয়ে সবারই একটু ভারী ভারী লাগছে, কিন্তু মেসোমশাই হালকা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন এ-ঘর ও-ঘর, এ-বারান্দা সে-বারান্দা। একবার আমাকে ডাকলেন —"শোনো, রুণ্টু, এইদিকে শুইন্যা যাও"—কোনো জরুরী কাজ আছে ভেবে যেই কাছে গেছি মেসোমশাই আমার কানে-কানে ফিসফিস করলেন—"যে-যার বউরে! বোঝলা রুণ্টু? যে-যার বউরে!" আমার মুখের বিভ্রান্ত চেহারা দেখে এইবার দয়াবশে উক্তিটি প্রাঞ্জল করে দেন—"মেজো-ভায়রাও তার গাড়িটা দিসে, আরও একটা গাড়ি আমি রেইণ্ট করসি। চিনুর মামাগুলা, সব শালারা ওই গাড়ি কইরা যে-যার বউরে আনাইতাসে। এভেরিওয়ান ব্রিংগিং হিজ ওন ওয়াইফ। য্যান ওইজন্যই দ্যাশে কার-রেণ্টাল-সিস্টেমটা চালু আছে। যতসব সেলফ-সেণ্টারড ঘটি!"

এমন সময়ে সুন্দরী, সুবেশা, মোটাসোটা, এক মধ্যবয়সিনী, ঘামতে ঘামতে এসে ধপ করে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আহ্লাদে-গলায় বললেন—"উঃ, বড্ড চা-তেষ্টা পাচ্ছে কিন্তু, জামাইবাবু!" সাধারণত সুন্দরী শ্যালিকার প্রতি ভগ্নীপতির যে মনোভাব থাকার কথা, এক্ষেত্রে তার ঘনঘোর ব্যতিক্রম দেখা গেল। মেসোমশাই গম্ভীর স্বরে বললেন—"ঠাকুরগুলিরে আর অহন আপসেট কইরা কাজ নাই, পয়সা দিতাসি, এই লও—" বলতে বলতে প্যান্টের পকেট থেকে একটি চকচকে আধুলি বের করে অন্তত তিন ছেলের মা, সম্ভ্রান্ত মহিলাটির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন—"রাস্তা থিক্যা চা খাইয়া আস গিয়া। বেশিদূরে না। বাইরাইলেই দ্যাখবা ফুটপাথে সার সার চায়ের স্টল। সার সার। সার সার।" মহিলার মুখের অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি দেখেই তাড়াতাড়ি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার হাত এগিয়ে গিয়ে আধুলিটা নিয়ে নেয়। নিলে কী হবে? খপ করে আমার হাতটি ধরে ফেলেছেন মেসোমশাই।—"রুণ্টু, তুমি নিলা ক্যান? তোমারে তো দেই নাই? চা-টা খাইতে চায় মলিনা। মলিনার লগে দিসি!" আমি তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করি। পয়সাটা আমি মেরে দিচ্ছিলাম না, ঐ মহিলার জন্য চা এনে দেব বলেই। উনি কী করে মিছিমিছি নিজে কষ্ট করে...ইত্যাদি। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ এক্সট্রীমলি আনন্দিত হয়ে উঠলেন—"খাড়াও, ইউ আর আ গুড বয়, রুণ্টু। ভেরি কনসিডারেট। আরও দশ-পয়সা লইয়া যাও, দুই খুরি চা নিবা, তোমাগো একটা, অগো একটা। আর আমার লগেও একটা আইন্যা দিও।" এবার মলিনা মাসিমা হেসে ফেলেন।

..."আপনার আর আমার কি একটা খুরি থেকেই ভাগাভাগি? জামাইবাবু?" লজ্জা পেয়ে মেসোমশাই বলেন—"ওঃ হো, তিনজনার তিন খুরি চা! থ্রি কাপস!" বুড়োদা তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন—"কী, চা আনা হচ্ছে নাকি" বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর রেখাদি, তারপর সৌম্য, তারপর শিবু—শেষকালে একটা বড় কেটলি

আর তিন টাকা নিয়ে সৌম্য আর আমি বেরুলাম। ফিরে দেখি অপরাধী-অপরাধী মুখ করে মেসোমশাই বসে বসে চা খাচ্ছেন, সুন্দরী শ্যালিকাকে সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুররাই চা বানিয়ে ট্রে ভরে ভরে পাঠাচ্ছে! মেসোমশাই যারপরনাই লজ্জিত। কেটলিসমেত আমাদের দেখে বললেন—"রাইখ্যা দ্যাও রাইখ্যা দ্যাও। কাজে লাগবোই—পরে গরম কইরা খাইলেই হইবো। কি কও, মলিনা?" মলিনা মাসিমা কেবল হাসতে থাকেন। বিয়েবাড়িতে আর কে কবে মনে করে তিন টাকার ফুটপাথে কেনা চা গরম করে খায়?

ইতিমধ্যে দেশবিখ্যাত রূপচর্চাবিশারদ গোপকুমার এসে গেছেন, শুধু চুল বাঁধতেই যিনি পাঁচশো টাকা নেন—(এইসঙ্গে রাঁধতে বললে কত নিতেন কে জানে) এঁর আসাটা মেসোমশাই পছন্দ করেননি। তাই গলা তুলে বললেন—"আমাগো টাইমে তো মা-মাসিরাই চুল বাঁইধ্যা দিত। কিন্তু চিনুর মা তো তা দিবে না! অলস! তাই ফাইব হানড্রেড রুপিজ জলে ফ্যালাইল।" মাসিমা ধারেকাছেই ছিলেন। হৈ-হৈ করে এসে পড়লেন—"কে বললে আমি চুল বাঁধতে পারি না? তোমার ভায়েদের বৌভাতে কে বৌ সাজিয়েছিল? আমার ননদদের বিয়েতে কোন ভাড়াটে লোক এসে চুল বেঁধেছে, শুনি? এটা আলাদা। এ হলো চিনুর একটা স্পেশাল শখ। তা, এর খরচাও তো তোমার নয়, ওটা দিয়েছে আমার ভাই। তোমার তাতে এত গা-জ্বালা কিসের?"

—"আরে—যে-হালায়ই দিক না ক্যান ওটা কোনো কথাই না। কথাটা হইলো ওয়েইস্টেজের। ওই পাঁচশত টাকা দিয়া তোমার আমার দুইজনারই চন্দনকাঠের চিতা হইতে পারতো জান?" কোত্থেকে বুড়োদার উদয়। পুনরায় ব্যাফল ওয়ালের মতো মাসিমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন—"খুবই ইললজিকাল কথা বললে কিন্তু বাবা। যদিও সাজসজ্জায় একরাত্রে পাঁচশো টাকা খরচ করাটা মর‍্যালি সাপোর্ট করি না, তবু আমি মনে করি, একজন জীবিত ব্যক্তির মনস্তুষ্টির জন্য পাঁচশো টাকা খরচ করাটা অনেক বেশি ওয়ার্থ হোয়াইল, এক মৃতদেহের পিছনে ঐ অর্থ ব্যয় করার চাইতে। তাছাড়া যখন পনেরো টাকাতেই বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সিভিলাইজড উপায়ে একটা—"

—"পনেরো আর নাই রে বুড়া, হেই দিনকাল নাই। এই বাপেরে পুড়াইতে তোমার কিন্তু চল্লিশ টাকা লাগবো। আর তোমার মায়ের বেলায় নির্ঘাত আরো বেশি, ধাই দেন অন্তত পঞ্চাশ-ষাট তো বটেই"—এবার মাসিমা খুবই মুষড়ে পড়েন।—"ভালো! বাপব্যাটায় মিলে তোমরা আমার চিতার হিসেবটাই করো তাহলে আজকের দিনে"—মেসোমশাই পলকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন—"তোমাগো লেইগ্যাই তো এই কমপ্লিকেশন শুরু। ও গোকুলচন্দ্ররে আনলো কেডা? তোমাগো বড়লোক বাপের-বাড়ি থিক্যাই তো"— বুড়োদা আবার শুধরে দেন—"গোকুলচন্দ্র না বাবা, গোপকুমার।"

—"ওই একই হইল, যিনিই গোকুলচন্দ্র তিনিই হইলেন গোপকুমার, কোনো

ডিফারেন্স নাই”—

—“না, ডিফারেন্স তোমার কিছুতেই কি আছে, কেবল আমার বেলায় ভিন্ন। মুড়ি-মিছরি তোমার কাছে একদর—যত যন্ত্রণা সবই কেবল এই একটি জায়গায়” —বেগতিক বুঝে আমি বুড়োদার দাওয়াইটা অ্যাপ্লাই করি।

“মাসিমা, চিনুদি বোধহয় আপনাকে ডাকছিলেন।” কী কুক্ষণেই যে বললাম। বলবামাত্র মাসিমা দৌড়ে ও-ঘরে যান। এবং ততোধিক দৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। রণং দেহি মূর্তিতে।

—“তোমাকে কে বলেছিল শত্রুতা করে মেয়েটাকে এক্ষুনি হরলিক্স আর দই গেলাতে? কেন খাইয়েছ? কেন ওর অতো দামী বেনারসীতে দই ফেলে দিলে তুমি? অত কষ্টের সাজগোজ নষ্ট করে দিয়েছ কিসের জন্যে? কে বলেছিল তোমাকে? কে?”

চিবুক উঁচু করে প্যান্টের দু পকেটে দুই হাত গুঁজে, মাস্তান ভঙ্গিতে একটু ব্যাঁকা হয়ে দাঁড়ান মেসোমশাই। চেহারার মধ্যেই ডিফায়্যান্ট ভাবটা সুস্পষ্ট। যেন ফাঁসির মঞ্চে সূর্য সেন।

—“কইবো আর কেডা? আপন গর্ভধারিণী জননী যারে দেখে না, হিউজ নেগলেক্ট করে, তারে দেখবো তো বাপেই!” ব্যাপার কী? না পাঁচশো টাকার সাজসজ্জা কমপ্লিট হয়ে যাবার পরে, সহসা স্নেহপ্লাবিত হয়ে মেসোমশাই চিনুদিকে জোর করে হরলিক্স আর দই খাইয়ে এসেছেন নিজের হাতে। ফলে সেইসব সমুদ্রপারবর্তী অমূল্য কিসপ্রুফ লিপস্টিক, লিপগ্লস, লিপ-শাইনার, লিপ-লাইনার ইত্যাদি স্রেফ লেহ্য পেয় হয়ে গিয়ে, কনে সর্বস্বান্ত। ওষ্ঠাধরে এখন প্রধানত যাদবের দই লেগে আছে। হৃদয় হা হা করে উঠলেও বেচারা চিনুদি একঘর কুটুম্বের সামনে বাপের অবাধ্য হতে পারেনি।

—“এই হরলিক্স আর দইটুক এট্টু খাইয়া লও মা জননী, এ হইল গিয়া রোগীর পইথ্য, উপবাসের মধ্যে খাইলে দোষ হয় না। আহা, মাইয়াডার মুকখানি শুকাইয়া এই এত্তোটুক যে!” ফলে চিনুদির মুখ আরো বেশি শুকিয়ে খুবই করুণ হয়ে গেল। কিন্তু পিতার সেন্টিমেন্টাল অ্যাকশনে বাধা দেয়, এমন বুকের পাটা কোনো আত্মীয়ের ছিল না। যদিও প্রত্যেকেই পাঁচশো টাকার প্রসাধন অংশত খেয়ে ফেলা নিয়ে যৎপরোনাস্তি উদ্বেগে ভুগছিলেন। চিনুদির অসীম সহ্য। বুক ফাটলেও চোখ ফাটেনি—কেননা তাতে নয়নের টিয়ার প্রুফ-মাস্কারা এবং কপোলের ফিয়ারপ্রুফ 'ব্লাশার' পেইন্টও ধুয়ে যেতে পারতো, কে জানে?

খাওয়াবার সময় এক চামচ দই আবার কনের কোলে পড়ে গিয়েছে। পড়বামাত্র মেসোমশাই সেখানে একমগ জল এনে মুছেছেন। ফলে এখন কনের কোলের কাছে লাল বেনারসীর বেশ খানিকটা অংশ রং পালটে ঘোরতর খয়েরি এবং জরিটরি ভিজে ভারি হয়ে উঠেছে। চিনুদি ঠোঁট ফুলিয়ে সেইখানটা অনবরত ফুলের মালা

দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় আমি কেটে পড়াই ভালো মনে করি।

সন্ধে হয়ে গেছে, সৌম্য আর আমি একটা ঘরে ঢুকে সিগারেট খাচ্ছি। চারদিকে এত ফ্রি সিগারেট অথচ এমনই গুরুজনদের ভিড় যে না-লুকিয়ে খাওয়াটা সম্ভবই হচ্ছে না। হঠাৎ সেই ঘরেই মেসোমশাইয়ের প্রবেশ।—"রুন্টু, তুমি না ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার?" ভাগ্যিস আমার সিগারেটটা ততক্ষণে শেষ। "এখনও ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়নি মেসোমশায়।"

—"ঐ হইল গিয়া একই কথা। বিয়াতো এখনও হয় নাই, তবুও তো চিনু অহনই কনেবউ। তুমি হইলা গিয়া কনে-এঞ্জিনিয়ার। বোঝলা? ইলেকট্রিকাল অ্যাপ্লায়েন্সগুলি তো বুঝ? রেকর্ড প্লেয়ারে তুমিই বস গিয়া। যাও। যত আনট্রেইনড লে ম্যানগো হাতে পইরা মেশিনটা শ্যাষ হইয়া যায় আর কি। ঘটিরা মেশিন-টেশিনের সাবজেক্টটাই বুঝে না,—ব্রেইনটা ডাল তো?" সৌম্যর মামাতো ভাইবোনেরা যে সারাদিন রেকর্ডপ্লেয়ারে শানাই লাগাচ্ছে, এটা এইমাত্র মেসোমশায়ের খেয়াল হয়েছে। —"আর শুন, বি কেয়ার-ফুল, রেকর্ড দুইখান অলটারনেইটলি লাগাইবা। অলটারনেইটলি, অর্থাৎ একবার এইটা, আরেকবার ওইটা। বোঝলা তো? সৌম্য কই?" —সৌম্য তখন দরজার পিছনে মেঝেয় ঘষে ঘষে সিগারেট নেভাতে দারুণ ব্যস্ত। ঘরময় ফরাসপাতা অথচ অ্যাশট্রে নেই। ফরাসে ছাই যাতে না পড়ে তাই অতি সতর্কতা অবলম্বন করেছি। ঘরের এককোণে ঢুকে একফালি ফাঁকা মেঝেয় ছাই ঝাড়া হচ্ছিল। কিন্তু মেসোমশাইয়ের চোখকে ফাঁকি দেবে কে?—"ঐ ধারে ধোঁয়ার মতন দেখতাসি না? ওহানে কেডা? সৌম্য নাকি?" সৌম্য কাশল। —"হুঃ। ঘরময় ছাই ঝারতাসো। অ্যাঁ? চাদরটা ময়লা করতাসো। অ্যাঁ, কামের বেলায় দেখা নাই, ক্যাবলই আকামা কামের রাজা?" বলতে বলতেই মেসোমশাইয়ের সবেগে নিষ্ক্রমণ এবং পরমুহূর্তেই কোত্থেকে একটি স্বাস্থ্যবান নতুন মুড়োঝাটা হাতে পুনঃপ্রবেশ।—"ছিঃ ছিঃ, যতত ছাইভস্ম ঝাইরা পরিষ্কার-ঘরটাকে দিল শ্যাষ কইরা" —গজরাতে গজরাতে তিনি ঝাঁটা বুলিয়ে বুলিয়ে ধবধবে ফরাস থেকে কাল্পনিক ছাই ঝাড়তে থাকেন। মেসোমশায়ের নিজের পায়ে অবশ্য যথেষ্টই ময়লা ছিলো। ফরসা চাদরে সেই ময়লা পায়ের ছাপ পড়তে লাগলো, অম্লান বরফে ইয়েতির পদচিহ্নের মতো। আপ্রাণ চেষ্টাতেও ঝাট দেওয়ার পুণ্যকর্ম থেকে মেসোমশাইকে নিবৃত্ত করতে পারা গেল না। ফরাসটাকেও পরিচ্ছন্ন রাখা গেল না।

ইতিমধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো গাড়ির হর্ন শোনা গেল, গেটে শাঁখ বেজে উঠলো, উলুধ্বনি হলো। অমনি, "—দেয়ার! দি বরযাত্র! দি বরযাত্র ফাইনালি অ্যারাইভড!!!" বলে চিৎকার করে উঠে মেসোমশাই ঝাঁটা হাতেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। পেছন পেছন আতঙ্কিত সৌম্য আর আমি—"বাবা! ঝাঁটা! ঝাঁটা!", "মেসোমশাই, ঝাঁটা!

ঝাঁটা!" বলতে বলতে ছুটি, কিন্তু সমবেত গোলমালে আমাদের কাতর আকুতি ডুবে যায়। কে কার কথা শোনে! মুহূর্তের মধ্যে হাস্যবদন প্রফুল্লকান্তি মেসোমশাই মুড়ো ঝাটা হাতে বরযাত্রী অভ্যর্থনায় সদর গেটে রেডি! এই ক্রিটিকাল মোমেন্টে মিতুন, সৌম্যর ছোট বোন ছুটে এসে বাবার হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, এবং মেসোমশাইকে চাপা গলায় একটি ধমক লাগালো।

অমনি তাঁর মুখের হাজার পাওয়ারের হাসিটি দপ করে নিভে যায়, এবং মুড-মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে যায়। মেসোমশাই এবার হাত জোড় করে, বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে, ঠিক শ্রাদ্ধসভার কর্মকর্তার মতো দাঁড়ান। গাড়ি থেকে বরযাত্রীরা নামতে শুরু করে। মেসোমশাই গম্ভীর। নির্বাক। জোড়হস্ত। শাড়িপরা, সুন্দরী মিতুন আর তার একটি কিশোরী বান্ধবী বেলফুলের মালা আর একটি করে গোলাপ বরযাত্রীদের উপহার দিচ্ছে। একটি মিষ্টি হাসি সমেত। স্মিতহাস্য সুদর্শন এক যুবক মিতুনকে নিচুগলায় কী যেন বলতেই, লজ্জায় লাল হয়ে মালা না দিয়ে মিতুন তাকে দুটি গোলাপফুল দিয়ে ফেলে। তৎক্ষণাৎ মেসোমশায়ের মুখ খুলে যায়।

—"দুইটা কইর‍্যা গোলাপফুল কারেও দিবা না, মিতুন! সব একটা একটা, ওয়ান ঈচ! বোঝলা? 'মালা দ্যাও।"

সপ্রতিভ যুবকটি বলে—"আমিও তো ঠিক তাই বলেছিলাম, মালা দিতেই তো বলছিলাম। উনি কিন্তু দিলেন না—" এবার মেসোমশাই ছোকরাটির দিকে ঘুরে দাঁড়ান। ব্যালে ডান্সের পিরুয়েৎ করার ভঙ্গিতে। এক মুহূর্ত রক্ত জলকরা চাউনি, তারপর বললেন— "আপনের এট্টু মিসটেইক হইয়া গেসে না? আইজ তো আপনের মালা পাওনের ডেইট না? আপনের ফ্রেইণ্ডের।" তারপরে— "মিতুন, অমন যারে-তারে মালা দিবানা এই কইয়া দিলাম, হউক সে বরযাত্র, যতসব ফাজিল ছ্যামরা।" কুটুম্ব যুবকটি বিড়ম্বিত, মিতুন লজ্জিত, আমরা উদ্বিগ্ন, সৌম্য তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেটির ক্রোধে ফুলন্ত পিঠে সৌভ্রাত্রের হাত রাখে। এবং ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ভিতরে নিয়ে যায়। এবং অচিরেই অকুস্থলে বুড়োদার অভ্যুদয় ঘটে।

—"আবার তুমি কন্ট্রাডিকটারি কথাবার্তা বলছো বাবা? এই তুমি নিজেই বললে মালা দাও—মালা দাও, আবার এই বলছো মালা দিও না—মালা দিও না। মিতুন তো এতে একদম কনফিউজড হয়ে যাবে!"

মেসোমশাই চোখ তুলে মনুমেন্টের মতো উঁচু মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী পুত্রের মুখের দিকে তাকান। তারপর তার বুকের গোলাপফুলটির দিকে। তারপর বলেন—"মিতুন, তোমার দাদার বুকের থিক্যা ওই গোলাপটা খুইল্যা লও তো দেহি। যত ওয়েইস্টেজ।" ইতিমধ্যে বর-বরণ করতে কুলো-ডালা-শ্রী সমেত মাসিমাও গেটে উপস্থিত। চওড়া জরির দাঁতওয়ালা টুকটুকে লালপাড় দুধে-গরদের ঘোমটার নিচে তাঁর গোলগাল ফর্সা মুখখানি আধো-খুশিতে, আধো-কান্নাতে, উদ্বেগ উত্তেজনায় আশ্চর্য রঙীন। মাসিমার মুখের সেই লালচে আভার দিকে খানিক স্থির চোখে তাকালেন মেসোমশাই। তারপর বললেন—

—"মিতুন, বুড়ার বুকের থিক্যা গোলাপফুলটা খুইল্যা লইয়া তোমার মায়ের খোপায় গুইজ্যা দাও তো দেহি!"

সেই মুহূর্তেই বর নিয়ে ঢুকলেন বরের পিসেমশাই। যিনি মেসোমশায়ের অফিসের ইনকামট্যাক্স অডিটার। চেনামুখটি দেখতে পেয়ে অকূলে কূল পাবার মতো পরম উল্লসিত মেসোমশাই বরের দিকে দৃকপাত মাত্র না করে বরের পিসেকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"আরে —আসেন স্যার—আসেন, আইজ তো আপনেরই দিন!" উলু এবং শঙ্খধ্বনিতে মেসোমশায়ের মহৎ-উল্লাস চাপা পড়লো।

বরপক্ষ বড্ড বেশি ধনী। মেসোমশাই সেই কারণে একটু উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা চলছে না। কেননা বাড়ির আর সকলেই খুশি। বড়লোক হলেই বা। তারা লোক খারাপ নয়। একেবারে কিচ্ছু চায়নি। "হ্যাঁ, একটা বিয়ের মতো বিয়ে করেছে বটে চিনু! প্রেম তো কত লোকেই করে। বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেকেই করে। কিন্তু এমন একটা বিয়ে ক'জনে পায়?" —অতএব বালিগঞ্জে ভালো পাড়ায় বিয়েবাড়ি ভাড়া নিয়ে, টুনিবালবের ঝর্ণাধারায় আর টাটকা ফুলের তৈরি রাজকীয় তোরণে বাজীমাৎ করে বাড়ি সাজানো হয়েছে। এই শখ,এবং খরচ সব বুড়োদার। কিন্তু এই এলাহি ব্যাপারটা মেসোমশাই একদম পছন্দ করছেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিল গড়িয়ায় তাঁর "নিজ বাসভবনে" ছাদে প্যাণ্ডেল বেঁধে যেমনভাবে সেদিনও তাঁর ছোটভায়ের বিয়ে হলো, তেমনি করেই মেয়ের বিয়ে দেন। "চিনুর বিয়ে" বলতে যে স্বপ্নটা তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন তার সঙ্গে এসব কাণ্ডকারখানা ঠিকঠাক কিছুই মিলছে না। আজকের এই বিয়েবাড়ি তাঁর যেন নেহাত অচেনা। এর মধ্যে তাঁর ভূমিকাটা কোথায়? পাত্রও তাঁকে খুঁজতে হয়নি, চিনু নিজেই খুঁজে পেয়েছে। পণও নিচ্ছে না তারা একটি পয়সা, খাটবিছানা, দানসামগ্রী কিছুই নেবে না, রাখবার জায়গা হবে না নাকি তাদের। সবই আছে। কেবল নমস্কারী কাপড় তিপ্পান্ন পীস, আর আশীর্বাদে বরের একসেট হীরের বোতাম হলেই হবে বলেছিল —নইলে নেহাত আত্মীয়দের কাছে পাত্রের মুখ থাকে না, তাই। তাই সেই বোতামটা ছেঁটে ফেলে একটা হীরের আংটিতে রফা করে নিয়েছে চিনুই। (চিনুর মতো কনসিডারেট মাইয়া ওয়ার্ল্ডে কয়জনার হয়?) কিন্তু এতেই মেসোমশায়ের গচ্ছিত প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড উঠে গেছে, বন্ধুদের কাছে ধার হয়েছে। এখনও মিতুনের বিয়ে বাকি, সৌম্যর ডাক্তারি পড়া শেষ হয়নি। অথচ পাঁচশো টাকার খোঁপা, চার হাজারের ফুল এবং আলো (সে যে-হালায়ই দিউক না ক্যান), মেসোমশাইয়ের মাথার মধ্যে কেবলই এগুলো ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। সুতরাং বরযাত্রীরা যেই সভা-সাজানোর প্রশংসা করেছে, অমনি মেসোমশাই বলে ওঠেন—"তাইলে শোনেন স্যার, অই যে টুনিবালব আর ফুলের গেইট, তার দ্বারা কিন্তু বিয়াডা হয় নাই। তার জন্য প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ওঠাইতে হয় না। হ্যাঁ, মন্দ কি আর? ফেন্সী ব্যাপার, লাইট, ফ্লাওয়ার, এ সকল তো ভালোই! ঐ যে বাইবেলে কয় না, 'লেট হানড্রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম—লেট দেয়ার

বি লাইট?'—সকলই সইত্য। কিন্তু পার্সে কুলাইলে তবে তো? মাও সে-তুং যে কইসেন না, চাইনিজ পিপলদের লগে—'কাট ইওর কোট একর্ডিং টু ইওর ক্লথ'? আমিও তাই কই! খাঁটি কথা!"

বরযাত্রীরা মেসোমশায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য শুনে বাকশক্তিরহিত হয়ে পড়েন। আমি কী করে যে ওঁকে সরিয়ে নেব, ভেবে পাই না। এরপর মেসোমশাই উদাস দার্শনিককণ্ঠে বলেন—"এইজন্যই তো ঠাকুর কইসেন—সর্বদা সমানে সমানে কাজ করা উচিত। পূর্ববাংলায় আমাগো এক প্রবচন আছে—উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, যিনিই মধ্যম তিনি চলেন তফাতে। আমরা হইতাসি গিয়া সেই মধ্যম! বোঝলেন?" বরযাত্রীরা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। তাঁরা ঠিক বুঝতে পারলেন না, তাঁদের উত্তম বলা হচ্ছে, না অধম বলা হচ্ছে। কিন্তু মেসোমশায়ের তাতে কোনো উত্তাপ নেই। এবার তিনি—"এক্সকিউজ মী, আমি একটু রিফ্রেশমেন্টের দিকটা দেয়খ্যা আসি" বলে উঠে গেলেন।

আসলে বরযাত্রীদের সঙ্গে কন্যাকর্তার ব্যাক্যালাপ ব্যাপারটার সঘন সামাজিক গাম্ভীর্য বিষয়ে মেসোমশাই পর্যন্ত সচেতন। এবং সেই কারণেই নার্ভাস হয়ে পড়লে কেউ কেউ যেমন তোৎলা হয়ে যায়, মেসোমশাই তেমনি নিজের কথা খুঁজে পান না। কেবলই কোট করতে থাকেন। কিন্তু কোটেশনের উৎসগুলো তখন সব গোলমাল হয়ে যায়। কোনটা প্রবাদ কোনটা মাও সে-তুং কোনটা বাইবেল কোনটা রবীন্দ্রনাথ, সে সমস্তই তখন ইমমেটিরিয়াল হয়ে যায় ওঁর কাছে। এই যেমন বিয়ের আগের দিনের দুপুরবেলা গড়িয়ার বাড়িতে। বিয়েবাড়ির হট্টগোলে বাড়ির কুকুরটি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে এনতার তাড়া করেছিল লোকজনকে। তাড়া খেয়ে বাচ্চা চাকর কেঁদে ফেলেছে। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত। উদ্বিগ্ন।

—"কী হইসেটা কী?"

—"কুকুর অ কামড়াইথিলা।"

—"একচুয়ালি কামড় দিসে কি?"

—"না, কিন্তু—"

—"না? তবে কানসিলা ক্যান?"

—"মোর নূতন লুগা ছিড়ি দিলা।"

—"ঈশশ—।" দুমিনিট—লুঙ্গির জন্য মৌন শোক। তারপর—

—"তুই অরে উল্টাইয়া মারলি না ক্যান?"

—"বাবু আপন মতে মনা করিথিলে। কহিথিলে কুকুরকু মারিলে মোর গোড়অ ভাঙ্গি দিবে—"

—"আরে থো—! আমি হেইটা কইসিলাম তুই অরে মিছামিছি খ্যাপাইতিস বইল্যা। কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা করি নাই?"

—"ফোঁস? ফোঁস কঁড় বাবু?"

—"আরে হেইটাও শোনস নাই? লাঠির ঘায়ে মর মর সাপটারে দেইখ্যা সেই যে গান্ধীজী কইসিলেন—আরে, তোরে কামড় দিতে মানা করছিলাম, কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা করি নাই? মহাত্মাজীর সব থিক্যা ভেলুয়েবল অ্যাডভাইজ হইল এইটা। সর্বদা স্মরণে রাখবা। বোঝলা?"

তক্ষুনি বুড়োদা বললেন,—"বাবা ওটা কিন্তু মোটেই গান্ধীজী বলেননি, ওটা তো রামকৃষ্ণের কথা।" মেসোমশাইও ত্বরিতে জবাব দেন,—"আঃ—কথাটা যে হালায়ই কউক না ক্যান, কইসে তো? গ্রেট মেন থিংক এলাইক।"

বরযাত্রীদের কাছে ছুটি নিয়ে মেসোমশাই বললেন—"চল রুন্টু, ঠাকুরগো কামকাজ একটু ইন্সপেক্ট কইরা আসি?" হালুইকরদের কাছে উপস্থিত হয়ে যেই কন্যাকর্তার উপযুক্ত জলদগম্ভীর স্বরে গলা খাঁকারি দিয়ে—"মাছ ভাজাটা হইল কেমনি? দ্যাখাও তো দেহি—" বলা, অমনি বামুনের সাফ জবাব—"এখন ওসব হবে না। ফালতু ঝামেলা করবেন না। হ্যাঁ! শুনলে বাবু কিন্তু রাগ করবেন", রান্না-বান্নার চার্জে আছেন সৌম্যর সেজকাকা। মোটাসোটা, কর্মঠ, ভুঁড়িতে তোয়ালে বেঁধে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন,সব চুল সাদা। মেসোমশায়ের একটি চুলেও পাক ধরেনি, নেহাত ছোকরা-চেহারা, পরনে স্কুলের ইউনিফর্মের মতো হাতপুরো সাদা শার্ট সাদা জিনের প্যান্টে গুঁজে পরা। উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই মুখে। (ধুতি পাঞ্জাবি কন্যা-কর্তাকে কিছুতেই পরানো যায়নি। ধুতি খুলে গিয়ে কেলেংকারি হবার ভয়ে। অবশ্য মুখে বলেন—ধুতি নাকি বিধবা মেয়েদের ড্রেস, পুরুষ মানুষের পোশাকই নয় মোটে)! হালুইকর ঠাকুর জানে সব বিয়েবাড়িতে ঢের ফালতু মাস্তান থাকে, তাদের প্রশ্রয় দিতে নেই। সে তো আর মেসোমশাইকে দেখেনি, চেনেও না। মেসোমশাই কিন্তু সত্যি রেগে গেলেন। —"দুলু! দুলু!", সেই কণ্ঠস্বরে সেজকাকা আক্ষরিক অর্থে দৌড়ে এলেন—

—"কী? হইল কী মেজদা?"

—"এই রাস্কেলটারে ক্যান বসাইছস? এ রাস্কেল আমারে বাবু দ্যাখাইতাসে, আবার কয় কিনা, 'ফালতু ঝামেলা করবেন না।' আমাগো মাইয়ার বিয়া, আর আমারেই কয় কিনা 'ফালতু?' গেট আউট! গেট আউট! অহনই আমি অন্য ঠাকুর ডাইক্যা আনতাসি। আমাগো গড়িয়ায় শয়ে-শয়ে হালুইকর পথে পথে ঘুরতাসে।" ঠাকুরটি অতি চালু পার্টি। মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটার তাৎপর্য— বিশাল এক লুচিভাজা ঝাঁঝরি হাতেই দৌড়ে এল তক্ষুনি, পেছু পেছু দৌড়োলো তার যোগাড়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট, দু হাতের অঞ্জলিতে কলাপাতায় মুড়ে একডজন মাছভাজার গরম গরম নৈবেদ্য নিয়ে।— "এবারকার মতো মাপ করে দিন বড়বাবু। অপরাধ হয়ে গেছে। আপনারই মাছের পীস রক্ষা করছিলাম আমি। বিয়েবাড়িতে কত ফালতু লোকও তো থাকে" —আবার সেই শব্দ—ফালতু? মেসোমশায়ের রাগ কমল না। মাছ ছুঁলেন না। স্তব্ধ। আস্তে করে দুলুবাবু ঠাকুরদের প্রমপট করলেন—"আরেকবার!" এবার দুই ঠাকুর

গলা মিলিয়ে কোরাসে বারবার আকুল হয়ে মাপ চাইতে লাগলো এবং মেসোমশাইকে মাছভাজা খাওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। তখন ওদের ক্ষমা করে দিয়ে মেসোমশাই নিজে দয়া করে খানছয়েক খেলেন আমাকেও গুণে গুণে ছখানাই খাওয়ালেন এবং—"দুলুরে, অ দুলু! শোনো, তুমিও অহনই খাইয়া লইও খানকয় মাছভাজা, ভাল পীস আর কিন্তু পরে পাইবা না!" বলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলে যেতে যেতে বলেন—"হাঃ, আমার মাছের পীস রক্ষা করে কে? না হালুইকর ঠাকুর। যেই না poacher সেই হইল গিয়া gamekeeper, হাঃ!" তারপরেই মনে পড়ে গেল—"আহা, চিনুর মা-ডারেও দুইখান গরম মাছভাজা খাওয়াইলে হইতো!" যেমনি মনে পড়া অমনি কাজ—"রুন্টু, শোনো, রান্নাঘরে আমি যামু না, তুমিই যাও। দুলুর থিক্যা দু'খান মাছভাজা চাইয়া লও, নিয়া তোমার মাসিমারে খাওয়াও গা যাও। কইবা, আমি পাঠাইসি। বোঝলা? না খাওয়াইয়া আসবা না কিন্তু! ঠিক যেইড়া আমি দেখি না হেই দিকের টোটাল কনফিউশন। আরে, চিনুর মায়েরে যে মোটেই মাছভাজা খাওয়ানো হয় নাই, হেইটাই বা দ্যাখে কে? যাও, যাও—", বলতে বলতে উনি দ্রুত লোক-খাওয়ানোর দিকটায় চলে গেলেন। আমি ছুটি মাসিমার জন্য মাছ-ভাজার ব্যবস্থা করতে। মাসিমা তো প্রথমে হাসলেন, তারপর এক ধমক দিলেন, মোটেই মাছভাজা খেলেন না। সেই ব্যর্থ দৌত্যের পরে পুনরায় মেসোমশায়ের খোঁজে খাবার জায়গায় এসে দেখি চপ দেওয়া হচ্ছে। বরযাত্রীরা খেতে বসেছে। মেসোমশাই সৌম্যকে বলছেন—"বড়দের দুইটা কইরা, ছোটদের একটা। না চাইলে একদম রিপিট কইরো না। ওয়েইস্ট্ য্যান হয় না। বোঝলা?" এসব সংশিক্ষা রান্নাঘর থেকেই পই-পই করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি পরিবেশককে। কিন্তু মেসোমশাইকে চুপ করানোর প্রয়াস বৃথা। কানে কানে শেষটা ("এটা কিন্তু বরযাত্রীদের ব্যাচ, মেসোমশাই") বলে দিতেও তিনি ঘাবড়ালেন না।

—"আরেঃ, তয় হইসেডা কী? হউক না বরযাত্র, ওনারা তো আর পর না? আমার চিনুরই ঘরের মানুষজন—ওনারা শোনলেই বা দোষটা কোথায়? ওয়েইস্টিং ফুড ইজ আ ক্রাইম ইন ইনডিয়া —কী কন বেহাইমশায়?" বলে, যে শুক্ল কেশ শুভ্রবাস কাঁধে মুগার চাদর ভদ্রলোকের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিক্ষেপ করেন মেসোমশাই তাঁকে দৃশ্যত যে-কোনো বিবাহেই বরকর্তার ভূমিকায় মানাতো বটে, কিন্তু আজ এখানে তিনি মোটে বরযাত্রীই নন, চিনুদির কলেজের প্রফেসর। 'বেহাই' —এই অনর্জিত প্রিয়সম্বোধনে বিব্রত প্রফেসর গুপ্ত হ্যাঁ-না দুইই হয়, এমন একটি হাসি দিলেন। ফলে, যথেষ্ট কুটুম্ব কর্তব্য হয়েছে মনে করে, হৃষ্টচিত্তে মেসোমশাই বরযাত্রীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নিচে নেমে আসেন।

নেমেই অফিসের এক সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি। আর অমনি —'খুলিল হৃদয়দ্বার খুলিল!'

—"বাঃ। সুধীরচন্দ্র যে, আইস্যা পড়সো তাইলে? শেষমেষ পৌসাইলা? যাক।

তা-রপর? নিউজ কী? আইজ অফিসে গেসিলা? আমি তো এক্কেরে প্রিজনার হইয়া আছি। মাইয়ার বিবাহ, কি য্যামন ত্যামন ব্যাপার? ওহ!" বলতে বলতে বেশ মৌজ করে মেসোমশাই বরযাত্রীদের ছেড়ে-যাওয়া একটা গদি আঁটা সোফায় জমিয়ে বসে হাঁক পাড়েন—"কই পানসিগ্রেটের ট্রেটা গেল কই?" ট্রেসহ একটি ছেলে এগিয়ে আসতেই, আবার— "কোকাকোলার চাবিটা কার কাছে?" এবার চাবিসহ আরেকজন সবিনয়ে উপস্থিত হয়। "একটার বেশি কারেও দিবা না। আর তাও ক্যাবল বরযাত্র। ভেরি এক্সপেনসিভ হইয়া গেসে। ওনলি ওয়ান ঈচ! তুমি নিজে কয়টা বোতল খাইলা, মনু? ওনলি ওয়ান তো? বা, বা, বেশ, বেশ। এইবার এইদিকে দুইটা বোতল আনোতো দেহি! ঠাণ্ডা দেইখ্যা।" বন্ধুকে কোকাকোলা দিয়ে বললেন, "আইজ লনডন নোটবুকটা পড়সিলা? কী কাণ্ড কও তো দেহি? কোথায় ছিল জেমস কাউলি, আর কোত্থিক্যা আইসে এই চান্দে, আর ঈ-তে। হেঃ।" তারপর নিজের বোতলে একচুমুক দিয়ে বেশ রিল্যাক্স করে বসে ভুরু পাকিয়ে বেদম উদ্বিগ্ন মুখে কন্যাকর্তা বললেন, তাঁর নিমন্ত্রিতকে—"বোঝলা সুধীর, ইংলণ্ডের প্রেজেণ্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা সত্যই ভেরি ক্রিটিকাল। অগো ইমিগ্রেশন পলিসিটা লইয়া আমাগো চিন্তার ঢের কারণ আছে—থাউজ্যাণ্ডস অব কালার্ড পিপলের ফিউচার—"

সেই মুহূর্তে ছাদের ওপরে চিনুদির ফিউচার নির্ধারিত হচ্ছে—জ্যাঠামশাই কন্যাসম্প্রদানে বসেছেন। শাঁখের শব্দ মেসোমশাইয়ের বিশ্বমানবিক উদ্বেগকে বিপর্যস্ত করতে পারলো না।

অলৌকিক রত্নভস্ম এবং নন্দকাকু

হাঁপানির কল্যাণে আমার জগৎজোড়া হিতার্থী। আমার ঘরভরা শিশি-বোতল, খল-নুড়ি ছুঁচ-সিরিঞ্জ, যোগ-বিয়োগ, অম্বু-জম্বু শেকড়-বাকড় মাদুলি-কবচ, তৈল-ঘৃত, ধাতু-পাথর, বড়ি-গুলি, ধুলো-গুঁড়ো, তুকতাক। নেই কী? চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়-ধার্য-ঘ্রেয়-ভিদ্য-ছিদ্য-মালিশ্য সর্বস্ব! এবং অধিকাংশই বিনামূল্যে প্রাপ্ত, ফ্রী সাপ্লাই। কে বলে তোমারে রুগী, অবান্ধব, একা? শুভার্থী ফিরিছে সদা তোমার পিছনে। সেই যে বীরবল বলেছেন না আমরা প্রত্যেকেই খানিকটা ডাক্তারি আর খানিকটা আইন জানি—এই মন্তব্যটির প্রথমার্ধ যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি তা আমি জেনে গেছি। মর্মে মর্মে।

হাঁপানির অব্যর্থ দাওয়াই দেয় না কে? জিতন, আমাদের ধোপা, ফি-হপ্তায়

আমাকে বলে যায়—"দিদি, এইসা চলনে সে তো মর যাও গে! হমারা বাত তো সুনো। পানকা পত্তি লে-কে ভৈসাঘীউ ঔ গোলমির্চ গরম করকে উস পত্তিমে ডালকে সিনাপর মালিশ কর লো, হর-রাতকো, সোনেকা টাইমমে"—খুশিলাল, পাড়ার রিকশাওলা, আমি চড়লেই বলবে—"দিদিমুনিকো ইতনা খাঁসি। বহোৎ পরেশানি কো বাত। এক কাম করো, হর রোজ সুব্য-সাম লৌসন খায়া করো, কাচ্চা লৌসন, একদম ঠিকঠাক হো যায়গা।" বাসে-ট্রামে আমার হাড় কাঁপানো হেঁপো কাশির ধাক্কায় অস্থির হয়ে সহযাত্রী-যাত্রিণীরা আমাকে অবিলম্বেই চিত্রকূট হায়দ্রাবাদে, কি পাহাড়পুরে, নিদেনপক্ষে মধ্যমগ্রামে পাঠিয়ে দিতে চান। সর্বত্রই হাঁপানির 'অব্যর্থ' ওষুধ পাওয়া যায়। সেসব 'সেবন' করাও খুবই সহজ। কোথাও চাঁদের আলোতে পায়েস রান্না করে খেতে হবে, কোথাও কাঁচা পুঁটিমাছ (নাকি চারা পোনা?) জ্যান্ত কপ করে গিলে ফেলতে হবে (হাঁপানির ওষুধটা সেই মাছই খাবে, আমি না)। কোথাও আস্ত চাঁপাকলা না চিবিয়ে খেয়ে নিতে হবে, তারপর থেকে কদলী সম্পর্কিত যাবতীয় দ্রব্য ভক্ষণ ও স্পর্শন নিষিদ্ধ। (অর্থাৎ কাকিমার কুকিং ক্লাসে শেখা বানানা ফ্রিটার্স এবং কাঁচকলার কোপ্তা, মামণির মোচাঘণ্ট, পিসিমার থোড় ছেঁচকি, কেরালার বানানা চিপস এসব তো ঘুচবেই, নেমন্তন্ন খাওয়াও চুলোয় গেল, কলাপাতার ছোঁওয়া খাওয়া বারণ—তাহলে ইলিশ মাছের পাতুরিটাই বা কিসে হবে? দূর, অমন সর্বনেশে ওষুধ কেউ খায়?) এতৎসত্ত্বেও আমি যথাসাধ্য প্রত্যেকের এনে দেওয়া ওষুধপত্তর, জড়িবুটি, মাদুলিকবচ—সবকিছুই দু' চারদিন সশ্রদ্ধায় মাথায় করে পালন করি। (নইলে তো আমি নেমকহারাম নরাধম—। অন্যের নিঃস্বার্থ কষ্ট স্বীকারের মূল্য দিই না —সেক্ষেত্রে আমার মতো লোকের হাঁপানির যাতনা ভোগ করাটাই উচিত)। আমি যথাসাধ্য বিশ্বাস ও মনোযোগের সঙ্গে ট্রায়াল দিই কিন্তু কোথা দিয়ে যেন, কেমন করে যেন, কখন যেন—সব ভুল-ভাল হয়ে যায়। মাদুলিটা পরেই ভুল করে কারুর জন্য শোকে অধীর হয়ে শ্মশানে ছুটে যাই। (মাদুলির, আঁতুড়ে আর শ্মশানে যাওয়া সর্বদা বারণ)। ওষুধের কলাটা খেয়েই ভুল করে লোভে পড়ে বানানা মিল্ক শেক খেয়ে ফেলি, এইসব গড়বড় হয়ে যায় আমার। এগুলো মোটেই ইচ্ছাকৃত নয়। আলস্য আর অন্যমনস্কতার একটা ডেডলি কম্বিনেশন। আসলে নিয়ম মানা আমার স্বভাবে নেই। আমি বড্ড উড়নচণ্ডে, এলোমেলো।

নন্দকাকুর কিন্তু কিচ্ছুটি ভুল হয় না। তিনি নিবিষ্ট মনে, হুবহু, আগাপাছতলা 'লাগাতার' নিয়ম মেনে, একের পরে এক নিত্য নতুন হাঁপানির 'অব্যর্থ' বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেণ্ট করেই চলেন। অ্যালো, বায়ো, হোমিও, আয়ুর্বেদীয়, চৈনিক, যৌগিক স-ব। কাকা-ভাইঝি একসূত্রে বাঁধা আছি, প্রথমত ফুসফুসে, সে সূত্রটা হাঁপানির। দ্বিতীয় সূত্র হৃদয়ের, অর্থাৎ কাকিমা। আমরা দুজনেই কাকিমার রীতিমতো প্রিয়পাত্র। (এবং সেটাও সোজা ব্যাপার নয়)।

নন্দকাকুর একসপেরিমেণ্টাল অ্যাজমো-লজিতে আমার আপত্তি ছিল না যদি

না তিনি সেগুলো তাঁর আদরের 'খুকু'র ওপরেও চালু করতে চাইতেন। আর, সবার সব উপদেশই নন্দকাকুর কাছে দৈববার্তা, সারমন অন দ্য মাউন্ট। তাঁর তুলনায় আমি একটা হতভাগ্য, অবিশ্বাসী, পাপীয়সী—কেননা আমার ভগবান হাঁপানির দাওয়াই দেন না—তিনি ব্যস্ত জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন-মুক্তি, এই সমস্ত দেওয়া থোওয়ায়। নন্দকাকু চান বিশ্বের হাঁপানি রুগীদের একটা ইউনিয়ন বানাতে। নিদেনপক্ষে একটা বেরাদরি—ব্রাদারহুড—যেখানে 'সংবাদ বিচিত্রা' বুলেটিন বেরুবে, ঔষধ-চিকিৎসার দিশি-বিলিতি আধুনিকতম খবর সব বদলা-বদলি হবে। "জগতের যত হাঁপানি রুগী এক হও; তোমাদের হারাবার কিছুই নেই, হাঁপটি ভিন্ন।" নন্দকাকুর মধ্যে সর্বদা একটা মিশনারি স্পিরিট কাজ করে। আর হাতের কাছে অভাগা আছি কেবল আমিই। উনি যদিও ভবানীপুরে, আমি বালিগঞ্জে। তা সত্ত্বেও।

নন্দকাকুর বাড়িতে নিয়মিত কেলেঙ্কারিকাণ্ড হয়। আজ শুনছি সব রান্না হচ্ছে কাঠকয়লায়, একমাত্র কাঠের আগুন চলবে। কালকেই শুনছি ও-বাড়িতে কাঠের গুঁড়ো জ্বালিয়ে ধুনো দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ। আজ শুনছি রাত্রের খাওয়া আটটার সময় সারতে হবে, পাংচুয়ালি— কাল শুনছি রাত্রের খাওয়া সূর্যাস্তের পূর্বেই শেষ করা দরকার। কাকিমা স্বয়ং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, তাই পাগল হন না। কেবলই রোগা হন। এমন সময়ে নন্দকাকু একদিন লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। সোজা তিনতলায়। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে।

—"বৌদি, খুকুকে এবার সারিয়ে দেবোই। আসল লোক পেয়েছি।"

—"আগে তো নিজেকে সারাও।" মার নির্বিকার উত্তর।

—"আমি তো আজকাল সেরেই গেছি। এই দেখুন।" বলেই নন্দকাকু জোড়া পায়ে লাফ দিয়ে পৌষমেলায় কেনা মোড়াটার ওপর টক করে উঠে পড়লেন। মোড়াটা থরথরিয়ে কাঁপলো। নন্দকাকুও। কাশির ঝোঁকে।

"আহা! আহা! পড়ে যাবে যে ঠাকুরপো।"

—"মোটেই পড়বো না। এই দেখুন!" নন্দকাকু মেঝেয় আরেক লাফ দেন। এবারে মায়ের শুকোতে দেওয়া কুলের আচারের বারকোষের ওপরে। তারপরে ঠাকুরপো-বৌদিদি সংবাদটা কেমন জমলো, সেটা উহ্যই থাকুক। আমি অকুস্থল থেকে কেটে পড়লুম সেই ফাঁকে।

ক পর্ব: ভেষজ-চিকিৎসা

কিন্তু কাটাতে পারলুম না। নন্দকাকু নাছোড়। কেননা ইনি নাকি অব্যর্থ কবিরাজ। নাম হেমচন্দ্র সেন। চেম্বার চৌরঙ্গি পাড়ায়, মিশন রো একসটেনশনে। যেতেই হলো শেষ পর্যন্ত। অবশ্য তখন আমি ফের হাইনেক জামা পরছি। (অর্থাৎ জামার তলায় সেজমার এনে দেওয়া হরিদ্বারের সাধুর অব্যর্থ মাদুলি বাঁধা)। আমার সঙ্গে গার্জেন হয়ে গেল শিবু, আমাদের পড়শী, এবং আমার ছাত্র। শিবুর ধারণা, দিদির সর্বদা

একজন অ্যাডভাইসার সঙ্গে থাকা প্রয়োজন।

কবিরাজের চেম্বারে ঢুকতেই হাতে স্লিপ ধরিয়ে দিলে উর্দিপরা হিন্দুস্তানী দরোয়ান। ধবধবে সাদা দেওয়াল, তকতকে কাঠের মেঝে, একঘর হেঁপো-বেতো অপেক্ষমান রুগী। সবশেষে আমার নাম ডাকতেই পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ি। সামনেই বেদীর ওপরে এক সহাস্য নরকঙ্কাল নিঃশব্দে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। দু পা পেছিয়ে আসতেই চোখে পড়লো সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পেছনে একটি রক্তমাংসের (টাই বাঁধা) সহাস্য তরুণ। দেওয়ালময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আভ্যন্তরীণ ভয়াল গোপন দৃশ্যপট—শিরা-ধমনী, পেশী-অন্ত্র, হৃদয়-ফুসফুস ইত্যাদি। সভয়ে বলি—"আপনিই কবরেজমশাই?" "আজ্ঞে না, আমি ডাক্তার বোস, কবরেজমশায়ের অ্যাসিস্টান্ট।" মৃদু হাস্য করে তিনি দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। আমিও তাকাই। একটা দলিল বাঁধানো রয়েছে, বিলেতের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জিয়ন্সের ফেলো এই শম্ভুচরণ বোস। ভয়ে বুক চুপসে যায়। হাঁপানি বৃদ্ধি পায়। এই যদি হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট, খোদ কবরেজ তাহলে কোন স্ট্যাটাসের হবেন? নন্দকাকু কিচ্ছুই বলে দেননি, একদম আনপ্রিপেয়ার্ড চলে এসেছি। কে জানে কত ফী? আজকাল তো কবরেজদেরও চৌষট্টি, একশো-আটাশ শুনতে পাই। ডাক্তার বোস কিন্তু চমৎকার মানুষ। খুব মন দিয়ে কেস-হিস্ট্রি শুনলেন, পাতার পর পাতা নোট নিলেন। তারপর তোয়ালেপাতা সরু গদি মোড়া বেঞ্চিতে আমাকে পেড়ে ফেলে, 'পরীক্ষা' শুরু করলেন। অর্থাৎ হাঁটুতে হাতুড়ি ঠুকে, পেটে গোঁত্তা মেরে, পিঠে থাবড়া কষিয়ে, চোখ খুঁচিয়ে, কান মুচড়ে, জিভ টেনে, হাতফাত দড়িদড়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলে সে এক নিদারুণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলল: যার ফলে আমার অন্তত দেড় বছর আয়ু কমে গেল। কাগজ টেনে খরখর করে রক্ত-কফ ইত্যাদি ইত্যাদি পরীক্ষা, বক্ষপঞ্জরের এক্স-রে ফোটো প্রভৃতির সরলবর্গীয় ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিলেন তিনি। তারপর চোখ বুজেই বললেন —"আঃ। এবারে এক কাপ চা হোক, কী বলিস?" বলেই চোখ খুলে উত্তরের আশায় কঙ্কালটির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আমরাও অবাক হয়ে প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশায় কঙ্কালমুখী, স্তব্ধ! কলকাতায় সব্বারই ভয়েস আছে। এও কিছু বলবে নাকি? ...কোণের টুলে বসা নীরব, অনড় বেয়ারাটি কেবল উঠে বেরিয়ে গেল, এবং একটু বাদে ফিরলো দু-হাতে চার গেলাস চা নিয়ে। আমাকে, শিবুকে, ডাক্তার বোসকে দিয়ে, নিজেও একটা গেলাস নিয়ে চুপচাপ টুলে গিয়ে বসলো। ডাক্তার বোসের এই 'ডেমোক্র্যাটিক হিউম্যান অ্যাপ্রোচ টু টী' আমার খুবই ভালো লাগলো। এ-ছাড়া চা পেয়ে আমি নিজেও কৃতার্থ। আলুলায়িত। কদাচ কোনো ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে এমনধারা আতিথ্য পাইনি। সেটা বলেও ফেললুম। ডাক্তার বোস কেবল সহজ হেসে বললেন—"আসলে আপনাকে দিয়েই শেষ কিনা, তাই। আটটা বেজে গেছে তো।"

—"তার মানে? কবরেজমশাই আসবেনই না আজ?"

—"আসবেন না মানে? তিনি তো পাঁচটায় এসেছেন।"

কোণের টুল থেকে মধ্যবয়স্ক বেয়ারাটি (যার পরনের ময়লা খাকী পেন্টুলুনের নিচেটা দড়ি দিয়ে টাইট করে জড়িয়ে পায়ের সঙ্গে বাঁধা, গায়ে হাতা গোটানো খদ্দরের শার্টের ওপরে মিলিটারি সবুজ হাতকাটা সোয়েটার, নাকের ফুটোয় একগুচ্ছ চুলের নীচে আশুতোষী গোঁপ, পায়ে ধূলি-ধূসর ঘোড়তোলা বুটজুতো—) চায়ের গেলাস থেকে চোখ তুলে মৃদু হাস্যে কহিলা গম্ভীরে—

—"আমিই হেমচন্দ্র। নমস্কার!"

—"অর্থাৎ—"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নেহাত বেয়ারা মনে করে এই লোকটিকে এতক্ষণ দেখেও দেখিনি। খুবই সম্ভ্রান্ত উচ্চারণ, রং তামাটে মেরে গেছে, বেশ সুপুরুষ। রাণী ভিক্টোরিয়া যেমন পুরুষ ভৃত্যদের সম্মুখেই পোশাক বদল করতেন, কেননা—"ওদের আবার নারী-পুরুষ কিসের?" আমাদের প্রত্যেকেরই বোধহয় ভেতরে ভেতরে তেমনি খানিকটা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দোষ আছে। নইলে এঁকে দেখিনি কেন এতক্ষণ? এইবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠি, খানিকটা গরম চা চল্‌কে সিলকের শাড়িতে পড়ে, গেলাসসুদ্ধু হাত জোড় করে কাতরে উঠি—"সে কি! কবরেজমশাই? আপনিই? অথচ মোটে চিনতে পারিনি, ছি, ছি!" অভয় হাস্যে হেমচন্দ্র বললেন—"তাতে কি হয়েছে। এরকমই তো হয়ে থাকে। কেউই চিনতে পারে না। আমি অবশ্য খুব মন দিয়ে আগাগোড়া কেস-হিস্ট্রিটা শুনেছি। আপনার ডায়াস্টোলিক প্রেশারটাই যা কিঞ্চিৎ বেশি। তবে সেজন্য ভাবনা নেই। কমিয়ে দেব। আমার মায়ের কাছে চলে আসুন, মা ওষুধ দিয়ে দেবে। দারুণ, অব্যর্থ ওষুধ মায়ের।"

—"আপনার মাও বুঝি কবরেজি করেন?"—শিবু এবারে মুখ খুলল। "অবিশ্যি কবরেজি তো ফ্যামিলি ট্রেড। আপনার বোধহয় বাবা নেই?" সব কথায় কথা বলা চাই শিবুর। এবার ডাক্তার-কবিরাজ দুজনেই অট্টহাস্য করে ওঠেন। আমি শিবুকে চোখ পাকাই। কবরেজ বলেন—"নাঃ, বাবাটি থেকেও নেই। আসুন না আগামী শনিবার সকালে, মাকে স্বচক্ষে দেখে যাবেন। স্নানটা করেই আসবেন। খালি পেটে আসা বাঞ্ছনীয়। ওষুধ নেবেন তো।"

এবার ডাক্তারবাবু আমার হাতে একটা কার্ড গুঁজে দেন, তাতে একপিঠে লেখা কবিরাজ হেমচন্দ্রের নাম, এই চেম্বারের ঠিকানা, ফোন নম্বর, আর উল্টোপিঠে লেখা ৪২।১০৩বি, ধনপতি পতিতুণ্ড বাইলেনের ঠিকানা। একটা ছোট্ট নকশাও আঁকা আছে তাতে। যা বুঝলুম, গঙ্গার ওপরেই বাড়ি। ওয়াটগঞ্জের বাজারের দিকে।

"ভাঙাচোরা ইঁট বের করা একটা কালীমন্দির আছে, সেইখানেই আমি থাকি। হেম-কবরেজ বললেই রাস্তার লোকেরা বাড়ি চিনিয়ে দেবে।" এবারে উঠতে হয়। ভিজিটের প্রসঙ্গ তুলতেই কবরেজ জিভ কেটে বললেন—"ছি, আমি ভিজিট নিই

না। শুধু ওষুধের দামটা দেবেন, যখন ওষুধ পাবেন।”

—“আর ডাক্তার বোস?” শিবু আশায় উজ্জ্বল চক্ষে বলে ফ্যালে —“উনিও বুঝি ভিজিট নেন না?”

অমায়িক হেসে ডাক্তার বোস বললেন: “চেম্বারে কুড়ি, বাড়িতে গেলে চল্লিশ। কিন্তু হেমের রুগীদের জন্য কেবল ষোলো। এ তো চিকিৎসা ঠিক নয়, চেক আপ মাত্র। চিকিৎসা করবে হেম!’

নন্দকাকু ফোন করে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন শনিবার ভোর পাঁচটায়, যাতে চান-টান করে ভোর ভোর যেতে পারি। কিন্তু কাকু সঙ্গে যেতে পারছেন না, অগত্যা শিবুকেই ধরতে হলো। ও-সব পাড়াতে একা একা না যাওয়াই নাকি ভালো। পাড়াটা সুবিধের নয়, বন্দরের কাছাকাছি। গিয়ে দেখি রাস্তায় এই সাতসকালেই ফুলুরি-জিলিপি বিক্রি হচ্ছে, মাছি ভনভন করছে জিলিপির থালার ওপর। বিক্রি হচ্ছে অবাঙালি সব ভুজিয়া, রেউড়ি, চা। গলির গলি তস্য গলি হচ্ছে ধনপতি পতিতুণ্ডু বাইলেন। ভাগ্যে শিবু সঙ্গে ছিল। পথের প্রত্যেকটি মানুষই নয়নভরে আমাকে তাকিয়ে দেখছে —“দ্যাখ দ্যাখ মেয়েছেলেতে টেকশি চালায়”—এই মন্তব্যও কানে এসেছে। আঁকাবাঁকা গলিটার দু-ধারে দরজার সামনে নানা বয়সের, নানা গড়নের, নানান রূপসজ্জার মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে, চা খাচ্ছে, আর গল্প করছে। বেশ একটা রিল্যাকসড সকাল। কারুর কোনো তাড়া নেই। এ পাড়াতে কেউ আপিস যায় বলে মনে হলো না। মেয়েগুলির পরনে কত যে বিচিত্র সাজপোশাক, ছিটের কাপড়ের ম্যাকসি, নাভি বের করা প্যান্ট-স্যুট, সাটিনের সালওয়ার কামিজ—চুলে জরীর ফিতে, মুখে রং, রোলেক্সের শাড়ির ছড়াছড়ি। খুবই দরিদ্র দেহোপজীবিনীদের পাড়া এটা—নেপালী, বাঙালী, হিন্দুস্তানী নানা জাতি, নানা ধর্ম, হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত এলাকা বলেই মনে হলো। দেখেশুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম—প্রথমত, গলিটি অস্বাভাবিক সরু —একটা গাড়িও যাওয়া বেশ কষ্টের। দ্বিতীয়ত, সারি সারি মেয়েরা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, মেয়ে-দেখতে আসার মতন করে। শুধু দর্শনই নয়, আমাকে পরস্পরের কাছে প্রদর্শনও করছে এবং যে হাসাহাসিটা চলছে—সেও আমাকে নিয়েই, সন্দেহ নেই। তারা বলছে—“দ্যাখ, মজাটা দেখে যা, ব্যাটাছেলেটা দিব্যি বইসে আছে, আর মেয়্যাছেল্যেটা গাড়ি হাঁকাচ্ছে। বাবুটা দেখি মেয়্যা-ডেরাইভার রেখ্যেছে।” শিবু তো লজ্জায় লাল, আমি বলে তার পরম শ্রদ্ধেয় দিদি, গুরুজন, তথা মাস্টারমশাই। বাঁদরের মতো লাল মুখে শিবু বলল—‘ওসব কথায় যেন কান দেবেন না দিদি, যতসব বাজে বাজে মেয়েদের আজেবাজে কথা, ওদিকে তাকাবেনই না আপনি!”

কিন্তু না-তাকিয়ে উপায় নেই যে আমার। গলি-রাস্তাটি একেই সরু, কাশীর গলির মতো,তারই মধ্যে গয়লা গরু-মহিষ এনে দুধ দুইছে, খাটিয়া পেতে লোকজনেরা

শুয়ে-বসে চা-জিলিপি খাচ্ছে, শূয়োরের পাল ঘোঁৎঘোঁৎ করে চরে বেড়াচ্ছে, কিছু হাঁস-মুরগীও ঘোরাঘুরি ওড়াউড়ি করছে, ঠেলাগাড়ি কাৎ করা রয়েছে, খালি রিকশা ডাণ্ডা বের করে সিট উলটে পড়ে রয়েছে। তারই মধ্যে করপোরেশনের মেথর তার দু'চাকার ঠেলাগাড়ি নিয়ে ভ্রাম্যমাণ। আমাকে ঘন্টায় দুই মাইল স্পীডে, খাটিয়া সরিয়ে, ঠেলা হটিয়ে, মেথরের গাড়ি বাঁচিয়ে, গরু-মহিষ কুকুর-শূয়োর তাড়িয়ে, হাঁস-মুরগীদের ভাগিয়ে, চা-ওলা দুধ-ওলা, জিলিপি-ওয়ালাদের কাছে করজোড়ে মার্জনাভিক্ষা করে পথ করে নিয়ে এগুতে হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, হেম-কবরেজকে দেখছি সবাই চেনে। সবাই দেখিয়ে দিচ্ছে—"আরেকটু এগিয়ে যান, কালীমন্দিরের গায়েই বাসা।" কিন্তু কালীমন্দিরের দেখা নেই। ইতিমধ্যে গাড়ির পেছু পেছু গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা এবং শত শত নেড়ি কুকুর সশব্দে ধাওয়া করছে। ভোরের পাখির কূজনের সঙ্গে তাদের কলরব, গাড়ির হর্ন, শিবুর ক্ষণে মিনতি, এবং ক্ষণে হুঙ্কার—মিলেমিশে অপূর্ব এক শব্দব্রহ্মের সৃষ্টি হয়েছে।

এমতাবস্থায় কালীমন্দির এসে গেল। রাস্তাও সেইখানেই শেষ। গঙ্গার গায়েই ভাঙা-চোরা, চ্যাপ্টা-ইট বের করা, খুবই পুরোনো একটা ক্ষুদ্র মন্দির। তার চতুর্দিকে শুধু কাঁটাগাছ, আগাছা, আকন্দের ঝোপ। অনেকগুলো ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠলে তবে চাতাল মতন, এবং মন্দিরের প্রবেশপথ। গর্ভগৃহ অত্যন্ত অন্ধকার, তার অভ্যন্তর অদৃশ্য। কোনো দরজা নেই। ভিতরে আলোর চিহ্ন নেই। প্রতিমাও নেই বলেই সন্দেহ হয়। কেবল দুটি সবুজ বিন্দু জ্বলছে— পশুর চোখ। কোন্ পশু বোঝা যায় না—মন্দিরের দেওয়াল থেকেই বটবৃক্ষ বেরিয়ে উঁচু হয়ে উঠে মন্দিরকেই ছায়াবৃত করছে। আমি সিঁড়ির ওদিকে যাবার উপক্রম করতেই সাবধানী শিবু বলে—"যাবেন না দিদি, সাপ-খোপ থাকতে পারে।"—আমি কল্পনাও করতে পারি না এর ভিতরে হেম-কবিরাজ কী উপায়ে বসবাস করতে পারেন। এ কী সম্ভব ? এমন সময়ে মন্দিরের পিছন থেকে স্বয়ং কবরেজমশাই উদয় হলেন—"এ-ই যে। আসুন আসুন।" একগাল হেসে আমাদের তিনি অভ্যর্থনা করে মন্দিরের প্রায় গায়ে লাগা যে পাকা ঘরটিতে নিয়ে গেলেন, তার দোর-জানালা সবই পাল্লা রহিত। টিনের চাল আছে, দাওয়ায় একটি বেঞ্চি পাতা। তার ওপরে একটি নধর কালো ছাগল শুয়ে আছে, বেঞ্চিরই খুঁটিতে বাঁধা। মেঝেময় ছাগলনাদি। স্বাগত জানিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করলেন তিনি। শিবু আগে, না আমি আগে ইতস্তত করছি, (কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান) শেষে শিবুই শিভালরি দেখিয়ে ঢুকে পড়ল, (যা থাকে কপালে) শহীদের স্পিরিট নিয়ে। পিছন পিছন গম্ভীরভাবে আমি।

ঢুকেই চক্ষু বহরমপুরের ছানাবড়া। এটা কি কোনো মানুষের বাসস্থান ? মেঝে-ভর্তি ধুলো, বালি, শুকনো পাতা, ঘাস, খড়, কাঠের গুঁড়ো। ঘরে আর কোনো আসবাব নেই, শুধু একটি বেঁটে কাচের আলমারি, ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা, আর দেয়াল না-ঘেঁষে পাতা একটা কাঠের সরু তক্তাপোশ। দেয়ালে ইলেকট্রিক কানেকশন

থেকে ছেঁড়া তার ঝুলছে। (লীলা মজুমদারের পিসি দেখলে বলতেন ইলেকট্রিসিটি 'লীক' করছে!) বালব নেই। তক্তাপোশে আজকের স্টেটসম্যান খোলা এবং একপাশে একটি পেতলের বালতি ও প্লাস্টিকের মগ, অন্য পাশে একটি ময়লা কম্বল ভাঁজ করে রাখা এবং একটি লণ্ঠন। খাটে ঠেস দেওয়া একটি কর্মভারাক্রান্ত সাইকেল। ধীরেসুস্থে কাচের আলমারি খুলে প্রথমে লণ্ঠনটি তুলে রাখলেন কবিরাজমশাই। তখন দেখলাম আলমারিতে একটি কুঁজো, একটি কাচের গেলাস, সাবানের কেস, মাজন-ব্রাশ-চিরুনি ইত্যাদি—এবং কিছু পুরোনো খবরের কাগজ। এবারে বালতি এবং মগও কাচের আলমারির নিচের তাকে তুলে রাখলেন কবরেজমশাই। সাইকেলটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরের বাইরে রেখে এলেন। আমরা দাঁড়িয়েই আছি। এবার কম্বলটির ভাঁজ খুলে তক্তাপোশে বিছিয়ে দিয়ে কবিরাজ বললেন—"বসে পড়ুন বসে পড়ুন!" —যেন ডানলোপিলোর গদি, কি কিংখাবের আসন পেতে দিলেন। আমি ধপাস করে বসে পড়ি, বাব্বা, এতক্ষণ যা মেহনত গেছে বাড়ি বের করতে! কিন্তু শিবু বসল না। শিবুর চোখেমুখে একটা স্পষ্ট, উদভ্রান্ত অবিশ্বাস।

ঘরে ঢোকার সময়ে অতটা খেয়াল করিনি। এবারে পুরোনো দিনের বাংলা নাটকে, রোমান্স, কিংবা রহস্যোপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মুখের স্টকবাক্যটি আমার বুকের মধ্যে উচ্চারণ করলেন আমার আত্মারাম—

—"আমি কোথায়?" ঘরের কোণে কোণে যে বটানিকসের বটের ঝুরির মতো ঝুল, আর মাকড়সার জাল ঝুলছে শুধু তাই নয়, প্রচুর মাকড়সাও ঝুলন্ত। তারা কেউ ধ্যানস্থ, কেউ বুননরত, কেউ শিকারব্যস্ত, আমাদের সাড়া পেয়ে কেউ কেউ সরসর করে সরেও যাচ্ছে সসম্ভ্রমে।

ঘরে কদাচিৎ একটা মাকড়সা হলেই ভয়ে হুলুস্থুলু বাধাই, আর এখানে? এ তো দেখছি মাকড়সাদেরই বাড়িতে একটা উটকো মানুষ। চতুর্দিকে পানের পিকের ছোপ—তার মধ্যে একটা দারুণ এলিগ্যান্ট বিলিতি এয়ারলাইন্সের ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। অর্ধভুক্ত সিগারেট, বিড়ির টুকরোর সঙ্গে গাঁজার কলকেও মেঝেময় ছিটোনো। আর শিবু শিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে আর দেখছে। হিপ্নোটাইজড। একদিকের দেয়াল বেশ খানিকটা ভেঙে গিয়ে ছাদের কাছ থেকে পরোটার মতো গড়নের একটা ফোকর তৈরি হয়েছে। সেখানে থাক থাক ভাঙা ইটের ওপর বসে এক বিজ্ঞ কাক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ করছিল। অথবা গৃহস্থ মাকড়সাদের। সেখানে নীল আকাশের দারুণ ব্যাকগ্রাউণ্ডে পেয়ারা গাছের সাদা ডাল, সবুজ কচিপাতা উঁকি মারছে, হাত বাড়ালেই পেয়ারা! ভুল করেও যেন দেয়ালে হেলান না-দিয়ে ফেলি —তাই 'কাঠ' হয়ে বসে আছি। শিবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সন্তর্পণে বসেই পড়ে। তারপরেই তার দৃষ্টি ঘরের একটি কোণের দিকে আটকে যায়। শিবুর চমৎকৃত চোখ অনুসরণ করে আমারও চক্ষুস্থির। আরে? ঘরের ঐ কোণে যে বিশেষ জরুরী কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে। অতীব করিতকর্মা শত শত ইঁদুর মেঝের একটা ফুটো

দিয়ে উঠে এসে দৌড়ে দৌড়ে সারি বেঁধে সারাটা মেঝে পার হয়ে ঘরের অন্য এক কোণের ফুটোয় আত্মগোপন করছে। ব্যাপারটা সামান্য নয়। গুরুতরই। এরা নেংটি নয়, বেশ স্বাস্থ্যবান, দীঘল; ধেড়ে কিংবা মেঠো। কামড়ে দিলে রক্ষে নেই। ওদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে হেম-কবিরাজ বললেন—"ওরা অতি নিরীহ, ওপাশের কাঠের গোলায় ওদের বাসা।" বলে প্রতিবেশীসুলভ সৌজন্যে হাসলেন। কিন্তু আমি যা বুঝলুম, কাঠের গোলাতে ওরা হয়তো এককালে থাকতো, কিন্তু এখন আর থাকে না। দেখা যাচ্ছে এটাই ওদের পার্মানেন্ট বাসা। নাকি র‍্যাশনের দোকান? নাকি সিনেমার কিউ? কিন্তু এখানে র‍্যাশনই বা কোথায়? খাদ্যদ্রব্য তো কিছু দেখছি না, কাপড়-চোপড়ও নেই। একদিকের দেয়ালে একটা কুলুঙ্গিমতো, তাতে একটা ছেঁড়া শার্ট পর্দার মতো করে ঝোলানো, দুই হাতার মধ্য দিয়ে দড়ি টানা। অনেকটা ক্রুশবিদ্ধ যীশু বা কাকতাড়ুয়ার মতো। কিন্তু কলারের পিছন দিয়ে ধোঁয়া ভেসে আসছে। এতক্ষণে টের পেলুম ঘরে একটা হালকা সুগন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। ধূপের?

এক মিনিট অন্যমনস্ক হয়েছি কি হইনি, "বাপরে মারে" বলে চেঁচিয়ে পা দুখানা তক্তাপোশে তুলে ফেলি, খরখরিয়ে আমার বাঁ পা বেয়ে একটা পথভোলা (অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী?) আরশোলা উঠছিল।

"ও কিছু না"—হেম-কবিরাজ হেসে বলেন—"ওরা তো হার্মলেস।" ঘরময় আরো প্রচুর ছোটো-বড়ো-মেজো 'হার্মলেস' রাজত্ব করছে, দেখা গেল এবারে।

তক্তার তলায় একবার উঁকি দিয়ে নিয়ে শিবু বলল—"পা-টা গুটিয়েই বসে থাকুন দিদি", ঠোঁটে অদৃশ্যপ্রায় হাসির সংকেত। তাইতেই আমার বুক প্রায় শুকিয়ে গেল। সামনের দেওয়ালেই প্রায় ডায়নোসরের মতো বিপুলকায় এক টিকটিকি হঠাৎ খপাৎ করে একটা আরশোলা ধরে ফেলল। দেয়ালভাঙা ফোকর দিয়ে ফরফর করে উড়তে উড়তে দুটো যুদ্ধবাজ অথবা প্রেমিক কাক পরস্পরকে তাড়া করে ঘরে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল। শিবুর মুখে ডানার হাল্কা ঝাপ্টা মেরে। আমি আঁতকে উঠে দেয়ালে সেঁটে যেতে-যেতেই সন্ত্রস্ত শিবুই খেয়াল করিয়ে দেয় —"উঁহু? উঁহু! ওখানে মাকড়সা, দিদি।"

হেম-কবিরাজ আমাদের কাণ্ড দেখে হেসে উঠলেন—সেই হাস্যে কয়েকটা আরশোলা হার্মলেসলি এধার ওধার উড়ে গেল। কবিরাজ বলেন—"ওগুলো সবই নির্বিষ!" গায়ে যে-কোনো মুহূর্তে মাকড়সা, আরশোলা, কাক, ইঁদুর, টিকটিকি—যে কেউ এসে পড়তে পারে। ওরে বাবা রে! এ কোথায় এসে পড়েছি রে!

মুখে বোধহয় মনের অবস্থা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছিল। কবিরাজ বললেন —"চা চলবে?"

মুহূর্তেই বুকে বল পেলুম—"হ্যাঁ!"

—"লছমী!" কবাটহীন দোর দিয়ে মুখ গলিয়ে ডাক দিলেন কবিরাজমশাই। অমনি এক থুরথুরে বুড়োর উদয় হলো, মাথায় ধবধবে চুল, পরচুলোর মতো ঘন,

টিকিও আছে, পরনে খাটো ধুতি, খয়েরি আলোয়ান, হাতে লাঠি। চোখে ভীষণ পুরু লেন্সের নিকেল ফ্রেমের চশমা।

—"জী সরকার। ফরমাইয়ে।"—মুখে দাঁতের বালাই নেই।

—"চা হবে? তিনটে।"

—"জী হজৌর।" বলেই সে আলোয়ানের ভেতর থেকে শীর্ণ হাত বের করে, পাতে। কবরেজমশাই কিছু খুচরো ঢেলে দেন। বুড়ো বেরিয়ে যায়।

শিবুর সব কথায় কথা বলা চাই।

—"চা পাতা কিনতে গেল বুঝি? জলটা চাপিয়ে গেল না?"

—"তৈরি চা-ই কিনে আনতে গেল।"

—"অঃ। তাই তো? আপনার রান্নাঘর কোথায়?"

—"রান্নাঘর দিয়ে কী হবে, আমার মা তো কেবল ফল খায়। আমিও তাই ফলটল খাই। আর একবেলা ওই লছমীদের সঙ্গে খেয়ে নি।"

—"কী খান?"

—"কেন, লছমীরা যা খায়। কখনো চাপাটি, কখনো ছাতু। ভালোই খায় ওরা। হেলথ ফুড। আমার মাও মাছ মাংস খায় না তো, আমিও তাই খাই না।" হঠাৎ যেন জেগে উঠে শিবু প্রশ্ন করে—

—"আচ্ছা, আপনার মা রান্না করেন না?"

হোহো করে হেসে উঠে হেম-কবিরাজ বলেন— "আমার মা না রাঁধলে আপনাদের অন্ন জুটছে কেমন করে?"

এবারে শিবু টের পায় এ-ভাষা অন্য ভাষা। এ-মা রামকৃষ্ণের মা, রামপ্রসাদের মা! শিবুর বাক্য হরে যায়। আমি বলি—

—"কই, দেখি কোথায় আপনার মা?"

—"ঐ তো।" কুলুঙ্গির গায়ে ঝুলন্ত সেই ক্রুশবিদ্ধ শার্টটা দেখিয়ে দেন হেম কবিরাজ।

আমরা স্তব্ধ।

তারপর উঠে গিয়ে শার্টটা পর্দার মতো তুলে ধরতেই দেখতে পেলাম অত্যন্ত সুশ্রী ছোটো কালীমূর্তি। সর্বাঙ্গে ফুলের গহনা। কবরেজ বলেন—"জিবটা সোনার।"

—"এসব ফুলের গহনা কে গাঁথে?"

"লছমীর বউ। ওদেরই ঘর এটা। আমাকে থাকতে দিয়েছে। মাকে তো মন্দিরে রাখা যাচ্ছিল না। কোথায়ই বা যাই মাকে নিয়ে? তিনশো বছরের পুরনো ঘর এখানে মায়ের। লছমীরও কি কম মায়া? ওরাও তো বংশানুক্রমে মায়ের সেবক।"

—"মানে? ও পুরুত নাকি?"

—"ঠিক সেভাবে নয়, মানে বাগানটা ওরাই দেখতো। আগে ছিল লেঠেল, এখন হয়েছে মালী! এসব সম্পত্তি দেবোত্তর করে গেছেন ঠাকুরদা। ঐসব বাড়িও

আমাদেরই ছিল—", তর্জনীনির্দেশে বাগানের কিছু একতলা দোতলা পাকা বাড়িঘর দেখান তিনি। "ওগুলোও দেবোত্তর। যেমন এই মালীর ঘরটা পর্যন্ত। অথচ দেখলেনই তো মন্দিরের কী দশা।"

"শরিকরা কেউ সারায় না?" শিবু খপ করে বলে—"আপনারা বুঝি জমিদার ছিলেন?"

অট্টহেসে হেমচন্দ্র বলেন—"এখন হয়েছি কবিরাজ। লেঠেল থেকে ওদের মালী হবার মতন! —ঐসব বস্তিগুলো অবশ্য এখনও আমার কাকাদেরই সম্পত্তি।"

আমি আর পারি না। বলেই ফেলি:

—"তবে আপনার এ দুর্দশা কেন?"

—"দুর্দশা মানে? আমি তো সন্নিসি মানুষ, মায়েতে-ছেলেতে দিব্যি আছি। একে আপনি দুর্দশা বলেন?"

কবরেজমশাই আঘাত পেয়েছেন মনে হচ্ছে। শিবু অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে দেখে আমি ঝটপট কথা পালটাই—"মানে ঘর-দোরে তো ঝাঁটপাট পড়ে না দেখছি, তাই—"

—"কে দেবে? লছমী তো ওই বৃদ্ধ, স্বচক্ষেই দেখলেন, আর ওর বউয়ের তো কোমর থেকে পক্ষাঘাত।"

—"এতসব পোকামাকড়ের মধ্যে বাস করা—"

—"মন্দ কী? ভালোই তো। একটা ঘরে যতগুলি প্রাণীর আশ্রয় হয়। এসেছে, আসুক না। থাকে, থাকুক না। আমার তো ক্ষতি করে না।"

—"যদি করে?"

—"কী আর করবে? করুক না।"

আমার এর পরে আর কিছু বলার থাকে না। শিবু তবুও বলে—"

—"যদি সাপখোপ আসতো?"

—"আসেই তো। বর্ষাকালে একজোড়া সাপও থাকে এঘরে!" তারপরে গর্বোজ্জ্বল নয়নে বলেন—"আমাকে ওরা একটুও ভয় পায় না!"

এর পরে শিবুরও কিছু বলার থাকে না। চা এসে পড়েছে। বড় বড় কাচের গেলাসে! চা ভালোই! খেতে খেতে আমি বলি:

—"আলমারিটা তো প্রায় খালিই দেখছি। কুঁজো, বালতি, খবরের কাগজ এ-সবের জন্য তো আলমারি লাগে না। ওটা রাখা কেন?"

—"তাছাড়া ওটা ঘরের ঠিক মধ্যিখানেই বা কেন? দেয়াল ঘেঁষে কেন নয়?" বলে শিবু!

"দুটো পার্পাস সার্ভ করছে কিনা। এক—দেয়াল বেয়ে জল পড়ে বলে কিছুই দেয়াল ঘেঁষে রাখা যায় না। তক্তাপোশটাই দেখুন না। দ্বিতীয়—দরজায় কবাট তো নেই—এটা এমন অ্যাঙ্গেলে রেখেছি যে, আমি পুজো করলে বা ঘুমুলে পথ থেকে দেখা যায় না।"

বলে বিজয়গর্বে হাসেন হেমচন্দ্র। চা শেষ করতেই গেলাসগুলো নিয়ে কবরেজমশাই পিছনের দরজা দিয়ে বেরোন। আমিও কৌতূহলী হয়ে পেছু পেছু যাই। বাগান। টগর, গাঁদা, জবা, সন্ধ্যামালতী, লেবুগাছ, পেয়ারা গাছ। একটা বেলগাছ। এলোমেলো ঘাস-ঝোপ। আরো দুটো ঘর, তালা মারা। একটা খোলা।

—"লছ্মীদের ঘরসংসার। এই আউটহাউসটা ওদেরই। আমার কোনো লীগাল রাইট নেই। ওদেরই দিয়ে গেছেন ঠাকুরদাদা। ওরা দয়া করে আমাকে রেখেছে।"

—"আপনাকে কোনো বাড়ি-টাড়ি দিয়ে যাননি?" শিবু প্রশ্ন করে।

—"নাঃ, বাবা খুব চালু লোক ছিলেন। ছেলেকে নয়, বউকে সম্পত্তির জীবনস্বত্ব দিয়ে গেছেন।"

—"বউ? আপনার বউ আছেন?"—মৃদু মৃদু হেসে নিরুত্তর থাকলেন কবিরাজ হেমচন্দ্র শিবুর ব্যাকুলতার পরিবর্তে। তারপর উঠে গেলেন পর্দাশার্টের পিছনে রাখা মা কালীর সামনে। ওখানটা দেখি, লম্বাটে নিচু ছাদের সুড়ঙ্গটাই, কুলুঙ্গি ঠিক নয়। মানুষ ঢুকতে পারে, হামাগুড়ি মেরে চলতেও পারে ভেতরে। ঠাকুরের পিছনে অনেক তাক। তাকভর্তি কাচের বৈয়ামে শেকড়-বাকড় রাখা। মস্ত মস্ত কয়েকটা খলনুড়ি। পেতলের হামানদিস্তে একটা। ঐখানেই তাহলে কবরেজের কারখানা! মস্ত পেতলের পিলসুজে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলছে! আলোয় আলো করে রেখেছে ভেতরটা। ঝুলটুল কিছু নেই। মেঝেও পরিষ্কার ঝকঝক তকতক করছে। হেমচন্দ্র যেন মনের ভাষা পড়তে পারেন। বললেন—

—"মায়ের থানটুকুনি রোজ দুবেলা নিজের হাতে ঝাড়পোঁছ করি, নিকিয়ে রাখি। ওষুধও ওইখানেই তৈরি করি কিনা। হাইজিনিক কনডিশন থাকাটা বাঞ্ছনীয়।"

—"আর ঠাকুরের ঐ সোনার জিব, এত ওষুধপত্র সমস্তই দিনরাত খোলা পড়ে থাকে? এমনি অরক্ষিত, আনপ্রোটেক্টেড? চোরে চুরি করে নেবে না?" শিবু অবাক বিস্ময়ে বলে—"দোর জানলা কিছুই তো নেই এ-ঘরের।"

—"চুরি?" অনেক ওপরতলা থেকে হাস্য করেন কবিরাজমশাই। —"চোরের প্রাণের ভয় নেই? মা আমার সদাজাগ্রত—ওঁর জিব চুরি করতে গেলে চোরের নিজের জিবটা খসে পড়বে না?" আরেকটু হাসলেন। —"আর ওষুধ? নিলেই বা কী? কাজে তো লাগাতে কেউ পারবে না? কে বুঝবে কোনটা কিসের ওষুধ? লেবেলিং আছে কোথাও? আমি চোখে চিনি স-ব। আর জানে মা। মাকে পেরিয়ে চুরি করতে যাবে, কোন ডাকাতের এত সাহস?"

শিবু এবার টপিক বদলায়।

—"আলমারিতে তো যত আজেবাজে জিনিস দেখছি। তা আপনার দরকারি জিনিসপত্তর থাকে কোথায়?"

—"দরকারি মানে?"

—"মানে, জামাকাপড়. টাকাকড়ি, বইটই—"

—"জিনিসপত্র আমার যা দেখছেন, তা ছাড়া আর কিছু নেই। টাকা সবই পকেটে, আর জামাকাপড় সবই গায়ে। আরেক প্রস্থ থাকে ধোপার বাড়িতে। সেটা এনে এটা দিয়ে দেব। সন্নিসি মানুষের আর কী চাই? বলুন?"

—"আপনি শোন কোথায়?" আমার প্রশ্ন।

—"কেন, এই তক্তায় শুই!"

—"বালিশ-বিছানা কই?"

—"লাগে না।"

—"মশারিও না?" বড় বড় ফড়িঙের মতো সাইজের মশা এই দিনেরবেলাতেই ঘরে উড়ছে।

—"নাঃ। মশারা আমায় পছন্দ করে না।"

—"শীত করে না আপনার?"—গঙ্গার কনকনে বাতাস এই ঘরের ভেতর দিয়ে হামেশাই শর্টকাট করে বাগানে যাচ্ছে। আমারই শালটা ভালো করে জড়িয়ে বসতে হচ্ছে।

—"এই তো কম্বলই রয়েছে। যাতে আপনাদের এখন বসিয়েছি? এটা গায়ে দিই।"

—"এইতেই শীত আটকায় আপনার?"

এবারে দুহাতের মুঠোয় গাঁজার ছিলিম ধরার মুদ্রা বানিয়ে হেমচন্দ্র মিটির মিটির হাসেন,

—"বাকীটা এইতে আটকে যায়! সে আপনি বুঝবেন না।"

হেনকালে ঘরে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। পরনে টকটকে লাল সিল্কের লুঙ্গি আর ঘীয়ে রং টেরিলিনের হাওয়াই শার্ট। পায়ে খড়ম। কপালে সিঁদুরটিপ। মুখময় অল্পস্বল্প দাড়িগোঁফ। ঢুকেই বললেন—"জয় হোক।" বেশ ভুঁড়ি আছে।

কবরেজমশাই এঁকে দেখামাত্র দৌড়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। সেই অপরূপ দৃশ্যে আমার অঙ্গ শিহরিত হলো। এই ধূলিমলিন, পতঙ্গবহুল, অমার্জিত মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে কেউ? তারপর ছুটে এসে আমাকে অধীর আকুলতায় বললেন,

—"আপনাদের কী অসীম সৌভাগ্য। আমার গুরুদেবের দর্শন পেলেন। আমার সব শিক্ষাদীক্ষা এঁরই কাছে। ইনি অত্যন্ত উচ্চস্তরের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। আমার মতো ভেষজ চিকিৎসা অবশ্য গুরুদেব আর করেন না। উনি এখন স্রেফ রত্ন চিকিৎসায় আছেন। রত্ন চিকিৎসার স্টেজে আমি এখনও পৌঁছুতে পারিনি, তবে গুরুর ইচ্ছেয় আর মায়ের আশীর্বাদে আশা করি—একদিন—"

—"অবশ্যই! অবশ্যই!" বললেন গুরুদেব।

হেমচন্দ্র—"সবই তোমার ইচ্ছা, প্রভু!" বলে কাতরে উঠলেন। তারপরেই আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিসিয়ে বললেন—"চোখের দৃষ্টিটা নজর করেছেন একবার? ওঃ কী দৃষ্টি! ওইতেই টের পাওয়া যায় কোন লেভেলের সাধনা

ওনার।" আমি অতি অভাগা, খুব কষে নজর করেও দৃষ্টিতে কোনো লেভেলের সাধনারই আন্দাজ পেলুম না। চোখদুটো একটু লাল লাল লাগল। ঘরে একটা মোদো গন্ধও পাচ্ছিলুম। টেরিলিন শার্টের খোলা বোতামের ফাঁকে রুদ্রাক্ষের মালা দেখা যাচ্ছিল, তার নধর ভুঁড়িটির কিয়দংশ, সেই ভুঁড়িতে ক্ষীরননীর ইশারা আছে—কিন্তু তান্ত্রিক তেজ, তপস্যা, বা কঠোরতা কোনোটারই চিহ্ন নেই।

গুরুদেব বসলেন না। ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলেন হেম কবিরাজকে ঘরের বাইরে, আমাদের দিকে ফিরেও চাইলেন না, বাইরে থেকেই তিনি বিদায় নিলেন।

হেম কবিরাজ ঘরে ঢুকে এসে বললেন,

—"বিলায়েতের বাজনা আপনাদের কেমন লাগে ?" এই প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না। উত্তর দিতে পারলুম না। কবিরাজই বললেন,

—"বিলায়েৎ বাজাচ্ছে পরশু আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে, আপনাদের পাড়াতেই, কেয়াতলাতে—চেনেন নাকি, ঝুনঝুনদাস বেগারওয়ালাকে ? ওদের ওখানেই। গুরুদেব তাই খবর দিয়ে গেলেন। আপনারাও নিশ্চয় যেতে পারেন ইচ্ছে করলে—ফ্রী, বাই ইনভিটেশন ওনলি। লিমিটেড গেস্টস।"

—এই ভাঙা টিনের ঘরে, ইঁদুরের কিউ, আরশোলার রেস, কাকের প্রেমযুদ্ধ, টিকটিকি এবং মাকড়সার দ্বৈত বোঝাপড়ার মধ্যে হঠাৎ বিলায়েৎ এবং ঝুনঝুনদাস, প্লাস এই তান্ত্রিক গুরুদেব—সব মিলেমিশে আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। আমার ভয়ানক তেষ্টা পেল।

—"একটু জল খাবো।"

—"নিশ্চয়ই !" কবরেজমশাই কাচের আলমারি খুলে তাক থেকে কুঁজো গেলাস নিয়ে জল ঢালতে লাগলেন—একটা কাগজ উড়ে পড়লো মাটিতে। তাকিয়ে দেখি, ওমা, এ যে মার্কিনী খাম ! বিলায়েতের বাজনার চেয়েও তাজ্জবকি বাত ! আমাকে জল দিয়ে চিঠিটা তুলে রাখতে রাখতে আবার যেন থটরীডিং করে কবরেজমশাই বললেন—

—"আমার স্ত্রীর চিঠি। ওরা থাকে শিকাগোয়।"

শিবুর চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে, মুখটা অবশ্য ফাঁক হয়ে দাঁত ও জিভ দেখা যাচ্ছে, চোখের দৃষ্টি বর্ণনাতীত। কবরেজ আবার বললেন—

—"নাঃ, মেম নয়। বাঙালী বউ। বাবার পছন্দ করে আনা। বউয়ের কিন্তু আমাকে পছন্দ হয়নি। মেয়েটাকে নিয়ে শিকাগোয় চলে গেছে।"

—"কিন্তু শিকাগোয় কেন ? উনি কী করেন সেখানে ?"

—"কী আবার করবেন ? এখানে থাকলে যা করতেন, তাই ! রান্নাবান্না ঘর-কন্না।

এসব কথা বলবার সময়ে হেমচন্দ্রের মুখের পেশী বদল হচ্ছিল না, বরং আমরাই ক্ষণে ক্ষণে চমক লেগে মুখের আকৃতি বদল করে ফেলছিলাম।

হঠাৎ কবিরাজের মুখে সম্পূর্ণ ভাব পরিবর্তন ঘটল—খুব কোমল আর গর্বিত হয়ে উঠল মুখের রেখাগুলো—

—"আমার মেয়েটা এবার কলেজে ঢুকবে। হাইস্কুল পাস করে গেল।" একটু থেমে,—"দশ বছর দেখি না মেয়েটাকে।" তাঁর চোখদুটো হঠাৎ যেন পাড়ি দিল সুদূর অতলান্তিকের ওপারে, যেখানে স্কুলের টুপির নিচে কালো চুলের থোকা ছড়িয়ে, হিমেল বিদেশী বাতাসে গলার রঙিন কম্ফর্টার উড়িয়ে, বুটজুতো আর ওভারকোট পরে একটি বাঙালী কিশোরী স্কুলে যাচ্ছে বরফ ভেঙে ভেঙে। একা।

আমরা চুপ করেই রইলাম। কিন্তু অরসিক শিবুটা এক সময় বলে বসল—

—"ওষুধটা তাহলে আজ দিচ্ছেন না? দিদি বেকার-বেকারই চান করে এত বেলা পর্যন্ত খালি পেটে—"

হেমচন্দ্র যেন ঘুম ভেঙে উঠলেন। ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গেই —"সে কি? কেন দেব না? ওষুধ তৈরি করে রেখেছি না?" বলেই কাচের আলমারি খুলে খবরের কাগজের ডাঁইয়ের নিচে থেকে একটা মোড়ক বের করে কপালে ঠেকিয়ে "মা, মাগো!" বলে আমাকে দিলেন। —"কালো সুতোয় বেঁধে আজই পরে ফেলুন, যেন ঠিক বুকের ওপরে পড়ে। তিন হপ্তা যত্নে রাখবেন। কোনো নিয়ম নেই অবিশ্যি।" তারপর ওখান থেকেই, যেন ম্যাজিক করে, এক শিশি অ্যান্টিব্যাকট্রিনের মতো সবজে পদার্থ বের করে দিয়ে বললেন—"প্রত্যহ দুবেলা দুদাগ বুকে-পিঠে মালিশ সকালে-সন্ধ্যায়।"

আলমারি বন্ধ করতে করতে—"শেকড়, পঁচিশ। তেল, কুড়ি। পঁয়তাল্লিশ। তবে এখন নয়। এক হপ্তা পরে। আগে ফল হোক। ফল না পেলে টাকা নিই না", বলেই একগাল হাসলেন।

শিবুও হাসলো একগাল। ওর চোখে মুখে মুগ্ধতা—এ কি মায়া, না মতিভ্রম? ফল না পেলে টাকা নেয় না এ কেমন ডাক্তার? ডাক্তার না দেবতা?

আর আমি? —"কোনো এক বিপন্ন বিস্ময়" তখন আমার "অন্তর্গত রক্তের ভিতরে" খেলা করছে। কারণ? কারণ ঐ কালো সুতো। আমার যে মাদুলি-তাবিজ পরতে-টরতে বড্ড লজ্জা করে। এসেছিলুম ওষুধ খেতে, এটা তো আয়ুর্বেদিক ওষধি, এ তো 'সেব্য' হবার কথা। যাকগে সেসব। অপ্রিয় প্রসঙ্গ। শেকড় পরা-না-পরা পরের কথা, আপাতত কৌতূহলটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আমি বললুম—

—"আপনার স্ত্রীকন্যার কোনো ছবি নেই?"

—"ছবি?" হেসে ওঠেন কবিরাজমশাই, দার্শনিক কণ্ঠে বললেন—"ছবি দিয়ে কী হবে? মানুষগুলোই যখন আছে, জীবন্ত। যেখানেই থাকুক, আছে তো।"

আমি চুপ করে যাই। দশ বছরে সেই মেয়ে কত বড়ো হয়ে গিয়েছে। সে কি আর সে-মেয়ে আছে?

এমন সময় শিবুটা বলে বসলো—

"আচ্ছা, ওই যে আপনার গুরুদেব এসেছিলেন, উনি অমন অদ্ভুত পোশাক পরেন কেন?"

—"শার্ট তো? শার্ট উনি এতদিন পরতেন না। চাদরই জড়াতেন। ইদানীং ওঁর এক শিষ্য হংকং-এ চাকরি পেয়ে অনেকগুলো শার্ট দিয়েছে, না পরলে দুঃখ পাবে, তাই পরছেন। কিন্তু ওতে কিছু এসে যায় না। এহ বাহ্য! ওঁর দিব্যজ্যোতি এতে বিঘ্নিত হয় কি?"

—"আমি তো শার্টের কথা বলিনি। লাল সিল্কের অমন কটকটে লুঙ্গি পরে উনি"—

শিবুকে থামিয়ে দিয়ে হাঁ হাঁ করে ওঠেন কবরেজমশাই—

—"লুঙ্গি কোথায়? ওটা তো পট্টবস্ত্র। কী আশ্চর্য! তন্ত্র-সাধনায় পট্টবস্ত্র পরিধেয়, তাও জানেন না?"

আমি খুব লজ্জা পেয়ে যাই। পাটের ধুতি? মানে চেলি? শিবু স্টুপিড তাকে সিল্কের লুঙ্গি বললো! ছি ছি। শিবু কিন্তু অদম্য,—সে বললো—"আপনিও তো তান্ত্রিক। তবে আপনি কেন প্যান্ট-শার্ট পরে আছেন, পট্টবস্ত্র পরিধান না করে?"

আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে যাই। আর কখনো যদি শিবুকে সঙ্গে এনেছি! কী যা-তা বলে যে!

"অমৃতং বালভাষিতম" গোছের ক্ষমার হাসি হেসে হেম-কবরেজ বলেন—"আমার কথা আলাদা। আমি আর তান্ত্রিক হলুম কোথায়? ওঁরা হলেন সিদ্ধপুরুষ।"

পাছে শিবু আরো তর্ক করে, আমি উঠে দাঁড়াই। খিদেও পেয়েছে জবর। বেলা বাড়ছে। আরশোলা এবং ইঁদুর বাঁচিয়ে অতি সাহসী ও সাবধানী পা ফেলে কোনোরকমে নোংরা ঘিঞ্জি গলিটায় বেরিয়ে এসে আরামের নিশ্বাস ফেলি আমি। আঃ। কী চমৎকার! কী পরিচ্ছন্ন দিগ্বিদিক!

তারপরেই দেখি, কেলেঙ্কারি! আমার দীন, ক্ষুদ্র গাড়ির পিঠে পিঠ ঘষছেন এক বিপুলকায় বৃষভ। সেই অতিকায় ঘর্ষণে গাড়িটা থরথর করে কাঁপছে, ভূমিকম্পের মতো। আর গাড়ির ঠিক পশ্চাতে, ছায়াময় তলদেশে এক স্নেহময়ী শূকরজননী চার-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন—সর্বাঙ্গে পাঁচটি-ছটি শূয়ার-কা-বাচ্চা দুধ খাচ্ছে। আহা, কী উন্নয়নশীল দৃশ্য। আহার, বাসস্থান, কী না আছে এদের। দো-ইয়া-তিন-বাস দরকার নেই। মাতৃতান্ত্রিক সুখী পরিবার। গাড়ির বনেটে, এবং ছাদে বৃহৎ সংখ্যক মনুষ্যশিশু নৃত্যগীতাদির দ্বারা সম্ভবত ঐ সুখী পরিবারের মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত। অথবা শ্রদ্ধেয় বৃষভের।

পাশের ভাঙা মন্দিরের বাইরে রোদ্দুর এসে পড়েছে। কিন্তু অভ্যন্তর অন্ধকার। শিবু হঠাৎ সেইখানে গিয়ে হাততালি বাজিয়ে "হেট হেট" করতেই বিনীতভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো একটি রোগা, ঘেয়ো কুকুর। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি রোঁয়াওঠা কুচোকাচা কুকুরছানাও। সস্নেহে ওদের দিকে তাকিয়ে হেম-কবিরাজ বললেন— "ক্ষেমঙ্করী।

ওখানেই ওর আতুড়ঘর করে দিয়েছি। ওর জন্ম হয়েছিল অবশ্য আমার ঘরেই। ওর মায়ের নাম ছিল কনকলতা।" ক্ষেমঙ্করী হেম-কবরেজের পায়ে গা ঘষতে লাগল। সেদিকে নজর না দিয়ে কবরেজমশায় তখন ষাঁড়টির লেজ ধরে মোচড় দিচ্ছেন এবং ভয়ঙ্কর শব্দে "হ্যাট হ্যাট" করছেন। ষাঁড় নড়ছে না। ততক্ষণে বস্তির বাচ্চারা আপনিই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ষাঁড় এবং শূয়োর তাড়াবার পুণ্যকর্মে লেগে গিয়েছে। ষাঁড় এবং শূয়োর ফ্যামিলি না সরালে গাড়ি চলবে না। ষাঁড়ের নামটি শোনা গেল না, কিন্তু শূকরীটির নাম আছে—যে-সে নাম নয়, আনারকলি। এবং সে রাষ্ট্রভাষাভাষী। বাংলায় কথা বললে চলবে না, কোর্ট ল্যাংগুয়েজ চাই। বাচ্চারা বলতে লাগলো-—"হট যা, হট যা, হেই আনারকলি! হেট হেট, উঠ যা। আনারকলি, উঠ যা, চলি যা"—ইত্যাদি! সবই আনারকলি শুনতে পেল, কেননা উত্তরে সে কানদুটি নাড়ল, কিন্তু কর্ণপাত করল না। গা এলিয়ে চোখ মেলে শুয়েই রইল, জুলজুলিয়ে চেয়ে। ধর্মের ষাঁড়ও বিন্দুমাত্রও না ঘাবড়ে উল্টে এমনই এক শিং নাড়া দিলো যে হেম-কবিরাজও কয়েক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। দেখেশুনে এবারে শিবু বলল—"দিদি, গাড়িতে ঢুকে পড়ে বরং স্টার্ট লাগিয়ে দিন। নইলে এ-ব্যাটারা সহজে নড়বে না। একেবারে এম. এল. এ. হস্টেলের জমিদারি পেয়ে গিয়েছে।" শিবুর উপদেশ অনুযায়ী গাড়িতে উঠে স্টার্ট লাগাই এবং হর্ন বাজাই। সঙ্গে সঙ্গে এক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা হয়। পতাকার মতো লেজ উঁচিয়ে, চার পা শূন্যে তুলে ষাঁড়বাবাজী হঠাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকেন। পথের ভিড় মুহূর্তে ফাঁকা। —রাস্তার ধারের মেয়েরা এখন অনেকেই চান করে ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে ফিরছে—তারা আর্তনাদ ও ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। এই আকস্মিক উপদ্রবে আনারকলিও উঠে পড়ে (অথবা গাড়ির একসহস্ট পাইপের গরম ধোঁয়ার ধাক্কা তাকে উৎপাটিত করে), বাচ্চাদের নিয়ে সে মা-গঙ্গার পবিত্র নিরাপদ কাদায় নেমে যায় ধীরে-সুস্থে। হেম কবিরাজ সগর্বে বলেন—"ওরা সবাই খুবই বাধ্য প্রকৃতির, এই বস্তিরই তো জানোয়ার ওরা!"

এবার বেরুনো।

গাড়ির পিছনের বাধা নাড়ানো গেছে, কিন্তু সামনে একটি উঁচু পাঁচিল। তাতে একলক্ষ ঘুঁটে। পাঁচিলের পাশ দিয়ে একটি সরু ইটবাঁধানো গলিপথ। অবশ্যই পায়ে-চলার। সেটির দিকে তর্জনী নির্দেশ করে কবরেজমশাই নিতান্ত আন্তরিকভাবে বললেন—

—"ওই রাস্তাটা দিয়ে বেরিয়ে যান, শর্টকাট হবে, সোজা বড়ো রাস্তায় পড়ে যাবেন।"

স্তম্ভিত শিবু বলে—"সে কি! ওইটুকুনি গলিতে গাড়ি ঢুকবে কেন?" রীতিমতো অফেনডেড গলায় কবরেজমশাই দুহাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলেন—

—"কেন, আমার গাড়ি তো ঢোকে? ঐ পথেই তো আমি রোজ চেম্বারে

যাই?”

—“কী গাড়ি মশাই আপনার?” বলে শিবু উত্তরের অপেক্ষায় থাকে। আমার চোখের সামনেই ঘরের দাওয়ার দেয়ালে ঠেস দেওয়া সাইকেল। কবিরাজ চোখ দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে দিয়ে মিটির মিটির হাসেন। শিবু হাসে না। ব্যাজার মুখে বলে—“ওঃ। সাইকেল!” তারপর বলে—

“ব্যাক করা ছাড়া উপায় নেই দিদি, পুরোটা রাস্তাই ব্যাক করে বেরুতে হবে। শালা, এ গলির যা ফর্ম!”

তারপর শিবু, কবরেজ, এবং গণ্ডা পাঁচেক বাচ্চা সশব্দে রাস্তা ক্লিয়ার করতে করতে চলে, পিছনে পিছনে আমি অতি সাবধানে ব্যাক করতে করতে আসি, খাটিয়া, ঠেলা, রিকশা ইত্যাদি দেখে শুনে (ধাক্কা লাগলেই তো গেছি)। আমার সামনে সামনে গণ্ডা কয়েক কুকুর ঘেউঘেউ করতে করতে মহা উল্লাসে দৌড়য়। এ গলিতে আমার ইম্পর্টেন্স প্রচণ্ড! এ যেন স্বয়ং গবর্নরের গাড়ি—সামনে-পেছনে এডিসির মোটর-বাইক, মাইক-ওলা পুলিশের গাড়ি ইত্যাদি। হেম-কবিরাজ হঠাৎ জানলার কাছে এসে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বলেন—“মোটর তো আসে না এখানে বড় একটা। বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে ঐ গলি দিয়ে হেঁটেই আসে সবাই শর্টকাটে—গাড়ি দেখে তাই বস্তির লোকেরা খুব খুশি হয়েছে আর কি!”

খুশির প্রমাণস্বরূপ কয়েকটা মন্তব্য কানে এলো—“এটা আবার কেমনি টেকশি রে? সামুনে দিকে যায় না, কেবলই পিছনবাগে যায়?” উত্তর—

—“আরে, ফ্যালাইয়া থো। অরে দুইষ্যা কী হইবো? হৈল গিয়া মাইয়া লোগটার দোষ—আগাইতে তো আর শিখে নাই, ক্যাবল পিছাইতেই শিখছে”, শুনতে শুনতে মাথার মধ্যে একটা দিব্য দরজা খুলে গেল। কবিরাজী মানে “ক্যাবল” পিছাইতেই শিখছি না তো? ফেলেই দেব নাকি শেকড়টা?

খ-পর্ব: রত্ন-চিকিৎসা

ফেলা হলো না। নন্দকাকু ফেলতে দিলেন না। চলল আমার তেলমালিশ আর গলাবন্ধ হাইকলার জামাপরা। (আমার ধারণা যারাই হাইনেক ব্লাউজ পরে, তাদেরই গলায় কালো সুতোয় বাঁধা শেকড়-বাকড় থাকে)! কিন্তু হাঁপানি কমল কিনা বোঝা গেল না এক হপ্তায়, তাই টাকাও নিলেন না হেম-কবরেজ। চলুক আরো দু হপ্তা। তারপরে নেওয়া যাবে। আরো দু হপ্তা কাবার হবার আগেই নন্দকাকু হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে এসে হাজির। হেম-কবিরাজ হাওয়া হয়ে গেছেন। পড়ে রয়েছে তাঁর ঘরভর্তি আশ্রিত প্রাণীরা, সাইকেলটা লছমী তুলে রেখেছে নিজের ঘরে, ডাক্তার বোসের চেম্বারে কেবলই কবিরাজী রুগীদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। কিছুই নিয়ে যাননি সঙ্গে, মা-কালীটিকে ছাড়া। কালীকে নিয়ে কবিরাজ ফেরার।

—“গেলো কোথায় মানুষটা?”

—"আর বলো কেন", নন্দকাকু নাক কুঁচকে বলেন, "ওসব কবরেজী-ফোবরেজি ওর নাকি সবই ফোরটোয়েন্টি, আসলে শেকড়-বাকড় যোগাতো ঐ বস্তিরই এক নেপালী বুড়ি। কবরেজ আসলে সে-ই। বুড়ি অকস্মাৎ পটল তুলেছে। তার মেয়েটা অন্যরকম ব্যবসা করে, গাছগাছালি চেনে না। বুড়ি নাকি নেপাল থেকেই ওষুধের সাপ্লাই নিয়ে আসত। হেমচন্দর তাই নেপাল ছুটেছেন। বুড়ির এক বোন আছে সেখানে, সেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা জানে। তারই খোঁজে গেছে।" এইসব তথ্য নন্দকাকু পেয়েছেন লছমীর কাছে, লছমীর বউ নাকি আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদছে। ঐ হেম-কবরেজই খেতে পরতে দিত বুড়োবুড়ীকে।

—"অতঃপর ?"

—"অতঃপর কুছ পরোয়া নেই", নন্দকাকু ঘোষণা করেন।

—"আমি তো যাচ্ছি নকুড়েশ্বরের কাছে। ভেষজ চিকিৎসা আর নয়, এবারে রত্ন-চিকিৎসা। অব্যর্থ ফল হয়। নকুড়বাবু অমন সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কবরেজ নন, খুব পড়াশুনো করেছেন। মস্ত তান্ত্রিক। হেমচন্দ্রের গুরুদেব।"

—"হেম-কবরেজের গুরুদেব ? ফর্সা-লম্বা, ভুঁড়িওলা—অল্পস্বল্প গোঁপ দাড়ি, লাল লুঙ্গি, সরি, পট্টবস্ত্র, কপালে সিঁদুর ? সেই কি ?" বর্ণনা শুনেই নন্দকাকু সম্মোহিত। হুবহু, এই তো তবে চিনিস দেখছি। চল, ওঁর কাছে নিয়ে যাই তোকে। এই আসল লোক। সিদ্ধপুরুষ। সত্যিই সাধনা করেছেন। অলৌকিক রত্নচিকিৎসা কি সোজা ব্যাপার ? এতে রোগ সারবেই ! না সেরে যাবে কোথায় ?"

কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হলুম না। রত্ন-চিকিৎসা নামটাই আমার মনে ধরলো না, পকেটেও ধরবে বলে মনে হলো না। তাছাড়া ওই লোকটাকে দেখে আমার 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ' ছবির মহাপুরুষকে মনে পড়ে গিয়েছিল। আমি বাবা কাপুরুষ আছি। ওর মধ্যে যেতে চাই না। তায় আবার অলৌকিক !

সাহসী নন্দকাকু কিন্তু যেতেই থাকলেন, ফলও হয়তো পেতে লাগলেন। আমি পুনরায় অ্যালোপ্যাথিতে ফিরে গেছি শুনে মর্মাহত হয়ে অভিমানে নন্দকাকু এ-বাড়িতে আসাই ছেড়ে দিলেন। তখন মা এক রোববার সকালে আমাকে ভবানীপুরে পাঠালেন নন্দকাকুর মান ভাঙাতে।

নন্দকাকু বাড়ি নেই। কাকিমা আমাকে দেখেই নায়েগ্রার মতো অঝোর ধারে ভেঙে পড়লেন— "এসেছিস খুকু ? দেখে যা স্বচক্ষে তোর কাকার কাণ্ড ! আমার জীবন শেষ করে দিলে।"

—"কে শেষ করলে ? কাকু ?"

—"কাকু, আর কাকুর ঐ ডাকাত, ঐ চোট্টা তান্ত্রিকটা। সে তোর কাকুকে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে।"

—"সে কি গো ?" আমার আর বাক্য-স্ফূর্তি হয় না।

—"ছাইভস্ম পুরে পুরে কী সব পুরিয়া বানিয়ে দেয়, আর দুশো-পাঁচশো এই

রেটে টাকা নেয়। টাকা নেয়, আর বলে কিনা—আমি বিনামূল্যেই রত্ন-চিকিৎসা করি। আপনি যা দিচ্ছেন তা শুধু রত্নের মূল্য—ওগুলো তো জহুরীর কাছে কিনতে হবে! ভেবে দ্যাখ জোচ্চুরিটা কেমন!"

"রত্নগুলো কোথায়? কোমরে পরেন না হাতে? তুমি যাচিয়ে নাও তো স্যাকরার কাছে?"

—"হায় ভগবান! তবে আর বলছি কী?" কপাল চাপড়ান কাকিমা।—"রত্নগুলোই তো খায়।"

"খায় মানে? পাথর আবার খাবে কি!" আমি থ!

—"খায় মানে পুড়িয়ে খায়। পুড়িয়ে ছাই করে খায় তো! আহা, কতো রত্নই যে ক'মাসে খেয়ে ফেললে তোর কাকা! আজ সেগুলো সব থাকলে আমার একটা সুন্দর জড়োয়ার সেট হয়ে যেতো।" কাকিমার গলা কান্না-কান্না হয়ে বুজে আসে।

—"সেও কি সম্ভব? পাথর কি পোড়ে?"

—"পোড়ে না? খুব পোড়ে। 'রত্নভস্ম' কথাটা শুনিসনি? 'স্বর্ণভস্ম,' 'মুক্তাভস্ম,' এইসব শব্দ শুনিসনি জীবনে?"

—"তা শুনেছি বটে। কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ কি প্রেশাস স্টোনস—মানে মণিমুক্তো, হীরেজহরৎ পুড়িয়ে খেতে পারে কখনো?"

—"পারে না? খুব পারে। ওরে, হাঁপানির কষ্টের জন্যে মানুষ সব পারে।
এই একটি কথায় কাকিমা আমাকে চুপ করিয়ে দেন। —"কী খাচ্ছেন তবে তোর কাকা নিত্যি মধুর সঙ্গে বেটে বেটে, গেল ক'মাস?" কাকিমা বলেন—"বাড়িতে দুধ-ঘি ঢোকে না, মাছ-মাংসও প্রায় বন্ধই, নিজেদের জন্যে গুড়-চা, আর কতো বলব? টাকাকড়ি সব যাচ্ছে ওই রত্নচিকিচ্ছেয়। এর চেয়ে গাঁজা-ভাং কি মদ-টদ খেলেও ঢের ভালো হতো। মণিমুক্তোর চেয়ে ঢের সস্তা পড়ত। ওরে, নেশার মতন করে হীরেজহরৎ খাওয়া কি আমাদের পোষায়? একি বেগুনপোড়া?"

'নেশা' শব্দটা টং করে ঘন্টা বাজিয়ে দেয় মাথার মধ্যে আমার। কে জানে কী দিচ্ছে রত্নভস্মের নাম করে? সত্যি সত্যি রত্ন পোড়াতে ওর বয়ে গেছে। সত্যিকার চুনিপান্না হাতে পেলে কেউ পোড়াতে পারে নাকি? কখখনো না। অন্য-কিছুর ছাই দেয় নিশ্চয়ই—কাঠ-কয়লা, কি ঘুঁটের। কিংবা তার চেয়েও দামী কিছুর, যাতে রুগীর নেশা ধরে যাবে। যাতে কবরেজী ছাড়তে না পারে।

—"কে জানে কী জিনিস গেলাচ্ছে কাকুকে—'রত্নভস্ম' বলে? হাশিশ? মারি-হুয়ানা? আফিং? কোকেন? নিদেনপক্ষে তুমি যা বললে সেই গাঁজা? ভাঙ? কি চরস?—যাতে নেশা ধরে যায় তেমনই কিছু খাওয়াচ্ছে মনে হয়।"

বলতে না বলতেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন কাকিমা।—"ওরে! খুকুরে। ওসব তুই কী সর্বনেশে কথা বলছিস রে? ওরে! ওরা যে সব পারে, ওই হতচ্ছাড়া ডাকাত, চোট্টা হীরে-খেকো খুনে তান্ত্রিকরা!" তারপরেই খাড়া হয়ে বসেন—গলার স্বর পাল্টে

যায়। এবারে গঠনমূলক চিন্তা। ক্লিয়ার কনস্ট্রাকটিভ অ্যাপ্রোচ।—"এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে। এক্ষুনি। আজই। গাড়ি এনেছিস তো সঙ্গে? চল— যাচ্ছি আমি—"

রণং দেহি মূর্তিতে কাকিমা শাড়ি বদলাতে যান। যেন অর্জুন যুদ্ধে নামার আগে অস্ত্রসজ্জা করছেন। মুখ অবিশ্যি বন্ধ হয় না। আরো নানা মূল্যবান ইনফর্মেশন বেরিয়ে আসতে থাকে। অনর্গল। —"ছোড়দাকে তো জানিস, একেই গ্যাস্ট্রিক, তায় হার্ট ট্রাবল", কাকিমা বলেন, "ছোড়দাকেও জপিয়েছে তোর কাকা। নকুড়েশ্বর তো বুক-পেট দুটোরই ট্রিটমেন্ট করবার জন্যে হামলে পড়েছিল, কিন্তু আমার ছোড়দাটি তো আবার অন্যরকম লোক, সে বেঁকে বসল। 'আমার হার্টটি আমি কার্ডিওলজিস্ট ডাক্তার সুধীর সেনকে দান করেছি, ওটা ওঁর প্রাইভেট প্রপার্টি, ওদিকে খবর্দার নজর দেবেন না, আমার পেটটাকে বরং আপনি নিন।' শুধু পেট দেখতেই তান্ত্রিকটা মাসে একশো তিরিশ টাকা করে নিচ্ছিল, হপ্তায় হপ্তায় একপুরিয়া মাত্র ওষুধের জন্যে। কী যেন নাম, 'কাঞ্চনভস্ম' নাকি। হঠাৎ কী যে খেয়াল হলো ছোড়দার, ল্যাবোরেটরিতে ছাইটা পরীক্ষা করিয়ে আনল। কী পাওয়া গেল বল তো? কাঞ্চন-টাঞ্চন কিছুই নয় কেবল হত্তুকি আমলকি বয়ড়ার গুঁড়ো! সেই দেখেই পরশুদিন ছোড়দা পিয়নকে দিয়ে চিরকুট পাঠিয়েছে—'এর হাতে ঐ ত্রিফলা-চূর্ণ ওরফে কাঞ্চনভস্মটি (অর্থাৎ আমার উপার্জিত কাঞ্চনের ভবৎকৃত ভস্ম) দিবেন।' সেই পড়ে নাকি কবরেজের হাত-ফাত কাঁপতে লেগেছে। ব্যাটার জুচ্চুরি ধরা পড়ে গেছে তো? পুরিয়া এনে দিয়ে পিয়নকে বলেছে 'টাকা পয়সা দিয়েছেন কিছু?' পিয়নও তেমনি ওস্তাদ। বলেছে, কই না তো? শুনে কাতর হয়ে নাকি কবরেজ বলেছে, 'তবু, কালীর জন্যে, যাহোক কিছু?' পিয়ন তখন পকেট থেকে ঠিক পাঁচসিকে পয়সা বের করে দিয়েছে মায়া করে। তাই নিয়েছে। তবেই ভেবে দ্যাখো—"

—"নন্দকাকু কি তারপরেও গেছেন?"

—"তবে আর শুনলে কী? পরশুদিনই এই কাণ্ড, তবুও উনি আজকে গেছেন।"

"খুবই অদ্ভুত! সত্যি। নিশ্চয় রত্নভস্ম বলে কোনো নেশার জিনিস খাওয়াচ্ছে"—বলতে বলতে আমরা রাস্তায় নেমে পড়ি।

নকুড়েশ্বরের বাড়ি কাকিমা ভালোই চেনেন দেখা গেল। বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা আছে,

—"চাঁদসীর ক্ষত-চিকিৎসালয়।" আমি তো অবাক! কাকিমা ব্যাখ্যা করেন—

—"এটা ওর নয়, ওর বাপের ব্যবসা। দোরের পাশের ঐ ছোটো সাইনবোর্ডটা ওর।" সেখানে ঝকঝকে পেতলের ফলকে লেখা—

"তান্ত্রিক রত্নচিকিৎসক, পণ্ডিত নকুড়েশ্বর কাব্যতীর্থ, বি-এ বি-এল জ্যোতিষার্ণব।" এর কোন ডিগ্রিটা যে সরাসরি রত্নচিকিৎসার সঙ্গে জড়িত, সেটা বুঝতে পারলুম না। ভেতরে ঢুকেই দেখি মারোয়াড়ি গদির মতো ফরাস বিছিয়ে

সামনে ডেস্ক নিয়ে এক শক্তসমর্থ টাক মাথা বৃদ্ধ ফতুয়া ধুতি নিকেলের চশমা পরে বসে আছেন। সামনে খেরোর মলাট জাবদা খাতা কলম। পিছনে দেয়ালে তাক ভর্তি চীনেমাটির বইয়াম। তাতে বিবিধ লেবেল। কাকিমা বললেন—"ওর বাবা।" ভদ্রলোক হাসি মুখে আমাদের নমস্কার করে বললেন—"এই যে মিসেস চৌধুরী, আসুন। আপনার কত্তাও আছেন এখানে নকুড়ের ঘরে।" এই সকালেই বেশ কজন রুগী এসে বসে আছে এই ক্ষত-চিকিৎসকের সামনে। কাকিমা প্রতিনমস্কারপূর্বক, একটুও না হেসে গম্ভীর গলায় বললেন—"ডাক্তারবাবু, আপনার গুণধর ছেলেটি আমাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে।" আমার মাথায় লজ্জায় বজ্রপাত হলো। কিন্তু ক্ষত-ডাক্তারবাবু বেশ স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দেন—

—"শুধু কি আপনাকেই? আমাকে সর্বস্বান্ত করছে না? ও-ছেলে সব্বাইকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে।" দু'হাত উল্টে ঠোঁট উল্টে তিনি বললেন—"ছিল, ছিল এক-রকমের পাগল, তন্ত্রমন্ত্র পুজোআচ্চা নিয়ে, এখন হয়েছে আরেক রকম। কিছুতেই তো সে পারিবারিক ব্যবসাতে ঢুকল না। আমরা জ্যোতিষীও নই, তন্ত্রমন্ত্রও জানি না, বংশানুক্রমে চাঁদসীর ক্ষতচিকিৎসা করে আসছি। হেন ক্ষত নেই যা আমার বাবার হাতে সারতো না। আমার হাত অতটা পরিষ্কার না হলেও এই তো এই পায়ে—ক্যান্সার রুগীকে সুস্থ রেখেছি তিন বছর—" (সামনে আঙুল বাড়িয়ে যাকে দেখালেন তাঁকে রুগী বলেই মনে হলো না)।

—"ছেলে প্রথমে বললে উকীল হব। তা গোঁ আছে—হলোও উকীল। কিন্তু তারপরে বললে সংস্কৃত পড়বো, হলো কাব্যতীর্থ। সেই থেকে চলল জ্যোতিষচর্চা, তারপরে, হলো তন্ত্রসাধনা—(আমাদের এই শ্মশান ধারে ঘর হয়েই ওই যন্ত্রনাটা হয়েছে।)—এখন তো আবার নতুন নেশায় ধরেছে"—

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে ক্রমেই বিমর্ষতর হয়ে যেতে লাগলেন—"ওর মা গেল বছরে স্বগগে গেছে, বেঁচে গেছে! ছেলেকে ইদিকে শনির দশায় পেয়েছে —শনির দশায়। ওই যে, শনি"—চোখের ইশারায় দরজা দেখিয়ে দেন তিনি।

ফর্সা, ঢ্যাঙা, রোগা টিংটিঙ (বহুরূপীর 'রক্তকরবীর' সর্দারের মতো চেহারার), একমাথা উস্কখুস্ক রুক্ষ পাকা চুল, গায়ে আধময়লা লক্ষ্ণৌর বাঁদিক খোলা পাঞ্জাবি আর ফর্সা চুড়িদার পাজামা—পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে বয়স—এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকছেন। তাঁর মুখে কালোয়াতী গানের গুনগুন, আর এই সাতসকালেই মদের গন্ধ ভুরভুর। চোখে উদাস দৃষ্টি, অন্যমনস্ক।

ঢুকেই তিনি জড়ানো গলায় হাঁক পাড়েন—

—"নকুড়! নকুড়। নকুড়বাবু কি উঠেছেন?" তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে স্মার্টলি যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর পরনে বেগুনি রঙের ঘন্টা পেন্টুলুন আর ভুঁড়িচাপা হলুদ গেঞ্জী। তাঁর বাঁ কোণের পকেটে একটি ঘন নীল উটপাখি ঠ্যাং উঁচিয়ে, পাখা মেলে স্তব্ধ হয়ে আছে। অল্পস্বল্প গোঁপদাড়ি, দিব্যি ভুঁড়ি, কপালে সিঁদুর।

—"আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য! এস. কে. যে। এত সকালে?" আহ্লাদে গলায় অভ্যর্থনা জানান নকুড়েশ্বর, সিঁদুর লেপা কপাল থেকে চুলের গুচ্ছ দেবানন্দের কায়দায় এক ঝাপ্টায় সরিয়ে। আমাদের অবিশ্যি দেখতে পেলেন না। কিন্তু এহ বাহ্য। সিদ্ধপুরুষ! বাবা ব্যক্তিটি ছাড়বার পাত্র নন কিন্তু!

—"আগে এঁদের দিকে নজর দাও বাবা নকুড়। এঁরাই আগে এয়েচেন।"

নকুড়েশ্বর অগত্যা আমাদের দেখেন। দেখে ম্রিয়মাণ হয়ে যান। "আসুন আসুন, মিসেস চৌধুরী।"— উত্তরে কাকিমা কটমটিয়ে তাকান মাত্র।

পর্দা সরিয়ে ঢুকে দেখি দিব্যি সোফাটোফা পাতা আধুনিক বসার ঘর। এককোণে একটা বেঁটে লোহার সিন্দুক বড় বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। অন্যদিকে, এক বুকর‍্যাক ভর্তি আইনের বই, আরেকটি র‍্যাকে ন্যাকড়া জড়ানো পুঁথিপত্র কিছু। কালী-টালী, তন্ত্র-মন্ত্র জাতীয় কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু কাচ বসানো সেণ্টার টেবিলে হিন্দী ইংরিজি বাংলার যাবতীয় চিত্রল সিনেমা পত্রিকা ছড়ানো, এবং একটি সোফাতে স্পষ্টতই বিচলিত নন্দকাকু। কেননা, নন্দকাকুর ঠিক সামনেই, টেবিলের ওপরে সুতো বাঁধা একতাড়া পাঁচ টাকার নোট। ঢুকেই কাকিমার প্রখর দৃষ্টি সেইদিকে। নন্দকাকুর কাতর দৃষ্টি এবং আমার বিহ্বল দৃষ্টি সেইখানেই নিবদ্ধ; এবং নবাগত অতিথির উদাস দৃষ্টিও। কেবল নকুড়েশ্বরই ভিন্ন। তিনি উচ্ছ্বসিত,

—"তারপর? এস. কে. যে আজ সকালবেলাতেই?" তেপান্তর মাঠ পার হয়ে আসা ঝোড়ো বাতাসের মতো বুক কাঁপানো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ঘরটি দিশি মদের গন্ধে পরিপূর্ণ করে এস. কে. বলেন,

—"দিস ইজ দি এনড! ইয়ে জিন্দগী হ্যায় বেওয়ফা—রাজুকে পুড়িয়ে এলুম। মানে, রাজনলিনীকে। অর্থাৎ আমার জীবনটাকেই চিতায় তুলে দিয়ে এলুম। বরবাদীয়োঁকে আজীব রাস্তা হ্যায়! ইয়েস—আজকে আমার জীবনটা দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে গেল, নকুড়!"

কাগজে পড়ে এসেছি, প্রতিভাময়ী বর্ষীয়সী চিত্রতারকা রাজনলিনী দেবীর মৃত্যুসংবাদ। বয়স হলেও কর্মক্ষম ছিলেন চিত্রজীবনে। ঘরে মৌনতা বিরাজ করে। দু মিনিট হবার আগেই এস. কে. আবার কথা বলেন—

—"জানোই তো, রাজুই ছিল আমার সব। মানে,—রাজুর সঙ্গে আমার—সে তো আজকের কথা নয়, সেই নাইণ্টিন থার্টি থেকে। বাংলা ছবির তখন গর্ভযন্ত্রণা চলেছে, মেয়ে পাওয়াই ভার, লাইনের মেয়ে ছাড়া। সেই সময়ে রাজুকে আমিই আবিষ্কার করি! মাই ঔন ফাইনড! ওর মতো পবিত্র উদাস সরল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ —" ওঁর চোখে নাকে জলধারা উথলে পড়ে (আমি মনে মনে শুনতে পাই: দানশীলা, তেজস্বিনী দয়াবতী)—নকুড়েশ্বর প্যাণ্টের পকেট হাতড়ে তাড়াতাড়ি নীল সিল্কের ইস্ত্রি করা রুমাল এগিয়ে দেন—দামী বিলিতি সেণ্টের অভিজাত গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে বাংলা মদের দিব্য সৌরভ চাপা পড়ে না। এস. কে. দয়া করে

নকুড়েশ্বরের রুমালে ফোঁৎ ফোঁৎ নাক ঝাড়লেন।

ইতিমধ্যে কাকা-কাকিমা মুখোমুখি। "সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি" নন্দকাকু যেন সন্ত্রস্ত হরিণী। আর কাকিমা? খাস রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।—সে কী দৃষ্টি! আমি বেচারী ফেউয়ের ভূমিকায়। নকুড়েশ্বর এতক্ষণে সংবিৎ পেয়ে বললেন,

—"ইনিই বিখ্যাত ডিরেক্টর এস. কে. দত্তচৌধুরী, সাত্ত্বিকের সব ছবিগুলি যিনি ডিরেক্ট করেছেন। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?"

—"মানে?" নন্দকাকু প্রায় শিবুর মতোই আনাড়ি বাক্য বলে ফেলেন।

—"সাত্ত্বিকবাবু তো নিজেই তাঁর ফিল্মগুলি ডিরেক্ট করতেন।" নকুড়েশ্বর এবার মৃদু মৃদু হাস্য করেন। সবজান্তার হাসি।

"লোকে তাই ভাবে। আসল ঘটনা অন্য! আসল ঘটনা এই এস. কে.-র কাছে শুনুন। ইনিই ছিলেন সাত্ত্বিকের অল-ইন-অল।" এস. কে. সলাজ নয়নে তাকান, —অতটা বাড়িও না নকুড়, আমি ছিলুম সাতুর ডান হাত। এবং ডান হাত কী করতো, বাঁ হাত তা টের পেতো না, এক্কেবারে সেই প্রিভিউয়ের দিনের আগে!"

—এবারে আমিও আপত্তি না করে পারি না।

—"কিন্তু সাত্ত্বিকবাবু তো মোটামুটি একগুঁয়ে লোক ছিলেন। মানে ওঁর ব্যাপার তো সবই খোলাখুলি, সবাই সব জানে, উনি যে অন্যের কত্তাত্বি একদমই সইতেন না ছবির ব্যাপারে, সে কথা তো বিশ্বসুদ্ধু সকলেই জানি—", উদার হাস্যে দক্ষিণ হস্তটি বরাভয় মুদ্রায় উঁচু করে আমাকে থামিয়ে দিয়ে এস. কে. বলেন :

—"থাক, থাক, আজ সাতু যখন নেই তখন ওসব কথা আর বলে কী হবে! এসব প্রাইভেট অ্যাণ্ড কনফিডেনশিয়াল ফ্যাক্ট তোমার পাবলিক নলেজ করাই উচিত নয় নকুড়।"

—"মিস্টার চৌধুরী খুবই সদাশয় ব্যক্তি"—নকুড়েশ্বর বলেন।

—"ও, তাহলে তোমার নিজের খবরটা ওঁদের দিয়েছো?" রাজনলিনীর শোক ভুলে গিয়ে রীতিমতো উৎসাহের সঙ্গেই প্রশ্নটি করেন ভদ্রলোক। এবং এই ব্যক্তিগত সংবাদ-সংক্রান্ত প্রশ্নে স্পষ্টতই লজ্জা পেয়ে যান সিদ্ধপুরুষ মহাতান্ত্রিক নকুড়েশ্বর। কেমন নম্র-নম্র মুখ করে বলেন,

—"না! ও আর দেবার মতন খবর কি আর?"

—"দেবার মতন খবর নয়? বলো কি?" টেবিলে রাখা নোটের তাড়ার দিকে চেয়ে চেয়ে এস. কে. বলেন,

—"মিউজিক আর. ডি. বর্মণ! সেটা খবর নয়? অ্যাঁ?"

—"মানে?" নন্দকাকু ঠিক বুঝতে পারেন না।

"নকুড় তো ফিলিম করছে। ফ্যান্টাস্টিক স্ক্রিপ্ট বানিয়েছে। আর. ডি. বর্মণ তো খুশি হয়ে রাজী!"

এবারে কাকিমা জাগ্রত হন।

ফিল্মের ব্যাপারে কাকিমার বেশ ইণ্টারেস্ট আছে—

—"ডিরেক্টার নিশ্চয়ই আপনি?" এস. কে. সায় দিয়ে মাথা হেলান।

—"আর হিরো-হিরোইন কারা?" কাকিমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

—"বলো? নকুড়, বলে দাও? বলে দাও না কাকে তোমার হিরোইন করছো!" এস. কে. যতই উৎসাহ দেন, শ্রীমান নকুড়েশ্বর যেন ততই লজ্জায় কুঁকড়ে যান।

—"বলো না, বলো? লজ্জার কী? এ তো গর্বের কথা—বলো, ওঁদের বলে দাও, নকুড়,"—লজ্জায় লালচে হয়ে নকুড়বাবু বলেই ফেলেন—"শর্মিলা!" বাকিটা এস. কে. বলে দেন—"শর্মিলা কিনা বাংলা ছবিতে নামতে খুব ভালোবাসে। তাই।"

—"গল্প কার?" কাকিমা যেন ইণ্টারভিউ নিচ্ছেন।

—"গল্প নকুড়ের নিজেরই লেখা, স্ক্রিপ্টও তারই। অসামান্য সেই স্ক্রিপ্ট, মানে, না পড়লে বিশ্বাস হবে না। এত এক্সাইটিং—নকুড়েশ্বরই লাইফস্টোরি বলতে পারেন, কিন্তু ওঃ! রাজুটাই যে চলে গেল! ওকেই তো ঠিক করেছিলুম মায়ের পার্টে। ওঃ রাজু। মাই সুইট চাইল্ড। মাই ডার্লিং রাজনলিনী!" হঠাৎ পুনর্বার শোকটা উথলে উঠল এস. কে.-র। আমরা ছবিটবিতে রাজনলিনী দেবীকে ষাটের উপরেই দেখছি তাই যৌবনের এই আবেগের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। নকুড়েশ্বরও অতিরিক্ত বিব্রত হয়ে পড়েন—"থাক থাক, ওকথা আর" —তিনি অপরাধীর মতো চোর চোর মুখে বলেন, যেন এই মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। কথা ঘোরাতে চান কাকিমাও, তাই প্রশ্ন করলেন—

—"আর হিরো? হিরো কে? ধর্মেন্দর নাকি? সেও তো শুনেছি বাংলা বইয়ে নামতে চায়"—কাকিমা নানান ফিল্ম পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা। এবারে নকুড়েশ্বর গোলাপ-ফুলটির মতো লাজ-রাঙা হয়ে ওঠেন। এবং তদ্দৃষ্টে অকস্মাৎ শোকার্তের ভূমিকা থেকে ইয়ারের ভূমিকায় চলে যান শ্রীযুক্ত এস. কে.। একটি চক্ষু টিপে গেয়ে ওঠেন "CS আমার গোপন কথা, Sনে যাও ও CSI খি"— তারপর হঠাৎ শোক এবং ইয়ার্কি উভয় রোল পরিত্যাগপূর্বক খুব সীরিয়াস হয়ে গিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন— "হিরো নকুড়েশ্বর হিমসেলফ। দেখুন, লাইফ-স্টোরির ফিল্মে কিন্তু সেটাই বেস্ট! সাতুকে দিয়েও তো আগে তাই করিয়েছিলুম, শেষ বইটাতে মনে নেই? সাত্ত্বিকের লাইফ স্টোরি যেটা? জাঁ ককতো তো বার বার তাই-ই করেছেন। এমন-কী ক্রুফোও। 'ডে ফর নাইটে'? তবে নকুড়ের নামটা বদলে দিতে হবে! ভাবছি ধামান নামটি কেমন।"

—"বেশ নাম। চমৎকার নাম"—বলতে বলতে হঠাৎ ঝুঁকে কাকিমা টেবিল থেকে খপাৎ করে নোটের বাণ্ডিলটা তুলে নেন— নন্দকাকুর দিকে তাকিয়ে বলেন— "এটা তো পশ্চিমের দোকানঘরগুলোর ভাড়াটা? তাই না? আজই দোসরা।" ভীত নন্দকাকু স্বীকারোক্তিতে মাথা নাড়েন। কাকিমা উঠে দাঁড়ান। ব্যাগ খুলে টাকাটা

প্রথমে ভরেন। নেক্সট মুভ হিসেবে পানের ডিবে বের করে মুখে বেশ খানিক পানজর্দা ঠাসেন, যাতে মনের বল বৃদ্ধি পায়। তারপর মুখটা উঁচু করে (যাতে পানের রস না গড়িয়ে পড়ে) সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেন—

—"খাওয়াচ্ছেন তো টিকের ছাই আর হত্তুকির গুঁড়ো, ইদিকে হাজার দুয়েক অলরেডি গচ্চা গেছে। আজ আমি এসে না পড়লে আরো পাঁচশো যেতো। হুঁঃ। বাবুর ফিলিম করা হচ্ছে। ধীমান। ঐ ফিলিমের প্রযোজক কি আমরাই? বলি, টাকাটা যোগাচ্ছে কে? এই হতভাগা রুগীগুলো। না?" এবার নিচে নামল, এবং আঙুলটি এস. কে-র দিকে উদ্যত হলো—"ওই জুটেছেন আসল ফোর-টোয়েন্টি। যেই সাত্ত্বিকবাবু মারা গেছেন, অমনি তাঁর নামে যা-নয়-তাই বলা? আবার রাজনন্দিনী দেবীর নামেও মরণের সঙ্গে সঙ্গেই কেচ্ছা করা হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী মরলে এ কী বলবে কে জানে। একখুনি পুলিস ডাকা উচিত।" তারপর স্বর পালটে—

—"আর বাছা নকুড়েশ্বর, তোমাকেও বলি। বুড়ো বাপের কথা-টথা একটু শুনলেও তো পারো। চাঁদসীর চিকিচ্ছে না করতে চাও, কোর্টেও তো বেরুলে পারতে? এ ব্যাটা বুড়ো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে যে তুমিও গেলে, আমরাও গেলুম, বাপ। এটা যে কেলোর কীর্ত্তি হচ্ছে। হ্যাঁ, সে ছিলো বরং পাগলা হেম-কবরেজ।" কাকিমার কণ্ঠে হঠাৎ গরম গরম মায়া ঝরে পড়ে—

—"ঘাস পাতা দিত বটে, কিন্তু পয়সারও খাঁই ছিল না মোটে। সে তবু একরকম। পাগলটা নাকি ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে একেবারে নেপালে চলে গেচে।"

এবারে পরম বিস্ময়ে নকুড়েশ্বরের মুখ খুলে যায়—

—"নেপাল? হেম তো নেপালে যায়নি।"

—"তবে? লছমী যে বললে—", নন্দকাকুকে থামিয়ে দিয়ে নকুড়েশ্বর তাড়াতাড়ি বলতে থাকেন,

—"হেম তো গেছে তার শালার বাড়ি, ইউ. এস. এ.-তে। শিকাগোয় হেমের শালা রেস্টুরেন্ট খুলেছে, হেমের বউ সেখানে রান্না করে। বউ লিখেছে ওদেশে হিন্দুধর্মের খুব বাড়বাড়ন্ত, যোগ-যাগ তন্ত্র-মন্ত্র খুব চলছে, মায় ঝাড়ফুঁক পর্যন্ত। হেম তাই শিকাগোয় গেছে একটা কালীমন্দির খুলতে। ওখানে বাঙালীও ঢের, কালীবাড়ি একটা দিব্যি জমে যাবে।"

এক মুষ্টিতে নন্দকাকু, অন্য মুষ্টিতে আমি, বগলে ব্যাগ, কাকিমা দরজার দিকে ফরোয়ার্ড মার্চ করতে করতে পর্দার সামনে এসে আবাউট টার্ন করে ঘুরে দাঁড়ান। এস. কে. নীরব, উদাস চোখে টেবিলে নোটের তাড়ার শূন্য স্থানটির দিকে চেয়ে বসে আছেন। নকুড় উঠে দাঁড়িয়েছে উত্তেজনায়। কাকিমা নকুড়েশ্বরের দিকে চেয়ে একটি যথার্থই মিলিয়ন ডলার অ্যাডভাইস ঝাড়লেন—

—"দ্যাখো বাছা নকুড়েশ্বর—তুমিও আমেরিকাতেই চলে যাও না কেন? হলিউডে

ছবি করবে, দেবানন্দ শশী কাপুরের মতন নাম করবে, আর হীরে-জহরৎ পুড়িয়ে খাবার ব্যবসাটাও ও-দেশেই জমবে ভালো। ওটা বোধহয় সায়েব ব্যাটারা খেতে শেখেনি এখনো।”

অপারেশন ম্যাটারহর্ন

তোমরা নিশ্চয়ই সেই জাপানী মহিলার নাম শুনেছো, শ্রীমতী তাবেই, যিনি এই বিশ্ব নারীবর্ষে এভারেস্ট শিখর জয় করলেন। কিন্তু তোমরা কি জানো, একবার দু'জন ভারতীয় ছাত্রী দুরারোহ ম্যাটারহর্ন শিখর বিজয়ে বেরিয়েছিল? ম্যাটারহর্ন আল্পসের একটি শৃঙ্গ। যেমনি উঁচু তেমনি খাড়াই—বিশেষত তার দক্ষিণমুখ পর্বতারোহীদের পক্ষে বশ মানানো প্রায় অসাধ্য। বছর তেরো চোদ্দ আগের কথা—দুটি ভারতীয় মেয়ে ঠিক করল তারা ম্যাটারহর্নের দক্ষিণমুখ জয় করবে। তারা কোনোদিন মাউন্টেনিয়ারিং শেখেনি বটে, কিন্তু তাদের সাহস ছিল খুব। কেম্ব্রিজে পড়তে গিয়েছিল দুজনে ভারতবর্ষের দুই কোণ থেকে। গিয়ে ভাব হয়ে গেছে। যেমনি মনে হওয়া অমনি ঈস্টারের ছুটিতে পিঠে হ্যাভারস্যাক ফেলে, হাতে স্লিপিং ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল তারা দুজনে,—লক্ষ্য ম্যাটারহর্ন। সম্বল কষ্টেসৃষ্টে জমানো কয়েকটি পাউণ্ড, কিছু দেশের ডালমুট, কিছু ডিম, চীজ, রুটি, জেলি, এক শিশি ইনস্ট্যাণ্ট কফি। এছাড়া ম্যাপ, কমপাস, হুইসিল আর টর্চ তো আছেই। কিছু চুইংগামও।

ম্যাটারহর্নে চড়তে গেলে যেতে হয় ৎসেরমাট নামে একটা ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামে। ৎসেরমাট-এ যেতে গেলে প্রথমে যাওয়া দরকার জেনিভা শহরে, ট্রেন ধরতে। রেণুকা আর নবনীতা তো খুব কষ্টেসৃষ্টে একটা ট্রেনে করে প্রথমে গেল লণ্ডন, তারপর লণ্ডন থেকে আরেক ট্রেনে ডোভার, তারপর জাহাজে চড়ে ডোভার থেকে ক্যালে (সেটা ফ্রান্সে), ফের ট্রেনে চড়ে ক্যালে থেকে লিয়ঁ—আবার ট্রেন বদলে লিয়ঁ থেকে জেনিভা (সেটা সুইটজারল্যাণ্ডে)। রেলগাড়ি বদল করে জেনিভা থেকে ৎসেরমাট চলল। পথে অনেকবার চীজ কিনল, রুটি কিনল, কলা কিনল। রেণুকা আবার মাছ-মাংস খায় না। সে তামিলনাড়ুর মেয়ে। অন্যজন বাঙালী।

জেনিভার ট্রেনটা সোজা ৎসেরমাট পাহাড়ে ওঠে না কিন্তু। পথে আবার একটা ছোট স্টেশনে এসে ফুরনিক্যুলার ট্রেনে চাপতে হয়। সেই শুঁয়োপোকার মতো খুদে খুদে ট্রেনগুলো পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ। তার চাকার গায়ে দাঁত-দাঁত কাটা শেকল পরানো, আবার রেললাইনেও দাঁত-দাঁত খাঁজকাটা, ট্রেন শেকল আর দাঁত দিয়ে

সেই লাইন কামড়ে কামড়ে খাড়া হয়ে পাহাড়ে ওঠে, খসে-টসে পড়ে যায় না। পথে প্রথমে গ্রাম ছিল, ক্ষেতখামার—আপেলবাগান ছিল, গরু-ভেড়া চরছিল, গয়লানীরা বেড়াচ্ছিল—দৃশ্য-টৃশ্য স্বাভাবিক ছিল। তারপর ক্রমশ কমতে লাগল ঘরবাড়ি, মানুষবসতির চিহ্ন। কেবল বাড়তে লাগল ঝর্ণা, আর ঝাউবন। আর বরফ। ট্রেনের গতি কমে এল। মাঝে মাঝে টানেলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে—অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে, ছাদ থেকে জলের ফোঁটা পড়ছে,—মাঝে মাঝে গ্লেশিয়ার পার হচ্ছে। মস্ত মস্ত ঠাসা বরফের নদীর নাম গ্লেশিয়ার—বহু শত সহস্র বছর ধরে এইসব বরফ জমেছে—এরা নদী,কারণ খুব আস্তে হলেও, এদের গতি আছে। বছরে যদি দুই কি তিন ইঞ্চি এগোয়, সেটা তাদের পক্ষে উদ্দাম গতিবেগ! মাঝে মাঝেই গাঢ় শ্যাওলার চাদর ঢাকা, মাঝে মাঝে গভীর, চওড়া খাঁজ, খোঁদল, ফাটল। কোথাও বা গর্ত। বরফের নদীর রং ঠিক সাদা নয়, কেমন স্বপ্নের মতো সবজে, নীল-মতন। হঠাৎ হঠাৎ অনেক সময়ে এইসব গ্লেশিয়ারের অংশ ধসে পড়ে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেয়। 'তুষার ধস' এই ভয়ঙ্কর শব্দটি আল্পসের এইসব পার্বত্য গ্রামে প্রবল ভীতিকর, অলুক্ষনে। ৎসেরমাটে সবাই 'স্কী' করতে যায় বোঝা যাচ্ছে, নয়ত পাহাড়ে চড়তে। এছাড়া আর কেনই বা যাবে? এই ছোট্ট ট্রেনের ভেতরে দেয়ালে লম্বা লম্বা তাক তৈরি করা আছে। তাতে স্কী রাখা। আমরা দুজন স্কী করতে জানি না। পোশাক দেখলে অবশ্য বোঝবার উপায় নেই—এত যত্ন করে স্কী-পোশাক নকল করেছি। যত বরফ বাড়তে লাগল, তত আমার মনে হতে লাগল, ম্যাটারহর্নের দক্ষিণমুখ আমরা ম্যানেজ করতে পারব কি? "ভাই রেণুকা, ওটা এবার ছেড়েই দে বরং। যাই, গিয়ে দেখে-টেখে আসি। বড়ো বড়ো পর্বতারোহীরাই যা পারেন না, আমরা কি তা পারি? পাহাড়ে চড়ার আইনকানুনগুলোও তো ঠিক শেখা হয়নি আমাদের। তার চেয়ে বরং বাঁদিক থেকেই এবারের অভিযানটা চালানো যাক—যে-দিকটাতে স্বাভাবিক খাঁজ কেটে রেখেছেন ভগবান। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছে হতো দক্ষিণ দিক দিয়ে লোকেরা ওঠে তাহলে কি উনি এদিকেই খাঁজ কাটাতেন না? কী হবে ভাই শুধু শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করে?"—তোমরা মনে রেখো যে, তখনও ভারতবর্ষের মেয়েদের পর্বতারোহণের চল ছিল না। তাছাড়া আমরা দুজন পার্বতী নই কোনোরকমেই। দুজনেরই সমতলে জন্ম, সমতলেই মানুষ হয়েছি। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের আশা এবং উৎসাহ পর্বতপ্রমাণ আকাশচুম্বী।

ছোট্ট স্টেশন ৎসেরমাট-এ নামলুম মাত্র ক'জন যাত্রী। শুধু আমরাই ভারতীয়। নামতেই দেখি ক্রাচ-বগলে কয়েকজন লোক গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। হাড়কাঁপানো শীতে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে গান গাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্রাচ কেন? একসঙ্গে এতগুলো খোঁড়া লোক? স্টেশনের সামনেই দেখি এক রাজসূয় কাণ্ড—কী সুন্দর একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে, কী তার রং, কী তার ঢং। অপু-দুর্গার রেল দেখতে ছোটার মতন, অগ্র-পশ্চাৎ বিস্মৃত হয়ে ম্যাটারহর্ন অভিযাত্রী-যুগল

ঘোড়ার গাড়িটার পেছন পেছন ছুটলাম। যেন কোমরে ঘুনসি-বাঁধা আদুড়-গা অপোগণ্ড; কৌতূহলে এতই ডগমগ আমরা। না জানি কারা চড়েন এই গাড়িতে? এ দৃশ্য তো সুলভ নয় পশ্চিমী শহরে—একটা বরফমোড়া স্বপ্নরাজ্যে এটা বরং মানিয়ে গেছে। রথ থামল 'পোস্ট অফিস' লেখা একটা দরজার সামনে। ভেতর থেকে কোন রাজা-রাজকন্যে বেরুবেন, দেখব বলে আকুল নয়নে দাঁড়িয়ে আছি—প্রথমে নামল ক্রাচ। তারপর মানুষ। আরো ক্রাচ আরো মানুষ। নারী, পুরুষ, শিশু। সবার বগলেই ক্রাচ—ছোট্ট ক্রাচ, বড় ক্রাচ, বেঁটে ক্রাচ, লম্বা ক্রাচ। ইত্যাদি।

ব্যাপারটা কী? এত ক্রাচওলা লোক কেন— একি কেবল খোঁড়াদের দেশ? এই ম্যাটারহর্ন? রেণুকা কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস। খুব বুদ্ধি তার। সে বলল, "নিশ্চয় হটস্প্রিং-টিং আছে। রাজগীরের মতো।"—ও হরি, তাই বল! আমি এবার নিশ্চিন্ত হলাম। রাজগীরে যেমন লাঠি হাতে পঙ্গু লোকের ছড়াছড়ি, এও তেমনি। সুইটজারল্যাণ্ডের রাজগৃহ এটা। বরফ-নদীর নীচে হটস্প্রিং। ঈশ্বরের কী আশ্চর্য লীলা। প্রকৃতির কী অপ্রাকৃত ইন্দ্রজাল? আহা, এ গাড়িটা তাহলে খোঁড়াদের গাড়ি? কৌতূহল মিটল।—এবার গেলুম মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে।

ইয়ুথ হস্টেলে জায়গা নেই। একটাও হোটেল আমাদের বসবাসের যোগ্য নয়, কারণ সেখানে আধ-বেলা ঠাঁই নেবার মতনও রেস্ত আমাদের নেই। একটা পাঁসিয়নেটে গেলুম। এক গৃহস্থ মহিলা বাড়িতে ঘর ভাড়া দেন। এদেশে এটাই রীতি। তিনিও বললেন, জায়গা নেই। শুধু ছাদের ঘরটায় জায়গা আছে—কিন্তু খাট মাত্র একটা। আমরা যত বলি খাট-বিছানা চাই না, আমরা মেঝেতে দিব্যি স্লিপিং ব্যাগ পেতে শোব—মহিলা বলেন, "ওসব চলবে না, খাটে শোয়া চাই। একজন মাত্র থাকো, অন্যজন অন্যত্র পথ দ্যাখো।"—তাই কি হয়? আমরা শেষে বললুম, "দুজনেই ঐ ঘরে শোব।" উনি বললেন, "তাহলে আমাকে পুলিশে ধরবে।" আমরা বললাম, "একজনের ভাড়া নিন তাহলে। দুজনের নেবেন না। আপনি কাউকে ফ্রী থাকতে দিলে পুলিশের কী?"— আমাদের নাছোড়বান্দামি এবং আহ্লাদপনা দেখে শেষটা তিতিবিরক্ত হয়ে মহিলা বললেন, "যাও—যা খুশি করগে যাও, দুজনে মিলে এক বিছানায় ঠাসাঠাসি করে মর, আমি জানি না।"—আনন্দের চোটে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল—কিন্তু দুধ-ঘি-সব খেয়ে সুইস মহিলাদের বপু এমনই বিপুল হয়, যে সাহস হলো না। মহা আনন্দে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা ঘুপচি ঘরে উঠলাম। চিলেকোঠা—নানা দিক থেকে ছাদটা ঢালু হয়ে এসে দেয়ালে মিশেছে। ঘরে আলো জ্বলছিল না। প্রথমেই ঘুরে ঘুরে আবছা অন্ধকারে আলোর সুইচ খুঁজতে লাগলাম। এক একবার রেণুকার মাথায় ঠোক্কর লাগে, আর "আহা! আহা!" বলতে-বলতেই ঠাস করে আমারও মুণ্ডু ছাদে ঠুকে যায়—এমনিভাবে সুইচ খোঁজা চলল। দরজার বাঁয়ে, দরজার ডাইনে, খাটের এপাশে, খাটের ওপাশে, নাঃ নেই। সুইচ কোথাও নেই। তবু ভালো যে টর্চ আছে সঙ্গে। ক্লান্ত হয়ে খাটে বসলাম। সিংগল

খাট। নরম তুলতুলে তোশকের ওপর দুধের ফেনার মতো চাদর টানটান পাতা। একটাই মাত্র কম্বল, ভাঁজ করা আছে। বিছানায় বিলেতের ধরনে চাদর গোঁজা নয়। রেণুকা দেখল, দরজায় ছিটকিনি—অর্থাৎ তালা নেই। হোয়াট ? নো লক, নো লাইট ? রেণুকার মুখ শুকিয়ে গেল। "তুইও যেমন ! আমাদের আছেটা কী, যে চোরে নেবে ? লক দিয়ে কী হবে ?"— রেণুকা খুব চটে গেল।—"আছেটা কী ? কেন, তুমি রামায়ণ পড়োনি ? সীতাহরণের কথা জান না ? ছেলেধরার কাহিনী শোননি কখনও ?" বাঃ ! —যত বলি, "ওরে রেণুকা, তুইও সীতা নোস, আমিও সীতা নই, তাছাড়া সে - রামও নেই, সে-রাবণও নেই,"—কে শোনে কার কথা ! "দ্যাখ রেণুকা, এতেই ভয় ? ভুললে চলবে না, আমরা ম্যাটারহর্নের দক্ষিণাপথ অভিযাত্রী !" রেণুকা ধমক দিয়ে উঠল—"পাহাড়ের বিপদ আলাদা। তা বলে ঘরের বিপদে ভয় করবে না ?" রেণুকার মাউন্টেনিয়ারিং-এর মুডটা নষ্ট হয়নি দেখে সান্ত্বনা পেলুম।

এদিকে পেট চোঁচোঁ করছে। খিদেয় নাড়ীভুঁড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কিছু ডিমসেদ্ধ রুটি জ্যাম খেয়ে বেশ খানিকটা জল খেলুম। কলে গরমজল ছিল না, যে কফি গুলবো। থাক, জলটা হয়তো আদিতে হটস্প্রিংয়ের, কে জানে ? নিশ্চয় খেলে শরীর ভালো হবে।—কী ঠাণ্ডা জল রে বাবা ! ঘরটাও ঠাণ্ডা, হীটেড নয়। একটা হীটার আছে, পয়সা ফেললে জ্বলা উচিত, যেমন জ্বলে ইংলণ্ডের ভাড়াবাড়িতে। কিন্তু পয়সা ফেলব কোথায় ? এই চিলেকুঠরিতে সম্ভার সত্যিই তিন অবস্থা—হীটার আছে কিন্তু পয়সা ফেলার ব্যবস্থা নেই, অমনিও জ্বলছে না। এটা ওটা টিপেটুপে দেখলুম, নাঃ, হীটার নট জ্বলন নট কিচ্ছু। সুইচ নেই।—একেই পথশ্রমে শরীর অতিরিক্ত ক্লান্ত, তায় ঘর কনকনে ঠাণ্ডা, শুতে পারলে বাঁচি—কিন্তু রেণুকা অরক্ষিত কক্ষে কিছুতেই ঘুমোবে না। সে ঘরের একটিমাত্র চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল- —দরজা বন্ধ না হলে শোবে না। এ তো কলকাতা থেকে পুরী যাওয়া নয়, এ হচ্ছে ম্যাটারহর্ন অভিযান। সঙ্গে তো দেশের মতো বেডিং-ট্র্যাঙ্ক-বালতি-লণ্ঠন কিছুই নেই, যা দিয়ে দরজায় ঠেকা দেবে ! শেষে টেবিলটাই টেনে এনে দোরে ঠেস দিয়ে, তার ওপরে চেয়ারটাকে তোলা হলো। নিচু সিলিংয়ে প্রায় ঠেকে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় শুধু ছাদ থেকে দড়িটা বেঁধে ঝুলে পড়লেই হলো, যেন ফাঁসি-যাবার সব বন্দোবস্ত পাকা। রেণুকা এবার শুতে রাজি হলো। কিন্তু এখন সমস্যা কে খাটে, কে মাটিতে ? কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান ? এ বলে তুই খাটে শো। ও বলে তুই খাটে শো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো দুজনেই খাটে শোব। কম্বলখানি টেনে নিয়ে কোটটোট মোজাটোজা সুদ্ধু দুজনে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম—বুট দুটো খুলে রাখলুম দোরগোড়াতে। শুয়ে পায়ে স্লিপিং ব্যাগ দুখানি চাপা দিলুম—দিয়ে শুরু হলো ঠক-ঠকানি। রেণুকার সীতাহরণের ভয় কাটছে না, আমার নিমোনিয়ার ভয় ঢুকেছে। ঘুম হলো তা সত্ত্বেও। সকালবেলার আলোয় যেই জানলার চৌকো কাঁচগুলো জলরং হয়ে ফুটে উঠতে শুরু করল, আমি উঠে পড়লুম। উঠতে গিয়ে

মুখে কী একটা নোংরা সুতোর মতন ঠেকল। টেনে ছিঁড়ে ফেলতে গেছি যেই, অমনি টুক করে জোর আলো জ্বলে উঠল ঘরে।—ওটাই সুইচ। সিলিং থেকে ঝুলছে।

রেণুকাও উঠে বসল। দেখা গেল দরজায় টেবিল, টেবিলের ওপরে চেয়ার, তার ওপরে দুটো হ্যাভারস্যাক, তার নীচে দু-জোড়া বুটজুতো। আমাদের গায়ের ওপরে দুটো কোট, দুখানা স্লিপিং ব্যাগ। ঘরের দৃশ্য মোটামুটি এই। আর হীটারের পাশেও সিলিং থেকে ঝুলন্ত একটা ময়লা সুতো। সেটা টানবামাত্র হীটার গরম হতে শুরু করল। ঘরেই বেসিন। মুখ ধুয়ে বাসিরুটি চীজ কলা ডিমসেদ্ধ নিয়ে বসা হলো। ফরাসী রুটি বাসী হলেই ভয়ানক শক্ত হয়ে যায়। ভাঙা যায় না পর্যন্ত। ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে নরম করে তাই খানিকটা খেলুম দুজনে... উপায় কী। পয়সা কম, খিদে বেশি। খেয়ে-দেয়ে ছেঁড়া কাগজ, রুটির গুঁড়ো, ডিমের খোলা, কলার খোসা, সবই সযত্নে পকেটে পুরে ফেলা হলো। কারণ খেতে-খেতেই নজরে পড়েছে দরজার গায়ে একটা নোটিশ টাঙানো:...ঘরের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। এখন কোণের টুকরিতে আবর্জনা ফেললেই ঝি এসে খপ করে ধরে ফেলবে। ধরলে নিশ্চয় জরিমানা হবে। জরিমানা হলে ম্যাটারহর্নে ওঠা হবে না। তাই প্রমাণ লোপের প্রচেষ্টায় লেগে গেলাম দু'জনে। ভয়ে ভয়ে নীচে গেছি...কী জানি দেখে যদি বুঝতে পারে যে আমরা ঘরে খেয়েছি? মাত্র একটা পাতলা কম্বল দিয়েছে, আর ছিটকিনি দেয়নি কেন...এসব অভিযোগ করার মতন মনের জোর আর বাকী ছিল না,...নিজেরাই যেহেতু নিয়ম ভেঙেছি। আইন অমান্য করে নিজেরাই চোর হয়ে গেছি। রেণুকার মুখটা যদিও বেশ অপরাধী-অপরাধী দেখাচ্ছিল, তবুও দরজায় ছিটকিনি নেই কেন —এই মর্মে সে মৃদু অনুযোগ তুলতে গেল। অমনি মহিলা সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। আর যায় কোথায়? তক্ষুনি আমাদের রাগ হয়ে গেল। পকেটের কলার খোসা-টোসার কথা ভুলে গিয়ে আমরা রেগে বললুম, চাই না থাকতে, একখানা মোটে পাতলা কম্বল, দোরে তালা নেই, তার আবার মেজাজ কত! শুনে মহিলা রাগ করলেন না, অবাক হয়ে গেলেন। "কম্বলটা তো অতিরিক্ত, ওটা একটা তো কী, অত মোটা লেপটা রয়েছে না?"

"লেপ? কোথায় লেপ?"

"কেন? বিছানায়?"

"কৈ কৈ, ছিল না তো? লেপ-টেপ কিছু ছিল না।"

"কিচ্ছু ছিল না? দেখাচ্ছি ছিল কিনা!" বলেই মহিলা থপ থপ করে বাড়ি কাঁপিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। পিছন পিছন আমরাও। এসে দেখি উনি বড়ো বালিশটা তুলে তার তলা থেকে যেন ম্যাজিকে, দু' ভাঁজ করা লম্বা চওড়া, বিশেষরূপে স্থূলবপু একটা পালখের লেপ টেনে বের করলেন। সেটা বিছানা জুড়েই পাতা ছিল। ধবধবে ওয়াড় পরানো সেই নরম লেপের ওপরেই আমরা সারা রাত্রি চেপে শুয়ে থেকে শীতে কেঁপেছি। ইংলণ্ডে বিছানা করার ঢংটা অন্যরকম

বলে ব্যাপারটা মোটে ধরতেই পারিনি অন্ধকারের মধ্যে! লেপকে লেপ বলে চিনিনি...তোশক ভেবেছি। মহিলা জীবনে এমনধারা উজবুক গাঁইয়া দেখেননি আমাদের মতো।...তিনি হেসে আর বাঁচেন না!

এবার রওনা, ম্যাটারহর্নের উদ্দেশ্যে। ম্যাটারহর্নে চড়ব বলে আমরা দুজনে প্রথমে গেলাম মুদির দোকানে। তাজা নরম রুটি কিনব, কলা কিনব...কিছু কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য চাই। গায়ে বল না সংগ্রহ করে উঠব কী করে ম্যাটারহর্নের দক্ষিণাপথ বেয়ে? দু'খানা চকলেটও নিতে হবে। পর্বতারোহণে সব সময় চকলেট খেতে হয়, বইয়ে পড়েছি। চকলেট এনার্জি দেয়। চারিদিকে তুষার-রাজ্য, মাঝে মধ্যে দু' একজন ক্রাচবিহীন মানুষজন দেখলেই আমরা উৎসাহিত হচ্ছি..."দ্যাখ দ্যাখ, এর কিন্তু ক্রাচ নেই। আমাদের মতোই!" শীত প্রচণ্ড কিন্তু আমাদের কষ্ট হচ্ছে না। আপাদমস্তক পশমে ঢাকা...পায়ে পেল্লায় স্নো-বুট, হাতে ইয়া ইয়া চামড়ার দস্তানা, গায়ে স্কী-জ্যাকেট, পরনে স্কী-প্যান্টস, মাথায় গরম ফেট্টি বাঁধা, গলায় কাশ্মীরী স্কার্ফ। ধড়াচুড়োর কোনো অভাব নেই। আমি কেবলই খুব মনোযোগ দিয়ে রেণুকাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছি...আর ভাবছি, আমাকেও অমন স্কী-বিবিটি দেখাচ্ছে নিশ্চয়। একই তো পোশাক দুজনের। সাদা তুষারে রোদ পড়লে চোখ ঝলসে যায়, তাই সানগ্লাস পরা নিয়ম। রেণুকার চোখে বিলিতি কালো চশমা...আমার যেহেতু একটা চশমা আছে, তার ওপরে দু গুণ এঁটেছি ধর্মতলার সানগ্লাস। তাতে স্মার্টনেসও দু গুণ হয়। আত্মবিশ্বাসে টৈ-টুম্বুর আমরা আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ম্যাটারহর্নের দিকে এগোচ্ছি। পা টিপে, কারণ বরফ খুবলে পথ যদিও কেটেছে, সে-পথ খুবই পিছল। দুজনকেই দিব্যি খোকা-মেম খোকা-মেম লাগছে, একমাত্র রসভঙ্গ করছে মাথার ফেট্টির নীচে থেকে ঝুলন্ত দুটো কালো বিনুনি। লেজের মতো দোদুল্যমান সেই বেণীর ডগায় দুলছে আমাদের এতোল-বেতোল দু'টি পাতি-খুকুর প্রাণ! সোঁদা গন্ধওলা দিশি-দেহাতী মন! আঃ, বেণীদুটো যদি না থাকত, কিংবা বগলে যদি ক্রাচ থাকত তাহলেই কেউ বলতে পারত না আমরা বিদেশী। বরফ ভেঙে হাঁটা বড়োই কষ্টকর কর্ম। ফুটপাথের দু পাশে কোমর অবধি উঁচু বরফের পাঁচিল, মাঝখানটা কুপিয়ে পরিষ্কার করা। কিন্তু অত্যন্ত পিচ্ছিল। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই, ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে, রোদ নেই। মন-খারাপ-করা মন-খারাপ-করা একটা আলো। তা হোকগে। আমরা বেরিয়েছি যে উদ্দেশ্যে তা থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। ম্যাটারহর্ন আমাদের ডাকছে। আসার আগে কেম্ব্রিজে যা কিছু ছবির বই, ট্যুরিস্ট অফিসে প্রাপ্তব্য সবকিছু কাগজপত্তর ভালো করে পড়ে ফেলেছি। ম্যাটারহর্ন অভিযানের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এবার ভালো সঙ্গী জুটলেই হলো। ঠিক উঠে পড়ব।

...কিন্তু ভাই রেণুকা, এই রাস্তাই যদি এত কঠিন, এত পিছল হয়, তাহলে ম্যাটারহর্নের গা বেয়ে কি আমরা উঠতে পারব? আমরা তো কিং-কং নই। টারজানও

নই। পর্বতারোহণের বুটজুতোই আলাদা, তার নীচে কাঁটা মারা থাকে। আমাদের সে-সব নেই। পড়ে যাব যে ভাই। হ্যাঁ ভাই রেণুকা, এবারে ম্যাটারহর্নটা বাদ দিলে কেমন হয়? ডান-বাঁ দু দিকটাই তো বরফ দিয়ে ঢাকা। এ-জুতোয় কি হবে? ধুৎ তেরি! ভীরু বাঙালি কোথাকার। শুরুতেই কু গাওয়া?...রেণুকা ধমক দিতেই রাগ হয়ে গেল। ভীতু বলা? বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি! মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি! সেই আমাদের ভীতু বলা?...ঠিক হ্যায়। চালাও পানসি...ম্যাটারহর্ন! মনে মনে রাগলেও মুখে কিছু বলতে পারলুম না, কারণ আগেই চোখে জল এসে গেছে। রাগলে এই দুর্দশা হয় আমার। সুবিধা এই যে, রেণুকারও তাই হয়। মনে মনে আবৃত্তি করে নিলুম...দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে...লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। পা যেন কিছুতেই পিছলে না যায়।...অবশেষে পৌঁছে গেলুম সেই জায়গায়,...যেখানে সকলেই বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ কিনা ম্যাটারহর্নের পাদদেশে। অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা! ঠিক যেমনটি দেখেছি ছবিতে...তেমনি সিধে, খাড়া উদ্ধত, স্পর্ধিত গিরি-শৃঙ্গ ম্যাটারহর্ন একটু ত্যাড়াব্যাঁকা এক বিপুল শিবলিঙ্গের মতন সাদা বরফে প্রোথিত হয়ে আছে...ধূসর আকাশ ফুঁড়ে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলুম। তারপর খোঁজ নিয়ে জানলুম, আজ অভিযাত্রী দল যাবে না। আজ নাকি ব্যাড ওয়েদার, তাই শখের অভিযাত্রীদের আজ যাত্রা নাস্তি।

আহ! শুনে যেন বুক থেকে একটা ম্যাটারহর্ন পাহাড় নেমে গেল। ভাই রেণুকা, আজ তাহলে একটু দেখি-টেখি, বেড়াই-টেড়াই? কাল চড়ব, কেমন? কাল যখন রোদ্দুর উঠবে, হয়ত একটু বরফও গলবে, তখন উঠব, সেই বেশ হবে।...এত দূর পথশ্রমের ক্লান্তি আজও কাটেনি। এই ভালো হলো। আমরা কখন যে পথ ছেড়ে প্রশস্ত বরফের মাঠে নেমে পড়েছি তা টেরও পাইনি। এই মাঠে শিক্ষানবিশি চলছে —স্কী-ইং এবং স্কেটিং ছাত্রদের। বরফের মধ্যে কয়েকটি তাঁবুও খাটানো রয়েছে। এদের কী সহ্যশক্তি রে বাবা।

রং-বেরঙের পোশাকে স্কার্ফ উড়িয়ে চঞ্চল চপল গতিতে নেচে বেড়াচ্ছে অজস্র মানুষ—নারী, পুরুষ, শিশু। কেউ স্কীতে, কেউ স্কেটে। স্কেটিং-এর জন্য একটু শক্ত বরফ চাই, স্কীর জন্য চাই অনেকটা জায়গা, গ্লেশিয়ারই ভালো। মোহিত হয়ে আমরা এগোচ্ছি, এখানে ক্রাচ-ওলা কেউ নেই—আমাদের পা হাঁটু অবধি তুষারে ডুবে যাচ্ছে, একটা একটা করে টেনে বের করছি, ফের পদপাত করছি, ফের পদোদ্ধার করছি —বেশ অভ্যাস হয়ে এসেছে—যেন আজন্ম এভাবেই চলা-ফেরা করেছি গড়িয়াহাটে, কলেজ স্ট্রীটে। রেণুকার মোহিত দৃষ্টি কালো চশমা ভেদ করেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুজনেরই নাক বেয়ে, চশমা বেয়ে, চিবুক বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টির জল গড়াচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম রেণুকাটা সত্যি বড্ড কালো। এই সাদা তুষারের রাজ্যে সাদা চামড়ার লোকগুলির মধ্যে রেণুকাকে যেন তাল-ভঙ্গকারী লাগছে। এক সেকেণ্ড মাত্র। তার পরেই মনে পড়ল রেণুকাও নিশ্চয় আমাকে দেখে ঠিক ভাবছে, এঃ, নবনীতাটা

বড্ডই কালো দেখছি!—তার মানে যতই স্কী-বিবিটি সাজি না কেন আমরা, রেণুকার মধ্যে ঢেউ তুলছে যে অগাধ রসম-সম্বর, আর আমার ভেতরে যে গজগজ করছে ঠনঠনের ঝোল-ভাত, সেটা বাইরে থেকেও বেশ দেখা যাচ্ছে। আমরা যে আলাদা, আমরা যে ভিন-দেশী সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না, সেটা আমাদের গায়েই লেখা আছে। ভেবে একটু মুখ গোমড়া হলো—ভাবলুম: কালো জগৎ আলো। কেষ্ট কালো, কালী কালো, আমি-রেণুকাই বা কালো হব না কেন? শক-হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন—সে দেহে একটু ঘনত্ব থাকবে না? এই তো ভালো—এমনি ট্যান চামড়া পাবার জন্যেই তো এই সাদা চামড়ারা মরে যাচ্ছে—আর এছাড়া রেণুকার মুখখানি খুবই মিষ্টি। বলা অবশ্য উচিত নয়, আমি ভাবলুম, কিন্তু আমার মুখটাও তো খুব একটা তেমন কিছু বিচ্ছিরি নয়—এইসব ভাবতে ভাবতে মনটা যেই প্রফুল্ল হয়ে উঠছে...অমনি কানে এল মার্কিন আওয়াজ—"হাই। তোমরা বুঝি পাকিস্তানী?"

"পাকিস্তানী হতে যাব কেন?" রেণুকা এক ধমক দেয়।

"সরি।" সড়াৎ করে স্কী চালিয়ে আধ মাইলটাক নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল ছেলেটি। আমি বললুম,

"অমন করে না বললেই হতো। ওরা কিছু জানে না।"

"পাকিস্তান কি আগে হয়েছিল, না ভারতবর্ষটা আগে?—আগেই বলবে, পাকিস্তানী? কেন, আগে ভারতীয়টা মনে আসে না?"

"তবে কি তোমরা ভারতীয়?" চমকে উঠে দেখি স্কী চালিয়ে সে আবার ফিরে এসেছে।

"হ্যাঁ। তুমি বুঝি মার্কিনি?"

"হ্যাঁ। পশ্চিম জার্মানি থেকে বেড়াতে এসেছি। ছুটিতে।"

"তুমি কি হটস্প্রিং-এর জন্য এসেছ?" রেণুকা প্রশ্ন করে।

"হটস্প্রিং? এখানে হটস্প্রিং আছে নাকি, এই বরফের মধ্যে?"

"কী জানি? সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।"

"আমি তো কখনো শুনিনি?" মার্কিন ছেলেটি বলে।

আমি তাড়াতাড়ি অন্য কথাটাও জিজ্ঞেস করি।

"তবে কি কোনো আশ্রম-টাশ্রম আছে? সাধু-সন্তের মন্দির? ভেল্কি-মিরাকল জাতীয় কিছু? আছে নাকি?"

আরো আশ্চর্য হয়ে গেল মার্কিন ছেলেটি।

"ভেলকি? সাধু-সন্তের মন্দির? তোমরা কি তীর্থযাত্রী?"

"আমরা বলে তীর্থের দেশ ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, আমাদের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, বিলেতে আসব তীর্থ করতে।" গঞ্জনা দিয়ে ওঠে রেণুকা।

"সরি, আমরা জানি, সব ভারতীয়ই হিন্দু কিন্তু—"

মার্কিন ছেলেকে এক থাবায় থামিয়ে দিয়ে আমি বলি— "কে বলেছে সব ভারতীয়ই হিন্দু? জানো সেটা সেকুলার স্টেট? সেখানে সর্বধর্ম সমন্বয় ঘটেছে —হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-ক্রীশ্চান-পার্সি-জুইশ সব আছে।"

"জুইশও?" অবাক হয়ে বলে ছেলেটি, "আমিও জুইশ।"

"কিন্তু এখানে তীর্থস্থান আছে কিনা বললে না তো?" রেণুকা ভবী ভোলেনি, "কিংবা হট স্প্রিং?"

"আমি তো কই কখনো শুনিনি তীর্থ আছে বলে। কিন্তু কেন? তোমরা কি ভূতত্ত্বের ছাত্র—নাকি সমাজতত্ত্বের? একবার বলছ হট স্প্রিং চাই, একবার বলছ তীর্থস্থান চাই। লোকে তো এখানে ধর্মকর্ম করতে আসে না, আসে খেলাধুলো করতে। স্কী করতেই আসে। তোমরা কেন এসেছ?"

"আমরা এসেছি ম্যাটারহর্নে চড়ব বলে। কিন্তু এখানে এত বাতের রুগী কেন? এত পঙ্গু, বেতো রুগীর ভিড় দেখেই ভাবলুম হট স্প্রিং আছে, নয়তো কোনো মিরাকল।"

"বেতো রুগী কোথায় পেলে এতো?"

"কেন, পথে-ঘাটে, সর্বত্রই তো। সবার বগলেই তো দেখি ক্রাচ!" এবারে হাসির তোড়ে বরফ ফাটিয়ে দিলে মার্কিন ছেলেটি! "বাত— বেতো? পঙ্গু?" তার হাসি থামে না, এরা তো সবাই স্পোর্টসম্যান—কেউ স্কী করতে গিয়ে পা ভেঙেছে, কেউবা পিছলে পড়ে। আছাড় না-খেয়ে কেউ স্কী করতে শেখে কখনো? বেতো হবে কেন, এরা খেলোয়াড়! এরা মাউন্টেনিয়ার! বেতো! হা হা হা! ওঃ —তাই বলছো হট-স্প্রিং? হাউ অ্যাবসার্ড! মিরাকল! হাউ ক্রেজী!" হোহো হাসিতে আমাদের কলিজা ফাটিয়ে দিয়ে তিনি সড়াৎ করে স্কী চালিয়ে অন্তর্হিত হলেন। দূরে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল তাঁর নীল জ্যাকেট। হাসিটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো আমাদের কানে—এবং প্রাণে। এই বরফেও বুঝতে পারছিলুম আমাদের কান-ফান গরম হয়ে উঠেছে—রাগ, লজ্জা দুয়ে মিলে একটা বিশ্রী অনুভূতি। তায় পাগুলো সব দেবে দেবে যাচ্ছে নরম বরফে, টেনে হিঁচড়ে তুলে তুলে আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সদর রাস্তার দিকে ফিরতে লাগলুম। কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছি না।

রাস্তার ওপর পৌঁছে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আরামসে স্বাভাবিক নিয়মে যেই দুপা হেঁটেছি, "যাক বাবা বাঁচা গেল" ভেবেছি, অমনি ঘটল সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা। সড়সড় সড়াৎ। বিনা-স্কীতে, বিনা-স্কেটে, আমি দিব্যি স্পীডের মাথায় আচমকা পাহাড়ী পথের ঢালু রাস্তায় অপসৃত হলুম। যেন স্পেস ক্যাপসুলের মধ্যে ঈজি-চেয়ারে বসে আছি—এমনি গা-এলানো ভঙ্গিতে, উপবিষ্ট শরীরে অনায়াসে পা দিয়ে শুকনো ডালপালার বেড়া ভেঙে একজনদের বাড়ির পিছনের উঠোনে ঢুকে যাচ্ছি দুর্নিবার গতিতে। দ্যাখ-না-দ্যাখ তাদের মুরগীর খাঁচার অভ্যন্তরে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছি। বিদ্যুৎ-চমকের মতো প্রথমেই মনে হলো—রেণুকাকে সাবধান করা দরকার।

—হুইসিল? ভাবামাত্র পিঠের ওপর আচম্বিতে জোড়া বুটের জোর ধাক্কা!—"বাবা গো! গেলাম!" সমস্বরে বললুম রেণুকা এবং আমি। "সো সরি!" আবার ডুয়েটে বলা। ইতিমধ্যে অভিমন্যুর মতো অবস্থা হয়েছে আমাদের। স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল, পরাক্রান্ত এবং যুদ্ধবাজ মোরগকুল তথা রণচণ্ডী মুরগীসকল আমাদের সসৈন্যে আক্রমণ করেছে। তারা তেড়ে এসে 'ট্রেসপাসারদিগকে' যত্রতত্র প্রবল শক্তি সহকারে ঠুকরে দিচ্ছে—এবং ভীম বিক্রমে কক-কক-কক-কক আওয়াজে ভয়াল রণহুঙ্কার দিচ্ছে। মুরগীকে রাম-পাখি কেন বলা হয় সেদিন বুঝেছিলুম। যে-কোনো রাক্ষসসেনাকে তারা অবলীলায় হারিয়ে দিতে পারবে! দূর থেকে দেবতারা যেমন রামকে উৎসাহ দিতেন—এখানেও তেমনি খাঁচার বাইরে থেকে মুরগীদের শৌর্য, বীর্য, একাগ্রতা এবং ঐক্যবদ্ধতাকে উৎসাহিত করছিল একটি উতলা ব্যাঘ্রের মতো কুকুর। এই সমবেত তাণ্ডবের মধ্যে সতত ঠোক্করমান মুরগী ও মোরগ-সংযোগে আমরা দুজন দুঃসাহসিক পর্বত অভিযাত্রী—খাঁচার মধ্যে পা ছড়িয়ে হতভম্ব বসে আছি। চশমা ছিটকে পড়েছে বটে, কিন্তু ধর্মতলার সানগ্লাস ভাঙেনি। স্তম্ভিত রেণুকার মাথায় কিছু তুষার, কিছু উড়ো পালক। দেখে বুঝলুম আমারও দৃশ্য নিশ্চয়ই তথৈবচ! চারপাশের দিকে চেয়ে ব্যথা বিস্ময় ভুলে আমরা হড়বড়িয়ে হেসে ফেললুম।

হাসব না? এরকম দৃশ্য তো খুব চেনা আমাদের। ঠিক এইটে না হোক, এমন ধরনের কাণ্ডকারখানা তো লরেল-হার্ডিতে কতই দেখেছি! তফাত এই যে, ঘটনাটা সত্যি আর পাত্রপাত্রী আমরা নিজেরা! ব্যাকগ্রাউণ্ডে অচঞ্চল মহিমায় ম্যাটারহর্ন—আর ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে গৃহপালিত পশুপক্ষীর মিলিত কূজন-গর্জন। কোনোরকমে সেই প্রবল পরাক্রম পক্ষীসেনার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলুম সেদিন। ভেঙে-যাওয়া বেড়াটি গলেই পালিয়ে এলুম গৃহস্থের আঙিনা থেকে, রণমূর্তি মুরগীদের দিকে বিষদৃষ্টি হানতে হানতে। কেবলই চোরাচাউনিতে দেখছিলুম এদের চিল্লা-চিল্লিতে গৃহকর্তা আবির্ভূত হলেন কিনা—নাঃ, কেউ দেখেনি। সরু পিচ্ছিল পাহাড়ী পথের ঢালু বেয়ে দেখা গেল অনেকটা যেন স্কী-চিহ্নের মতোই আমার ও রেণুকার সুদীর্ঘ পতন-চিহ্ন সদ্যটানা গতিময় রেখা হয়ে ফুটে আছে। দাগখানা দেখেই যেন কোমরটা ফের কনকন করতে লাগলো।

আমরা দুই বন্ধু এবার পরস্পরকে ক্রাচ করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছল বরফে পা গেঁথে পা গেঁথে অগ্রসর হলুম।

"কালই আমরা জেনিভায় ফিরে যাব, কী বলিস? এ জায়গাটা তো দেখা হলো।"

রেণুকা চুপ। "লেগেছে বেশি? মা থাকলে দু'ফোঁটা আর্নিকা খাইয়ে দিতেন। চল, দুকাপ হট চকলেট খেয়ে নিই।"

রেণুকা চুপ। চোখে জল।

"তখনি বলেছিলুম, প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করা উচিত নয়। করার ইচ্ছেটাও করা

উচিত নয়। দেখলি তো?"

"আমাদের ম্যাটারহর্ন চড়া হলো না।"

খোঁড়াতে-খোঁড়াতেই ফুঁপিয়ে উঠল রেণুকা—"এত কষ্ট করে এসে, কেবল মুরগীর খাঁচাতে ঢোকা হলো!"

"দুঃখ করিস না রেণুকা—ম্যাটারহর্ন কি যার-তার কপালে থাকে?"

একটা কাফে-তে ঢুকে হট চকলেট খেতে খেতে আমরা ভাবলুম, আজ রাত্রেই জেনিভায় রওনা হব। বিদায় ম্যাটারহর্ন, বিদায় মুরগী-সকল!

হট চকলেট খেয়ে উঠে রাস্তায় বেরিয়েই মনে হলো, আকাশে বাতাসে যেন একটা আশ্চর্য তফাত। রোদ কি উঠেছে? না তো? বৃষ্টিটা কি ধরলো? তাও না। তবে? বেশ ব্যথা করছে কোমরটা—দুজনেই ক্রাচ ধরে আস্তে খুঁড়িয়ে হাঁটছি আর ভাবছি ব্যাপার কী? একটা নতুন আভা যেন ফুটে উঠেছে পথে-ঘাটে লোকজনের চোখে-মুখে। এই আভাটা আগে তো ছিল না? কী হয়েছে বল তো? রেণুকা, দেখেছিস, লোকেরা আমাদের দিকে একটা কেমন-চোখে তাকাচ্ছে?

রেণুকা এতক্ষণে পুরোনো আলো-আলো-গলায় কথা বলল। রেণুকা বলল, "ওরা কিনা বুঝেছে আমরাও ওদের মতোই স্পোর্টসম্যান— ম্যাটারহর্নে চড়তে গিয়ে আহত হয়েছি! তাই সম্ভ্রম করছে। এতক্ষণ বোধহয় ভেবেছিল কোনো উজবুক ট্যুরিস্ট-ফুরিস্ট হবে!"*
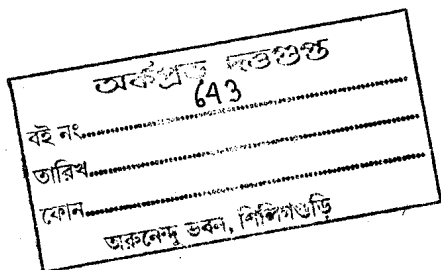
[*সর্বৈব সত্য ঘটনা। স্থান, কাল, পাত্র কোনোটিই কাল্পনিক নয়]।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী
রঞ্জন মিত্র
অনুজপ্রতিমেষু

গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ

'সন্ধেবেলায় কে ডেকে নেয় তারে!'

আচ্ছা, তোর মনে আছে গীতু, সেই পাঠচক্রের সেশনটা? অশোকতরুর সেই মুখ নামিয়ে গান: "ও আমার গোলাপবালা।" এখন তো অশোকতরু অন্য ঢঙে গান করেন। আর তোর মামাবাবুর বক্তৃতা হলো সে-সেশনে, স্বপ্ন বিষয়ে সেই যেরে, যেখানে আমি আমার জলের স্বপ্নটার মানে জিগেশ করেছিলুম? উনিও খুলে বলবেন না, আমিও না জেনে ছাড়ব না। এখন তো মানেটা জানি, উঃ এত হাসি পায় সেদিনকার কথা ভাবলে! মামাবাবুকে কী মুশকিলেই ফেলেছিলাম! সত্যি, গীতু তোরা যে কী করে থাকিস গদাধরপুরে! ওখানে তো আর এরকম পাঠচক্র-টক্র হয় না। বক্তা পাবি কোথা, গাইয়েই বা কই? সভ্য-সমাজের বাইরে একটা কলেজ বসিয়েছে কী করতে কে জানে। ওখানে লাইফ বলতে তো কিছুই নেই। থিয়েটার তো নেইই, ভালো সিনেমাও নিশ্চয় যায় না, একজিবিশন কি কনসার্টের তো প্রশ্নই ওঠে না, তেমন একটা রেস্তরাঁ কিংবা দোকানপাট পর্যন্ত নেই। কী করে আছিস বলতো? কী নিয়ে থাকিস? প্রেম-ট্রেমও তো হয় না অমন মফঃস্বলের মধ্যে। সবাই নিশ্চয় চোখ পাকিয়ে আছে। একগাদা মেয়ে-মাস্টার মিলে হস্টেলে থাকা, দেখিস বাবু, সাবধান, শেষটা লেসবস বানিয়ে ফেলিস না গদাধরপুরটাকে। এতো প্রায় জেলে থাকার মতনই কিনা। ফ্রীডম নেই কিছু। আচ্ছা, কী করিস রে তোরা ছুটির দিনে? কিংবা সন্ধেবেলায়? নদীর ধারটা পুরোনো হয় না? কাছাকাছি কোনো প্রপার শহর আছে? গাড়ি করে ঘুরে আসা যায়? গাড়িও নেই? কেন, কলেজের স্টাফ-কারে যাবি। তাও নেই? আশ্চর্য! যেমন জায়গা, তেমনি কলেজ! কী করতে যে আছিস ওই অজ পাড়াগাঁয়। কী করেই বা আছিস ওই অজ গাঁয়ে, চিরকাল শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় বাস করে? বোরিং লাগে না? বিয়েটিয়ের তো নামও করিস না। লাগিয়ে দিই একটা সম্বন্ধ? আমার এক ভাশুর ফিরেছেন বিদেশ থেকে, একটু বয়স্থা এডুকেটেড মেয়ে চান, নিজেও বহুকাল অ্যাকাডেমিক লাইনেই ছিলেন। তোর সঙ্গে বেশ মানাবে। না মশাই, অত মুচকি হাসির কিছুই নেই। বত্রিশ তো পার হলে, এরপর আর কবে বিয়েটা করবে শুনি? চিরটাকাল কেবল গেঁয়ো গাধাগুলোকে পিটিয়ে গোরু বানালেই চলবে? গদাধরপুরে মানুষ থাকে! ওটা কি একটা লাইফ হলো গীতু?

লাইফটা কী রকম বদলে গেল দ্যাখ! একসঙ্গে পড়তে পড়তে কত স্বপ্ন, কত প্ল্যান—তারপরে আমি শ্বশুরবাড়ি, আর তুই গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ। কোথায় গেল লেখক হওয়া. কোথায় গেল নাটক করার স্বপ্ন। একদিক থেকে দেখলে অবশ্য তুই মন্দ নেই। বেশ ঝাড়া হাত পা। আমি? এটা ভালো থাকা হলো? ঘরসংসার ছেলেপুলে নিয়ে ন্যাতা-জোবড়া হয়েই কাটল দশটা বছর। একদম গবেট হয়ে গেছি। কে বলবে একদিন ডিবেটিং চ্যাম্পিয়ান ছিলুম। এখন যা কিছু ডিবেট সব আয়া বাবুর্চির সঙ্গে। কর্তা? হুঁ, তা হ'লেই হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার দেখাটা হচ্ছে কোথায়, যে ডিবেট করব? তিনি তো এই অফিস, এই ফ্যাক্টরি, এই ট্যুরে যাওয়া, অমুক পার্টিকে মীট করতে গ্র্যাণ্ড হোটেলে লাঞ্চ, তমুক পার্টিকে মীট করতে স্যাটারডে ক্লাবে ডিনার—এই কম্মই করে বেড়াচ্ছেন দশ বছর ননস্টপ। বউয়ের সঙ্গে বসে বসে ডিবেট করবার মতন তাঁর অত সময় নেই ভাই। দিনরাত ছুটোছুটি। একটু যদি বিশ্রাম পান,—তো সে ক্লাবে। বউয়ের আঁচল ধরা হলে কেউ জীবনে উন্নতি করে না, বুঝলে? কেন আমার জন্যে তো আয়া আছে ড্রাইভার আছে খানসামা আছে মালী বাবুর্চি ঠাকুরচাকরের ঘোর বৃন্দাবন একেবারে! আবার একটি কর্তাও চাই? সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? একেই তো আমার বলে কত ফ্রীডম! যখন খুশি বেরোও, যেখানে খুশি যাও, যা খুশি কেনাকাটা করো, শ্বশুর শাশুড়ি-দেওর-ননদ কেউ ঘাড়ে নেই, যে-যার সে-তার। সবরকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে, হাই সোসাইটির কনেকশনস রয়েছে, কত নেমন্তন্ন, কত পার্টি। আমার মুখে নালিশ শোভা পায় না ভাই। পায়? তুইই বল! ব্যাপারটা কি জানিস, ছোটবেলায় পড়েছিলি না, দোয়াত আছে, কালি নেই? আমার সংসারটা হচ্ছে ঠিক তাই। হাসছিস? ছাই বর্তে যেতে, তুমি আমার জীবন পেলে। জানিস না তাই বলচিস। সেই চিরাচরিত গল্প আর কি—এ সকল ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বউদের হয় কোনো প্রেমিক যোগাড় করে পালিয়ে যাওয়া, নয়তো ভাগ্নে-টাগ্নে কিংবা ড্রাইভার-টাইভারের সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করা। গল্পের বইতে তাই করে। যারা এসব কম্ম পারে না, তারা চার ইঞ্চি ঝুলের জামা পরে ফ্রেঞ্চ শিফন শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত তুলে লেসের রুমালে নাক চেপে হপ্তায় একদিন বন্যাত্রাণে কিংবা কুষ্ঠাশ্রমে বেড়াতে যায়, আর বাকী ছ'দিন ধরে তারই জন্যে দু'বেলা মিটিংবাজী করে পার্ক হোটেলে। আর বাকীরা হয় দুপুরবেলা ক্লাবে গিয়ে অন্য গিন্নিদের সঙ্গে তাস খেলে আর জিন খায়, নয়ত আমার মতন খুঁজে খুঁজে পুরোনো বন্ধুদের বের করে, তুতিয়ে পাতিয়ে আড্ডা দিয়ে সময় ভরাতে চায়। আজকাল অবশ্য 'বুটীক' খোলার একটা রেওয়াজ হয়েছে, উপরি রোজগারও, সময়টাও কাটে।

—সময় যে আর ফুরোতে চায় না। বাচ্চারা তিনজনেই দার্জিলিঙের ইশকুলে আছে। এখানে কি রেগুলার পড়াশুনো হয়? আজ বনধ, কাল স্ট্রাইক।! ওইখানে থাকলে ডিস্টার্বেন্স হবে না। তাছাড়া উনি বলেন হস্টেলে থাকলে নিজেরটা নিজে

করতে শিখবে! আমি যে এদিকে কী করি, গান? হ্যাঁ, আবার একটু আধটু ধরেছি ওটা — একটা স্পেশাল ক্লাসে জয়েন করেছি। নারে, পিয়ানোটা ছেড়েই দিয়েছি। ওটা তো কোনোদিনই তেমন ভালো লাগতো না। কেবল চালিয়াতির জন্যে শেখা ভালোবেসে আর স্কুলে পিয়ানো নেয় ক'জন? তোর সেতারের কথাটা একদম আলাদা। সেতার হলো তোর প্রাণ। তাও কি আর এতদিন থাকতো, যদি বিয়ে-থা করে সংসার পেতে বসতিস? নেহাত বনে-বাদাড়ে পড়ে আছিস, আর একা-একাটি আছিস, তাই এখনও সেতারটা বজায় রাখতে পেরেছিস। ভাগ্যিস তোর রেডিও প্রোগ্রামগুলো থাকে, তাই তো তবু কলকাতায় আসিস। নইলে কে আর পারতো বলো গদাধরপুরে গিয়ে গিয়ে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ টিকিয়ে রাখতে? অমন একটা গডফরসেকন প্লেস! রেডিও? অ্যাবসার্ড কথা বলিস না। আমি গাইব কি? আমার গান কি লোকসমাজে বের করবার মতন? ওই সময় কাটাতে নিজের মনের যা একটু গুনগুন করা। তোমার সেতারের সঙ্গে তার তুলনা হয়? আমি তো ভাই কোনোদিনই অরিন্দমদের মতন গাইতে পারতুম না!

আচ্ছা, তোর অরিন্দমের কথা মনে পড়ে, গীতু? সত্যি কী গলাই ছিল ছেলেটার, না রে? এখন তো আর রেডিওতে প্রোগ্রাম করে না। অত বড় পোস্টে কাজ করছে, আই, টি, সি,তে ব্যুরোক্র্যাট হয়ে গেছে। পুরোপুরি বক্সওয়ালা বড়সায়েব। আমার কর্তা যেমন। অথচ দ্যাখ অরিন্দমের চেয়ে কত নিরেস গাইতেন উমাদি, অরিন্দম যখন এ-ক্লাস আর্টিস্ট, উমাদি তখন বি-তে। চর্চার গুণে সেই উমাদিরও এল. পি. বেরিয়ে গেল।

গানের লাইনটাই যে ছেড়ে দিল অরিন্দম। জুনিয়র এক্সিকিউটিভ পরীক্ষায় অত ভালো রেজাল্ট করল কিনা। এখন তো তিনি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। ভালো চাকরিটা পেয়েই মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল ওর। হাসচিস তুই? ভালো চাকরি পেলে বুঝি লোকেদের ক্ষতি হয় না? খুব হয়। কত যে ক্ষতি হয়, তা যার ভালো চাকরি নেই, সে কখনো বুঝবে না। বেকারী যেমন, বড়ো চাকরিও তেমনি। কী করে যে মানুষকে নষ্ট করে ফ্যালে তা তো দেখতে পাও না। সে অন্যরকম সর্বনাশ। অরিন্দম যদি ওই চাকরিটা না পেতো, আমি ঠিক জানি এখন মস্তো বড়ো গাইয়ে হতো। কোনটা বেশী ভালো হতো ভাব?

—গীতু, তোর মনে আছে, সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে উমাদি আর অরিন্দমের গান—"সোনার হরিণ চাই?" অপূর্ব হয়েছিল। না?

অরিন্দমের "চিরসখা" তোর মনে পড়ে না, গীতু? উমাদির বোধহয় অরিন্দমের প্রতি একটা উইকনেস ছিলো—উমাদির সেই "বন্ধু রহো রহো সাথে" আমি কোনো-দিনই ভুলবো না। আমাদের সেই হেঁটে হেঁটে ফেরা, সায়েন্স কলেজ থেকে অরিন্দমকে তুলে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায়, বালিগঞ্জের ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে, পাঠচক্রের রিহার্সালের পরে? মনে পড়ে গীতু? কী করে হাঁটতুম রে অত? চৌরঙ্গীতে এসে, ট্রাম ধরে

শ্যামবাজার। এখন তো একদম হাঁটতেই পারি না। তুই এখনও পারিস? তুই যে রোগা আছিস। তাই। আচ্ছা, আমরা দুজনেই অরিন্দমের গান অতো ভালোবাসতুম অথচ কোনো হিংসেহিংসি তো ছিল না? রেজাল্ট বেরুনোর পরে গঙ্গার ধারে সেই সন্ধেটা মনে পড়ে? অরিন্দমের "আমার এ-পথ" গাওয়া, আর তোর-আমার কান্না? মনে পড়ে, তোর কী রাগ আমার ওপরে, অরিন্দমকে যখন আমি 'না' বললুম? আচ্ছা, তুই অতো ক্ষেপে গেলি কেন বলতো? কী আশ্চর্য একটা বন্ধুতা হয়েছিল আমাদের তিনজনের। বেচারা উমাদি আমাদের তিনজনকেই হিংসে করতেন! উঃ! আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন? অন্তত দুশোবার তো তোকে বলেছি কেন অরিন্দমকে 'না' বললুম। তোমার অত ইচ্ছে ছিল তো তুমি নিজেই কেন বিয়ে করলে না বাপু তাকে? বাঃ! আমাদের 'জুড়ি মিলেছিল' না ছাই। তোর ওটা একটা ফিক্সেশন। এই দশ বছর বাদেও একই কথা বলবি? কেন ওকে বিয়ে করলুম না?—কেন আবার। আমার ব্যারিস্টার বাবাটি অমন কেরাণী বাপের গাইয়ে-ছেলেকে পাত্র বলেই মানতেন না,—আমাদের সঙ্গে ওদের বাড়ির অবস্থা মিলতো না। আমি একভাবে মানুষ, ওরা অন্যভাবে। তখনও তো আর ঐ পরীক্ষাটা দেয়নি ও। কী করে জানবো বল যে দুটো বছর যেতে-না যেতেই অরিন্দমের এতখানি অবস্থা পালটাবে? যখন ও চাকরিটা পেলো, ততদিনে তো আমার বিয়ে হয়েই গেছে। অরিন্দম কিন্তু মাত্র গেল বছরে বিয়ে করল। দিল্লীতে। পাঞ্জাবি বউ। শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী। তুই দেখেছিস? না, আমিও দেখিনি। অরিন্দমকেই দেখিনি। সেই আমার বিয়ের রাত্তিরেই শেষ সাক্ষাৎ! ও কখনো আমাদের বাড়িতে আসেনি। আমার কর্তাকে তো মীটই করেনি! করলে অবশ্য জমত ভালো। কথাটা কি জানিস? ও যদি গানই ছেড়ে দিল, তাহলে ওকে বিয়ে করলেই বা কী তফাতটা হতো? এই একই হতো। আমার কর্তারও যেমনি, অরিন্দমেরও নির্ঘাত তেমনি—অফিস, ফ্যাক্টরি, লাঞ্চ, ডিনার, ট্যুর প্রোগ্রাম, ক্লাব, ককটেল! দেখতিস ঠিক সেই একই লাইফ হতো আমার। বরং কষ্ট আরেকটু বাড়তো। কেবলই মনে হতো: গান ছিল, গান নেই! একটা ব্যুরোক্রাটের সঙ্গে আরেকটার তফাত একখানা কাস্টম-মেড মার্সিডিজ গাড়ির সঙ্গে আরেকখানার যা—অর্থাৎ শূন্য, নিল।

—ধেৎ, সম্মান করব না কেন? নিজের স্বামী বলে কথা! সম্মান-টম্মান সবই করি, তবে কি জানিস, ওদের ওই জান-প্রাণ দিয়ে কেরিয়ার গড়াটাতে কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছে ভাই। ওদের এয়ারকনডিশনড অফিসের চেয়ার টেবিলগুলো যেমন ফ্যাশনেবল আর কমফরটেবল, ওদের লাইফগুলোও তাই—আর লোকগুলোও সব একজাতের।

একটাকে চিনলেই সবগুলোকে চেনা হয়ে যায়। যাই তো ক্লাবে। সবক'টা এক! সব ছাঁচে-ঢালা মানুষ রে। অরিন্দমের চাকরিটা তো ঐ ছাঁচের, সেও অমনিই হয়ে গেছে নিশ্চয়। এই আমার কর্তার মতোই। গান-টান তো আর কোথাওই গাইতে

শুনি না। ওর বউটার জীবনও আর দশ বছর বাদে ঠিক এই শ্রীমতীর মতোই হবে, তাকেও কলেজ-ফ্রেনডদের খুঁজতে বেরুতে হবে দেখিস। হ্যাঁ, তা যা বলেছিস ! যদি দশ বছর টেকে ! আজকাল তো এইরকমই হাল হয়েছে। এদের এই সোসাইটিটাই তেমনি ! রুনুর লাইফটা কী হয়ে গেল দ্যাখ। সত্যি ভারি স্যাড। জয়ন্তী আবার বিয়ে করে ফেলেছে, এখন মিসেস মেহেরা হয়েছে। রুনুটা ওরকম পারবে বলে মনে হয় না। ও বি.এ. পড়তে ভর্তি হয়েছে শুনলুম !

হ্যাঁরে গীতু, তোদের ওখানে ফিলসফিতে কোনো ভেকেন্সি নেই ! আমি কিন্তু ইন্টারেস্টেড। বাচ্চাদের তো দার্জিলিঙে পাঠিয়েছি, এখন আমার কাছে আলিপুরও যা, গদাধরপুরও তাই। এটা কি একটা লাইফ হলো ? হয় ভীষণ হেকটিক, আর নয়তো বোরিং ! বরং তোদের ওখানটাই বেশি রিফ্রেশিং হবে। আমার বায়োডাটা তো তুই জানিস গীতু। সত্যি একটু খোঁজ নিবি, গিয়েই ? 'সিরিয়াসলি বলচি।' কি আশ্চর্য, হাসছিস ? ওহ, কর্তার কথা ছাড়। তাঁর বেয়ারা বাবুর্চি সবাই আছে। আমি তো একটা ফাউ। কর্তা বোধহয় টেরও পাবেন না মেমসাহেব কলকাতা মে, ইয়া গদাধরপুর মে ! একমাত্র পার্টি দেবার সময়ে ছাড়া। বাজে কথা রাখ। আরেকটু কফি নে। এটা নতুন পারকোলেটর—ভালো কফি বানায়, না ? ফ্রান্সের এক সাহেব দিয়েছেন কর্তাকে। শোন, সত্যি রে, ফিলসফিতে একটা চান্স হয় না তোদের গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে ? কি বললি ? ওখানে বড় মশা ? টিকতে পারব না ? —তুইও আমাকে ঠাট্টা করচিস, গীতু ?

মিরাক্ল

ফিরতে ফিরতে দশটা বেজে গেল। সক্কলের আগে দুটো ফোন করতে হবে। ফেরবামাত্র। একটা খোকনের বাড়িতে, ওর দাদুঠাকুমাকে জানিয়ে দিতে হবে যে খোকন আজ বাড়ি ফিরবে না। বাপি, খোকন দু'জনেই হাসপাতালে রাত কাটাবে; বাচ্চুকে হসপিটালে রিমুভ করতে হয়েছে। বাচ্চুর অবস্থা ভালো নয়, লোক চিনছে না, দারুণ রাইগর হচ্ছে। ডাক্তারবাবু বাড়িতে রাখতে ভরসা পেলেন না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে মেজ জামাইবাবুর থ্রু দিয়ে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এলুম এইমাত্র। বাচ্চু বাপিদের সঙ্গে পড়ে, হোস্টেলে থাকে। জ্বর বাড়তে বাপি ওকে এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এখানে রাখলে চলবে না। ডাক্তারবাবু ভয় পাচ্ছেন। জেনারেল ওয়ার্ডে রেখেও শান্তি নেই। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি

করানোর চেষ্টা করছেন। খোকনের দাদুকে ফোনটা করে দিয়েই ভক্তিব্রত মেসোমশাইকে ফোন করতে হবে। অতবড় ডাক্তার ভক্তিব্রত মেসো নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করতে পারবেন। হার্টের অবস্থা নাকি অস্বাভাবিক, প্রেশার অবিশ্বাস্য নিচে নেমে গেছে। বাপির বন্ধু, বয়স কত আর? এই উনিশ-কুড়িই হবে। অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাবার সময়ে পালস ছিল না। বাচ্চুর আবার কলকাতায় কেউ নেই। লোকাল গার্জেন এক জামাইবাবু তিনি নামেই লোকাল; থাকেন বিরাটিতে। আর মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই কাটান ট্যুরে দিদিটি গিন্নিবান্নি গাঁইয়া মানুষ। খবর শুনে কেবল কেঁদেই ভাসাচ্ছেন!— জামাইবাবু এখন ট্যুরে। সবটা দায়িত্বই বন্ধুদের ঘাড়ে পড়েছে। তারাও তো ছেলেমানুষ। দেখি, ভক্তি মেসোকেই ধরতে হবে। রাত দশটার পরেই সেটা সুবিধে। আমিও তো খুব একটা এক্সপার্ট কেউকেটা নই, চাকুরে-মেয়ে বলে খানিকটা হালু-চালু, এই পর্যন্ত। ঠিক এই সময়টায় পাঁচদিনের জন্যে দুর্গাপুরে পাঠিয়েছে ওঁকে,—কী যে করি! খোকনের বাবা-মাও আপাতত দিল্লিতে, বাড়িতে কেবল বুড়োবুড়ি—দাদুঠাকুমা। খোকনের বাড়িতে ফোন করতে চেষ্টা শুরু করি—ওঁরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন। খবরটা না দিলেই নয় যে নাতি আজ রাত্রে ফিরবে না।

ডায়ালের চেষ্টা করতেই বুঝলাম লাইনে জট। তোলবামাত্রই এক ভদ্রলোক বললেন,—"ফোরয়েট সিক্সয়েট জিরো টু ত্রি?" আমি বললুম—"না। রং নাম্বার। ছেড়ে দিন।" নামিয়ে রেখে আবার তুলে ডায়াল করি। আবার —"ফোরয়েট সিক্সয়েট সারি, ফোরসিক্সয়েট সিকস জিরো টু ত্রি?"

মনে অসহ্য উদ্বেগ তায় এই ইনডিসাইসিভ অ্যাপ্রোচ টু লাইফ অ্যাণ্ড ফোন নাম্বার্স—ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে যায় আমার। বললুম—"আগে মনস্থির করুন তো দেখি? ঠিক নম্বরটা বেছে নিন। আসলে কোনটা চান?" বলেই খেয়াল হলো, ভদ্রলোক সাতটা ফিগার বলছেন। ফোন নম্বরে সাতটা সংখ্যা তো হতেই পারে না। স্বগতোক্তি করে ফেলি,—"সাতটা ফিগার বলছে—পাগল নাকি?" গুরুগম্ভীর আরেকটা তৃতীয় গলা এবার ফোনের মধ্যে গুমগুম করে ওঠে—"ছেড়ে দিন দিদিমণি, পাগল নয়, ও ম্যাড্রাসী মাতালের কাণ্ড।"

—আজ্ঞে কী বললেন?

—বলচি—ওসব ম্যাড্রাসী মাতাল। ওদের কিচু জ্ঞানগম্যি আচে? বিশমিনিট ধরে এই চালাচ্চে। একেকটা নম্বর। আপনি তো এইমাত্তর লাইনে এয়েচেন।

আসামের সাম্প্রতিক কীর্তিকলাপের কল্যাণে আমি এখন দারুণ সর্বভারতীয়। উদার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ প্রাণী। প্রচণ্ড ভীতি জন্মেছে,বুকের মধ্যে টের পেয়েছি প্রাদেশিকতা মহাপাপ। কোমর বেঁধে লেগে পড়ি—এই মদ্রদ্বেষীকে শায়েস্তা করা দরকার।

—"কেন, বাঙালী মাতালদের বুঝি জ্ঞানগম্যি থাকে? তারা মাদ্রাজী মাতালদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর জীব?"

—আঃ হা কী মুশকিল! সব মাতালই যাচ্ছেতাই, সব মাতালই পাবলিক ন্যুইসেন্স। কি বাঙালী কি ম্যাড্রাসী। তবে ম্যাড্রাসী মাতাল আরো খারাপ। গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করেন তিনি। আমিও খেপে যাই:—

—"কেন? কেন? শুনি?"

—কেননা ইদিগে তারা মাছ মাংস খাবে না, অথচ উদিগে মদ খাবে—ধাতে সইবে কেন? নিরিমিষ্যি সাত্ত্বিক আহারের সঙ্গে ওসব রাজসিক পানীয় চলে না, বুইলেন? কতায় বলে 'মদ্যমাংস'! মদ্য সইতে হলে মাংস চাই, প্রোটিন চাই—গায়ে বল চাই!

এই রে, সাত্ত্বিক-রাজসিক কী সব লজিক্যাল ইনকনসিস্টেন্সি দেখাচ্ছে! কিন্তু মূল বিষয় যখন প্রাদেশিকতার গন্ধযুক্ত, তখন যুক্তি মানেই দুর্যুক্তি। অ্যাবসার্ড অথবা সাউণ্ড—কোনোপ্রকার যুক্তিতেই প্রাদেশিকতাকে সাপোর্ট করা যায় না। অতএব ইতিহাস থেকে উদাহরণ খুঁজতে থাকি, কোথায় ভেজিটেরিয়ানরা বলশালী ছিল? — ডাইনোসর?—বৌদ্ধরাজারা?—হিটলার!

—কেন মশাই, হিটলার তো নিরিমিষ্যি খেত, সে কি শক্তিমান ছিল না?

—না। সে ছেলো অত্যেচারী। বলবান হওয়া আলাদা জিনিস। তাছাড়া সে ব্যাটা মদও খেত না। তাছাড়া সে ম্যাড্রাসীও ছেলো না, ছেলো কি?

—মাদ্রাজী এত অপছন্দ কেন আপনার?

—কে বলেচে? ম্যাড্রাসী ভাড়াটের মতন ভাড়াটে হয় না। ম্যাড্রসী বসের মতন বস হয় না। তাছাড়া, ইলেকশন থেকেও তো বুইতে পাচ্চেন, ম্যাড্রাসের হাতেই ইনডিয়ার ফিউচার, ওরা সব টক দই খেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ক্লিয়ার ব্রেনে কারেক্ট পলিটিকাল পয়েন্টগুলো দেকতে পায়। বুয়েচেন? সাধে কি আমাদের ম্যাড্রাসী প্রেসিডেন্ট, ম্যাড্রাসী বিদেশমন্ত্রী, ম্যাড্রাসী অর্থমন্ত্রী?

—কিন্তু ওঁরা সবাই তো ম্যাড্রাসী নন, দুজন অন্ধ্রের লোক।

—ওই একই হলো। দ্রাবিড় কালচার। বিন্ধ্যের ওপার। ম্যাড্রাসী মানে কি ম্যাড্রাসের লোক? ম্যাড্রাসী মানে সাউথ ইনডিয়ান। ইডলি-ধোসাকে কী বলবেন? ম্যাড্রাসী খাবার। সেটা কি কেবল ম্যাড্রাসেই খায়? না হোল সাউথ ইণ্ডিয়া?

—হাল্লো, সিকসয়েট ফোরয়েট—স্যরি,—ত্রিয়েট ফোরয়েট সিকস জিরো টু?—দ্বিধা-জড়িত প্রশ্ন আসে। অমনি ধমক!

—"আঃ। এগেন ডিস্টার্বিং? পুট ডাউন রিসিভার। গো টু বেড। স্লীপ! গিভিং অল রং নাম্বার্স আনডারস্ট্যাণ্ড? নো সেভেন ফিগার নাম্বার ইন ক্যালকাটা। প্লিজ ডিসকানেক্ট। যত্তোসব ইয়ে—হুঁঃ।"

—য়োক্কে য়োক্কে, স্যরি টু ডিস্টার্ব ইউ স্যার, গুড য়িভিনিং টুয়্যায়ল —সবিনয়ে ফোন নামানোর শব্দ হয়।—আমিও সগৌরবে ঘোষণা করি—

—দেখলেন কত ভদ্র? দ্রাবিড় কালচার বাংলার চেয়ে ঢের উন্নত কালচার।

—ওই এক মিনিট! এক্ষুনি আবার তুলবে। মাতালের আবার কালচার। হুঁঃ।

হঠাৎ আমার খেয়াল হয় ফোনটা তো করা হচ্ছে না খোকনের দাদুকে? একি কাণ্ড; আমিও কি মাতাল? ব্যাকুল হয়ে বলে উঠি—

—আপনিও এবারে ফোনটা প্লীজ একটু নামিয়ে রাখুন, আমাকে খুব জরুরী একটা কল করতে হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে।

—আমারও খুব জরুরী। আপনিই নাবিয়ে রাখুন। আমি লাইনে এইচি আপনার ঢের আগে।

—প্লীজ! আমি দু' মিনিটে সেরে নেব।

—মেয়েছেলের ফোন দু'মিনিটে সারা হবে? হাসালেন।

—এটা সেরকম ফোন নয়। একটি ছেলেকে এইমাত্র হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছি। সেই সম্পর্কে খবর দিতে হবে—সত্যি সত্যি ভীষণ আর্জেন্ট—বিশ্বাস করুন —আমার গলা আটকে যায়।

—ঠিক আচে ঠিক আচে বুজিচি বুজিচি—খটাশ করে ফোন ছাড়ার শব্দ হয়। আঃ বেশ ভদ্রলোক তো? এই তো ডায়ালটোন! সযত্নে খোকনদের নম্বরটি ঘোরাই।

—হ্যাল্লো!—সেই গুম গুম আওয়াজ।

—আঃ! আপনি কেন ধরলেন?

—ধরলুম কেন? আমার ফোন রিং করচে বলে।—

—ওঃ—ছাড়ুন, ছাড়ুন, আপনি না ছাড়লে—

—ছাড়চি। ছাড়চি। আমি কি ইচ্ছে করে বাগড়া দিইচি নাকি? ভালো ঝঞ্ঝাটেই পড়িচি বাপু। নিন মোশাই করুন আপনার ফোন!

ঝনাৎ করে রিসিভার নামানোর শব্দ হয়। আবার ডায়ালটোন। খোকনের নম্বর ঘোরাই। দু'বার রিং করতেই—

—হ্যাল্লো।

—ফোর টু টুটু থ্রি টু?

—এখনো পাননি বুঝি?

—অ্যাঁ? আবার আপনি? ধুত্তোর ছাই—

—এ লাইনদুটো জড়িয়ে গ্যাচে মনে হচ্চে—ওটা আপনি আজ আর পাবেন না বোদায়।—

—পাই না-পাই আপনাকে ভাবতে হবে না! আপনি আগে নামিয়ে রাখুন তো? —বিনাবাক্যে ওদিকে শব্দ হয়—কট্টাস। ডায়ালটোন। ডায়াল করি—

—হ্যাল্লো—একটা সুদূর শব্দ আসে এবার।

—হ্যালো, খোকনের দাদু বলছেন? দাদু, নমস্কার। আমি বাপির বউদি। আমাকে চিনতে পারছেন তো?

—নমস্কার। তা আর পাচ্চিনি? খুব পাচ্চি চিনতে। রাগ করবেন না যেন বউদিদি, আমি—ইনঅ্যাডভারট্যাণ্টলি—

—অ্যাঁ? আবার আপনি? এখনো লাইনে আছেন?

—মোটেই নেই। ফোন বেজেচে, রিসিভ করিচি। আর বলতে হবে না, ছেড়ে দিচ্চি।

—শুনুন, শুনুন, এবারে বাজলেও রিসিভ করবেন না।

—তা কখনো হয়? আমি রিসেপশনিস্ট। ফোন-ধরা ফোন-করাই আমার কাজ।

—এই রাত সোয়া দশটার সময়ে কোন আপিসে রিসেপশনিস্ট বসে থাকে জানতে ইচ্ছে করে?

—কোনো আপিসেই নয়। আপিসগুলো বেলা পাঁচটার পরে মহাশ্মশান।

—তাহলে?

—আমি তো হোটেলে চাগরি করি। আটাশবছর ধরে এই হোটেলে চাগরি কচ্চি। নাইট ডিউটি। মানে টেন-টু সিক্স ফুলশয্যে। অথবা কণ্টকশয্যে। যাই বলুন।

—অ! তা দয়া করে খানিকক্ষণ অন্তত ফোন ধরবেন না। আমি খবরটা দিয়ে নিই? খুব আর্জেন্ট।

—না ধরলিই বা কী? বাজচে তো এখেনে। খোকনের দাদুর বাড়িতে তো যাচ্চেই না। বুয়েছেন? জট পাকিয়ে গ্যাচে লাইনে। কী খপরটা কী?

—আর বলবেন না একটি ছেলেকে হাসপাতালে—

—ভর্তি করে এয়েচেন। তা তো শুনলুম। কেসটা কী? মিনিবাস?

—না না। ভীষণ জ্বর বিকার— এনকেফালাইটিসের আশঙ্কা—

—সেই খবরটা খোকনের দাদুকে দিতে হবে? যে আপনারা খোকনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে এয়েচেন?—

—না না, খোকনকে নয়। বালাই ষাট। বাচ্চুকে। কিন্তু খোকন আজ রাত্তিরে ফিরবে না, ওরা সব বন্ধুরা মিলে হাসপাতালে রাত জাগবে —সে খবরটা না দিলে বুড়োবুড়ি দাদু-ঠাকুমার তো উদ্বেগেই—

—অ! বাচ্চুকে! কিন্তু আজগে ফোনে তো পাবেন না! বাড়িতে খবর দিয়ে আসার মতন কেউ নেই?

—কোথায় আর? উনি দুর্গাপুরে গেছেন অফিসের কাজে, দেওর তো নিজেও হাসপাতালে রাত জাগছে। আছি কেবল ননদ আর আমি।

—আই সী!

একমুহূর্ত গম্ভীর নৈঃশব্দ্য। তারপর—

—খোকনের বাড়িটা কোতায়?

—যোধপুর পার্কে। অনেক দূর।

—আপনি ঠিকানাটা দিন দিকিনি। খবরটা যদি পৌঁচে দেয়া যায়, দেকি চেষ্টা করে।

আপনি দেবেন? আপনি এখন কোথায়?

—শ্যালদায়। এ হোটেলটা শ্যালদা ইস্টিশনের কাচে।

—পাগল নাকি? কোথায় শেয়ালদা কোথায় যোধপুর পার্ক! এত রাত্তিরে।—

—রাত বেশি হয়নি তো, স' দশটা মোটে। ট্রামবাস চলচে। দেকি কোনো ছোঁড়া-ফোঁড়াকে পয়সা দিয়ে যদি পাঠাতে পারি—দিন ঠিকানাটা দিন—

—না না, ওসব পাগলামি ছাড়ুন। আমি বরং দেখি সামনের বাড়ি থেকে যদি ফোন করা যায়।! আমাকে তো আরো গোটা দুই মেসেজ দিতে হবে কি না?

—কি? বিলাই কত্তে পাচ্চেন না। না?

—না না, তা কেন? আপনার কাইনড অফারের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। সত্যি বলছি। দেখি, যদি—না পেরে উঠি তখন হয়তো...

সামনের বাড়ির কাকাবাবু-কাকীমা খুব ভালো লোক। প্রায় শুয়ে পড়ছিলেন, ভাগ্যিস আরো দেরি করিনি? যাক একবারেই লাইন মিলে গেল। খোকনের দাদু-ঠাকুমা সত্যিই খুব ভাবনায় পড়েছিলেন। একটা ডিউটি চুকলো। নেক্সট ভক্তিব্রত মেসোমশাই। তাকেও পাওয়া গেল এক ডাকেই। সব শুনে বললেন—"দাঁড়া, দেখি যদি দাশগুপ্তকে পাই, নইলে মণ্ডলকে ধরতে হবে। আমি একটু পরেই ফোন করে তোকে জানিয়ে দেব কদ্দুর কি পারা গেল।" ফোন ছেড়ে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরলুম। ফিরেই মনে পড়লো—"ফোন করে জানিয়ে দেব" মানে? ফোন তো নষ্ট। ফোন তো জটপাকানো। শেয়ালদার সেই হোটেলের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা। ওদিকে সামনের বাড়ির আলো নিবে গেছে। আবার গিয়ে বুড়োমানুষদের তুলে বিরক্ত করা যায় না। কাকীমা অসুস্থ মানুষ। এখন কী করি?

এদিকে আমাদের ফোনে তো সমানেই নানাবিধ অশরীরী শব্দ— দেয়ালাকরা শিশুর আধোফোটা হাসিকান্নার মতো—আধো আধো ক্রিরিরিং...রি রি রিং... হচ্ছে তো হচ্ছেই। হঠাৎ লক্ষ্য করলুম তিনবার করে বাজছে। আশ্চর্য তো, বাজা উচিত ছ-বার করে। ছোট ননদ রিংকুটা সদ্য কলেজে ঢুকেছে, অঙ্কের পোকা, চটপটে বুদ্ধি খেলে মাথায়, বললে—"ও বৌদি, নির্ঘাৎ সেই ভদ্রলোক ওয়াননাইন নাইন ঘোরাচ্ছেন এবার।—দেখই না ফোনটা তুলে।"

ফোন তুলতেই—হ্যালো, ট্রাংকবুকিং?

—আজ্ঞে না।

—তবে? ওয়ান নাইন নাইন?

—আজ্ঞে তাও না। আমাকে চিনলেন না? আমি সেই যে বাপির বউদি।

—ওঃ হো, আর আমি সেই শ্যালদার—

—আজ্ঞে বুঝেছি।

—আপনি কি পারলেন যোধপুর পার্কে খবরটা দিতে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা হয়ে গেছে। সামনের বাড়ি থেকে। থ্যাংকিউ।

—যাক বাঁচা গেল! এবার ছেড়ে দিন।

—আপনি এতরাত্তিরে কোথায় ট্রাংক বুকিং করছেন?

—আর বলেন কেন? হোটেলের চাগরি। বুক কচ্চি একটা ডিল্লির কল।

—ও বাবা। দিল্লি? তাহলে আর ভদ্রতাটা রেসিপ্রোকেট করা গেল না! স্যরি।

—তার মানে?

—মানে, আপনি তো যোধপুর পার্কে গিয়ে আমার মেসেজটা দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন? আমি কিন্তু তার রিটার্ন দিতে দিল্লি গিয়ে আপনার মেসেজটা পৌঁছে দিতে পারছি না! এই আরকি!

গম্ভীর গলায় সীরিয়াস উত্তর হয়—না না, তা কী করে হবে। সে তো সম্ভবই নয়। তারচে, আপনি বরঞ্চ ফোনটা ছেড়ে দিন। তাহলেই হবে। এখন রিং শুনলেও ধরবেন না কিছুক্ষণ।

—তা কেমন করে হবে? আমি যে একটা ডাক্তারের কল এক্সপেক্ট করছি? ছটা টুংটাং বাজলেই আমি ধরব। তিনটে বাজছে শুনলে বরং আর ধরব না। আপনি চেষ্টা করুন —বলে আমি রেখে দি।

—টুং-টাং-টিং, ক্রিং-ক্রাং ক্রিং চলতেই থাকে। যেন আধোঘুমে-আধোজাগরণে নিশি-যাপন করছে টেলিফোন। আমরাও ঘুমোতে পারি না। রিংকু আর আমি খাটে শুয়ে জেগে থাকি, ওই বকমবাজ ডিলিরিয়াস ফোনের পাশে। কী জানি, যদি ফোনটা এসে যায়? হঠাৎ রিংকুর মস্তিষ্কে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল।

—বৌদি, এক কাজ করলে হয় না?

ভক্তি মেসো যতবারই ফোনের চেষ্টা করবেন, প্রত্যেকবার তো শেয়ালদার ওই ভদ্রলোককেই পাবেন? ওই নম্বরেই যাবে নিশ্চয়ই আমাদের সব ফোন। ওদের কলগুলো, ফোন এখানে বাজছে। ওকেই বল না কেন, "রং নাম্বার" বলে নামিয়ে না রেখে, বরং আমাদের মেসেজটা নিয়ে রাখতে?

—আইডিয়াটা মন্দ নয়। খাসা, কিন্তু একজিকিউট করবি কেমন করে? ভদ্দল্লোককে পাবো কোথায়?

—কেন ট্রাংকবুকিং ঘোরাও? এই তো তিনটে করে রিং হচ্ছে। ঠিক কনেকশন হয়ে যাবে। গেরো বাঁধা আছে না?—

ননদিনীগর্বে বুকটা ক্যাশিয়াস ক্লে-র মতো চওড়া বোধ করতে থাকি। ডিরেকটারি খুলে ট্রাংক বুকিং নম্বর খুঁজে, সেইটে ঘোরাই। —হ্যালো?

হ্যালো—ট্রাংক বুকিং? গম্ভীর প্রশ্ন হয়।

—আজ্ঞে না। আমিই বলছিলুম, ঐ যে, বাপির বৌদি—

—বুজিচি! এখন আবার কাকে ফোন কচ্চেন?

—আপনাকেই খুঁজছিলুম আর কি!

—অ্যাঃ? রীতিমতো ভয়ের ছাপ ফোটে গলায়।

—মানে ডাক্তারের সেই কলটা তো পাচ্ছি না, তাই ভাবছিলুম আপনাকে একটা কথা বলে রাখি—

অ। তাই! কণ্ঠস্বরে স্পষ্টত রিলিফ।—বলুন, কী বলচেন?

—আচ্ছা, থ্রি ফাইভ ফোর সিক্স জিরো থ্রিতে কোনো ফোন যদি আপনার লাইনে আসে—

হ্যাঁ-হ্যাঁ এয়েছেল তো? ঐ নম্বরে এক ভদ্দল্লোক দুতিন—

—ঐ! ঐ! ঐ হচ্ছেন ভক্তি মেসোমশাই, উনিই তো জানবেন ছেলেটাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি করা গেল কিনা ! ওই ফোনের জন্যেই আমরা বসে আছি।

—কিন্তু লাইন তো জড়িয়ে গ্যাচে! কল তো আপনি পাবেন না?

—সেই তো মুশকিল। তাইজন্যেই আপনাকে একটা অনুরোধ করব ভাবছি—

—বলুন!—অসামান্য ভদ্র শব্দ হয়।

—ফের যদি থ্রি-ফাইভ-ফোর সিক্স জিরো থ্রি-তে কোনো কল আসে, দয়া করে রং নম্বর বলে নামিয়ে রাখবেন না।

—কিন্তু ওটা তো আমাদের নম্বর নয়।

—জানি! জানি! কিন্তু ওইটেই তো আমাদের নম্বর? ফের যদি ফোন আসে, আপনিই দয়া করে একটু মেসেজটা নিয়ে রাখবেন? ডক্টর ভক্তিব্রত ভট্টাচার্য, ডিরেকটর, হেলথ সার্ভিসেস ফোন করবেন।

—ওঃ হো। তাই নাকি? কি সৌভাগ্য!

—আমাদের মেসোমশাই হন! বেশ গর্ব ফোটে গলায়।

—বা! বা! বেশ! বেশ!

—উনি যদি বুলটিকে চান,—

—আপনার নাম বুলটি?

—ঐ ডাকনাম আর কি, বুলা থেকে—

—আমার ভাইপোর নামও বুলু। বি-কম পড়চে।

—ওমা? তাই নাকি? বেশ মজা তো? বুলা, বুলু একই। তা, যা বলছিলুম, ভক্তিব্রত মেসোমশাই যদি—

—কিন্তু উনি আমাকে মেসেজটা দেবেন কেন? আমার লোকাস স্ট্যানডাই-টা কী? হু অ্যাম আই?

—লোকাস স্ট্যানডাই? সেসব থাকগে। এইভাবে তো কাজটা হতে পারে? আপনি কি ডক্টর বি. বি. ভট্টাচায্যি? ডিরেক্টর, হেলথ সার্ভিসেস? বুলটিদের লাইনটা জড়িয়ে গেছে—আমাকেই মেসেজটা নিয়ে রাখতে বলেছে। বাচ্চু কেমন আছে? ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি হলো কিনা?

—বা—চ—চু কে—ম—ন আ—ছে। ই—ন—টেন—সিব হোলড অন প্লীজ কে-
-য়া—রে—

—ও কী? আপনি কী করছেন?

টেকিং ডাউন ইওর মেসেজ ম্যাডাম। হ-ল—কিনা। ব্যাস। এটাই তো রিসেপশানিস্টের কাজ। সারাক্ষণ তো এই কম্মোই কচ্চি। মেসেজ রাখা, আর মেসেজ দেওয়া। কল বুক করা আর কানেকশন দেওয়া। হ্যালো আর হোল্ড অন।

—ওঃ হো। স্যরি, আপনার দিল্লির বুকিংটা...

—ট্রাংকবুকিং ধরলে তো? নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্চে সব।

—তারা ধরবে কেমন করে? বাজছে তো আমাদের বাড়িতে। তারা তো জানেই না আপনি ডাকছেন।

—তাও তো বটে! ওঃ।

যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। সব্বোধ্বংসী মহাকালের কুনজরে পড়িচি মোশাই, দিদিমণি—সব ভেঙে পড়চে। পুরো কোলকাতা শহরটা চতুর্দিক থেকে ব্রেকডাউন কচ্চে। যেমনি রাস্তাঘাটের অবস্তা তেমনি ট্রাম-বাসের অবস্তা, তেমনি তেল চিনি ক্যারাসিন তেলের অবস্তা। যেমনি আমাদের হাসপাতাল, তেমনি ইলেকট্রিক সাপ্লাই, তেমনি আমাদের জলের ব্যবস্তা, রাস্তায় তো জঞ্জালের কাঁড়ি, এমনকী, গঙ্গানদীটা পজ্জন্ত নাকি বুঁজে যাচ্ছে শুনিচি। কী সব্বোনেশে কতা! মহাপাপের ফল। বুয়েচেন? একটা জাত অনেক পাপ কল্লে তবেই তাদের অমনটা হয়। একেবারে শেষ হয়ে যাবার আগে সভ্যতার এমনি অবস্তা হয়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর বলি: তা যা বলেছেন। সত্যিই জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে কলকাতাতে। উম...আচ্ছা, আবার বলি? যদি থ্রি ফাইভ ফোর সিকস জিরো থ্রিতে কেউ—

—ফোন করে, তবে মেসেজটা রেকে নোবো। থ্রি—ফাইভ— ফোর—সিকস—জিরো—থ্রি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন...

—মেসোমশাইয়ের নাম ভক্তিব্রত ভট্টাচায্যি, ডিরেক্টর, হেলথ সার্ভিসেস...

—ভ-ক্তি-ব্র-ত—মেসোমশাই...এই তো? ঠিক আচে। যিনি ফোন করুন, মেসেজ নিয়ে নোবো। আমি তো বসিই রইচি। কিন্তু আপনাকে খবরটা ফের দোবো ক্যামন কোরে?

—কেন? ওয়ান নাইন নাইন? ট্রাংক-বুকিং? ফায়ার? অ্যাম্বুলেন্স? হাওড়া স্টেশন? যা খুশি ঘোরাবেন। যাই ডায়াল করুন আমাকেই তো পাবেন!

—তা বটে। যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। হোল সিস্টেমটা ব্রেকডাউন কচ্চে মোশাই দিদিমণি। এখন যদি একটা কোনো এমারজেন্সি হয়—

—যদি মানে? আমার তো এমারজেন্সিই—

—সত্যি! কী কাণ্ড। শালাদের—স্যরি—

—যাক গে, ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই, রেখে দিচ্ছি। গুড নাইট—

—গুড নাইট দিদিমণি, আমার অবিশ্যি এখন গুড নাইট নয় গুড আফটারনুন বলতে পারেন—টেন পি এম টু সিকস এ এম যখন ওয়ার্কিং ডে—

—সত্যি কী কষ্ট আপনার।

—কষ্ট আর কি! চাগরি। অব্যেস হয়ে গ্যাচে।

আপনি শুয়ে পড়ুন।

—কোনো খবর এলে আমি দিয়ে দোবো।

ঘণ্টাখানেক তন্দ্রা এসেছিল—আবার ফোনে তিনটি ট্রি-রি-রিং বাজতে লাগলো। অস্ফুট ইঙ্গিতের মতো। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড হাইজাম্প করে।

—হ্যালো!

—হ্যালো!

—ওঃ আপনি? পেলেন দিল্লি?

—ডিল্লি? নাঃ চেষ্টা কচ্চি। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু। বুইলেন? কিন্তু আপনারটা এয়েছেল।

—এসেছিল? ভক্তিব্রত মেসোমশাই—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রুগী ভালোই আচে। ইনটেনসিব কেয়ারে ভর্তি হয়ে গ্যাচে। ডাক্তার দাশগুপ্ত নিজে গে দেকে এয়েচেন এই রাত্তিরেই—তিনি বলেচেন রুগীর বয়েস কম, স্বাস্থ্য ভালো, দিব্যি ফাইট কচ্চে, ওযুদে অলরেডি রেসপনড করেচে—

—আপনাকে যে সত্যি, মানে কী যে বলব—

—আগে সবটা শুনে নিন, ধানাই-পানাইটা পরে হবে। ডক্টর ভটচায্যি মনে কচ্চেন সারভাইভ্যালের চান্স ভালই, তা সত্ত্বেও রুগীর আত্মীয়স্বজনদের খপর দিয়ে দেয়া উচিত—ওরা ভাবচে লক্ষণটা মেনিনজাইটিসের,—এখনো প্যাথলজিক্যাল টেস্টগুলো অবিশ্যি হয়নি, নেক-রিজিডিটি আছে, তাছাড়া ডিলিরিয়াসও—রুগীর বাপমাকে ইমিজিয়েটলি খবর দিতে বলেচেন।

—বাপ মা তো গৌহাটিতে।

—ট্রাঙ্ককল করুন। ফোন আচে?

—জানি না। কিন্তু ঠিকানা জানি।

—আর ফোন থাকলেই বা কি। এই ডিল্লির মতনই হবে। ফোনের যা অবস্তা! টেলিগ্রাম করুন।

—টেলিগ্রাম? এত রাত্তিরে কোথায় বেরুবো? দুটো বাজে বোধহয়—কাল সকালে করতে হবে।

—সকালের চেয়ে রাতেই তাড়াতাড়ি যাবে। দেরি করবেন না। দিন দিকি ঠিকানাটা? আর মেসেজটা দিয়ে দিন। আমি পাঠিয়ে দিচ্চি টেলিগ্রাম।

—আপনিই বা এত রাত্তিরে—ডেস্কের ডিউটি ছেড়ে—

—আমি যাবো ক্যানো? হোটেলের ছোঁড়াগুলো রয়েচে কী কত্তে? এইখেনেই ফর্ম রয়েচে—আর পাশেই টেলিগ্রাম আপিশ— হোলনাইট ওপেন। দিন, দিন, ঠিকানা আর মেসেজটা—কী লিকবেন? আগে তাদের নাম ঠিকানাটা বলুন—ফর্মটা বের করি দাঁড়ান। হ্যাঁ, রেডি। এইবার বলুন?...কই?...বলুন?...

—বলব?

—বলবেন না তো কি আমি হাত গুনবো? ছেলেটার বাপের নাম কি?

—সত্যেন বড়ুয়া!

—থাকে কোতায়?

—প্রফেসর্স কোয়ার্টার নম্বর ফাইভ, গৌহাটি ইউনির্ভাসিটি, গৌহাটি।

—বড়ুয়া? অসমীয়া? এখানে আচে যে বড়?

—ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে।

—তার বেলায় বাঙ্গালী বুজি বদ নয়? হুঁঃ। —হুঁঃ। যত্তোসব পলিটিকসের বদমাইসি আসলে।

—হ্যাঁ। সাধারণ মানুষ তো রাজনীতিকের হাতের পুতুল।

—বলুন, কী লিকবেন এইবার? ঠিকানা লিকে নিইচি। আর্জেন্ট করবেন কিন্তু। নইলে যাবেই না। আসামে যে তাণ্ডব চলেচে। আর্জেন্ট কল্লেও যায় কিনা দেকুন। কলকাতার টেলিগ্রাম তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ আর্জেন্টই করুন। নিশ্চয়ই। এ আর বলতে?

—ছেলেটার নাম কী?

—বাচ্চু।

—তবে লিকুন—বাচ্চু সীরিয়াসলি ইল—হসপিটালাইজড— কাম ইমিজিয়েটলি -তলায় নাম কী দেবেন?

—বাপি-ই দিয়ে দিন। আমার দেওর ওদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল গৌহাটিতে। ওঁরা চিনবেন।

—শুনুন, শুনে নিন ভালো করে, আবার পড়চি: আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। সত্যেন বড়ুয়া প্রফেসার্স কোয়ার্টার নম্বর ফাইভ, গৌহাটি ইউনিভার্সিটি গৌহাটি। বাচ্চু সিরিয়াসলি ইল হসপিটালাইজড কাম ইমিজিয়েটলি। বাপি। এই ত?

—বাঃ, খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু টাকাটা তো দেওয়া যাবে না?

—ওটা পরে হবে'খনে। এটার খচ্চা বেশি নয়। কত আর, গোটা দশেকের মাধ্যই হয়ে যাবে। আরো কম হবে। এখন নিচে নাম ঠিকানা দিতে হবে। কী লিখব? সেনডারস নেম অ্যাণ্ড অ্যাড্রেস!

—কিন্তু টাকাটা—

—পরে হবে। অত ভাবনার কিচু নেই। নাম ঠিকানাটা আগে দিন। টাকাটা পরে কখনো ওই দ্যাওরের হাত দে পাটিয়ে দিলিই চলবে। বলুন, কী দোবো নাম

ঠিকানা? অবিশ্যি ফোন নম্বরটা দিলেও হয়! বাপি, কেয়ার অব কী লিখব?

—কেয়ার অব এন. কে. দত্ত, থ্রি ফাইভ ফোর সিকস জিরো থ্রি।

—এ-ন-কে-দত্ত—থ্রি-ফাইব...

—এবার আপনারটা বলুন?

—বলচি। লিকে নিন। খাতা পেনসিল আচে?

—আচে।

—বেশ। লিকুন—জি. পি. চন্দর, জ্ঞানপ্রকাশ চন্দর, থ্রি ফাইব ফোর টু এইট ওয়ান।

—হয়েছে? জি. পি. চন্দর, থ্রি ফাইব... হুঁ। হয়েছে। এবার ঠিকানা?

—ঠিকানা? চাগরির ঠিকানাটাই ঠিকানা। দিনের বেলায় মেস। রাত্তির বেলায় আপিশ। ও আপনি অতো বুজবেন না। বুজেও কাজ নেই। লিকুন, হোটেল শ্রীনিবাস—

—হোটেল শ্রীনিবাস...

—হোটেল শ্রীনিবাসটা হচ্চে হ্যারিসন রোডের ওপরিই, প্রায় শ্যালদার অপোজিটে—তিনতলা বাড়ি। সদ্য গোলাপী টালি লাগিয়েচে একতলার ভেতর সাইডে, বাইরের দ্যালেও। আপনার দ্যাওর ঠিক খুঁজে পাবে। আপনি এবারে একটু শুয়ে পড়ুন দিকিনি? এভাবে সারারাত্তির উদ্বেগের মদ্দে! আপনার টেলিগ্রাম আমি এক্ষুনি করিয়ে দিচ্চি।

—টাকাটা আমি বাপিকে দিয়ে কালই নিশ্চয়—হাসপাতালও তো ওই কাছেই—

—হবে, হবে। ছেলেটা ভগবানের দয়ায় বেঁচে উঠুক তো আগে? বিদেশ বিভূঁয়ে—

—আপনাকে কী যে বলবো মানে...আপনার মতো মানুষ...আজকের দিনে এমন মানুষ সত্যিই...মানে

গম্ভীর গলায় মৃদু হাস্য করেন জি. পি. চন্দর। এই প্রথম হাসি।

—এইটুকুনি তো মানুষ মানুষের জন্যে করবেই।

— এটুকু করবেই মানে? কেউ করে? কেউই করে না। সরে বসে একটু জায়গা পর্যন্ত করে দেয় না কেউ অন্যের জন্যে।

দেয়, দেয়। হোটেলে কাজ কত্তে কত্তে চুল পেকে গেল দিদিমণি, মানুষ কি কম দেকিচি? মন্দও যেমন দেকিচি, ভালোও তেমনিই দেকিচি। এটুকুনি মানুষ মানুষের জন্যে করেই থাকে। আপনি কর্চ্চেন না? দ্যাওরের বন্ধুর জন্যে? এবারে ছেড়ে দিন দিকিনি? একটু শুয়ে পড়ুন।

—ঘুম হবে কি? হাসপাতালের খবর-টবর আসে যদি?

—সে এলে তখন উটবেন। এলে তো আসবে এখেনে। ধরবো তো আমিই। আপনি শুয়ে পড়ুন গে।

—থ্যাংকিউ মিস্টার চন্দর... আপনাকে কী যে বলব।

—কিছুই বলতে হবে না বুলটি দিদিমণি, থ্রি ফাইভ ফোর টু এইট ওয়ানটুকু

মনে রাকবেন, কোনো দরকার হলে মোটে সঙ্কোচ করবেন না। ইউ আর লাইক মাই ডটার, সুদ্ধু একটা ফোন করে দেবেন। লাইনের জটটা খুলে গেলে তো আর এরকম ডিরেকট সার্ভিস পাবেন না?

পরদিন সকালে বাপি যখন ফিরল, অসম্ভব উত্তেজিত। মুখ-চোখ লাল।

—বাচ্চু কেমন আছে?

—আগের চেয়ে ভালো। প্রেশারটা স্টেবিলাইজ করে গেছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে বৌদি। একেই বোধহয় মির্যাকল বলে, এই সকাল সাড়ে ছটা সাতটা নাগাদ, একজন বুড়োমতো লোক, ধুতি-শার্টপরা, সব চুল সাদা। এসে বাচ্চু বড়ুয়ার বন্ধুদের খোঁজ করল,—একেবারে বাপি, খোকন নাম ধরে! তারপর আমার হাতে এই স্লিপটা দিয়ে—বলতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার বৌদি—এই স্লিপটা দিয়ে বলল —"বড়ুয়াকে টেলিগ্রাম করা হয়ে গেছে। এটা তার রসিদ। তোমার বৌদিদিকে দিও।" মানে আমরা তো...একেবারে স্টানড। স্পেলবাউনড! বিফোর উই কুড রিকভার ফ্রম দ্যাট ডেজড স্টেট, হি ডিসাপিয়ার্ড। হাওয়া হয়ে গেল বৌদি। জাস্ট মিলিয়ে গেল। আর দেখতেই পেলুম না। কে লোকটা? কী করে জানল বাচ্চুর কথা? আমাদের কথা? আমাদের নাম? তোমার কথা? কে? কে পাঠালো টেলিগ্রাম? রিয়্যালি বৌদি, টু, থিংক অফ ইট...ও কি, তুমি হাসছো? জাস্ট লুক অ্যাট দিস চিট—অ্যাকচুয়ালি গেছে টেলিগ্রাম দেখেছো তো? বাট হু ওয়াজ হি? নোবডি নোজ হিম...সত্যিই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বৌদি, এই দ্যাখো—

বাপি মুঠো করে আস্তিন-গোটানো পেশী-বহুল হাতটা সামনে এগিয়ে দ্যায়। লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। আমি আর হাসি না।

এমনি সময়ে খোকনের ফোন এলো। তার মানে লাইনের জট খুলেছে। খোকনও অসম্ভব উত্তেজিত।

—"শুনেছেন তো? বাপি বলেছে সব? কী স্ট্রেনজ একসপিরিয়েন্স...ভাবলেই গা শিরশির করে উঠছে, সত্যি বৌদি, দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ! দাদু তো শুনে বলছেন আর ভাবনা নেই, তোদের বন্ধু এ-যাত্রা বেঁচে গেল— আমি অবশ্য অতটা বলছি না, তবে ব্যাপারটা সত্যিই মির্যাক্যুলাস। একেই বোধহয় বলে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি মিরাক্ল। না বৌদি? আচ্ছা, রিসীটটা আপনি হাতে নিয়ে দেখেছেন? ইটস আ রিয়্যাল রিসীট!"

ক্যান ইউ বিলিভ ইট? এমন যে হতে পারে—উত্তেজনায় খোকনের বাক্যি হরে যায়।

ভাগ্যিস রিংকুটা মর্নিং কলেজে বেরিয়ে গেছে? ফিরলেই বারণ করে দিতে হবে। জি. পি. চন্দরের কথাটা ছেলেদের কাছে কোনোদিনই ভাঙা চলবে না।

ওরা বড় দরিদ্র। বিশ্বাস বস্তুটির স্বাদ ওরা মোটেই পায় না। তার সুযোগই আসে না বেচারাদের জীবনে। এটুকু পেয়েছে, আহা, জমা থাকুক। সত্যিই তো,

মিরাকুলাস ঘটনা মিস্টার জি. পি. চন্দর।

স্লিপটা যত্ন করে তুলে রাখি। শেয়ালদার অপোজিটে, গোলাপী টালি, হোটেল শ্রীনিবাসে নিজেকেই দেখছি যেতে হবে টাকাটা ফেরত দিতে।

জোবান সুজিকি

"বাপরে বাপ! আবার প্রেজেন্ট? নিজেকে ফিরিয়ে এনেছি এই যথেষ্ট"—দাদামণি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে টেবিলে পা তুলে দিয়ে চুরুটে দেশলাইতে মন দেন। বৌদি ছাড়বার পাত্রী?

"ছি ছি ছি, লোকে বলবে কি? জাপানে ঘুরে এলে বারোদিন— একটা মাত্তর জাপানী পুতুল ছাড়া কিছু আনলে না? নাইলন শাড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ক্যালকুলেটার, ক্যাসেট রেকর্ডার, ক্যামেরা টিভি—লোকে কত কি আনে, নিদেনপক্ষে মুক্তোটুক্তো—কিছু না?"

"সব টাকা যে জোবানে চলে গেল।"

"তার মানে? জুয়ো খেলেছিলে নাকি?

"দূর। জুয়ো খেলব কেন? ট্রাডিশনের জন্যে মূল্য দিতে হবে না? ট্রাডিশনের মূল্য দিতে গিয়ে কেবল কি ধনেই মরেছি? প্রাণেও মরছিলুম আরেকটু হলে।" চুরুট থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বৌদির মুখখানা আবছা করে দেবার চেষ্টা করেন দাদামণি। কিন্তু বৌদির মুখ অত সহজে আবছা হবার নয়।

"প্রাণসংশয় হওয়া অতই সোজা? বললেই হলো? ধনসংশয়টাই সহজ, আর তোমার সেটা চব্বিশঘণ্টাই হচ্ছে।" গল্পের গন্ধ পেয়ে আমরা এখানে কথায় যোগ দিয়ে ফেললুম!—"সত্যি? বল, দাদামণি, বল না, কী হয়েছিল?"

"তোরাও যেমন! তোদের দাদামণি বলুক, আর তোরাই শোন। আমার ওসব ঢের শোনা আছে। যত গুলতাপ্পি বানাবে—"

—"না গো না, গুল নয়। তানাবেকে তো মনে আছে? সেই যে এসেছিল সেবারে, খৈতানের সঙ্গে?

"সেই নাকচ্যাপ্টা জাপানীটা? যে আমাকে অত সুন্দর পাখাটা দিয়ে গেল?"

"হ্যাঁ, সেই তানাবে। অত সুন্দর পাখা দিল, তবু তাকে নাকচ্যাপ্টা বলছ?"

"না তো কি শুকনাসা বলতে হবে?"

"সেই তানাবে ছিল সঙ্গে। গুল কিনা, তাকেই জিজ্ঞেস কোরো। আবার আসছে

সে, জানুয়ারিতে।"

বৌদি এবারে একটু নরম হন।

"কী হয়েছিল কী, শুনি?" তাচ্ছিল্যভরে বললেও বোঝা যায় ভেতরে উদ্বেগ রয়েছে।

"কী হয়নি, তাই বরং জিজ্ঞেস করো। জোবান আর সুজিকি। জোবান আর সুজিকি আমাকে ধনেপ্রাণে শেষ করে দিচ্ছিল। আরেকটু হলেই। বড্ড বেঁচে গেছি। তোমারই ঠাকুরের দয়ায়। রোজ অত ফল-বাতাসা খাওয়ানোর একটা প্রতিদান তো আছে?"

বৌদি এবার বেশ নরম। খাটের একপাশে বসে পড়েন। আমরা তো আগেই খাটে গুছিয়ে বসেছি। দাদামণি সুরু করেন।

"তোরা তো জানিস তোদের বৌদি কী কিপ্টে। ওর ছেলেবেলার সেই ক্যামেরাটা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল, ছবি তুলে আনতে। কেননা, ওটা দিয়ে ছবি তোলা খুব সোজা। প্রথমেই হলো কি, সেইটে গেল হারিয়ে।"

"অ্যাঁ"—বৌদি চেঁচিয়ে ওঠেন—"সেটা হারিয়ে এসেছো? আমার বাবা দিয়েছিলেন চোদ্দবছরের জন্মদিনে—" কান্নায় গলা বুজে আসে বৌদির। আঁচল চোখে উঠে যায়। —দাদামণি ব্যাকুল—"আহা শোনোই না, এসে গেছে ক্যামেরা তোমার। হারিয়েছিল—পাওয়া গেছে। হয়েছে—?"

"তাই বল? এবার বল কী করে হারাল?" বৌদির চোখে জল, মুখে হাসি।

"তানাবেকে তো চেনো। কিন্তু তোশিওকে চেনো না। তোশিও-নো বিখ্যাত পণ্ডিত, সেও আসবে জানুয়ারির সেমিনারে। তখন দেখবে। তাদের দুজনের সঙ্গে যাচ্ছিলুম ইউয়াকি শহরে। পথে পড়ে কাজিওয়াতা। তোশিও-নোর ছেলেবেলার বাসা। সেখানে প্রচুর সামুরাই পরিবার বাস করে। মধ্যযুগীয় শহর। জাপানী ট্রাডিশনের খনি। তোশিও ভয়ানক ট্রাডিশন-পাগলা লোক, সেই আমার প্রধান গার্জেন ছিল ওখানে। সে আর তানাবে। ভালো ইংরিজি বলে, আমার দেখাশুনোর ভার তাদের ওপরেই ছিল। আমাদের সেমিনার চারদিনেই শেষ। তারপর টোকিও ছেড়ে চললুম উত্তর-পূর্ব জাপানের এই শহর ইউয়াকিতে। সেখানে একহপ্তার নেমন্তন্ন। কিন্তু তাদের কলেজ তখন বন্ধ। তাই তোশিও আর তানাবে ঠিক করেছিল আমাকে ক'দিন কেবল জাপান দেখাবে। জাপানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করাবে।"—দাদামণি ধোঁয়া ছাড়লেন।

"প্রথমটা, কাজিওয়াতা। নেমে দেখি হাতে ক্যামেরা নেই। সীটে রেখে এসেছি। এদিকে ট্রেন তো সুপারসনিক গতিতে উধাও। স্টেশনমাস্টারের ঘরে গেলুম তানাবের সঙ্গে। সে বিশাল এক খাতা বের করে লিখতে লাগল— নাম? ঠিকানা? বয়স? পাসপোর্ট নম্বর?—"

"আমি তো হারাইনি, আমার ডিটেলে কী হবে?"—নিয়ম। ক্যামেরার নাম?

বয়স? নম্বর? কটা ফিল্ম এক্সপোজড হয়েছে?"

সর্বনাশ। কুড়িটা, না উনিশটা; কিছুতেই মনে পড়ে না। কিন্তু ওটা জরুরী। ক্যামেরার বর্ণনা শুনে তানাবে বললে—"ওটা বরং ফেলে দাও। ও দিয়ে কী হবে? কত ভালো ভালো ক্যামেরা বেরিয়েছে, কিনে দেব তোমায়।"

"ও বাবা! আমার বউয়ের ক্যামেরা—"

"বউকে তুমি ভয় পাও?" অবাক চোখে তাকিয়ে তানাবে বলল।

"তুমি পাও না?"—তানাবে উত্তর না দিয়ে বলে—"এ-কথাটা তোশিও-নোর সামনে খবর্দার যেন বোলো না। তুমি কি জানো ও কেন গাড়ি চালায় না?"

"কেন? লাইসেন্স নেই বলে?"

"ডানহাত নাড়তে হবে বলে।"

"ডানহাত নাড়তে ওর অসুবিধা আছে?"

"নেই? ওরা খাস সামুরাই যে! ওর ঠাকুর্দা ঠাকুমা দাদামশাই দিদিমা চারজনেই সামুরাই বংশীয়। তাই।"

"তাই মানে?"

"সামুরাইদের ডানহাত চালানো মানেই তো তরওয়াল চালানো। এও জানো না?"

"তাই তো। তা তুমি তো গাড়ি চালাও।"

"আমি চালাবো না কেন? আমার তো কেবল দিদিমা সামুরাই বংশীয়া। বাকী সবাই চাষী। আমি দুহাত নাড়তে পারব না কেন?"

সত্যিই তো। চমৎকার লজিক।—"দুজনে তো একসঙ্গেই পড়াশুনো করেছ, একসঙ্গেই চাকরি করছ, অথচ তোমাদের মধ্যে এত তফাত?"

"তফাত থাকবে না? এটা তো ট্রাডিশনের কথা। ও সামুরাই। আমি কৃষক। এখন যদিও বেতন একই পাচ্ছি—তাতে ট্রাডিশন তো বদলায় না। ওটা হাজার বছরের ব্যাপার।" একটু থেমে তানাবে বলল—"তোশিওর বউ টোকিওয় কেন থাকে, জানো?"

"টোকিওতে থাকেন বুঝি? কেন?"

"কেননা তোশিও যখন ইউয়াকিতে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করল, ওর বউ বলেছিল— 'তার মানে, টোকিও ছেড়ে চলে যেতে হবে?' ব্যস। সেই থেকে তোশিওর বউ টোকিওতে, আর তোশিও ইউয়াকিতে। বউ পায়ে ধরেছিল, তবুও তোশিও ওকে সঙ্গে নেয়নি। এত স্পর্ধা, স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ইচ্ছে প্রকাশ করে? সেই শেষ। দশবছর তোশিও ইউয়াকিতে একা থাকে। বউ অনেকবার আসতে চেয়েছে-–কিন্তু স্বামীর সেই এক কথা। 'থাকো তুমি তোমার টোকিওয়।' ওকে যেন তুমি বোলো না তোমার বউয়ের ক্যামেরার জন্যে তুমি এমন করছ।"

তোশিওর পাণ্ডিত্যের প্রতি আগেই আমার সম্ভ্রম ছিল, এখন তো আরো বেড়ে গেল। সত্যি, পুরুষসিংহ একেই বলে। এমন না হলে স্বামী? শৌর্য, বীর্য আছে,

হ্যাঁ ! সামুরাইয়ের রক্তই বটে। ঝাড়া ৪৫ মিনিট ধরে ক্যামেরার আইডেনটিফিকেশনের ব্যবস্থা হলো। ইউয়াকি স্টেশনে খবর দেওয়া হবে। সেখানে প্রমাণ দাখিল করলে ক্যামেরা মিলতে পারে।

কাজিওয়াতা শহরের লোকেরা খুবই দুঃখিত, সেখানে মার্কিনরা বোমা ফেলতে ভুলে গেছে বলে। বোমা না-পড়ার দরুন, ওদের দারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে। মহা মুশকিলে পড়েছে তারা—অন্যসব শহরের দিব্যি উন্নতি হচ্ছে, ওদের বেলায় কচু। না রিমডেলিং না রেনোভেশন, না রিকনস্ট্রাকশন, নট কিচ্ছু। কোনোরকমের ডিভেলপমেন্ট প্ল্যানিং নেই। ফলে সামুরাই ঐতিহ্য ঘুণপোকার মতো কাজিওয়াতার ইটে-কাঠে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যের হাত থেকে রেহাই নেই শহরবাসীর। —তোশিও অবশ্য এতে খুবই খুশি, তাকে তো আর এখানে থাকতে হয় না।—

তানাবের কথা থেকে যা বুঝলুম, তার সারমর্ম এই।

মুরাসাকি একবর্ণ ইংরিজি জানে না। সে হচ্ছে তোশিওর সম্পর্কে ভাই, তারাও ভগ্নাংশ-সামুরাই। কাজিওয়াতা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সে-ই তার গাড়িতে। দিনের শেষে, মুরাসাকি জাপানীতে কিছু একটা বললো। যা শুনে তোশিও-তানাবে দ্বৈত কোরাসে গেয়ে উঠলো— "জোবান ?", এবং দুজনেরই মুখ স্বর্গীয় উদ্ভাসে আলোকিত হয়ে উঠল। তোশিও বললে—"চলো, চলো, চাকলাবাকলাতি,এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। মুরাসাকি আজ আমাদের একটা অসামান্য জিনিস দেখাবে। দারুণ ট্রাডিশনাল। জোবান !"

"সেটা আবার কী?

"স্পা !"

শহর থেকে বেশ দূরে। পাহাড়ের ঢালুতে, ছোটো সাদা দোতলা বাড়ি। গাড়ি থামতেই, এক রুক্ষমূর্তি জাপানী কোত্থেকে উদয় হয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

"ওকি ? ওকি ? গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে কেন ?"

"ও ঠিক আছে। পার্কিং করছে।" তানাবে সান্ত্বনা দেয়, "এটা একটা বড় হোটেল। চলো ভিতরে যাই।"

দোতলা বাড়িতে ঢুকতেই দুটি সিল্কের কিমোনোপরা সুন্দরী মেয়ে এসে একশোবার কোমর ভাঁজ করে নত, নম্র, বিনয়ী ভাবে, বিনা অনুমতিতে আমাদের পা থেকে জুতো-মোজাগুলো কেড়ে নিয়ে অন্য একরকম মোজা আর ঘাসের চটি পরিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাক—গাড়ি গেছে, এবার জুতোগুলোও গেল। কোথায় যে পার্কিং হতে চলে গেল কে জানে ? এরা দেখছি একবার এলে আর ফেরবার পথ রাখে না। একশো কুড়ি টাকা দামের জুতোটি খুইয়ে, এই ঘাসের চটি পরে কলকাতায় ফিরলে, তোমাদের বৌদি আমাকে আর আস্ত রাখবে না। একেই তো ক্যামেরা গেছে ! মনটা ভারী হয়ে রইল।

মেয়েদের সঙ্গে মুরাসাকির কথাবার্তা সব জাপানীতে হচ্ছে। তোশিও-তানাবে

এসে বললে—"চল, সব ঠিক হয়ে গেছে।" সঙ্গে একটি জাপানী মেয়ে এল পথ দেখাতে। আমরা গিয়ে লিফটে চড়লুম। লিফট উঠছে তো উঠছে। স্পষ্ট দেখেছি ছোটমতন সাদামতন দোতলা বাড়িটায় ঢুকলুম, পাহাড়ের গায়ে—আর এই লিফট তো উঠল সোজা পাঁচতলা। আশ্চর্য কাণ্ড। নেমে একটা টানেলের ভেতর দিয়ে যেতে লাগলুম আমরা, আগে আগে কিমোনোপরা মেয়েটি তুরতুর করে খরগোশের মতো পায়ে হাঁটছে। টানেলে বিজলীবাতি ফিট করা। টানেল দিয়ে বেরিয়ে আরেকটা লাউঞ্জ। আরেকটা লিফট। এবার এটাতে ঢুকলুম। এটা উঠল চোদ্দতলা। আমি প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছি। তানাবে নিজে নিজেই বললে—"উনিশতলায় আমাদের ঘর। এটা একটা হোটেল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এদিকে ওদিকে বিলডিংগুলো, টানেল দিয়ে দিয়ে জোড়া। এক একটা বিল্ডিংয়ের এক একরকম হাইট। কোনোটা দোতলা, কোনোটা সাত, কোনোটা চোদ্দ। বুঝেছ তো এবার?"

—"তা বুঝেছি। জাপানী ব্যাপার, সবই জলের মতো সোজা।" ঘরে পৌঁছুলুম। জাপানী স্টাইল ঘর। একদিকটা পুরো মোটা মাদুরে মোড়া। জানলায় ভর্তি দেওয়াল, কাচের বদলে কাগজের সার্সি। অন্যদিকটা পাইনকাঠের প্যানেলিং। ঘরের মধ্যিখানে দারুণ একটা গালার কাজ করা ড্রাগন-ডাইনোসর-সাপ আঁকা অপূর্ব জলচৌকির মতন টেবিল। চমৎকার কাগজের লণ্ঠন জ্বলছে।

"এইটেই তোমাদের ঘর।" দেখিয়ে দিয়ে, কোমর ভাঁজ করতে করতে পিছু হেঁটে সেই সুন্দরী বেয়ারা বেরিয়ে গেল। মুরাসাকি-তোশিও-তানাবে গিয়ে ঝটপট ক'খানা রংচঙে কিমোনো চড়িয়ে এল কোত্থেকে। এবার তারা বসে পড়ল টেবিল ঘিরে। আমিও কোটটি খুলে রেখে যেই বসেছি গিয়ে, তোশিও বললে—"এভাবে বসা মানেই কিন্তু ট্রাডিশনের অপমান। যাও, আগে কিমোনো পরে এস।" আমি যেই শার্টপ্যান্টের ওপরে কোটের মতো কিমোনোটি পরে এসেছি, ঘরে যেন বোমা পড়ল। তানাবে বলল—"শোনো, চাকলাবাকলাতি (ওরা চক্রবর্তী ওইভাবেই বলে) কিমোনোটা ওভারকোট নয়। অন্যান্য জামাকাপড় খুলে ওটাকে পরতে হয়।" আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে শার্ট প্যান্ট খুলে রেখে কিমোনো পরে এলুম। তোশিও-তানাবে চোখা-চোখি করলে। দুজনেই মাথা নাড়লে। ভুরু কুচকে সরু চোখ প্রায় বুজে ফেলে বললে—"কিমোনোর নিচে কেবল ভগবানের তৈরি চামড়াটুকুই থাকবার কথা, তোমার কিমোনোর নিচে ওসব কী?"—"কিছুই না। গেঞ্জিইজের"— বলতেই তানাবে বলে উঠল—"ছি ছি ছি। কিমোনোর নিচে গেঞ্জিইজের? এ যে ব্লাসফেমি! না না, শিগগির যাও, খুলে এস। তোশিও ভীষণ আপসেট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। ওদের আবার সামুরাই-রক্ত, কথায় কথায় গরম হয়ে যায়। আমাদের মতো চাষাভুষো তো নয়। মুরাসাকিও দুয়ের তিন ভাগ সামুরাই।"—

কী আর করা, ভগবানের চামড়ার ওপর কিমোনো পরে, ওই জলচৌকির পাশে

নতুন বৌয়ের মতো আড়ষ্ট হয়ে গুটিসুটি কোনোরকমে এসে বসলুম। দেখি দরজা খুলে গেছে। একের পরে এক খাঁদা বোঁচা পরমাসুন্দরী মেয়ে স্বপ্নের মতো কিমোনো পরে, অতিসুন্দর সব পাত্র বয়ে বয়ে ঘরে ঢুকছে। চারজন মেয়ে এসে বসল। টেবিল ভরে গেল খাদ্যে। সঙ্গে বেঁটে কুঁজোতে ভর্তি গরম গরম সাকে-মদ। খাবার-দাবারগুলো বেশিরভাগই কাঁচা। টেবিলে একটা উনুন মতনও রাখা হলো। তাতে কাঁচা মাংস নেড়ে চেড়ে পাতে দেয়। আর কাঁচা ডিম সদ্য ভেঙে বাটিতে ঢেলে দিয়েছে, তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতে হয়। সেটা সস। মেয়েগুলো মিষ্টি-মিষ্টি হাসে। আর কিচিরমিচির করে। আর মাথাটি হেলিয়ে দুলিয়ে কেবলই কুচো-গেলাসে সাকে-মদ ঢেলে ঢেলে হাতে তুলে দেয়। আপত্তি করা ট্রাডিশন বিরুদ্ধ। হাঁটু মুড়ে বসে বসে দোজো-দোমো কীসব বলতে বলতে ওই মেয়েরা খুদে পেয়ালা কেবল ভরেই যাচ্ছে। আমরাও পেয়ালা খালি করেই যাচ্ছি। 'সাকে' খাবার আবার নিয়মকানুন আছে। কাপে ঢেলে তো দিব্যি আমার হাতে তুলে দিল। আমি যেই একচুমুক খেলুম, অমনি দেখি মেয়েটা আমার হাত থেকে খপ করে গেলাসটি কেড়ে নিয়েছে। নিয়ে নিজেই তাতে চুমুক দিচ্ছে। একি রে বাবা! কিছু বুঝবার আগেই আবার কাপটি আমার হাতে ফেরত চলে এসেছে। আমি একচুমুক দি, আর সেই মেয়ে একচুমুক দেয়। তারপর কাপটি ভরে দেয়। এরা হচ্ছে সাকে খাওয়ানোর সাকী, পেয়ালা ভরে দেওয়াই এদের কাজ। খাচ্ছি তো খাচ্ছি, সাকে খেতে খেতে শরীর গরম, বেশ নেশা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। আর কাঁচা আনাজ কাঁচা মাছ খেতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হচ্ছে না। এমন সময়ে দেখি তোশিও-নো তার ডানহাতটা উপর দিকে তুলে ফেলেছে। কি সর্বনাশ। কেলেঙ্কারি কিছু ঘটবে নিশ্চয় এবারে। আর বাঁহাতটাকে বুক-পেটের মাঝামাঝি আড়াআড়িভাবে রেখেছে। বীরত্ব ফুটে বেরুচ্ছে ভঙ্গিতে। নিশ্বাস বন্ধ করে আছি।

দেখলুম কিছুই হলো না। বেঁটে বেঁটে মিঠে মিঠে মেয়েগুলো থালাবাটি তুলে নিয়ে পেছু হেঁটে হেঁটে গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তোশিও-নো হাতটি নামিয়ে নিয়েই, আবার ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে ধরল। আমি ভাবলুম, এবার বোধহয় আমাদেরই গুটি গুটি পেছু হটে বেরিয়ে যেতে বলছে। কিন্তু, না। দেখি দরজা খুলে গেল। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে মেয়েগুলি খুরখুর তুরতুর করে আবার ঘরে ঢুকছে। চায়ের নিয়মকানুন আলাদা। অত দোজো-দোমো করে সেধে সেধে চেপেচুপে খাওয়ানো নেই, পেয়ালা কেড়ে নিয়ে তেড়ে এসে চুমুক দিয়ে দেওয়াও নেই। সাকের বেলায় যেমন ছিল। নির্ভয়েই চা-পান-পর্ব শেষ হলো। তবে চা-টা জলপাই-সবুজ রঙের। আর বুনো কষা স্বাদের। খেয়ে ভুলেও মনে হয় না চা খেলুম। তায় দুধ চিনি কিছু নেই। চীনে চা'র মতো জুঁইফুল পর্যন্ত না। উপরন্তু সর্বক্ষণ উঁচু হয়ে হাঁটু ভাঁজ করে নীলডাউন ভঙ্গিতে বসে থাকা জাপানের সামুরাই ট্রাডিশন রাখতে কি আর বাঙালী কেরানী আমরা পারি? চা খাওয়া শেষ হতেই তোশিও-নো

এক্কেবারে সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন—দুই পা ফাঁক করে দুই হাত আকাশে তুলে ইংরিজি 'এক্স' অক্ষরের মতো চেহারা করে তিড়িক্ তিড়িক্ করে দুবার লাফালেন মেঝের ওপরে—ঘরে বেশ ভাইব্রেশন জাগলো। মুখে ইংরিজিতে মিলিটারি সুরে অর্ডার করলেন—"নাউ টু দ্য বাথ!" অমনি তানাবে এবং সেই শহরের নীরব অধ্যাপক মুরাসাকিও একবার ঠিক ঐভাবে নেচে উঠল—

"টু দ্য বাথ! টু দ্য বাথ!" যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। আমিও দেখাদেখি লাফাব বলে যেই উঠতে গেছি, উঠব কি, মুখ থুবড়ে পড়লুম মেঝের ওপরে। অতক্ষণ উপুড় হয়ে হাঁটু মুড়ে নীলডাউন হয়ে বসে থাকা।— দুটি পা জন্মের শোধ ঐ ভঙ্গিতেই রুদ্ধ হয়ে গেছে। ভাঁজ খোলে কার সাধ্যি! তা তিনবারের বার যেই পা সোজা হলো, অমনি তোশিও-র মতো করে দুবার ধুপ ধাপ লাফিয়ে নিলুম। লাফটা অত্যাবশ্যক। বোঝাই গেল। পাগুলো সোজা করবার জন্যে। মেয়েরা সব দোর ঠেলে বেরিয়ে খুরখুর তুরতুর করে হেঁটে আগে আগে যেতে লাগলো, পিছু পিছু মার্চ করে চলছি আমরা। প্রথমে তোশিও-নো, তার পিছনে তানাবে, তার পিছনে আমি। আমার পিছনে মুরাসাকি। রহস্যময় কাঠের তৈরি টানেল, আধো-আলো থেকে আধো-অন্ধকারে। এঁকে বেঁকে চলেছে তো চলেইছে পাহাড়ের বুকের মধ্যে। আমরাও মার্চ করতে করতে যাচ্ছি। একটা লিফটের কাছে এসে রাস্তাটা বৈঠকখানা হয়ে গিয়ে শেষ হলো। লিফটে উঠে স্পষ্ট দেখলুম : বাইশতলার নিচে জি-ফ্লোর, তারও নিচে ও-ফ্লোর, সেই বোতাম টেপা হলো। অথচ আসার সময় সাদাচোখে স্পষ্ট দেখেছি, চোদ্দতলা উঠলুম। নামছি চব্বিশ তলা। এটা কেমন করে হচ্ছে?

সাকে-টা বড্ড বেশি হয়ে গেছে নাকি? খুদে খুদে পেয়ালা বলে টের পাওয়া যায় না তেজটা কী প্রচণ্ড। ও-ফ্লোরে নেমে দেখি সামনেই এক সুবিশাল জলকুণ্ড। উঁহু, সুইমিং পুল না, কুণ্ড! কুণ্ডটা ভাগ ভাগ করা আছে, জলের নিচে চৌকো চৌকো দেওয়াল, তার ওপর দিয়ে জল চলাচল করছে। ওখানে পৌঁছে গিয়ে মেয়েরা বিদায় নিয়ে গেল। তোশিও-নো, তানাবে, মুরাসাকি খপাখপ তাদের কিমোনো খুলে ফেলে ঝপাং ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরনে ভাগবতী চামড়া।

আমি আর কী করি? "যা থাকে কপালে" বলে আমিও চোখ বন্ধ করে কিমোনো খুলে সামনের কুণ্ডটায় ঝাঁপিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বার্ড স্যাংচুয়ারির মতো কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল—তোশিও-নো ওদিক থেকে হেঁকে উঠলেন, "ওখানে নয়, এদিকে এস। ওটা হলো লেডিস কুণ্ড।" আমি তো পালাতে পথ পাই না —তাড়াতাড়ি উঠে পাশের কুণ্ডে ঢুকে পড়ি। শিগগিরই দেখলাম লেডিসরাও এসে কিমোনো খুলে ফেলে ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কুণ্ডে। এত স্ত্রী-পুং কুণ্ড ভাগাভাগির উদ্দেশ্য আর যাই হোক, স্নাতকদের লজ্জা নিবারণ নয়। কেননা মাটির ওপরে যা কিছু লিঙ্গভেদের বন্দোবস্ত তা কেবল মেঝের ওপরে লাইন টেনে। শুধুই তাত্ত্বিক ভেদ, থিওরেটিকাল ডিসটিংশন। পর্দা বা দেয়ালের মতো জাগতিক আড়াল-

আবডালের বালাই নেই। দেয়াল যা কিছু জলের নিচে। আর জল তো নয়, অগ্নিকুণ্ড। গন্ধকের হলদে ধোঁয়ায় বাতাস আবছা, দৃষ্টি অস্পষ্ট, ওটুকুই আব্রু। চোখের দৃষ্টি কেবলই ঝাপসা হয়ে যায়। চতুর্দিকে হলদে হলদে গন্ধকচূর্ণ জমে আছে পাথরের ওপরে। আর গন্ধকবাষ্পের কড়া গন্ধে নাক ভরপুর। অথচ এতটুকু শ্বাসকষ্ট নেই। জল এত গরম, যে মনে হলো একদম ঝলসে গেছি—এক লহমার মধ্যেই সাকে খাওয়ার যা যা কিছু নেশা সব ছুটে গিয়ে হাড়েমজ্জায় ঝনঝনে জ্ঞানগম্যি এসে গেল।

যখন তোশিও-নো জল ছেড়ে উঠলো, পেছু পেছু আমরাও উঠলুম ডাঙায়। কেউ কারুর দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছি না, আড়ে আড়ে। প্রত্যেকেই দেখছি প্রত্যেকের চেহারা ঠিক তেলে-ভাজা চিংড়ি মাছের মতন। লাল টকটক করছে। ভগবানের চামড়া। গন্ধকের ধোঁয়ায় অবশ্য সবাই কিছুটা আচ্ছন্ন। কিমোনো নিতে গিয়ে দেখি কিমোনো কখন হাওয়া হয়ে গেছে। অ্যাঁ! এবারে কি তবে বিনা কিমোনোতেই ফিরে যেতে হবে? আমি তো বসে পড়েছি প্রায় মাটিতে—এমন সময়ে দেখি মস্ত সাদা একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ অন্তরীক্ষ থেকে। প্রত্যেককে একটা। তোয়ালে লুফে নিয়ে গা মুছে তোয়ালে জড়িয়ে গুটিগুটি এগোচ্ছি, তোশিও বলল—"ওকি! ওকি! তোয়ালে রেখে যাও।"

তোয়ালে রেখে? তানাবে, মুরাসাকি ঝড়াঝঝড় তোয়ালে মাটিতে ফেলে দিলে। অন্তরীক্ষ থেকে ফর্সা কাচা কিমোনো এসে গেল তাদের হাতে। বেঁটেখাটো একরঙা কিমোনো—গতবারের মতন রংচঙে বড়সড় নয়। দেখাদেখি আমিও। তবু ভালো, যাহোক একটা জামা পরে যাওয়া হবে ঘরে, অন্তত। গেঞ্জি-ইজের প্রভৃতি তো অনেকক্ষণই হলো বিস্মৃত দিনের উপকথায় পরিণত হয়েছে। তবু স্বীকার করতেই হবে, শরীর বেশ চনচনে মনে হয়েছে এই গন্ধককুণ্ডের জলস্পর্শে। পাতালের আগুন থেকে উঠে-আসা-জল—সেকি সোজা ব্যাপার?

আমরা পুনরায় মার্চ করতে করতে গিয়ে লিফটে চড়লুম। এবার উঠলুম উনিশতলা। নাঃ—মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে যাবে এবারে। আমার অবস্থা দেখে তানাবের মায়া হলো। ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিলো। এদের আসলে অনেকগুলো লিফট আছে, একেকটা একেক রকম লেভলে যাতায়াত করে। প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন লিফটে চড়ছি বলে ভিন্ন ভিন্ন তলার হিসেব পাচ্ছি। পাহাড় কেটে কেটে ঘরবাড়ি তো একেক হাইটে এক এক তলা।

ঘরে এসে পৌঁছেই দেখি মাটিতে পাতা হয়ে গেছে চমৎকার বিছানা। ঠিক যেমন দেশের বাড়িতে বিছানা হয়। মেঝেয় একটি তোষক, তাতে সাদা ধবধবে চাদর মোড়া, দুটি বালিশ, তাতে সাদা ধবধবে ওয়াড় পরানো; একটি লেপ—তাতেও দুগ্ধ-ধবল ওয়াড়। বালিশের নিচে ফর্সা কিমোনো ভাঁজ করা। দেখেই আরাম হলো। পর পর চারখানা মাদুরে চারখানা বিছানা। শুয়ে পড়ব ভাবছি। কথাটা বলতেই

তোশিও— "শোবে মানে? স্নান করতে হবে না?"

—"আবার স্নান? এতক্ষণ তবে কী করলুম—"

—"ওটাকে ধুতে হবে না? গা-ময় গন্ধকচূর্ণ বসে গেলে ঘা হয়ে যাবে যে!" বলেই লেফট-রাইট করে তোশিও বাথরুমে চলল। তানাবে আমাকে বললে—"যাও, তুমিও যাও, টু অ্যাট এ টাইম।"—এ আবার কিরকম নিয়ম রে বাবা? একা একা কি বাথরুমে যাওয়াও বারণ? বাথরুমে ঢুকে দেখি আশ্চর্য ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুটি বিশাল স্টীলের বালতি। অর্থাৎ বালতির মতো আকৃতির টব। খালি। তার পাশে দুটি টেলিফোন। ঘরে ঢুকেই কিমোনো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোশিও-নো ফোন তুলে কিছু কথাবার্তা বলল। দেখলুম এ-ঘরে থরে থরে পরিষ্কার তোয়ালে সাজানো আছে। বাঃ। এবং কিছু কিমোনোও। তোশিও দেখি টবের মধ্যে ঢুকে উবু হয়ে বসেছে। টবের কিনারা দিয়ে মাথাটি উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে। অন্য টবে আমিও বসলুম। হঠাৎ দেখি বালতি আপনা আপনি গরম জলে ভরে উঠছে। তলা থেকে জল উঠে গলা পর্যন্ত ভরেই থেমে গেল। আমাকে কোনো কল খুলতে হলো না, মগটগের তো বালাই নেই। জলে কেমন-কেমন গন্ধ?

—"এটা যে ওই স্পা থেকে। কুণ্ডের জল কিনা।" তোশিও বলল। আমি তো থ!

—ঘরেই আসে? তবে কেন অত কষ্ট করে চব্বিশ তলা ঠেঙিয়ে পাতাল-প্রবেশ, এবং সর্বসমক্ষে কিমোনো ত্যাগ? দিব্যি বন্ধ দরজার ভেতরে বালতি করে চলে আসছে যখন, প্রথমেই তো এখানে নেয়ে নিলে হতো।

—"দূর, তা কখনো হয়? ট্রাডিশন বলে একটা ব্যাপার আছে না? তোমার কিছু খেয়াল থাকে না, কুণ্ডস্নান একটা ট্রেডিশনাল কাস্টম? এখানে ওই জল পাইপে করে আনা হচ্ছে, তার কারণ ওই জল না হলে গা থেকে গন্ধকের গুঁড়ো উঠবে না।"—এক সময়ে ঐ জল আবার আপনা আপনি নেমে গেল, বালতি খালি হয়ে গেল। যেন ম্যাজিক। কোথা দিয়ে যে আসছে, কোথা দিয়ে যে যাচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছি না। জলটা যেন জ্যান্ত।

—"এবার ফ্রেশ ওয়াটার।"

—"সাবান? সাবান আছে?"

—"সাবান ব্যবহার করা ট্রাডিশনে নেই।"

—"আই সী। ফ্রেশ ওয়াটার এলেন। ফ্রেশ ওয়াটার গেলেন। দিব্যি ঝরঝরে লাগছে। লাফিয়ে উঠে পড়ছি, তোশিও-নো ডান হাত নেড়ে ফেললেন। আমার বাঁ হাতটি ডানহাতে বজ্রমুষ্টিতে ধরে এক ঝাঁকুনিতে ফের বসিয়ে দিলেন বালতিতে। "এইবারে আসল স্নান। এলিকশির অফ বাথ। এইবারে যে জলটা আসবে সেটা হচ্ছে পিওর কপার মিশ্রিত। বিশুদ্ধ তাম্রলিপ্ত জলে স্নান করলে তবেই তো গন্ধক-কুণ্ডে স্নানের পূর্ণ উপকারটা পাবে?"

—জল আসতে শুরু করেছে। আপাদমস্তক কথাটার মানে বোঝা যাচ্ছে, পা থেকে জল উঠছে। আপাদস্কন্ধ উঠবে।—"গাউথামা বুদার নির্দিষ্ট প্রণালীতে এই রিচুয়াল বাথটা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ তো তোমাদের দেশেরই, 'অ্যাব্যা-গ্যায়ানা' বাথ। তোমাদের মন্দিরে এসব ব্যবস্থা নেই?" মনের আনন্দে ডুবতে ডুবতে তোশিও বলল। ও হরি! এর নাম অবগাহন? গৌতম বুদ্ধের প্রণালী?

"আমাদের দেশে এসব যন্ত্রপাতি এখনো পৌঁছয়নি। ডিভেলপিং কান্ট্রি। এখনও বানাতে শিখিনি।"

—"আড়াই হাজার বছরেও বানাতে শেখনি? তাজ্জব কথা!" থুপে থুপে গা মুছতে মুছতে তোশিও বলল। লজ্জায় চুপ করে যাই।

ঘরে ফিরেই চমৎকৃত। দেখি তানাবে-মুরাসাকি দুজনেই ঝাঁ চকচকে উলঙ্গ, তারাও পাশের বাথরুমে গিয়ে দ্বৈত-স্নান সেরে এসেছে। জোড়ায় জোড়ায় নাইতে হয় এখানে। আপাতত তারা গম্ভীর মুখে কিমোনো ভাঁজ করছে। বালিশের নিচে যত্ন করে কিমোনোটি রেখে তারা মিষ্টি হেসে শুভরাত্রি বলে শুয়ে পড়ল। আমার আর লজ্জা করবে কি।

—"এ জন্মের মতো আর হয়ে গেছে যা হবার।" এমন-কী লেডিস কুণ্ডে পর্যন্ত নেমে পড়েছি। আমি ফিসফিসিয়ে তোশিওকে বললাম—

—"এবার গেঞ্জি-টেঞ্জি ইজের-টিজেরগুলো পরে নিলে কি ট্রাডিশনের অবমাননা করা হবে?"

—"পরতে পারো কিন্তু কেন পরবে?" তারপর তানাবের দিকে লক্ষ্য করে বলল—"ওরা চাষাভুষো মানুষ। লজ্জা শরমের বালাই নেই, কিমোনো খুলে ফেলেছে। ছি ছি ছি!"

—"তুমি বুঝি কিমোনো পরেই ঘুমোও?"

—"দুর কিমোনো পরে কেউ ঘুমোয়? আমি লেপের নিচে ঢুকে খুলে রাখব। সেটাই সভ্যতা।"

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি সবাই প্রস্তুত। জলচৌকিতে জাপানী ব্রেকফাস্ট চলে এল। কাঁচা মাছ, কাঁচা ডিম, গরম সুপ, গরম ভাত, পাঁপরভাজার মতন কুড়মুড়ে সবুজ শ্যাওলা ভাজা। শসার আচার। খেয়ে দেয়ে রওনা দিলুম। জুতোজামা রাখা ছিল যেখানে, সেখানে যেতেই ট্রেতে করে তত্ত্বের মতো সযত্নে সাজিয়ে বিল এলো। তোশিও-তানাবে, আমি এবং মুরাসাকি, সকলে মিলে বিল নিয়ে কিঞ্চিৎ কাড়াকাড়ি চলল— শেষটায় মুরাসাকিই দিয়ে দিলে। কেননা সেইটেই নাকি ট্রাডিশন। ওটা ওরই শহর, আমরা ওর অতিথি। জাপানী ভাষায় বিলটা লেখা ছিল, তাই কাড়াকাড়ি করলেও বিলটা যে কত তার বিন্দু-বিসর্গও আমি বুঝতে পারিনি। ছবির মতো সুন্দর বিল, হ্যাণ্ডমেড পেপারে তুলি দিয়ে আঁকা। যেন বাঁশের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার জন্য।

জোবান থেকে কাজিওয়াতা। সেখানে মুরাসাকিকে বিদায় দিয়ে আমরা ট্রেনে

উঠলুম, ইউয়াকি। ইউয়াকি স্টেশনে নেমে তানাবে মনে করিয়ে দিল—"হারানো ক্যামেরা পুনরুদ্ধার করবে না? বের কর তোমার কাগজপত্তর পাসপোর্ট কমপ্লেনের কপি।" এসব সময়ে তোশিও-নো অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। এবম্বিধ তুচ্ছ ব্যাপারে মন দেওয়া সামুরাইদের যোগ্য নয়। তানাবে বলল,—"তুমি কাগজপত্র বের কর, আমি একটু মেনস রুম থেকে ঘুরে আসছি।"

—আমি স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে "গুড ইভনিং" বলতেই সে বলে উঠল, —"কামেলা?" এবং ড্রয়ার খুলে তোদের বৌদির বক্স ক্যামেরাটি বের করে দিয়ে এক গাল হেসে বললে—"তু ওলদ। নিউ বাই।" আমি তাড়াতাড়ি বললুম — "আইডেন্টিফিকেশন? পাসপোর্ট নম্বর? এক্সপোজার নম্বর? পেপার্স?" স্টেশন-মাস্টার হেসেই কূল পায় না। গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে।—"হোয়াত আইদেনতিফিকেশন? ইউ ইনদিয়ান। আই নো ইনদিয়ান লস্ত ওলদ কামেলা।" সত্যিই তো? আমার চামড়াই তো আমার আইডেনটিটি। এই সুদুর উত্তর-পূর্ব জাপানী মফঃস্বল শহরে আর কজন ভারতীয় এসে বক্স ক্যামেরা হারাচ্ছে? আর এর জন্যে কি না এত ঝামেলা কাজিওয়াতাতে— ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট গেছে ফর্ম ভরতে। বেরিয়ে দেখি তোশিও আর তানাবে কী সব পরামর্শ করছে। আমাকে বললে, "ক্যামেরা পেয়েছ তো? চলো, বাড়িতে গিয়ে সব কথা হবে।" কিসের পরামর্শ? গাড়িতে যেতে যেতেই প্রশ্ন করি। ব্যাপার কি? তানাবে বললে, "মুরাসাকি যদিও বিলটা দিয়েছে, কিন্তু বিল হয়েছে বিরাট। ওটা কোনো একজনের স্কন্ধে ফেলে দেওয়া যায় না। এখন ওকে কীভাবে আমরা আমাদের অংশটা শোধ করতে পারি, ট্রাডিশন অনুযায়ী, তোশিওকে তাই জিজ্ঞেস করছি। আমরা চাষাভূষো লোক— আমরা অত আদব কায়দা জানি না তো? তিনজনে মিলে এক লক্ষ কুড়ি হাজার ইয়েন পাঠালেই হিসেবটা এক হবে, এইটুকু বলতে পারি আর কি।" (অর্থাৎ চার হাজার টাকা।) তোশিও-নো গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—"চিঠি লিখতে হবে। লিখতে হবে —তোমার যত্ন-আত্তিতে এবং অতিথি সৎকারে আমরা তৃপ্ত। যারপরনাই খুশি হয়ে এই টাকাটা সেই বিমল আনন্দের প্রকাশস্বরূপ তোমাকে পাঠাচ্ছি।—ওনলি অ্যাজ এ টোকেন অব আওয়ার জেনুইন অ্যাপ্রিসিয়েশন"—অর্থাৎ বখশিশ? বন্ধুর আতিথ্যের শেয়ার দেওয়া মানে ট্রাডিশনের অবমাননা। কিন্তু বখশিশ? সামুরাইদের বার্থরাইট ওটা।

আবার চমৎকার হ্যাণ্ডমেড পেপারে ছবির মতো অক্ষরে তুলির মতো কলমে লেখা হলো সেই কিম্ভূত চিঠি। এবার সই করার পালা। বলাবাহুল্য, প্রথমেই তোশিও। তারপরে আমি, যেহেতু আমি চক্রবর্তী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, যারা রাজ্য-শাসনও করত —সেহেতু সামুরাইয়ের পরেই জাতিগতভাবে আমার স্থান উচ্চে। সবার শেষে তানাবে। (ব্যাটা চাষা)—"আমি কি বাংলাতেই সই করব?" তোশিও বললে, "না! বাংলা কেন, কোনো ভাষাতেই তুমি এ চিঠি সই করতে পার না। কেননা এটা জাপানী

ভাষায় লেখা। এবং তুমি জাপানী পড়তে পার না। যে ভাষা তুমি পড়তে পার না, সে ভাষায় লেখা কোনো ডকুমেন্টেই আমরা তোমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে পারি না। সেটা বে-আইনী।" —তবে? এইমাত্র আমার অংশটা আমি শুধে দিয়েছি —যা কিছু বক্তৃতার দক্ষিণাস্বরূপ জুটেছিল, সবটা গেছে ট্রাডিশনের দয়ায়, জোবানের গন্ধকের বাষ্পে! এখন সইও করতে পারব না?—"তাহলে আমি কি তাকে আলাদা ইংরেজিতে চিঠি দেব?" এবারে তানাবে হাসল—"ও কি ইংরিজি জানে?" "তাই তো! তবে?"

—"তবে আর কি? তোমার নামটা আমিই সই করে দিচ্ছি জাপানী ভাষাতে। তাহলে আর কোনো গণ্ডগোল হবে না।" গুরুগম্ভীর রায় দিলেন সামুরাই তোশিও-নো। আমার বদলে—তিনি সই করলে সেটা যদি বে-আইনী না হয় তাতে আমার আর বলবার কিছুই থাকে না।

হাসিমুখে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কেবল আমার মুখের হাসিটি উবে গেল। —"এত বেশি খরচ হলে আর কোনো ভালো জিনিসকেই কি ভালো লাগে?" —আশ্চর্য কথা—তানাবে-তোশিও দুজনেই আমার এ দুঃখুটা কিন্তু দিব্যি বুঝতে পারলে। কি চাষা, কি সামুরাই বেশি খরচের দুঃখটা সবাই বোঝে।—"আমার গাড়িটার মতন হলো আর কি।" তোশিও বলে।

—"গাড়ি? তোশিও-নো, তুমি গাড়ি চালাও না শুনেছিলুম যে?"

—"গাড়ি চালায় না ঠিকই। তা বলে গাড়ি থাকবে না কেন? কোনো ইউনিভার্সিটি প্রফেসারের গাড়ি নেই, এটা লজ্জার কথা!" তোশিওর হয়ে তানাবেই উত্তর দেয়। —"যেমন তেমন গাড়িও নয় তোশিও-নোর। স্পেশাল অর্ডার দেয়া গাড়ি। দেখতে যাবে একদিন?"

—"বেশ তো। আজই চল না। গাড়িও দেখবে, চাও খাবে।" তোশিও নেমন্তন্ন করলে।

বিকেলে গেলুম। সত্যিই দারুণ গাড়ি। গ্যারাজ আলো করে আছে।

ভেতরে ছোট রেফ্রিজারেটর ফিট করা। তাতে বরফের ট্রেতে গোলগোল আঙুরের মতো বরফ জমেছে। ছোট্ট কাবার্ডে দামী স্কচ, গেলাস সাজানো! গদির মতো কার্পেট মোড়া গাড়ির ভেতরটা। সামনে ড্যাশবোর্ডে ছোট টেলিভিশনে রঙিন জাপানী নাটক হচ্ছে। পাশে একটা কুলুঙ্গিতে কার্পেটের সঙ্গে রং মেলানো টেলিফোন। ঠিক খেলনার মতন। ছোট্ট।

—"ফোনটা সত্যিকারের?"

—"এখান থেকে বাড়িতে ফোন করতে পারো। করবে? নিউইয়র্ক অসলো সব পাওয়া যায়।"

আমি তো হাঁ। এমন গাড়িখানা, অথচ তোশিও অফিসে আসে ট্রেনে, বাসে? ব্যাপার কি? ওই ব্যাপার। গাড়ি চালানোর মতো নীচকর্ম সামুরাই করে না। কিন্তু

শোফার রাখার মতো বেতনও বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না। তার ওপর গাড়ির মেইনটেনেন্স খরচ আছে না? দু' দুবার পুরো কার্পেট, আপহোলস্ট্রি, ফ্রিজ, টিভি, বদলাতে হয়েছে না?

—"কেন? আউট অব ডেট হয়ে যায় বুঝি?" আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

—"তা নয়। মানে বাড়িটা তো সমুদ্রের ধারে। দু'দুবারই টাইফুনে সমুদ্রে বান ডেকে, গ্যারাজসুদ্ধ গাড়ি জলের নিচে ডুবে গেছিল! তাই বদলাতে হয়েছে।"

—"এঞ্জিন আছে?" হঠাৎ কি মনে করে বলি।

—"নেই? বাঃ! তবে আর গাড়ি কেন? বাড়ি হয়ে যাবে তো। তানাবে, দেখিয়ে দাও তো স্টার্ট দিয়ে"— তোশিওর স্বরে আহত সম্মানের ছোঁয়া।

—"থাক, থাক। আর দেখাতে হবে না। এই গাড়িটা ব্যবহারে লাগে না এটা বড়ই দুঃখ কিন্তু?"

—"কে বললে কাজে লাগে না? এই তো কাজে লাগছে।" হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে তোশিও বলে। "দিব্যি ভালো একটুখানি জায়গা এয়ারকনডিশন করলেই চলে যায়, বেশ 'কোজি', এন্টারটেইন করার পক্ষে মন্দ কি?"

অর্থাৎ এটা ওর গাড়ি নয়, বাড়িই। ওর বৈঠকখানা আসলে। ভালো।

তানাবে বললে, "জোবানে বড্ডই খরচ হয়ে গেছে। চাকলাবাকলাতির জন্যে আমাদের একবার সুজিকিতে যেতেই হবে। চল, কালই সুজিকি যাই।" আমি হাঁ হাঁ করে বাধা দিই— "আর ভাই কোথাও যাব না। খুব ভালো লাগছে জাপানে। কিন্তু হাতে টাকা নেই। আরও তো তিন-চারদিন থাকতে হবে।"

—"টাকা লাগবে না। সুজিকি তো জাপানের মহারাজার অতিথিশালা। ৯০০ অব্দ থেকে এখানে মাত্র এক টাকা করে নামমাত্র সেলামী লাগে। খেতেও একটাকা। শুতেও একটাকা। চল, চল, খুব সুন্দর জায়গা। ট্র্যাডিশনাল অতিথিশালা কাকে বলে দেখে আসবে।" শুনে খুব উৎসাহ পেলুম। শহরে থাকলেই বরং খেতে শুতে ঢের বেশি খরচ। তার চেয়ে ওখানেই দু-তিনদিন কাটিয়ে আসা ভালো। তানাবে বললে —"কাল লাঞ্চের পরই বেরিয়ে পড়ব।"

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে একটি ছোট টিলার ওপারে বনের মধ্যে কাঠের বাড়ি। চমৎকার প্যাগোডার মতো দেখতে। কাঠের থাম। দরজা। খিলেন। ঘরে বিরাট প্রদীপ জ্বলছে।—লালেতে কালোতে সোনাতে কাঠের ওপর গালার কারুকার্য করা বারান্দা। অপরূপ বারান্দা। পুরোনো বলে পুরোনো? বলে দিতে হয় না, যে ৯০০ অব্দের। বিদ্যুৎ নেই। সবকিছু সেই পুরোনো দিনের মতোই। খুব সম্ভ্রান্ত ঘরদোর। খুব ট্র্যাডিশনাল। তোশিও মহা তৃপ্ত।—"এখানকার খাদ্যও আধুনিক নয়। ৯০০ অব্দের মেনু অনুযায়ী রান্না হয় এখানে।" বাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে এক থুত্থুরে বুড়ো আর তার থুত্থুরী বুড়ী পাহারা দেয় বাড়িটার। বেলা চারটেয় পৌঁছেছি।

বুড়ী রাগ করে বললে—"এত বেলায় এলে, ডিনার দিতে দিতে রাত ৯টা হয়ে যাবে। তা যাক, এখন চা খাও।"

—"এরাও কি ৯০০ অব্দ থেকে আছে?"

—"তা বলতে পারো, এরা আছে নব্বুই বছর। কিন্তু এই কাঠুরের পরিবারই এই জায়গার ট্রাডিশনাল খবরদারি করে আসছে সেই ৯০০ অব্দ থেকে। পূর্বপুরুষের অধিকারক্রমে এরা চাকরি করে যাচ্ছে।"

—"বুড়ো মারা গেলে কী হবে? ছেলেপুলে আছে?"

—"আছে। শহরে চাকরি করে। বুড়ো মরলে তাকে এই বনে এসে এই কাজ নিতে হবে। কিন্তু সে নিতে চায় না। তার বউও।" হঠাৎ তানাবে থেমে গেল। তোশিও সূত্রটা তুলে নেয়—

—"তার বউও ঠিক আমার বউয়ের মতো খুব শহর ভালোবাসে। কিন্তু ছেলেটা আমার মতো নয়। তাই সেও শহরে থেকে গেছে বউয়ের কিমোনোর পিঠে ওবি হয়ে। যত মেনিমুখো ছেলে। হুঁ,"—নাক দিয়ে বিশ্রী শব্দ করে অবজ্ঞা প্রকাশ করা তোশিওর মুদ্রাদোষ।

—"মেয়েদের কথায় চলেছ কি প্রলয় অনিবার্য। মেয়েরা থাকবে মেয়েদের মতো। এই যে তানাবে, বৌকে চাবি দিয়ে রাখে—ঠিক করে। ওরা চাষা—ওদের সব ব্যাপার সোজাসুজি। এটা কিন্তু খুব প্রশংসার।"

—"এই কাঠের বাড়িটার কড়ি-বরগাগুলো দেখেছো? এই যে দামী কাগজের লণ্ঠন? এই যে মাদুর?"—নির্বিকার গলায় ঠিক এই সময়ে তানাবে আমাকে রাজ-অতিথিশালার ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে থাকে। কড়িবরগা দেখব কি? তোশিওর কথা শুনে তো আমি হাঁ! শিষ্ট, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ঐ তানাবে, সে কিনা বৌকে চাবি দিয়ে রাখে? অথচ বেশ তো সুস্থ স্বাভাবিক দেখায় ওকে! বেচারী বউয়ের অপরাধ সে পরমা সুন্দরী!

আশ্চর্য দেশ বটে জাপান! ছোট শহরে ইউয়াকিতে এই চলেছে, অথচ টোকিওতে দেখে এলুম একটা রেস্তরাঁ হয়েছে গিনজাতে, টোকিওর চৌরঙ্গী, যেখানে স্বাধীন মেয়েরা এসে নিয়মিত সন্ধ্যাবেলা তাদের পুরুষসঙ্গী ভাড়া করে নিয়ে যায়। ওটাও যে দেশে চলছে তোশিও-তানাবের বউশাসনের চাষী-সামুরাই ডিরেকট মেথডও সেখানেই চলছে। সত্যি, কী ভুলই যে করেছি জাপানী মেয়ে বিয়ে না-করে। তোদের বউদি তো পারলে আমাকেই চাবি দিয়ে রাখে, নেহাত আপিস যেতেই হয় তাই!"

—"তা, আনলে না কেন একটা জাপানী বউ ধরে? তবু তো লোকে দেখত একটা কিছু আনলো। চাবি দেব না আরো কিছু—যা গুণবান দাদামণিটি তোমাদের। এক্ষুনি আমি দাতব্য করে দিচ্ছি, দেখবি কেউ ওকে ভুলেও নেবে না। ঈঈশশ্"

বৌদি ফোঁস করে উঠতেই দাদা বেগতিক বুঝে আবার গল্প ফেঁদে ফেলেন—

—"আমি স্তম্ভিত, ওদিকে তানাবে দিব্যি শান্ত মুখে বলে যাচ্ছে— "এই যে

কাঠের জলচৌকিটা দেখছ, এটা তৈরি হয়েছে হিরোসাকিতে। বিখ্যাত মধ্যযুগীয় শিক্ষাকেন্দ্র। অবশ্য আপাতত আপেল চাষের জন্যই বিখ্যাত।''—''সামুরাইদের আড্ডা বলেও প্রসিদ্ধ ছিল ওটা''—তোশিও যোগ করে দেয়। কী স্বাভাবিকভাবেই না ওরা বউ-ত্যাগ, বউ-বন্দীর প্রসঙ্গ আলোচনা করে!

বিচ্ছিরি সবুজ চা খেয়ে বারান্দায় এসে বসলুম। চারিদিকে জাপানী জঙ্গল, তাতে চমৎকার সব জাপানী পোকামাকড় ডাকছে, পটে আঁকা ধানক্ষেত, গ্রাম আরো দূরে, প্রশান্ত মহাসমুদ্র দেখা যাচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে যায়। ক্রমশ রাত হলো। ৯টার সময়ে খাবার এসে পড়ল। খাবার মানে একটা ভাতের ফ্যানের মতন সুপ, ওরা বলল বাকহুইট হচ্ছে খুব শক্ত দানার একরকম শস্য, গমেরই জাতভাই, তবে মানুষে আজকাল ওটা বড় একটা খায় না।—''মধ্যযুগের জাপানে খুব খেত। আজকাল কষ্ট করে যোগাড় করতে হয়।'' —তোশিও জানালেন সগর্বে। ''সেদ্ধ হতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।''—

—''প্রেশারকুকার নেই?''

—চাবুক মারলে যেমন কুঁকড়ে ওঠে মানুষে, তেমনি কুঁকড়ে গিয়ে তোশিও-নো বললেন, ''চাকলাবাকলাতি। মাদার ইণ্ডিয়ারও তো গ্রেট ট্রাডিশন আছে? তবে তুমি কী করে বারবার ট্রাডিশনকে অবমাননা করছ? শুনছ এরা কত কষ্ট করে বাকহুইট যোগাড় করে...সেটা কি প্রেশারকুকারে রাঁধবে বলে? ওটা কি মধ্যযুগের ট্রাডিশনাল বাসন? এখানে রান্নাবান্না সব হয় ৯০০ অব্দের নিয়মে। মেনু, রেসিপি সবকিছু ৯০০ অব্দের। তুমি সম্রাট হিরোহিতোর অতিথি!''

—ঐ সুপ বোলের পাশে দুটি ছোটা ছোটো নীলরঙের ডিম। ''আমাদের বাড়িতে সেই যে কাকে একবার বাসা বেঁধেছিল, নীল নীল ডিম পেড়েছিল, মনে আছে? দেখতে অনেকটা সেইরকম।'' দাদামণি থামলেন।

—''কিসের ডিম ছিল ঐগুলো? কাগের? এঃ, ছি ছি!'' বৌদি মুখ বিকৃত করেন।

—''কোয়েলের—কোয়েলের ডিম, নিদেনপক্ষে পঁচাত্তর বছরের পুরোনো। ওখানে পঁচাত্তর কেন, দেড়শ বছর পর্যন্ত পুরনো ডিম পাওয়া যায়।

সেই ডিম ভেঙে গরম সুপে ফেলে গুলে দিতে হয়। মানে যার নাম চীনে রেস্তরাঁয় এগড্রপ সুপ। সেই সুপই প্রধান খাদ্য। এছাড়া ওই বাকহুইটের তৈরি একরকমের কেক, অখাদ্য (না-নোন্তা, না-মিষ্টি), আর সবশেষে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টিভাতের ডেলা, জলজ উদ্ভিদের সবুজ ফিতে দিয়ে বাঁধা। এই খাদ্য, সঙ্গে সাকে আছে অবশ্য। বুড়ি এসে হাঁটু মুড়ে বসে দোজো-দোমো করে সাকে খাওয়ালো, জোবানের সেই মেয়েদের মতন কায়দা করেই। যত্নের অভাব নেই।

খেয়ে দেয়ে পরিষ্কার করে পাতা বিছানায় শুতে যাচ্ছি—(এখানে বিছানা অন্য-রকমের, বালিশ আর দুখানা কম্বল, একটাকা ভাড়া)। বুড়ো এসে হাঁ হাঁ করে আটকালে,

হাতে একটা মস্ত তোয়ালে ধরিয়ে দিলে। কী ব্যাপার? তোয়ালে পেতে শোবো?

—"শোবে না—আগে স্নান করতে হবে"—তানাবে হাসতে হাসতে বলে—সম্রাট হিরোহিতোর নিয়ম। ৯০০ অব্দে উনি আইন করে গেছেন এখানে যে-পথিকরা আসবে, আগে স্নান, তবে তাদের শোওয়া। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই নিয়ম।"

"বেশ।" স্নানের ঘরে চললাম। মস্তবড় ঘর। তাতে পাশাপাশি চারটে ডেকচি মাটিতে বসানো, জল ফুটছে। পাশে ঠাণ্ডা জলের বালতি, মগ সব আছে। একসঙ্গেই তিনজনের স্নান শুরু হলো। স্নান করতে করতে মনে হলো—জলটা কিসে ফুটছে? নিচে তো কৈ কোনো উনুন দেখছি না? তোশিওকে জিজ্ঞেস করতে তিনি মৃদু হেসে বললেন—"এখানে উনুন লাগে না।" আরেকটু হেসে তানাবে বললো—"উনুন নেই বলেই তো রান্না হতে অত দেরি হলো"—

..."আর সব রান্নাই কেবল সেদ্ধ? দেখলে না? এটাই ট্রাডিশন।"

এরা কি ধাঁধা বলছে? এদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? উনুন নেই, অথচ সেদ্ধ হচ্ছে, জল ফুটছে—ব্যাপারটা কী?

নাঃ, জাপানী ঐতিহ্য আমার বাঙাল ব্রেনের পক্ষে বেশী সূক্ষ্ম।

—"উনুন নেই তবে জল ফুটছে কেমন করে?" তোশিও-তানাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাস্য বিনিময় করে—

—"ওই তো মজা! ৯০০ বছরের ঐতিহ্য!"

গা মুছতে মুছতে আমি চতুর্দিকে তাকাতে থাকি, কোনো পাইপ?

নাঃ। ব্যাপার কী? গরম জলের রহস্য কিনারা হলো না। ঘরে এসে শুয়ে পড়ে, তোশিও রয়ে সয়ে বললো—"আসলে এটা একটা আগ্নেয়গিরির গায়ে কিনা। ওই জলের পাত্রগুলো যে-ফাটলের ওপর বসানো, তাতেই জল আপনি ফোটে। রান্নাও হয় ফাটলের ওপর পাত্র বসিয়ে। ওপাশে বড় মুখটা আছে, কাল সকালে যাব দেখতে। সেটা এখন একটা হ্রদ। কতরকমের পাখি আসে। অস্ট্রেলিয়ান পাখি, মঙ্গোলিয়ান পাখি, কোরিয়ান—প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডের পাখি, বিউটিফুল দৃশ্য।

আর পাখি! আর বিউটি! আমার প্রাণপাখি তো উড়ে গেছে। ভলক্যানোর ওপরে শুয়ে শুয়ে চোখে ঘুম আসে? কিন্তু আমার বন্ধুদের ভয়ডর নেই। তারা নিশ্চিন্ত। তোশিও-তানাবের প্রচণ্ড নাক ডাকছে। তোশিওর সামুরাই স্টাইলে "ঢ্যারারাম ঢ্যারারাম ঢ্যাম"... তানাবের চাষাড়ে স্টাইলে..."সাঁই গুড় গুড় সুঁই"। কেবল আমারই চোখে ঘুমের বদলে সর্ষেফুল।

পর দিন সকালে ওরা লেক দেখতে গেল। আমিও গেলুম। শান্ত নীল জল-ভরা চমৎকার হ্রদ। কিন্তু হ্রদে একটিও পাখি নেই। পাখি কেন নেই? তোশিও ভুরু কুঁচকে খুব ভাবিত হয়ে পড়ল। "ছেলেবেলা থেকে এখানে আসছি...জীবনে কখনো এই হ্রদের পাখিহীন চেহারা দেখিনি। আশ্চর্য ব্যাপার!"

"আজকাল ইকোলজিক্যাল চেঞ্জের ফলে নানারকম অদল-বদল হচ্ছে"—

আমার সায়েন্টিফিক সান্ত্বনাবাক্য থামিয়ে দিয়ে তোশিও বলে ওঠে..."ট্রাডিশন ওসব আধুনিক ইকোলজির ধার ধারে না। বুঝলে?"

এবার সবিনয়ে তানাবে বলতে গেল—"কিন্তু পাখিরা কি সেটা জানে?—"

—"অবশ্যই জানে। তারা শত শত বছর ধরে আসছে এখানে। এটা তাদেরও ট্রাডিশন। আশ্চর্য! এটা কিন্তু আমার মোটেই ভালো লাগছে না।" আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে তোশিও। ইতিমধ্যে আমাকে কেউ একলক্ষ ইয়েন ঘুষ দিলেও আমি যে আর আগ্নেয়গিরির মাথায় বিশ্রামশালার আতিথ্য উপভোগ করতে পারবো না —তাতে ট্রাডিশন থাকুক আর চুলোয় যাক—এ ব্যাপারটা আমি তানাবেকে বেশ প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। ফলত, লাঞ্চের আগেই আমরা—প্রাকৃতিক শোভা ছেড়ে, ঘিঞ্জি শহরে নেমে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। সুজিকি রইল দুশো মাইল দূরে।

সেই রাত্রে আমাদের ইউয়াকি শহরে পরপর দুবার ভূমিকম্প হলো। কেউই অবশ্য প্রাণে মরেনি, তবে এবার বুঝলাম কেন জাপানে কাগজের জানলা হয়, কাঠের বাড়ি হয়। কিছু তেমন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হলো না।

ইউয়াকি ছেড়ে যাবার পালা এবার। তোশিও-তানাবে সজল চক্ষে স্টেশনে এল বিদায় দিতে। বার দু-তিন কোমর ভাঁজ করে, সামুরাইয়ের পবিত্র ডানহাত এবং বাঁ হাত বাড়িয়ে তোশিও আমার দুই হাত ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল—হাত আমার পুণ্য হয়ে গেল। ওদিকে চাষী তানাবের বিনয়নম্র কোমর ভাঁজ করা আর থামে না। "কলকাতায় দেখা হবে"—ট্রেন ছেড়ে দিলো।

টোকিওতে এসে পরদিনই রেডিওতে বড় খবর—

"হাজার বছর পরে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সুজিকি জেগে উঠেছে। আগুন, পাথর, লাভা, উদগিরণ করছে, লাভাস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিলার নিচেকার গ্রামের মানুষেরা সব প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, ইউয়াকি শহর উদ্বাস্তুতে ভরে গেছে...

খুবই দুঃখের কথা সম্রাট হিরোহিতোর প্রতিষ্ঠিত নশো বছরের প্রাচীন রাজকীয় ধর্মশালাটি, ও তার বৃদ্ধ সংরক্ষকদম্পতি এই অগ্ন্যুদগারে ধ্বংস হয়ে গেছে।"

দাদামণি দম নিতে থামলেন। চুরুটের লম্বা সাদা ছাইটা ঝেড়ে নিয়ে, বৌদির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে বললেন—"এর পরেও কি তুমি বলবে, প্রেজেন্ট কেন আনিনি? নিজেকে যে ফেরত এনেছি এটাই একটা উপহারস্বরূপ হলো না? তোরাই বল?"

আমরা আর বলব কী, আমরা ভয়ে চুপ। এরকম একটা খবর যেন কাগজে পড়েছি বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, পড়েছি। নির্ঘাত।

বৌদির পিঠের চাবিটা ঝনাৎ করে উঠল। বৌদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"পারোও বটে! যতো বাজে কথা। আসুক তোশিও-তানাবে। আমি ওদের জিজ্ঞেসা করবো জোবানটা। বেশি ভয়ের জায়গা না সুজিকি। আর বউশাসন? তার ব্যবস্থাও ঠিক করবো। আসুক না তোমার সামুরাইরা একবার কলকাতাতে!"

এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট

অনেকদিন বাদে দেশে ফিরেছি, নেমন্তন্ন খেতে খেতেই প্রাণ যায়। বিদেশে থাকতে টেলিভিশনে দেখতুম ভারতবর্ষে বন্যা হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে. কিন্তু সশরীরে এসে তো দেখছি উলটো! কে বলে এ দেশে দারিদ্র্য আছে? আজ লাঞ্চ, কাল ডিনার, পরশু ককটেল, আজ এই ক্লাবে খাওয়ানো, কাল সেই ক্লাবে খাওয়ানো—একেবারে সাহেবী ব্যাপারস্যাপার। সাহেবরা চলে গিয়ে এখন দেশসুদ্ধ সবাই সাহেব হয়েছি। মধ্যবিত্তের ঐশ্বর্য ঢের বৃদ্ধি পেয়েছে মনে হচ্ছে। নেমন্তন্ন করলে আগে লোকে বাড়িতে ডেকে যা করে রেঁধেবেড়ে খাওয়াতো এখন সবাই সবাইকে বাইরে খাওয়ায়। আগে "খাওয়াদাওয়া" শব্দটার মানে ছিল: লুচি মাংস দই মিষ্টি। আর এখন? "খাওয়াদাওয়া" মানেই হচ্ছে : হুইস্কি-সোডা-জিন-রাম। কোল্ড ড্রিংকের ব্যবস্থাই থাকে না অনেক সময়ে। মদ না খাওয়ালে সেটা মোটে "খাওয়ানো" বলে গণ্যই হলো না। আমি তো মাঝে মাঝে ব্যাগে করে নিজের জন্যে কোল্ড ড্রিংকের সাপ্লাই নিয়েই বন্ধুদের বাড়ি যাচ্ছি—অনেকে আমাদের কথা ভাবেই না কিনা। বাপরে বাপ। এত মদ বিলেতেও খায় না। যেদিনই নেমন্তন্নে যাই, খিদেয় আধমরা হয়ে পড়ি। খাবার পেতে পেতেই রাত কাবার। বাবুসাহেবদের শীধুপান যে আর শেষ হতে চায় না। এ কোন দেশী কলকাতা রে বাবা! এই লোকগুলোকেই তো আগেও চিনতুম, তারা তো ঠিক এমনটি ছিল না।

ছোটোপিসি বললে—"রোববার আমাদের বাড়িতে লাঞ্চ খাবি, তোর সঙ্গে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের আলাপ করিয়ে দিতে ইচ্ছে।" বাড়িতে খেতে বলছে শুনেই উৎসাহ হলো। তা ছাড়া, ছোটপিসিরা শুনছি বিরাট বড়লোক—আলিপুরে (ওল্ড! অফ কোর্স!) চওড়া কাঠের পালিশকরা সিঁড়ি, মার্বেলের গাড়িবারান্দা, সবুজ লনওলা সাহেবী বাড়িতে থাকে। কেবল বসবার ঘরেই নাকি তিন-তিনটে এয়ারকণ্ডিশনর দুজন লোকের জন্য। বয়বাবুর্চি পাঁচজন। বাথরুম ছটা। উর্দিপরা পাগড়ী বাঁধা ড্রাইভার। গাড়িটা অবশ্য এয়ারকণ্ডিশনড নয়. তবে পাখা লাগানো। গেটে ভোজালী-আঁটা নেপালী দরোয়ান।

দরোয়ান অবশ্য ছোটপিসের ঠিক নিজস্ব নয়, অফিসের। আর ভোজালীটা দরোয়ানের। বাড়িটাও ছোটপিসের ঠিক নিজস্ব নয়। অফিসের। এয়ারকণ্ডিশনর - গুলোও তাই। গাড়িটাও। গাড়ির অপূর্ব পাখাটাও। বয়-বাবুর্চি ড্রাইভার জমাদার গোনোটাই ছোটপিসের ঠিক নিজস্ব নয়, মায় তাদের উর্দিগুলো পর্যন্ত না। কেবল ছোটপিসিটি ছাড়া বাকি যা কিছু, সবাই ছোটপিসের অফিসের সম্পত্তি। রিটায়ার করলেই ব্যস! কোথায় বা কি ভূতের ফাঁকি মিলিয়ে যাবে ফট করে। তাই সময় থাকতে থাকতে এই বেলা একটু দেখিয়ে-চাখিয়ে নিতে না পারলে ছোটপিসিরই বা ভালো লাগবে কেন? "নিশ্চয়ই যাব" বলে কথা দিলুম।

কিন্তু কপালে নেই; কথা দিলে কি হবে! পর পর অতো নেমন্তন্ন খাবার ফলটি ফলল। রবিবার সকাল থেকেই পড়লুম। বেলা সাড়ে এগারোটায় ফোনে পাওয়া গেল ছোটপিসির বাড়ি— বেয়ারা ধরল এবং বলল "মেমসাব বাগবাজার মে।" বাগবাজারে আমাদের পুরনো বাড়ি। জ্যাঠামশাই এখনও ওখানে। আজ বাড়িতে খাওনদাওয়ান—এখন ছোটপিসি বাগবাজারে? মানে? "কখন ফিরবেন?"

—"সামকো লৌটেঙ্গে।"

আমি যত বলি—"হতেই পারে না, তোমাদের বাড়িতে আমার লাঞ্চের কথা।"

বেয়ারা তত সবিনয়ে বলে—"হাঁ জী, ইধর লাঞ্চ তো জরুর হ্যায় আপকা —লেকিন মেমসাব বাগবাজার মে।" চটেমটে আর ছোটপিসেকে ডাকলুমই না। দূর ছাই! আজ আমি যে যেতে পারছি না, সেটা বেয়ারাকেই জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলুম। ব্যাপার কিছুই বুঝলুম না। আমাকে খেতে নেমন্তন্ন করে ছোটপিসির বাগবাজারে চলে যাবার মানেটা কী?

আশ্চর্য! মানে বোঝা গেল পরদিন। ছোটপিসিই এসে হাজির, সকালের দিকে। অসুস্থ আমাকে দেখতে। এসে ছোটপিসি যে গল্পটা বলে গেল, আপনাদের হুবহু সেটাই বলছি। বিশ্বাস করা-না করা আপনাদের ব্যাপার। অতঃ ছোটপিসি উবাচ:

...তোকে তো লাঞ্চে ডাকলুম। তারপর তোর পিসের গেস্টদের লিস্টি দেখেই আমার মেজাজ টং হয়ে গেল। দেশ-বিখ্যাত ব্যক্তি একজন। এঁরা একসঙ্গে পদধূলি দিলে বাড়ির যে কী অবস্থা হবে তা ভালোই বুঝতে পারছি। পূর্ব অভিজ্ঞতা তো কম নেই। তার মধ্যে তুই এলে তোর কী অবস্থা হবে, তাও! এখন তোকেই বা বারণ করি কী করে? সুতরাং রান্নাবান্নার বন্দোবস্ত করে বাবুর্চিকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমি কেটে পড়লুম। সোজা ট্যাক্সি নিয়ে বাগবাজারে। যঃ পলায়তি স জীবতি। রাগ করিসনি। তোর কথা মনে করে আমার একটা দুঃখু দুঃখু ভাব হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু তবুও বাড়িতে থাকতে সাহস হলো না। শুনলেই বুঝবি কেন হলো না।

লাঞ্চ কেন, চায়ের বেলাও পার করে দিয়ে, সাতটা নাগাদ তো ফিরলুম, কেননা রাত্রে ওর এক কোলিগের বাড়িতে আটটার সময়ে ডিনারের নেমন্তন্ন। নিচে থেকেই ভুরভুরে গন্ধ, আর রেকর্ডের বাজনা শুনতে পেলুম। বুঝলুম ব্যাপার সুবিধের নয়। ভেবে দ্যাখ তুই, সন্ধে সাতটা বেজে গেছে। আর অতিথিরা এসেছেন বেলা বারোটার আগেই। দারোয়ান বললে,—"মেমসাবলোগ সব ঘর চলা গয়া, লেকিন সাবলোগ কোই কোই হ্যায়।" স্ত্রীরা সবাই চলে গেছে, কিন্তু স্বামীরা কেউ কেউ আছে, জেনে রাখবি, এটা মহা দুর্লক্ষণ! এর নাম এক্সপেন্স একাউন্ট। সন্ধে সাতটার পরেও লাঞ্চ!

ভয়ে ভয়ে ওপরে উঠে ঘরের পর্দা তুলেই দেখি চিত্তির। ঘরের মধ্যিখানে কলকাতার বিখ্যাত চারটে মাতাল। একজনের হাতে উঁচু করে ধরা একটা বোতল —অন্যেরা সেইটে কেড়ে নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। আর তোমার পূজনীয়

ছোটপিসে তাদের ঠিক মধ্যিখানে, গোপিনী পরিবেষ্টিত কেষ্টঠাকুরের মতো দাঁড়িয়ে। হাতে বাঁশির বদলে একটা গোল করে পাকানো বিজনেস স্ট্যানডার্ড নাকি ফিনান্সিয়াল টাইমস—কে জানে সেটা দিয়ে হন্যে হয়ে একে-ওকে মাঝে মাঝে দু' এক ঘা পেটাচ্ছেন। এই হচ্ছে ওঁর মাতালদের মারামারি থামানো—যেভাবে লোকে কুকুর-বেড়ালকে ট্রেনিং দেয়, অনেকটা সেইভাবে। কিন্তু মাতালরা তো আর কুকুর বেড়াল নয়, তারা ওতে শুনবে কেন? তাদের টেম করে কার সাধ্যি? ঘরের কোণে বড়ো হরি বেয়ারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে।

সন্ধে সাতটায় বাড়ি ঢুকে এই দৃশ্য দেখেই তো, আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল, রগ দপদপ করতে লাগল। আমাকে দেখেই তোর ছোটপিসে হঠাৎ কাতরে উঠলেন—"এই যে! এসেছ— এস! এস!—দ্যাখো তো, কী কাণ্ড!" যেন এইমাত্র নন্দনকানন থেকে পড়লেন—যেন জীবনে কখনো মাতাল দেখেননি। আমাকে দ্যাখামাত্র সমবেত মাতালদের প্রত্যেকের অভিমান ষোলকলায় উপচে উঠল।

—বৌদি! দেখুন না, ভটচায্যি কী করছে—

—কী করছে মানে? কে. পি. আমার হাত টেনে ধরে রেখেছে— ছাড়ছে না! —ছাড়ো বলছি,

—মিসেস রে, প্লীজ টেল সুরিন্দর টু লীভ মাই বটল—

—মিসেস রে, লুক অ্যাট দ্যাট বেচ; দেশাই—হি হ্যাজ গ্রাবড মাই বটল—

—বৌদি, কে. পি-কে বলুন তো, আমার হাত ছেড়ে দিক—

—কেন ছাড়বো? আগে সে আমাকে আপনি বলুক!—বলো, "ছেড়ে দিন"—

—বলব না।

—ছাড়ব না।

পরিষ্কার যুক্তিতর্ক চলছে—কে বলে মাতালদের যুক্তি থাকে না? হঠাৎ দেখি মারামারি থামিয়ে মাতালরা গোল হয়ে সার বেঁধে এ ওর পেছনে পরস্পরের কোমর ধরে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। সেই হারীত-লারিত-জারিতের ডায়াগ্রামের মতো। ব্যাপার কী? না আগের পপ মিউজিকের রেকর্ড পালটে গিয়ে হঠাৎ শুরু হয়েছে একটা পুরোনো হিন্দি গান—"পতলী কমর হ্যায়, তিরাছী নজর হ্যায়"— অমনি মাতালদের মেজাজও বদলে হাসিখুশি হয়ে গিয়েছে। ফোক ডান্স হচ্ছে। সকালে এদের পরনে ভালো ভালো পোশাকই ছিল মনে হয়, কিন্তু এখন সেগুলো ন্যাকড়ার মতো। ভেবে দ্যাখ, ধামসানো পোশাক পরা চারটে বিভিন্ন সাইজের লম্বা বেঁটে রোগা মোটা মাঝবয়েসী মাতাল গোল হয়ে থুপথুপিয়ে নাচছে—একজনের বগলে একটা বোতল। মাঝখানে আমার কত্তা।—তখনও করুণভাবে পাকানো খবরের কাগজ পেটা করে যাচ্ছেন অতিথিদের আর সেই নৃত্যের বৃত্ত থেকে বেরুতে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। কিন্তু ওরা ওঁকে বেরুতে দিচ্ছে না। এসব দেখতে ভালোই লাগছিল, এমন সময়ে গানটা ফুরিয়ে গেল—হঠাৎ শুরু হলো—"বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা

কি নহী''—অমনি কী যে হলো, নৃত্যরত মাতালরা রে-রে শব্দের ঘুঁষি তুলে বোতল উঁচিয়ে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরে গিয়ে এ-ওকে উল্টোবাগে তাড়া করল। ফোক ডান্সটা এখন আর তেমন নিরীহ্ নেই, হেডহান্টিং নাগাদের মতো হিংস্র টাইপের দেখাচ্ছে--তোমার পিসেমশাই ভীতু মানুষ—তিনি এবার কাগজটা ফেলে দিয়ে—"উষা! আমাকে বাঁচাও!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। বিজনেস স্ট্যানডার্ড না ফিনান্সিয়াল টাইমস ওঁকে আর রক্ষা করতে পারছে বলে মনে হলো না। আমি আর কী করি? ইষ্টনাম জপ করে দুগগা বলে বডি থ্রো দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম মাতালদের সার্কেলের ঠিক সেন্টারটা লক্ষ্য করে। জানিসই তো আমার এই বিপুল ওজনটা কখনোই বৃথা যায় না। ঝাঁপ দিয়েই বাঁ কনুই দিয়ে পরপর দুজনকে আর ডান কনুই দিয়ে আর-দুজনকে বিরাশি সিক্কার চারটি গোঁত্তা মারতেই তারা যেই দু'দিকে সরে গেল, তোর পিসেও সেই ফাঁকে ছুট্টে পালিয়ে গেলেন। ভেবেছিলুম ওতেই মাতালরা দাঁত ছিরকুটে উলটে পড়বে, কেননা শুনেছি মাতালদের গায়ে একদম নাকি শক্তি থাকে না। কিন্তু কি বলব তোকে, একটাও উলটে পড়ল না! একটুখানি টলে গেল মাত্র। তারপরেই আবার সার্কেলটা জোড়া লেগে গেল। পানা পুকুরের মতন। একবার দেখলুম আমিই তাদের কেন্দ্রমণি, তোমার ছোটপিসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নিচে পালিয়ে যাচ্ছেন, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। আমার কনুইয়ের গোঁত্তায় মাতালরা একটা পড়ল না বটে কিন্তু ওই যে কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো হরি বেয়ারা হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল, সে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, কাটা কলাগাছের মতো দপাস ক'রে উপুড় হয়ে সটান আছড়ে পড়ল কার্পেটের ওপরে। পড়েও তার ঘুম ভাঙলো না। এখন আমি এই বৃত্ত থেকে বেরুই কী করে? নেমন্তন্ন রয়েছে। হরির তো ওই অবস্থা, আর তোর পিসে পালিয়েছে! ভাবছি আবার গোঁত্তা মারবো, এমন সময়ে নিচে একটা হৈ চৈ উঠল। তার পরেই মনে হলো সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে আসছে, তোর পিসের পায়ের শব্দ নয়। হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো একটি আলুথালু বাঙালী মেয়ে। হাউমাউ করে কাঁদছে, কোলে একটা কচি বাচ্চা। বাচ্চাটাও তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, তার মা-ও তাই। পেছন পেছন আরো একজন চেল্লাচ্ছে। সে আমাদের দারোয়ান।—"অন্দর মত যাইয়ে! অন্দর মত যাইয়ে। পয়লা তো সিলিপ দিজিয়ে—" বলে। আর স্লিপ! কে শোনে কার কথা। মেয়েটা হাপুস নয়নে কাঁদছে আর বলছে..."ও মিস্টার ভটচায্যি। ও মিস্টার দেশাই!"...আর বাচ্চাটা বলছে..."ম্যাঁ..." আর করুণ গলায় দরওয়ান বলছে, "সিলিপ কাঁহা।"

এদিকে ঘরের দৃশ্য ভয়ানক। এই দুশো পাউণ্ডের আমায় ঘিরে মাতালদের সে কি বেদম নাচ...যেন কোনো বারব্রত, কি স্ত্রী-আচার পালন করা হচ্ছে।..."আয় আয় সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।" ওদিকে..."ও মিস্টার ভটচায্যি। ও মিস্টার দেশাই।" মেয়েটা কেঁদেই চলেছে। কিন্তু ওদের গেরাহ্যি নেই। শেষে ডেসপ্যারেট হয়ে দিলুম একটা কনুয়ের গোঁত্তা ভটচায্যির পাঁজরায়। অমনি ভটচায্যি বললে..."কৌন হ্যায়?"

মেয়েটি বললে..."আমি তো মিসেস চ্যাটার্জী"...

..."কোন চ্যাটার্জী? সৌমিত্র না উত্তমকুমার?"

উত্তরে মেয়েটা আরো কাঁদে আর বলে..."কী আশ্চর্য! আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি তো আপনাদেরই মিসেস চ্যাটার্জী।" এবার ভটচায্যি হঠাৎ রেগে গেল..."তার মানে? আই হ্যাভ ওনলি মিসেস ভটচায্যি! ব্যস হামকো কোই মিসেস চ্যাটার্জী উটার্জী নেহী হ্যায়!"..."ও মিস্টার দেশাই!..." এবার আমি দেশাইকে একটা রাম-গোঁত্তা মারলুম। তক্ষুনি দেশাই বলে উঠল..."হুইচ মিসেস চ্যাটার্জী? মিসেস বি. কে.? মিসেস এস. এন.? মিসেস জে. সি.? কৌনসা?" মেয়েটা একেবারে হুহু করে কেঁদে ফেললো। "কী মুশকিল! আমি তো আপনাদের দুজনেরই পি. এ.? চিনতে পারছেন না? গত পাঁচ বছর ধরে রোজ ডিক্‌টেশন নিচ্ছি? আমি তো আপনাদের স্টেনো হই"...

"স্টেনো তো ইধার কিঁউ? অফিসমে যাইয়ে...ডিকটেশন উধার মিলেগা..."

—মেয়েটি এবার কাঁদতে কাঁদতে কার্পেটে লুটিয়ে পড়লো। দেখাদেখি ওর বাচ্চাটাও। "ডিকেটেশন চাইনে স্যার, আমি হেলপ চাই! আমার স্বামীর স্কুটার একসিডেন্ট হয়েছে—হাসপাতালে নিয়ে গেছে—"

—"গুড! ফাইন! হসপিটালমে নিয়ে গেছে—তো? ব্যস! সব কুছ ঠিক হয়ে যাবে!"

—"ও মিস্টার ভটচায্যি,—এই রাত্তিরে আমি অত টাকা কোথায় পাই— ইঞ্জেকশন —রক্ত—হা ভগবান—" এমন সময়ে অকস্মাৎ "ওঃ হো! রুপাইয়া চাইয়ে? লিজিয়ে না— কিৎনা রুপাইয়া?" বলে মেজর সুরিন্দর সিং নিজের পকেট থেকে এক তোড়া নোট বের করে ওকে দিতে গেল। হাত কেঁপে গিয়ে টাকাগুলো সব মেঝেয় ছত্রাকার হয়ে পড়ল কিন্তু মেয়েটি সেদিকে তাকিয়েও দেখল না। কেবলই হাত জোড় করে বাচ্চা কোলে করে অজ্ঞান অবুঝ বসদুটোর কাছেই অনুনয় বিনয় করতে লাগলো সে। আমি তাড়াতাড়ি বলি—"লজ্জা করবেন না, ওতে লাভ নেই। এরা সব পাঁড় মাতাল এখন,—যা পাচ্ছেন চটপট নিয়ে নিন—হরির নুট যখন দিচ্ছেই" —এমন সময় হঠাৎ—"হরির নুট! হরির নুট!" বলে ভীষণ চেঁচাতে চেঁচাতে ভটচায্যি পকেট থেকে টাকাকড়ি বের করতে, আর কার্পেটের ওপরে ছড়াতে লেগে গেল। দেখাদেখি দেশাই আর কে. পি.ও নেচে নেচে 'হরিবোল' বলে আহ্লাদে চাদ্দিকে টাকা-পয়সা ছুঁড়তে শুরু করলে। —মেয়েটা তো থ! আমিই কষ্টেসৃষ্টে নিচু হয়ে কুড়োচ্ছি, এমন সময়ে 'হরির লুট' 'হরিবোল' ইত্যাদি শুনেই বোধহয়, শ্রীমান হরির লুপ্ত চেতনা জেগে উঠল। মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে সেও পাল্লা দিয়ে টাকা কুড়োতে থাকে। কুড়িয়ে কাঁধের ঝাড়নে ঝেড়েঝুড়ে সেগুলো যত্ন করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিতে লাগল হরি। এঘরের কর্মকাণ্ড দেখে মেয়েটা তো চুপ করেইছে, বাচ্চাটারও কান্না থেমে গেছে। মাতালদের নাচের বৃত্তও

আপনাআপনি ভেঙে গেছে। আমি মুক্তি পেয়ে তাড়াতাড়ি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা হাতে তুলে নিয়ে মেয়েটিকে বললুম—

—চলুন মিসেস চ্যাটার্জী, তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন দেখি কী করা যায়। এ টাকাগুলোই এখন রাখুন, আর আপনার সঙ্গে আমি গাড়িটা দিচ্ছি, ড্রাইভারই ওষুধপত্র কিনেটিনে দেবে, যা দরকার হেল্প করবে। এঁদের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন —ওকে রওনা করে দিয়ে ওপরে এসে দেখি হরি আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে —সব রেকর্ড ফুরিয়ে বাজনা বন্ধ।

আর তিন মাতালে মিলে লগবগ করতে করতে ফের লড়াই বাধিয়েছে সেই বোতলটা নিয়ে। চার নম্বর কে. পি. সিনহা বেচারী মোটা মানুষ, আর লড়তে না পেরে, রেফারী হয়ে গেছে। তোর পিসে অ্যাবসেন্ট। আমি তো ঢুকেই এক ঝটকায় বোতলটা কেড়ে নিলুম। অমনি রেফারী 'সুঁ' করে ভাঙা ভাঙা শিস দিয়ে বলে উঠল— "গেওওলল।"

—আর আমি দেখি : হা ভগবান, এটা তো একটা খালি বোতল। এই নিয়ে এত লড়াই—এ মাতালগুলোর নরকেও ঠাঁই নেই, আমার বাড়িতে তো নয়ই।— তেড়ে-ফুঁড়ে '—হরি-ঈ-ঈ' বলে ডাকতেই হরি রক্তচক্ষু মেলে, আমার সুরে সুরে মিলিয়ে —'জী-ঈ-ঈ' বলেই তক্ষুনি চোখ বুজে ফেলল। চোখের রঙটি দেখেই বুঝলুম অত ঘুম কিসের। ব্যাটা নেশাখোর! এক ধমক মেরে মিলিটারি কায়দায় বললুম —"হরি জলদি !— সাবলোগকো আভি হঠাও ! কুইক !" শুনে হরি চোখ বুজে বুজেই গুন গুন করে হাত নেড়ে বলে উঠলো, যেন বাগান থেকে গরু তাড়াচ্ছে কি ছাগল —"হে-ই ! হেই হেট !' তারপর এক চোখ মেলে আমাকেই জিজ্ঞেস করলো —"গিয়া ?" আমার মুখের চেহারাতেই বোধহয় উত্তর পেয়ে গেল।

—নেই গিয়া ? আচ্ছা খতরনাক সাবলোগ ? তারপরেই শিবনেত্র হয়ে বলতে লাগলো—জোরে জোরে—

—এঃ সাবলোগ, হঠ যা, হঠ যা ! ঘর যা, ঘর যা ! হুশ-শ-শ— খেপে গিয়ে আমি এবার হরিকে প্রচণ্ড ধমক লাগালাম—ও কী হচ্ছে কী ? হরি ? ভালো করে বলবি তো ? হরি তখন ঘুঁষি পাকিয়ে ভালো করে বলতে লাগলো—

—"এঃ সসালে সাবলোগ, হঠ ! হঠ !—ভাগ সালে ভাগ ! ঘর যা ! ঘর যা ! এঃ—সসসালে সাবলোগ—" আমি আর না পেরে হরিকে হিড়হিড় করে টেনে অন্দরের বারান্দায় নিয়ে এসে বললুম, "বুদ্ধু, ওমনি করে নয়, হাত ধরে এমনি করে হঠাও !" বলেই, প্রেশারের ওষুধ খেতে ছুটলুম। একেই আমি ভারী মানুষ, তায় রাগলেই মাথায় রক্ত উঠে যায়— ঘাড় টনটন করছে, মাথা যেন সীসের মতো ভারী।— বাড়ি এসে অবধি মাতাল সামলাতে সামলাতেই আধমরা ! ওষুধ খেয়ে স্নান করে সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে ফিরে এসে দেখি অন্দরের বারান্দায় সার সার তিন মূর্তি পড়ে আছে। একজন আবার আরেকজনের কানে কানে কী সব বলছে। নিচু

হয়ে মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শুনি ফিসফিস করে বলছে—

—'মোর লাগি করিয়োনা শোক
আমার রয়েছে কর্ম
আমার রয়েছে বিশ্বলোক—'

সেই শুনে অন্যজন খুব জোরে ফোঁস করে ঘর কাঁপিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ভালো করে চেয়ে দেখি এটা হচ্ছে হরি। আর হরির কানে নামতা পড়ার মতো করে কবিতা আওড়াচ্ছেন মিস্টার ভটচায্যি। ওপাশে একা শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন মিস্টার দেশাই।

ঘরে ঢুকে দেখি আরেক মনোহর দৃশ্য। ছ-ফুট লম্বা সুরিন্দর সিং চিৎ হয়ে ছোটো কোচের ওপরে শুয়ে আছে। লম্বা ঠ্যাংদুটো ভাঁজ করে হাতলের বাইরে শূন্যে ঝুলিয়ে। আর মোটা কে. পি. সিন্‌হা মেঝেয় কার্পেটে উপুড় হয়ে আছে কচ্ছপের মতো। মাঝে মাঝে কুমীরের মতো মাথা তুলে বলে উঠছে : বাট, জামাইবাবু ওয়াজ আ পারফেক্ট জেন্টলম্যান! আর অমনি সুরিন্দর সিং জড়িয়ে জড়িয়েই ধমকে উঠছে—

"স্যো হোয়াট?" তোমার ছোটপিসে কিন্তু ঘরে-বাইরে, কোথাও নেই। কী করি? রাত তখন ঢের। দশটা বেজে গেছে। কখন আর খেতে যাব আমরা? অনেক করে বলেছে গুপ্তরা—না গেলে খুব খারাপ দেখাবে—যাওয়া উচিত। এদিকে এঁরা লাঞ্চে এসেছেন প্রায় দশ বারো ঘণ্টা হলো। বয়-বাবুর্চিদের ডিউটি অফ হয়ে গেছে। তারা সব বাড়ি চলে গেছে। কেবল গেটে আছে দারোয়ান, আর ঘরে হরি। হরি তো ভূমিশয্যায়। 'শেষের কবিতা' শুনছে।

অগত্যা দরোয়ানকেই গিয়ে বললুম—"যার যার ড্রাইভারকে বল, এসে যে-যার গুণমণি মনিবকে বাড়িতে নিয়ে যাক—আউর হরি কো কান পাকড়কে উঠা দো।" বাহাদুর পায়ে পায়ে হরির কাছে গিয়ে হরির অবস্থা দেখে লজ্জায় অস্থির হয়ে প্রথমেই তো জিব কেটে ফেলল। তারপরেই হরির কানটি ধরে লাগালে এক থাপ্পড়। অমনি হরি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বাহাদুরকেই বিশাল সেলাম ঠুকে বললে —"জী সাব! ব্রেকফাশ রেডি!"

দুত্তোর! ব্যাটা নেশাখোর। বাহাদুর আরেকটা থাপ্পড় কষাতেই হরির নেশা ছুটে গেল।—তখন হরি আর বাহাদুর মিলে, ড্রাইভারদের ডেকে এনে পরপর তিনটে মাতালকে তো কোনোরকমে নিচে নিয়ে গেল চ্যাংদোলা করে। কেবল হরি শুধু একবার ভুল করে বলে ফেলেছিল "রাম নাম সৎ হ্যায়"—কিন্তু বাহাদুরের ধমকে থেমে গেল তাড়াতাড়ি। মুশকিল বাধালো মেজর সুরিন্দর।—"স্কোয়াড আগে বাঢ় —খড়-বিচালি খড়-বিচালি"—বলে শুয়ে শুয়েই এইসা পা ছুঁড়তে লাগলো, তার ধারে-কাছে যায় কার সাধ্যি! তাকে ছোট সোফা থেকে নড়ানো গেল না।

এদিকে তোমার ছোটপিসেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না—রান্নাঘর, বাথরুম

ওয়ার্ড্রোব, ক্লসেট, পর্দার পেছনে খাটের তলায়—কোথাও তিনি নেই। মহা দুশ্চিন্তায় পড়লুম। গেল কোথায় লোকটা? দরোয়ান লন-বাগান সমস্ত খুঁজে এল; সেখানেও নেই। আমার মনে কী ভীষণ অশান্তি বুঝতেই পারছিস! ফলে নিচে গিয়ে মাতালদের গাড়িতে তুলিয়ে দেওয়ার খবরদারিটাও আমাকেই করতে হলো!

ওরা তো তিনটেকে সারি সারি শুইয়ে রেখেছে সদর দালানে, ঠিক যেন ক্রিমেটোরিয়ামে মড়াদের কিউ। একে একে গাড়িগুলো সামনে এসে দাঁড়াবে আর মাননীয় অতিথিদের আড়কোলা করে তাতে তুলে তুলে দেওয়া হবে। হরি আর দরোয়ান রেডি। ড্রাইভাররা গেল গাড়ি আনতে।

প্রথমেই এলো দেশাইয়ের গাড়ি। দেখি তার পেছনে বুটটার ঢাকনি আলগা হয়ে উঁচুমতো হয়ে রয়েছে, ঢকঢক করে উঠছে-পড়ছে গাড়ি চললে। ড্রাইভার যেই ভালো করে বন্ধ করবে বলে ঢাকাটা তুলেছে অমনি কী হলো, ভাব দিকিনি? জ্যাক-ইন-দ্য-বক্সের মতো বুটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন তোমার পূজ্যপাদ পিসেমশাই। ভালো জামা-কাপড় সব ভীষণ নোংরা, গাড়ির তেল-কালি-গ্রীজ মাখা। বেরিয়েই চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকা তিন মূর্তিকে সামনে দেখে উনি চমকে উঠে — "মম্মার্ডার! মম্মার্ডার!" বলতে বলতে দৌড়ে সিঁড়ির তলায় ঢুকে পড়লেন। আগে তিন মাতালকে পার করে তারপর তোমার পিসেকে তো সিঁড়ির তলা থেকে টেনে বের করলুম। অমনি নিজের পকেট থেকে ইস্ত্রি করা সেন্টমাখা সিল্কের রুমাল বের করে টাক থেকে মাকড়সা-সমেত মাকড়সার জাল-ঝুল ঝাড়াতে ঝাড়তে তোমার পিসে খুবই সহজ গলায় বললেন—"কী গো? গুপ্তর বিয়ের অ্যানিভার্সারিতে যাবে না?"—গুপ্ত তোর পিসের কোলিগ—ওদের মধ্যে যেমন ভাব, তেমনি আবার একটু রেষারেষিও আছে; না গেলেই ঠিক দোষ ধরবে। দামী একটা প্রেজেন্ট কিনে রেখেছিলুম। এত কাণ্ডের মধ্যেও ঠিক ওঁর সেটা মনে আছে। এইসব সখের মাতালেরা কিন্তু ঠিকেয় ভুল করে না, বুঝলি?

—"আমি তো রেডি? কিন্তু রাত্তির এগারোটা কখন বেজে গেছে— এখন কেউ নেমন্তন্ন যায়?"—

—"খুব যায়", বলে উনি ঘরে চলে গেলেন। হাতমুখ ধুয়ে ফর্সা হয়ে পাটভাঙা পোশাক পরে এসে, ছোট সোফায় সুরিন্দরকে ঘুমোতে দেখে তোর পিসের সে কী আহ্লাদ। "আরে? সুরিন্দর বাড়ি যায়নি? বাঃ! চলো, চলো, ওকেও নিয়ে যাই গুপ্তর বাড়ি।" আমি বজ্রকঠিন হয়ে বললুম—"না! ওকে একদম ডিস্টার্ব করবে না! ও থাক যেমন আছে!" বলে সুরিন্দরের গায়ে তাড়াতাড়িতে টেবিল ক্লথটা চাপা দিয়ে রেখে নেমে গেলুম। ঘড়িতে তখন বারোটা বাজছে।

নিচে এসে দেখি ড্রাইভারও নেই, গাড়িও নেই। কোথায় গেল? বাহাদুর আমাকে ফিসফিসিয়ে বললে, সেই যে, মিসেস চ্যাটার্জিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটোছুটি করছে! এখনও ফেরেনি। এক শিখ ট্যাক্সিওলা তার গাড়িতে দরজা খুলে ঠ্যাংদুটো বের

করে ঘুমোচ্ছিল ঠিক গেটের উলটোদিকে। বাহাদুর দৌড়ে গিয়ে তাকেই ধরে আনলো। সে নাকি ওদের বন্ধু। সর্দারজী তো এন্তার পাঞ্জাবি ভাষায় গাল পাড়তে পাড়তে মিটার ডাউন করলো। আমি উঠে বসলুম, বগলে প্রেজেন্ট। তোমার ছোটপিসেও উঠতে যাবেন, ঠিক এমন সময়ে আমাদের গাড়ি ফিরল। ড্রাইভার যেই নেমেছে উনি অমনি টপ করে লাফিয়ে তার সীটে উঠে বসলেন—আর বসতে না বসতেই হঠাৎ ঘড়ি দেখে— "ঈশশ ! কী ভয়ংকর লেট হয়ে গেছে—" বলে স্টার্ট দিয়ে, শোঁ করে একাই বেরিয়ে চলে গেলেন। বাহাদুর আর ড্রাইভার হাঁ করে চেয়ে রইল। আমি তাড়াতাড়ি বললুম—"সর্দারজী। জলদি চালাও, জোরসে ! উস ডাকুকো পাকড়ো, মেরা হ্যাণ্ডব্যাগ লেকে ভাগ গিয়া।" কথাটা সত্যি। আমি মোটাসোটা মানুষ, শাড়ির কোঁচা-আঁচল সামলে, বগলে প্রেজেন্টের বাক্সো আঁকড়ে, ব্যাগটাকে আর ধরতে পারিনি, ওঁর হাতে দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেছিলুম। উনি আমার ব্যাগসুদ্ধই গাড়িতে উঠে হাওয়া।

আর যাবে কোথায়। মুহূর্তেই সর্দারজীর ঘুম উড়ে গেল। ডাকু পাকড়ানোর জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে সর্দারজী আমাকেও উড়িয়ে নিয়ে চলল। কখনো তোর পিসে আগে যান, কখনো আমরা আগে যাই— ওঃ সে কী দারুণ এক্সাইটমেন্ট, অনেকটা হিন্দি ছবির মোটর চেজ সিকোয়েন্সের মতো। যেন দেবানন্দ আর জিনৎ আসলে রেস দিচ্ছে। কিন্তু আলিপুর পাড়ার রাস্তাঘাট তো জানিসই—খাঁ খাঁ করছে। কেবল পথের কুকুরগুলো বেজায় চীৎকার জুড়ে তাড়া করলো আমাদের; অমন একটা সীন কিন্তু দর্শক বলতে ছিল শুধু ওরাই। এই যা দুঃখু। যাক, চকিতেই গুপ্তদের বাড়িতে এসে গেলুম। উনি গাড়ি থামিয়ে যেই নেমেছেন, নামবামাত্তর সর্দারজীও —"ডাকু হ্যায় ! ডাকু হ্যায় !— পাকড়ো, পাকড়ো" বলে বিরাট শোরগোল তুলে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে গিয়ে তোর পিসের গর্দান চেপে ধরেছে। ঘাড়টা ধরেই এক থাপ্পড়। উনি বেচারী মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিলেন, ভাগ্যিস আমি নেমেছিলুম ! তাড়াতাড়ি ধরে ফেললুম। সর্দারজী তখন তোমার পিসেকে বজ্রমুষ্টিতে পাকড়ে, ওঁর হাত থেকে আমার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে বলল—"শালা ডাকুকো আভি আলিপুর থানামে লে যানা হ্যায় ! চলিয়ে মেমসাব—"

ইতিমধ্যে তোমার ছোটপিসেও সংবিৎ ফিরে পেয়ে সর্দারজীর কলার চেপে ধরে হুংকার দিলেন—ডাকু ? কোন শালা ডাকু হ্যায় ? তুম ? না হাম ? তুম থাবড়া মারকে হামারা ওয়াইফকো ব্যাগ ছিনতাই কর লিয়া—চলো, আভি চলো আলিপুর থানামে—সে কী কেলেংকারী ! দুজনেই দুজনকে আলিপুর থানাতে নিয়ে যাবে বলে টানাটানি, ট্যাক্সির মিটার এদিকে বেড়েই যাচ্ছে। আমি একবার সর্দারজীর হাত ধরে কাকুতি মিনতি করি, আর একবার তোমার পিসের হাত ধরে। কেউই কোনো কথা শুনবে না। যাক, শেষ পর্যন্ত সর্দারজীকে অতিকষ্টে শান্ত করা গেল। সর্দারজী যখন —"শালা বাংগালী লোককো তামাশামে গোলি মারো"—বলে গাল পেড়ে আমার ব্যাগটা

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেল, তখন হাঁফ ছেড়ে আমরা গিয়ে গুপ্তদের কলিং বেল টিপলুম। রাত একটা বেজে গেছে।

আশপাশের সব ফ্ল্যাটেই তখন বিয়েবাড়ির মতো আলো জ্বলে উঠেছে—বারান্দায় বারান্দায় লোকজন গিজগিজ করছে। গুপ্তরাই কেবল গহন ঘুমে অচৈতন্য। যতই টুংটাং করে বেল বাজাই, দরজা আর খোলে না। অবশেষে ধপাধপ দোর ঠ্যাঙাতে গুপ্তসাহেব "হু ইজ ইট" বলে দু-ইঞ্চি দোর ফাঁক করে উঁকি মারলেন—হাতে একটা বেঁটেখাটো লোহার ডাণ্ডা। পরনে হলদে বেগুনী স্লিপিং সুট। আমাদের দেখে তো খুবই খুশি। একগাল হেসে আহ্লাদে ডাণ্ডা নাড়তে নাড়াতে স্বাগত জানালেন—"বাঃ! তোমরা? এসে গেছ তাহলে? এসো! এসো! হাউ সুইট অফ ইউ! আমরা বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—", বলতে বলতে ডাণ্ডাটা দরজার কোণে গুঁজে রেখে ড্রেসিং গাউন পরে এলেন। এবং মহা যত্নআত্তি করতে শুরু করে দিলেন। তোর ছোটপিসে তো সঙ্গে সঙ্গেই আরেক প্রস্থ স্কচ আর সোডা নিয়ে বসে গেছেন। এদিকে রুমা, মানে মিসেস গুপ্ত আর আসে না। আমি আমার আপেলের জুসটি হাতে করে বসেই আছি! বসেই আছি! শেষে গুপ্ত এসে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "তুমি নিজে একটু চল তো ঊষা—রুমাকে আমি কিছুতেই কনভিন্স করাতে পারছি না, ও কেবলই বলছে—'ইয়ার্কি মেরো না, যাও', আমি যেই খাটের পাশে গিয়ে ডেকেছি, 'হ্যাপি অ্যানিভার্সারি, রুমা', অমনি সে উঠে বসে চোখ গোল গোল করে বললে—"এ্যাঁ? তোমরা সত্যি সত্যি এসেছ? এই মাঝরাত্তিরে? কী মুশকিল! সরি, কী আনন্দ। ওঃ— থ্যাংকিউ। থ্যাংকিউ"—বলে দেঁতো হেসে প্রেজেন্টটা নিয়ে, খাট থেকে নামলো। তারপর বললো—"ও, তোমরা বুঝি অন্য কোথাও নেমন্তন্ন খেয়েদেয়ে এলে?"

শুনে আমি তো খাপপা!

—"অন্য কোথাও মানে? তোমাদের এখানেই তো আমাদের আজ নেমন্তন্ন?"

রুমা বললে—"সে তো আটটার সময়, আর বাড়িতে নয় তো, ক্লাবে! ক্লাবেই তো ডিনারে ডেকেছিলুম তোমাদের সবাইকে।"

আমি করুণ সুরে বললুম—"তাই নাকি? ভেরি স্যরি! আসলে আমাদের বাড়িতে আজ লাঞ্চ ছিল কিনা কয়েকজনের, তাঁরা এইমাত্র গেলেন।" রুমা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল :

—"লাঞ্চ? না ডিনার? কী যে বল!"

—"লাঞ্চই। —কিন্তু আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে ভাই রুমা? তোমার ফ্রিজে কী কী আছে, দেখি?"

ব্যাজার মুখে ফ্রিজ খুলে রুমা গড়গড়িয়ে বললে—"ডিম, বেকন, মুসুম্বী, দুধ, রুটি, চীজ, মাখন—"

—"দূর, আমরা কি ব্রেকফাস্ট খেতে এসেছি? তার চেয়ে বরং লুচি ভাজো, বেগুন ভাজো—"

চোখ কপালে তুলে রুমা বলল—"এ—খন? লুচি? ঘরে ময়দাই নেই? ঘি-ও নেই।"

মনে মনে বললুম—তা থাকবে কেন? কেবল স্কচ আর সোডাই আছে! যেটা যাবে এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টে! সেই যে হরি বলেছিল না,—"ব্রেকফাশ রেডি!" সেটা যে এমনি সত্যি সত্যি ফলে যাবে তা কে জানত? যখন আমরা মাঝরাত্তিরে দুধ কর্নফ্লেক্স টোস্ট ডিম নিয়ে খেতে বসলুম, টেবিলে মাথা রেখে রুমা বেচারী ঘুমোতে লাগল। অথচ তার স্বামীকে একবার দ্যাখো? গুপ্তর এমনই ভাবখানা—যেন এমনটাই হবার কথা ছিল। এত ভদ্র। নিজেই কফি করে দিলেন রাত দুটোর সময়। হাসিমুখে। তোর পিসে অমন পারতেন?

তারপর আজ সকালে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে "অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি" চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন— "ঊষা? আমরা যখন গুপ্তর বাড়িতে গেলুম,তখন ড্রাইভার কোথায় ছিল?"—আমি ওঁকে সব ঘটনা বললুম। মিসেস চ্যাটার্জীর কথাটা শুনে ওঁর কী মন খারাপ। তক্ষুনি উঠে পড়ে—"যত্তো ব্যাটা মাতালের কাণ্ড!" বলে মুখ বেঁকিয়ে, বেড-টী পর্যন্ত না খেয়ে ড্রাইভারকে ডেকে সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসপাতালে ছুটলেন তার খোঁজ করতে। সত্যি গরীবদুঃখীর প্রতি ওর ভারী মমতা কিন্তু জানিস?

উনি তো বেরুলেন, আমি ওঘরে গিয়ে দেখি সুরিন্দর নেই। ছোট সোফায় কেবল টেবিলক্লথটাই পড়ে আছে। আর টেবিলে একটা চিঠি চাপা দেয়া। তাতে লেখা : "ডাজ এনিবডি নো, হোয়াট হ্যাপেনড টু মাই মানি?"

আটটা বাজতেই ভদ্রতার অবতার দেশাই ফোন করল—"গুড মর্নিং মিসেস রে, ডিড ইউ স্লীপ ওয়েল?" তারপর একটু আমতা-আমতা করে—"স্যরি অ্যাবাউট লাস্ট নাইট!" তারপর আরো আমতা-আমতা করে—"আই হ্যাভ এ ফানি ফীলিং ইউ নো? আচ্ছা, কাল ও-বাড়িতে মিসেস চ্যাটার্জী বলে কি কেউ এসেছিলেন?" এসেছিলেন শুনে দেশাই ফোনেই প্রায় কেঁদে ফ্যালে আর কি!—"সত্যি ছি ছি ছি, কী লজ্জা? কী লজ্জা! কোন হাসপাতাল বলতে পারেন? আমি এখুনি সেখানে যাচ্ছি— এর হে হে, হোয়াট আ শেম।"

তারপর, সোয়া আটটায়, ভটচায্যি।—"কি বৌদি নাকি? সত্যি বৌদি, কাল বড্ড অত্যাচার করা হয়ে গেছে আপনার ওপরে। ছোট ভাইটি বলে মাপ করে দেবেন!" আচ্ছা, ভটচায্যি ইস্কুলে ছোড়দার সঙ্গে পড়ত, আমার "ছোট্ট ভাইটি" হলো কী করে? সে যাকগে— "তারপরেই—দাদা কোথায়? এত ভোরেই বেরিয়েছেন? এ্যাঁ। হাসপাতালে? মিসেস চ্যাটার্জী? কী সর্বনাশ! তাহলে ওটা স্বপ্ন নয়? আমি তো ভাবছি একটা বাজে নাইটমেয়ার দেখেছি, ঈ-ঈ-ঈশ—ছি ছি ছি! কী কাণ্ড বলুন তো?

আই মাস্ট গেট দেয়ার ইম্মিডিয়েটলি! ধুত্তোর! শালা মদ আর জীবনে ছোঁব না। স্যরি বৌদি—এক্সকিউজ মি—আচ্ছা কোন হসপিটাল বললেন?”

সোয়া নটায় তোমার ছোটপিসে ফিরে এলেন। হরি চিরাচরিত গম্ভীর মুখে ট্রে নিয়ে হাজির, “সাব, ব্রেকফাশ রেডি।” উনি খেতে বসে বললেন—“চাটুজ্যের পো এ-যাত্রা বেঁচেই গেল মনে হচ্ছে। দেশাই আর ভটচায্যিকে ওখানে দেখলুম। খুবই কনসার্নড হয়ে ডাক্তার-নার্স ছুটোছুটি করছে।”

তোর পিসে অফিসে রওনা হয়ে গেলেন। সেই গাড়িতেই আমি তোর কাছে চলে এলুম। এবার বুঝে দ্যাখ দিকি, কালকে আমি বাগবাজারে গিয়ে বসেছিলুম কেন?

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছোটপিসির কাহিনী শুনছিলুম—জেগে উঠে তাড়াতাড়ি বললুম—“খুব বুঝেছি, ছোটপিসি!” তৃপ্ত হয়ে ছোটপিসি বললেন—“তা যাকগে, এ রোববার তো তোকে খাওয়ানো হলো না, সামনের শনিবার বরং ডিনারে—”

আমি হাঁ হাঁ করে বলে উঠলুম—“কিন্তু ছোটপিসি। আমি বোধহয় শুক্কুরবারই দিল্লি চলে যাচ্ছি—বরং সামনের বারে খাবো, কেমন?”

খেসারৎ

“হাই! মা! মা রে! মা গ!”

মা চুপ করেই থাকে। সুফল যে বুকের ওপরে আছড়ে পড়ে এত ডাকছে কানে শুনতেই পায় না। ওপাশে শুয়ে আছে লক্ষ্মী। মনে হচ্ছে সারাটা মুখ যেন সিঁদুরে মাখামাখি (ঠিক যেমন ছিলেক বিহার দিনকে)। লক্ষ্মীর পাশেই হাঁ করে আছে বড়কা। সুফলের ঠাকুদ্দা। এতদিনে গেল। (লিজের বউ খাইছোঁ, পুত খাইছোঁ, বুড়া দ্যার দ্যার করিছোঁ) ছেলের বউ নাতির বউ দুজনকে দু’বগলে নিয়ে। (সালো বড়কা মাঝি তীথির কোয়া ইবার সুমায় হৈল তুমার?) লক্ষ্মীর পেটের দিকে তাকায় সুফল। পেটটা অল্প উঁচু হয়েছিল। (গেল। উটোও গেল। সুফল ইবার যিথাক ইচ্ছা সিথাক যেইতো পারবেক। সুফলের বাধাবাঁধন লাই)।

“হা রে কপাল। কেনে এইসেঁছেলম মত্তে লুভে পইড়োঁ গ! টুগদি সবুর সইলেক লাই—হাই মা! তুর তস্ সইলেক লাই!”

ওদের গাঁ থেকে শহর অনেক দূর। সেখানেও হাসপাতাল আছে বটে, কিন্তু সুফল

দেখেনি। সুফলের হাসপাতাল দেখা এই প্রথম। যেমন কলকাতা শহর দেখাও এই প্রথম।

হাসপাতাল কী বিচিত্র ঠাঁই!

চতুর্দিকে কেবল মরা আর আধমরা মানুষ ভর্তি। আর সাদা জামা পরা জুতো পরা যমদূতের মতন সব মেয়ে-মরদ খটখট করে ঘুরছে। সবাইকে ধমকাচ্ছে। মাথায় সাদা ফেট্টি বাঁধা একটা মেয়ে-মানুষ এসে সুফলকে মায়ের বুক থেকে হটিয়ে দিল, আরেকটা মরদ এসে ফটাফট চাদর চাপা দিয়ে দিল তিনটে মানুষের ওপর। একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে। (এত গরম। বাপরে। জানপরাণ যায়, গা'র ছালটো যেন ছেইড়্যোঁ, ইর ভিতরি চাদর চাপা?) একলা সুফলই রইল চাদরের বাইরে। সুফলের পরনে ফর্সা ধুতি। গায়ে ফর্সা গেঞ্জি। গলায় পেতলের মাদুলি। মাথায় ভিজে চুল পাট পাট করে আঁচড়ানো ছিল একটু আগেও। (সুফল এখুন যিথাকে ইচ্ছা সিথাক যেইতোঁ পারিস। ঘরকে যাবি? কার ঘরকে যাবি রে সুফল?) অমনি আরেকটা চাদরের তলায় ঢুকে পড়তে পারলেই সবচেয়ে ভালো হতো সুফলের এখন।

"লক্ষ্মী রে! হাই রে লক্ষ্মী! মোখে ছেইড়্যোঁ তু কুথাক চললি রে!" সুফল হঠাৎ শানবাঁধানো মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকতে আরম্ভ করে দেয়।

—"এই! ও কী হচ্ছে কী? মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা হবি যে?" ডাক্তারবাবুটা এসে ধমক লাগায়। গেঞ্জীর কোণা ধরে টেনে তোলে।

"বাবু! মোর সব যেছেঁ, সব চইল্যোঁ যেছেঁ গ'! সহ্য করতে লারছি।"

"সব গেছে মানে? কী গেছে তোর?"

"মা যেইছেঁ, বউঠো যেইছেঁ, বউয়ের প্যাটের ছেইল্যাতো যেইছেঁ, বুড়া কত্তা যেইছেঁ—হারে মোর কপাল!" ঠাস ঠাস করে মাথায় থাপ্পড় মারে সুফল।—"হাই বাবু গ' আমি ঘরকে যাব কেমনি কর‍্যোঁ গ'? গাঁকে যেইয়্যোঁ পুড়া মুকখান দিখাব কেমনি কর‍্যোঁ গ' বাবু? পুড়া ঘরকে যে জনমনিষি রইলেক নাই!"—সুর করে কাঁদতে থাকে সুফল। ছোকরা ডাক্তারবাবুটার মুখখানা কেমন যেন হয়ে যায়।

"দাঁড়া, দাঁড়া, চুপ কর। আগে আমায় বুঝতে দে। কে কে গেছে তোর বললি? মা? বউ?" বাবুটা কাগজ পেন্সিল বের করে।

মা যেছেঁ, বউটো যেছেঁ, বউয়ের প্যাটে ছেইল্যাটো যেছেঁ, বুড়াকত্তা যেছেঁ আমি জেন্যোঁশুন্যেঁ কুখুনো তো পাপ করি নাই—হাই বাবু গ'—মোর ঘরকে আর কেউ নাই রে বাবু—কেউ কুত্থাকে নাই কে নে রে আমার!" হাউমাউ কাঁদতে থাকে সুফল।

—"নাম কী তোর?"

—"সুফল মাঝি! অ বাবু, মোর কী হবেক রে—"

—"চুপ কর—গাঁয়ের নাম কী তোর?"

—"গেরাম কুন্তঙ্গেরাম, থানা ইলমবাজার, জিলা বীরভূম—"

—"ওঠ, ওঠ—আয় আমার সঙ্গে—"

—"কুথাকে যেইত্যেঁ হবেক গ' বাবু? শ্মশান কে?"

—"সেসব এখন নয়। ঢের দেরি আছে শ্মশানের। চল্ তোর নামঠিকানা লিখিয়ে দিবি চল। শালা ড্রাইভারগুলোর ফাঁসি হওয়া উচিত। না আছে কণ্ট্রোল, না হয় গাড়ির মেনটেনেন্স। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থেকেও রক্ষে নেই? ছি, ছি, ছি—"

তিনটে মড়ার মুখাগ্নি করা সোজা ব্যাপার নয়। মুখে আগুন মানে মায়া কাটানো। তা মায়াটা বেশ ভালোভাবেই কেটে গেছে এবার সুফলের। কত্তাবুড়া। মা, লক্ষ্মী। বেরিয়েছিল মোট চারজনেই। ঘর বন্ধ করে, ছাগল চরানোর ভারটা চাঁদু বধুনীর ওপরে দিয়ে।

"মিটিন আছেক। কইলকাথার ময়দানকে বঢ়িয়া মিটিন্। পার্টির দাদাবাবুরা গাড়িভাড়া দিয়্যেঁ লিয়েঁ যাবেক, ভাত দিবেক, লিখরচায় কইলকাথা দেইখ্যেঁ আসবি সব্বাই—গঙ্গাচ্ছান কইর‍্যেঁ আসবি সব্বাই—", সিদুখুড়া বলেছিল। তারই কথায় এসেছে ওরা তেরোজন, ময়দানে মিটিং করতে আর ঐ সঙ্গে লিখরচায় কলকাতা শহর দেখে যেতে। মা বললে,

"মুন বুলছেক ইবার না হলিঁ আর কুনুদিন হবেক লাই। মোর গঙ্গা দিখা হয় লাই রে সুফল। একটুস ডুব দিয়্যেঁ আসথম।" লক্ষ্মী বললে,—

"মা যাবেক, তবে মোকেও লিয়্যেঁ যাবি কিন্তুক, হঁ! বুল্যেঁ দিলম! ইকা ইকাটি ঘরকে থাকব লাই।" তারপর আড়ালে আহ্লাদী গলায় বলেছিল।

"কইলকাথাক যেইয়্যেঁ চিড়েখেনাটো দিখাবি, সুফল— বাঘ, সিঙ্গি, হাতী, বান্দর? ফুলটুসি সব দেইখ্যেঁ এসেছেক রে!"

"বেশ, বেশ। সব হব্যেঁ।" বড়কা মাঝি বলেছিল।

"পয়লা ইস্টিশানকে নেম্যেঁ গঙ্গাচ্ছানটো সেইর‍্যে লিব, তাপরে সিদা কালিঘাট। পূজাটো দিইয়্যেঁ, চিড়েখেনাক লিয়্যেঁ যাব তুদেরখে। তাপরে মিটিং। বাস। মিটিনকে যেইলিঁ তো পুরা শহরটো দেইখ্যেঁ লিলি। মইদান মানুম্যাণ্টো, ভিট্টরিয়া। আর ভীড় কী! বাপ গ'!"

অমন জমজমাট প্রোগ্রামটার কেবল শুরুটুকুই হয়েছিল। শেষটা অন্যরকম চেহারা নিল। ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে প্রত্যেকেই গঙ্গাস্নান গঙ্গাপুজো করেছে। এখন ট্রামে চড়বে বলে দাঁড়িয়েছিল সবাই হাওড়ার পুলের উপরে। কলকাতা এসেছে, ট্রামে চড়তে হবে না? প্রথমে কালিঘাট। তারপরে চিড়িয়াখানা।

উঃ! কী শহর! গাড়িঘোড়ার দাপট কী! বড় শহর সিউড়িও দেখেছে সুফল মাঝি। তার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না।

"গাড়িগুলান সব ঝেনে উদ্ধশ্বাসে দাঁদুড়ে আসছেক—", ভয় পেয়ে লক্ষ্মী বলে উঠেছিল—

"উঃ। জানটো লিয়োঁ লিবেক নাকি? বাপ্ গ'!"

তাই হয়েছে। ঠিক তাই হয়েছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়েছিল তেরোজন গ্রামের মানুষ ভোরবেলা স্নান সেরে। ব্রেক নষ্ট সরকারী বাস পাগলের মতো দুদ্দাড় করে ফুটপাতে উঠে এসেছে; সাতজনকে চাপা দিয়ে জানগুলো এক্কেবারে নিয়েই নিয়েছে। তিনজন সুফলেরই ঘরের মানুষ। বাকি চারজন ডোমপাড়ার। আরো তিনজন হাসপাতালে ভর্তি। বেঁচে গেছে সুফল, পঞ্চা, সিদুখুড়া। ওদের আর মিটিনে যাওয়া-হয়নি। (সুদ্ধা মা গঙ্গা আর হাওড়ার পুলটো আর হাসপাতাল। বাস। আর কুনুটা দেখলম লাই)!—"লক্ষ্মী রে! আই রে লক্ষ্মী! চিড়েখেনাক বিড়াতে যেইত্যেঁ বড্ড সাধ হইছিল রে তুর—।

—"আবার?" সাদা ফেট্টি বাঁধা ছুঁড়িটা এসে এক ঝাঁকি লাগায় সুফলের কাঁধ ধরে।

"থাকো থাকো ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ে ওঠো কেন? কাঁদতে হয় যাও বাইরে গিয়ে কাঁদো"—একটু থেমে বলে—"কান্নাই বা কিসের এত? তিনজন তো মরেছে? পুরো তিনহাজার পাবে। আমি অত টাকা পেলে বর্তে যেতুম, বুঝলে?"

—"দেশে ফিরে আরেকটা বিয়েসাদি করে ফেলিস"—সাদা ফেট্টি বাঁধা অন্য ছুঁড়িটা বলে। দুজনেই মুখ টিপে হাসে।

সুফল এদের কথার মানে বুঝতে পারে না। কী ভাষা বলছে এরা? এরা হাসছে কেমন করে? (ছামুতে ডাগর বউটো মইর্যেঁ পইড়্যেঁ আছেক, ইরা বুলে, গাঁকে যেইয়্যেঁ বিহাশাদি কর? বুলে, তিনটো মইরেছ্যেঁ তিনহাজার হবেক? ইরা কি পাগল? ভূতপিরেত মানবেক লাই?)।

দলের পাণ্ডা রবীন পোদ্দার, প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। সেও পার্টির দাদাবাবু। সব ছুটোছুটি থানাপুলিস সে-ই করছে। মাস্টার ছিল তাই রক্ষে। কতগুলো কাগজেই যে টিপসই করিয়ে নিলো এরই মধ্যে সুফলকে দিয়ে। সিদু খুড়া সান্ত্বনা দিলে—

"টুকুস ভালো কথা, তুর মার জেবনের সুকসাধটো মিট্যেঁ যেইছ্যেঁ। গঙ্গাচ্ছান কইরে মইরেছ্যেঁ, সিধা স্বগগকে পৌঁছাই যাবেক। হঁ! হইছে বটেক অপমিত্যু, কিন্তুক প্যণ্যচ্ছানের ফল লাই? উরা কুখুনো ভূতিন-পেতিন হবেক লাই। এই বল্যেঁ দিলম তুখে।" এই বিধানটা খুব মনের মতন হয়েছে সুফলের। এইটুকুই ভরসা। গঙ্গাচ্ছানটা টাটকা টাটকা করা আছে, মা-বউয়ের স্বর্গে যেতে দেরি হবে না। (আর যেমুন ধাঘী মরদটো সাথে যেইছ্যেঁ, বড়কা মাঝি! বুড়াকত্তা পথকেই মরুক, উর ঠাণ্ডা মাথাটো হবেক লাই)।

বুড়াকত্তার পেট-কাপড়ে পঞ্চাশটা টাকা বাঁধা ছিল। (আইব্বাপ! বুড়াকত্তা, তুর প্যাটে ইথ টাকা?) মায়ের আঁচলেও ডবল গেরো দেওয়া দুটো টাকা ছিল। হাতে ছিল কাঁকন-জোড়া। পুলিস সব খুলে এনে সুফলের হাতে তুলে দিয়েছে। কিছুই ছিল না কেবল লক্ষ্মীর ট্যাঁকে। গর্ভের সন্তানটুকু ছাড়া। তবে হাজার হোক নতুন

বউ, নেই নেই করেও গা-ভর্তি গয়না তার। চকচকে কালো চামড়ার ওপর ঝকঝকে সাদা রুপো— বড্ড মানাতো বউটাকে। লক্ষ্মীর হাতের জোড়া বালা, গলার গোলাপ ফুলহার, কানের মাকড়ি, খোঁপার ফুল, পায়ের মল, মায় আঙুলের আঙট পর্যন্ত সব খুলে খুলে গুনে গুনে পুলিসরা যখন সুফলের হাতে তুলে দিচ্ছে, সুফল আরেকবার চীৎকার করে উঠল— "লক্ষ্মী রে! আই রে লক্ষ্মী! তুর জেবনের সকসাধ ত কিছুই মিটলেক লাই? তুর প্যাটের ছেইল্যাঁর মুখানটুসও দেইখ্যে যেইত্যেঁ লারলি তু—", রবীন মাস্টার ধমক দিলে,—"চুপ কর। এখন ভালো করে গুছিয়ে রাখ দিকিনি গয়নাগাঁটিগুলো, খবদ্দার বেচবি না এক্ষুনি!"

না, বেচবে কেন সুফল? এক্ষুনি তো হাতে বাহান্ন টাকা এসেছে সুফলের, বাহান্নখানা তাসের মতন। আরও যা আসবে শুনেছে তাতে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সুফল মাঝির। নিজেকে পাপী-পাপী মতন লাগছে কেমন, কথাটা মনে পড়লেই। (কিন্তুক সুফল মাঝির ইথে দুষটো কুথাকে? পাপটো কুথাকে মোর?) রবীন পোদ্দার খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছে। (লিচ্চয় মিছা বুলেক লাই রবীন মাস্টার, সাঁচ্চা কথাই বুলছেক)। হিসেবপত্তর। বুড়ো ঠাকুর্দার জন্য এক হাজার, মায়ের জন্য এক হাজার, লক্ষ্মীর জন্য এক হাজার। মোট তিন তিন হাজার টাকার মালিক এখন সুফল। খেসারতি দেবে তাকে সরকার। একসঙ্গে তিনশো টাকাই চোখে দ্যাখেনি যে-লোক, সেই পাচ্ছে তিন হাজার। অত টাকা দিয়ে সুফল করবেটা কী? তিনখানা জ্যান্ত মানুষ তো আর কিনতে পারবে না? তিন তো নয়, সাড়ে তিনখানা।

—"আর প্যাটের ছেইল্যাটো গেল ঝে? উটোর লেগে খেসারতি দিবেক লাই সরকার?"

—"বড্ড লোভ তো তোর?" ঘেন্নাঘেন্না সুরে ধমকে উঠেছিল রবীন পোদ্দার —"যে ছেলে জন্মায়নি তার জন্যেও খেসারতি চাই?"

"চাই লয়? জম্মায় লাই সিটো কি তার দুষ। তার মাখে মইরে দিছেঁ বইল্যেই লয়?"

"ফের তক্কো?" অবাক চোখে তাকিয়েছিল রবীন পোদ্দার।

"তোদের প্রাণে কি মায়ামমতা নেই রে? মা-বউ গেল, বুড়ো ঠাকুদ্দা গেল, ঘর সংসার ফাঁকা ধুধু হয়ে গেল, আর তুই কষছিস টাকার হিসেব? ধন্যি জাত মাইরি তোরা। সত্যি!"

সুফলের হিসেব কষার সেই আরম্ভ। বাহান্নর আটটা টাকা বেরিয়ে গেছে শ্মশানেই। তিন তিনটে ঘরের জনের মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া কি সোজা কাজ? প্রস্তুতি চাই না তার জন্য?

—"যা যা, বাড়ি চলে যা, এখেনে থেকে আর কাজ নেই তোদের। পঞ্চা, সিদুখুড়ো, সামলেসুমলে সুফলকে দেশে নিয়ে যাও দেখি তোমরা—পরের ট্রেনেই

যাও।" ধমকে উঠেছিল রবীন পোদ্দার— "গুচ্ছের মদ গিলে শ্মশানেই মাতলামো শুরু করেছিস সুফল? লজ্জাও করে না তোদের? ছি ছি—"

—"সরকার খেসারতির ট্যাকাটো এখুন দিবেক লাই, মাস্টার? ট্যাকা লিয়োঁ ঘরকে যেথম বেটে।"

—"ফের টাকার কথা? বলিহারি যাই বাবা। সে টাকা পেতে পেতে এখন অনেক দিন! হাতে হাতে পাবি নাকি? দেবে ঠিক সময়মতন। সব খুইয়েও খেসারতির বেলা ঠিক হুঁশটি দেখি টনটনে—"

তা হুঁশ টনটনেই বলতে হবে বই কি সুফল মাঝির। ট্রেনে চড়ে বসেই বিড়বিড় করে হিসেব কষতে শুরু করেছে।

—"তিনটো মনিষ মইরেছোঁ, তিন হাজার। একটো মনিষ মইরলেঁ এক হাজার। একটো মনিষ জন্মায়লাই, তাই উটোর কুনু খেসারতি লাই। সুদ্ধা যি-মনিষগুলান মিছা মিছা জন্ম লিয়োঁ মিছামিছা মইর্যোঁ যেইছেঁক—", আঙুলের কড় গুণতে থাকে সুফল— "গোপলা মৈরেছে গেল সালকে রেলপুলিসের গুলি খেইয়্যাঁ, এক হাজার। লিতাই সিবার বানের জলকে ভেইসোঁ গেল, ভরপুয়াতি ছাগলীটো চালকে উঠাই লিজ্যে উঠতে লারলেক, অজয়ের ওঃ কী মরণ সোঁত—হা রে লিতাই! এক হাজার। এক এক দুই। দাদী যেইছোঁ কালেরা হইয়্যা, এক হাজার। তিন হাজার। বাপ-জেঠা গেল একই দিনকে জমিনের দাঙ্গাক লাঠি খেইয়্যাঁ—বাপ চার। জেঠা পাঁচ। পাঁচ হাজার। পাঁচ তিনকে আট। আর বুনদুটো তিনমাস পয়লা কয়লাখাদকে জলডুবি হইয়োঁ মইরেছোঁ—শালো কন্টাট্টারের লালখাতাকে উদের নাম লিখায় লাই—সরকার বুনদুটার লেগে একডুনু ট্যাকাকড়ি দিলেক লাই—আট দুই দশ। আর প্যাটের ছেইল্যা মিনিমাঙনা, উর বিলা খেসারতি লাই, সিটো জন্ম লিতেই লারলেক! ঠিক কাথা! কি বুল খুড়ো, আমি কি কম বুড়লুক? আইববাপ। সিদা কাথা? দশ হাজার ট্যাকা পাইছিঁ বেটে, সরকার মোখে দশ হাজার ট্যাকা দিছোঁক—বাপ এক। জেঠা দুই। দাদী তিন। গোপলা চার। লিতাই পাঁচ। দুটো বুন, শালফুল, নিমফুল। পাঁচ দুই সাত। বুড়াকত্তা আট। মা লয়। লক্ষ্মী দশ। মোর ঘরকে কি কম লুক মেইরেছোঁ সরকার? খেসারতি দিবেক লাই? প্যাটের বিটাটো ফাউ। হুঁঃ—পুরো দশ হাজার। ট্যাকাটা হাথে পেইয়্যা দেইখ্যো খুড়া পরথমকেই লক্ষ্মীকে সাঙ্গা কইর্যোঁ ঘরকে তুলব আমি, আর শালো দীনু চৌধুরীর হাথ মুচড়ায়্যা জমিনটো কেইড়োঁ লিব। মোর বাপজেঠা জান দিছোঁ উয়ার লেগে, কুনুদিনকে দীনু চৌধুরীর জমিন লয় সিটো —হুঁ,—" —চোখটা জ্বলে ওঠে সুফলের। সেদিকে তাকিয়ে ভয় পায় সিদু।

—"হায় হায় গ", সিদুখুড়ো ফিসফিসিয়ে পঞ্চাকে বলে— "শোকে-দুখে ছেইল্যাটার মাথা বিগড়ায়্যা যেইছো গ'—হাই ভগমান"—

—"কেনে? মাথা বিগড়াইছে বুল কেনে?" দাবড়ে ওঠে পঞ্চা। মদ সেও

কম খায়নি।—"লেহ্য কথাই বুলছেক বেটে সুফল। পরপর ঘরটো খালি হইয়োঁ যৈছে নি উর? খেসারতি দিবেক লাই কেনে দরকার– মরে লাই? জুয়ান জুয়ান মেইয়্যা মরদ মিছা মিছা মরে লাই উর ঘরকে? শালো কইলকাথাকে যেইয়োঁ মইরলে হাজার ট্যাকা আর গাঁওঘরকে মইরলে লবডংখ্য?" সিদু খুড়ো ভয় পেয়ে পাশের গাঁয়ের যাত্রীকে ডাকে—"আই মাঝি, ইরা বুলে কি? ছেইল্যাগুলান খেইপ্যে যেছেঁ নিকি?"

মেঝেয় থুথু ফেলে মুখ ভেংচে মাঝবয়সী লোকটি বলে—"তুমিও কি খেইপলে নিকি মাঝি? মদ খেইয়্যা কী বুলতে কী বুলছেক, ধুস, উসব শুন কেনে?"

চোখ

বীরুবাবু সকালবেলায় দোতলার বারান্দায় দাঁতন করছিলেন, এমন সময়ে সেই বিরক্তিকর হরিধ্বনি। কেওড়াতলার কাছাকাছি বাড়ি নেবার ফলটা এই হয়েছে যে একটা দিন যায় না মড়া না দেখে। ইচ্ছে না করলেও চোখ পড়লো নিচের দিকে, কেমন যেন চমকে উঠলেন। মৃতদেহের তো চোখ সাধারণত বোজা থাকে, না-বুজলে তুলসীপাতা চাপা দেওয়া থাকে। এই মুখটা—ঠিক যেন কোনো জীবন্ত লোক খাটিয়ায় শুয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে। রোগাটে ছুঁচলো মুখ, ফর্সাই বলা যায়, সরু কালো গোঁফ ঠোঁটের ওপরে। ওপরের ঠোঁটটা অদ্ভুতভাবে একটু কাটা—ফাঁক দিয়ে একটা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তার চোখদুটি মেলা। একটা চোখ আরেকটার চেয়ে বড়, যেন ওপরের পাতাটা নেই—পাথরের চোখের মতো—পুরো মণিটাই প্রায় দেখা যাচ্ছে। বীরুবাবুর বেজায় অস্বস্তি হলো। ব্যাটারা আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে লাল আলোর জন্যে—বীরুবাবুর মোটে ইচ্ছে না করলেও, নড়তে পারলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন বারান্দায় সেঁটে, ওই জ্যান্তমতন মরা মুখখানার দিকে চেয়ে। দেখতে-দেখতে কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হলো মুখটা?

নিশ্চয় দেখেছেন। কোথায়?...কোথায়? বাজারে কি? মাছওলা কোনো? সব্জীওলা? ট্রামে কি? কন্ডাক্টর? কোথায়? শ্যালদা লাইনে ট্রেনের ফেরিওলা নয় তো? নাঃ—এসব অদ্ভুত সংশ্রব মনেই বা আসছে কেন তাঁর? মুখখানা খুব চেনা-চেনা লাগছে—অথচ কিছুতেই ঠাহর করতে পারছেন না কী জন্য চেনা। ভাবতে ভাবতেই আলো বদলালো, হরিধ্বনি দিয়ে ওরা চলে গেল। খাটিয়ায় শুয়ে ওঁরই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুলতে দুলতে চলে গেল লোকটা। চেরা-ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতটা যেন হাসছে।

বিশ্রী লাগছে সক্কালবেলাতে এই বিতিকিচ্ছিরি মড়ার মুখ দেখা। বীরুবাবু কলঘরে গেলেন মুখ ধুতে। চোখে বারবার জলছড়া দিয়ে যেন ওই বিস্বাদ অভিজ্ঞতাটাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেন। মড়ার মুখে কত প্রশান্তি থাকে। মড়ার মুখে এমন ফিচেল-ভাব তিনি জীবনে দেখেননি। চা, খবরের কাগজের ফাঁকে ফাঁকেও বিতৃষ্ণার অনুভূতিটা যেন ফিরে আসতে লাগলো। তিনি থলি হাতে বাজারে বেরুলেন।

চেনা মাছওলা, চেনা আলুওলা, চেনা ফলওলা। বাজারে তাঁর সবাই চেনা। তবুও বীরুবাবু আজ প্রত্যেকের দিকে নতুন চোখে চাইতে লাগলেন—যেন কোথাও কিছু লুকিয়ে আছে। বীরুবাবু দুশো পার্শে বেছে নিলেন, পাঁচশো আলু, দেড়শো পেঁয়াজ, একশো ঢেঁড়স, চারটে মুলো, শাক তিন আঁটি—হঠাৎ দেখতে পেলেন। শাকউলি বুড়ির বাঁ চোখটার মণিতে যেন ঢাকনি নেই—ছুঁচলো মতন মুখখানা—বীরুবাবুর হাত থেকে শাক পড়ে যাচ্ছিলো, বুড়ি তাড়াতাড়ি তুলে দিল, আধুলি থেকে কুড়ি পয়সা ফিরিয়ে দিলে—অন্যদিকে চেয়ে অন্ধের মতো কোনোমতে পয়সাটা নিয়েই বীরুবাবু চলে এলেন।

শসা এক জোড়া,—মাথা ঠাণ্ডা করে বীরুবাবু ভাবলেন, আজ বেসপতিবার, ছ'টা কলা, দুটো কমলালেবু নিতে হবে। গিন্নির লক্ষ্মীপুজোর বাই আছে। সংসারে তো লক্ষ্মী উথলে উঠছে! নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তবু লক্ষ্মীপুজোর ফলটি চাই। বাতাসা চাই। বীরুবাবুর ভুরুটা কুঁচকে উঠলো। তিনি এসব পুজো-ফুজো-তে বিশ্বাস করেন না। তবু গিন্নিকে নিজের মনে থাকতে দেন। ছেলেপুলে হয়নি, --কিছু একটা নিয়ে থাকবে তো মানুষ। তাঁর না-হয় অফিস আছে। সন্ধ্যেবেলা নগেনবাবুর বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা আছে। গিন্নি বেচারীর ওই সিনেমার কাগজ, কখনো একটা বাংলা ছবি, আর লক্ষ্মীপুজো, সত্যনারায়ণ—এই নিয়েই তো জীবন। ভাবতে ভাবতে গিন্নির প্রতি করুণায় মনটা আবার নরম হয়ে এলো বীরুবাবুর। আহা করুক একটু—শখ আহ্লাদ বলতে তো ওইটুকু। কলা কত করে?—লোকটা পিছন ফিরে টাঙাচ্ছিলো কলার কাঁদি—বললো—কোন কলাটা?— বলতে বলতে এপাশ ফিরলো। রোগাটে, ছুঁচলো মুখ, ওপরের ঠোঁটটা চেরা, ফাঁক দিয়ে একটা হলদে দাঁত বেরিয়ে আছে—সরু গোঁফে ঢাকা পড়েনি। বীরুবাবুর গলার ভেতরে নিশ্বাস আটকে এলো—তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। গিন্নি, বেসপতিবার, ফল, বাতাসা...ছিটকে সরে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। কলাওলা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। বীরুবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করলেন মনের লাগামটা কষে ধরতে।

বাজারের জনস্রোতে কারুর দিকে চাইতেই ওঁর কেমন ভয় করতে লাগলো, যেন প্রত্যেকের মধ্যেই একটা চমক থাকতে পরে। কোনো-দিকে-না-তাকিয়ে হাঁটতে গিয়ে কার বুঝি পা মাড়িয়ে দিলেন—উঃ, দেখে চলতে পারেন না? পায়ে কি খুর বাঁধিয়ে রেখেছেন দাদা?— বীরুবাবুর যেন জ্ঞান ফিরলো—আহা, লাগলো? বলতে বলতে তিনি পাশে চেয়ে দেখলেন লোকটি নিচু হয়ে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে

মুখ তুলে তাকালো—বাঁ চোখ ভাবলেশহীন, বিস্ফারিত, ডান চোখে রাজ্যের বিরক্তি, সরু গোঁফের নিচে চেরা-ঠোঁটের ফাঁকে হলদে দাঁত যন্ত্রণায় খিঁচিয়ে রয়েছে—প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বীরুবাবু দ্রুত সরে গেলেন। বাজার করা মাথায় উঠলো, বাড়ি পৌঁছুতে পারলে বাঁচেন। কেমন যেন দুর্বল লাগছে পা দুটো, মাথার ভিতরটায় গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে, ব্রীজের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি গেলে যেমন হয়, নিজের পায়ের ওপর যেন নিজের কন্ট্রোল নেই, বীরুবাবু ডাকলেন : এই রিকশা। রিকশাওলা পাদানিতে বসে ঝিমুচ্ছিলো, ডাক শুনে জেগে উঠলো। বিস্ফারিত বাম চোখে দৃষ্টি নেই—চেরা ঠোঁটের ফাঁকে—বীরুবাবু আর তাকাতে পারলেন না, আপনি বুজে গেলো চোখ—ছুটে গিয়ে পাশের ট্যাক্সিটার দরজা খুলে উঠে পড়লেন। আঃ! সীটে গা এলিয়ে দিয়ে কী আরাম।

সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত কাঁপুনি হচ্ছে যেন—এই মুহূর্তে এই বসবার জায়গাটা না পেলে উনি নিশ্চয় রাস্তায় পড়ে যেতেন। মোটা আওয়াজে সর্দারজী জিজ্ঞেস করলো, কিধর যানা ? বীরুবাবু ক্লান্ত গলায় নির্দেশ দিলেন। এতোই কাছে যে ড্রাইভার বিস্মিত হলো। বাড়িতে এসে নেমে তিনি ড্রাইভারকে এক টাকা ষাট দিতে গেলেন, খুচরোই সমস্তটা। ড্রাইভার চোখ থেকে রোদের চশমাটা খুলে পয়সা গুনতে লাগলো। গুনে নিয়ে বীরুবাবুর দিকে চেয়ে বললে, বাস ! ঠিক হ্যায়। বীরুবাবু দেখলেন সর্দারজীর দাড়িগোঁফের জঙ্গলের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে বাঘের মতো নিষ্পলক বাঁ চোখ—যেন পাথরের চোখ, চামড়া ঢাকা নেই। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সিঁড়ির তলার পরিচিত স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে পৌঁছে তাঁর যেন বুকটা ফেটে যেতে চাইলো। হাঁটুতে হাঁটু জড়িয়ে যাচ্ছে দেখে প্রথম ধাপটাতে বসে পড়লেন। বাইরে আওয়াজ পেলেন, স্টার্ট দিয়ে ট্যাক্সি চলে গেলো। বীরুবাবুর যেন ধড়ে প্রাণ ফিরলো—সঙ্গে সঙ্গে চোখ-দুটোও যেন ভিজে ভিজে হয়ে এলো, সেই বুক-ফাটা চাপটা যেন চোখ থেকে বেরুবার পথ পাচ্ছে। রুমাল বার করে চোখমুখ মুছলেন বীরুবাবু। এবারে ওপরে গিয়ে ভালো করে এক কাপ চা খেতে হবে। কী আশ্চর্য বিভ্রম !

বিভ্রম ছাড়া এটা কিছুই নয়। বীরুবাবু ভাবলেন, সকালে উঠেই প্রায় আধো-ঘুমের মধ্যে অমন বীভৎস মড়া দেখবার যা একখানা অভিজ্ঞতা চোখের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—হয়েছে, আর কি যতসব অবচেতনের বজ্জাতি। যাকে বলে হ্যালুসিনেশন ! এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যান্ত কালী দেখতেন, শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে দেখলেন জগন্নাথ মূর্তি—আর বীরুবাবু চতুর্দিকে মড়া দেখছেন। তাঁরা ছিলেন গিয়ে পুণ্যবান ব্যক্তি—আর সরকারী কেরানীর কপালে জ্যান্ত নরক ছাড়া কীই-বা জুটবে। বীরুবাবু ভাবলেন, খাওয়া-দাওয়াটায় একটু যত্ন নিতে হবে এবার। বেশি করে প্রোটিন ও ভিটামিন খাওয়া উচিত। দুধ তো বহুদিন বন্ধ। মাংস-ডিমও বন্ধ। হবে না ? পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীরে রাসায়নিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তাই থেকেই

এসব স্নায়বিক রোগের উৎপত্তি। নার্ভাস ডিসঅর্ডার ছাড়া কিছু নয়। গোড়াতেই এর উচ্ছেদ দরকার। উনি আজই ডাক্তারের কাছে যাবেন। ভিটামিন বড়ি-টড়ি একটা কিছু খেতে হবে আরকি। বয়েস হচ্ছে। শরীরের বল, রস ফুরিয়ে আসছে। এখন বাইরে থেকে বলসঞ্চার করা দরকার। ফুড সাবস্টিট্যুশন দরকার ওষুধ দিয়ে। ভাবতে ভাবতেই বীরুবাবুর পায়ে বল এলো। তিনি সহজভাবে উঠে দাঁড়ালেন। থলি হাতে উপরতলায় উঠে গিয়ে কড়া নাড়লেন সিঁড়ির মাথায় থেমে।

গিন্নি এসে দোর খুলে দিলেন—কিগো, আজ এত দেরি? আমার তো ভাবনাই হয়ে গিয়েছিলো। যা দিনকাল!—বীরুবাবুর হাত থেকে থলিটা নিতে হাত বাড়ালেন গিন্নি।

—আর বোলো না! আজ এমন একটা অদ্ভুত—বলতে বলতে বীরুবাবু একমুহূর্ত থামলেন—ওকে এটা হঠাৎ বলা কি ঠিক হবে? এসব ব্যাপার মনের ভেতর ঢুকিয়ে না দেওয়াই ভালো—এমনিতেই যা ভীতু মানুষ—এসব আনক্যানি গল্প ওকে বলে কাজ নেই। অটোসাজেশন বলেও একটা জিনিস আছে। বীরুবাবু কথা ঘুরোনো ঠিক করে নিয়ে থলিটা গিন্নির হাতে তুলে দিলেন। দিতে দিতে দেখলেন গিন্নির বাঁ চোখের মণিটায় অকূল বিস্ফারিত দৃষ্টিহীনতা, চেরা ওপরের ঠোঁটের ফোকরে একটি হলদে দাঁত তাঁরই দিকে হাসছে। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো, সহসা পিছন দিকে হেলে পড়লেন। গিন্নির আর্তনাদের মধ্যে বীরুবাবুর দেহ সিঁড়ির ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়তে লাগলো নিচে। আরো নিচে।

[উপসংহার : ডাক্তার এসে বলেছিলেন, স্ট্রোক। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু। কতশত স্ট্রোকের পিছনে যে কি গল্প থাকে, আমরা কি জানতে পারি? বীরুবাবুর গল্পটাই তো তিনি বলে যেতে পারলেন না]।

সুটকেস

চন্দন বাবার জন্যে বিলেত থেকে ঘড়ি আনলো, কিন্তু মার জন্যে কী যে আনবে ভেবে পেলো না। শেষে কী ভেবে একটা লাল-টুকটুকে, ছোটো দেখে হালকা ফাইবার গ্লাসের সুটকেস কিনলো। বাবা ঘড়ি পেয়ে মহাখুশি, এক স্নানের সময়েই যা ঘড়িটা খুলে রাখতে বাধ্য হন। আর মা গদগদচিত্তে সুটকেসটিকে একটা টুলের ওপরে, ফুল-তোলা কাপড় দিয়ে ঢেকে, সাজিয়ে রাখলেন।

চন্দনের ছোটো ভাই বুচকুন এখনও কলেজে পড়ে, মা-বাবার কাছে শুধু সেই

থাকে। আর থাকে সেজ বোন ইন্দিরা, ওখানে গার্লস স্কুলে পড়াচ্ছে। ছোটো বোনটা ক্লাসফ্রেণ্ডকে বিয়ে করে আগেই কলকাতায় চলে গেছে। দিদি-মেজদি তো বহুকাল শ্বশুরবাড়িতে। দিদির ছেলেই বুচকুনের সমান। চন্দনের চার দাদাও বিয়ে-থা করে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। দশ ছেলেমেয়ের মা হলে কি হবে সলাজনয়নী এখনো বেশ শক্ত আছেন, রান্নাবান্না নিজেই করেন। ক্ষেত্রবাবুর এই আটাত্তর হলো, বাঁ-চোখে ছানি পড়েছে, ভালো দেখতে পাচ্ছেন না আজকাল। চন্দন তাই চিঠিতে দরকারি অংশগুলো আনডারলাইন করে দেয়।

আপাতত চন্দনের দুটো চাকরি হয়েছে বার্নপুরে। এক ইঞ্জিনীয়ারিং, আরেক বোনের জন্যে ঘটকালি। বাবা-মায়ের মনে এখন প্রধান উদ্বেগ ইন্দিরা, যার বয়েস সাতাশ পুরেছে। গোটা শিলিগুড়ি শহরে নাকি সাতাশ বছরের অবিবাহিত কন্যা আর একটিও নেই। চিঠিতে চন্দন তাই নিয়ম করে পাত্রের খবর পাঠায়। সাধারণত খাঁটিই, মাঝে মাঝে অবশ্য কল্পিতও। কেননা চন্দন সার কথাটা বুঝে গেছে, বাবা-মাকে সবচেয়ে খুশি করতে পারে এই একটিই প্রসঙ্গ।

সেদিন চন্দনের চিঠিতে একটা চমৎকার সম্বন্ধ এলো—পাত্র এই শিলিগুড়িরই ছেলে, কাজ করে আসানসোলে, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। বাবা যদি সম্বন্ধটা পছন্দ করেন, তবে চন্দন কথা বলতে পারে ছেলের সঙ্গে। বাবা যাতে যোগাযোগ করতে পারেন পাত্রের বাবার সঙ্গে তাই শিলিগুড়ির ঠিকানাটাও পাঠিয়েছে চন্দন। ছানি-পড়া চোখে বাবা অধিকাংশ সময়েই আন্দাজে কাজ সারেন। তিনি আন্দাজে পড়লেন যে, চন্দন কথা বলে ফেলেছে পাত্রের সঙ্গে, এখন বাবা যেন কথাটা পাকা করেন পাত্রের বাবার সঙ্গে। বাবা ছাতাটা নিয়ে জুতোতে পা গলাতে গলাতে ডাকলেন,—"বড়বৌ, আমি একটু বেরুচ্চি। কথাটা পাকা করে আসি, ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা যখন হয়েই গেছে। কাল বিকেলেই ওরা মেয়ে দেখে যাক।"

মা (ওরফে বড়বৌ) বললেন—"সে কিগো ? পাকা কথা কি? চন্দন তো কোনো কথাই পাড়েনি এখনো। তুমি বরং যাও, পাওনা-থোওনা কে কিরকম চায় সব শুনে এসো, ঘরদোর দেখে এসো, মেয়ে দেখানো এক্ষুনি কী ? ও পরে হবে। কালই দেখাতে হবে না।"

বাবার কেবল চোখেই ছানি নয়, কানেও একটু কম শোনেন মাঝে মঝে। তাই রাগটা ইদানীং বেড়েছে। বাবা রেগে বললেন—"মেয়ে দেখানো হবে না ? বেশ আমি তাহলে চন্দনকে লিখে দিচ্ছি এ সম্বন্ধ ক্যানসেল, এখানে হবে না।"

—"আহা, আমি কি তাই বলেছি ? আগে তুমি অন্য অন্য কথাবার্তা কয়ে নাও, ঘরটা কেমন বুঝেশুনে এসো. চন্দন ওখানে পাত্রের সঙ্গে কথা বলুক, তারপরে তো মেয়ে দেখাবে ?"

কেবল আধখানা শুনতে পেয়ে বাবা বললেন—

—"ও! চন্দন পাত্রের সঙ্গে কথা বলবে, তারপরে হবে। আমি কেউ নই ?

আমার কথা বলা চলবে না? বেশ, দেখাচ্ছি কেমন আমি কেউ নই। এই চললুম পাত্রপক্ষকে বারণ করে আসতে। দেখি এ বিয়ে কী করে হয়? বিলেত ফেরত বলেই ছেলের কথা বাপের কথার ওপরে উঠবে?"

বাবা জুতো পরে ছাতা বগলে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে মাও চেঁচিয়ে উঠলেন—

—"এ্যাঁ, বিয়ে ভাঙতে গেলেন? এতবড়ো রাগ? বাপ হয়ে মেয়ের এতবড়ো সব্বোনাশ করা? বেশ। আমিও চললুম তবে মাথাভাঙ্গা!"

চন্দনের মামাবাড়ি মাথাভাঙ্গার কাছাকাছি। রাগ করে কথায় কথায় গত পঞ্চাশ বছর ধরেই সলাজনয়নী বলে আসছেন—"এই চললুম আমি মাথাভাঙ্গা।" কিন্তু তারপরে কার্যটি আর এগোয়নি।

এগোয়নি, তার কারণ একাধিক। প্রথম কথা, শিলিগুড়ি থেকে মাথাভাঙ্গার কাছে ওই পাড়াগাঁয়ে যাওয়াই ছিলো এক বিপুল জটিলতা। যেতে হলে জলপাইগুড়ি হয়ে ট্রেন বদলে, অন্য ট্রেন ধরে তারপরে বাস ধরে, তারও পরে হাতি কিংবা ডুলি চড়ে, যেতে হতো। যদিও বা কোনো জাদুবলে মা একা একা এতকাণ্ড করতেনও, মস্ত একটা দ্বিতীয় বাধা ছিলো, তোরঙ্গ। চন্দনের বাড়িতে কেবল ধেড়ে ধেড়ে স্টীলের ট্রাংক আর কাঠের প্যাঁটরা ছাড়া বাক্সোই ছিলো না। সুটকেসের চল হয়নি চন্দনের বাড়িতে। তা, রাগ করে কি কেউ একখানা ধুমসো ভারি তোরঙ্গ মাথায় করে বাপের বাড়ি যায়? নাকি এক কাপড়ে ভিকিরির মতনই কেউ খালি হাতে বাপের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে? এই গূঢ় সমস্যার কারণেই মা এতদিন "চললুম মাথাভাঙ্গা"টাকে কাজে পরিণত করতে পারেননি। পঞ্চাশ বছর পরে, এতদিনে সমস্যার সমাধান হয়েছে। মা ফুরফুরে হালকা বিলিতি সুটকেসে ভরে নিলেন ক'খানা ভালো দেখে ধোপ-দোরস্ত শাড়ি-সেমিজ, গুরুদেবের ফটো, জপের মালা, তেল সাবান গামছা, ফিতে চিরুনী আয়না আর জমানো হাতখরচের টাকাটা। ছোকরা চাকর পরমেশ্বরের হাতে এক টাকা চার আনা দিয়ে বললেন—"একটা সিনেমা দেখে আয়।" দোরে তালা লাগিয়ে দোরের চাবি, ঘরের চাবি প্রতিবেশিনীর আঁচলে বেঁধে দিয়ে এলেন —"ইন্দু ইসকুল থেকে এলেই তাকে দিয়ে দিয়ো—" বলে। বুচকুন তখনও কলেজে।

সোজা একটি রিকশা চড়ে মা গেলেন সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে। গত পুজোয় তাঁর দাদার ছেলেরা এসেছিলো—আজকাল দিব্যি টানা বাস হয়ে গেছে শিলিগুড়ি-টু-মাথাভাঙ্গা। চমৎকার নতুন টারম্যাকের রাস্তা হয়েছে। বদল-টদল করতে হয় না কোথাও। ওখানে নেমেও হাতি চড়তে, কি ডুলি নিতে হয় না। রিকশা করেই বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বাড়ি যাওয়া যায়। দাদার ছেলেরা বার বার করে ডিরেকশান দিয়ে গেছে—মা তো প্রায় চোখ বুজেই পৌঁছে গেলেন দাদার বাড়ির দোরগোড়ায়। দাদা বুড়ো হয়েছেন, বৌদিও। কিন্তু স্বয়ং সলাজনয়নী দেবীকে দোরগোড়ায় একাকিনী সশরীরে সুটকেস হস্তে মজুত দেখে তাঁরা যেন আহ্লাদের চোটে খোকাখুকু হয়ে

পড়লেন। ভাইপো-ভাইঝি, নাতি-নাতনীদের মধ্যে উল্লাসের সাড়া পড়ে গেলো—এ যে রিয়্যাল অ্যাডভেঞ্চার।

এদিকে বুচকুন, ইন্দিরা আর তাদের বাবার চক্ষে ঘুম নেই, অন্নে রুচি নেই। রান্নাবান্না করে ইসকুল করতে ইন্দুর বেশ স্ট্রেন হচ্ছে, বাবা এদিকে পরমেশ্বরের রান্না মোটেই খাবেন না। চিঠির পরে চিঠি যাচ্ছে মাথাভাঙ্গা, জবাব আসে না। শেষে মামাবাবুই লিখলেন—"নয়ন এখন কিছুদিন এখানে থাকিবেক। উহার দেহ আগে আরও একটু সারিয়া উঠুক!"—

শুনে বাবা আর থাকতে পারলেন না, সেইদিনই বুচকুনকে মাথাভাঙ্গায় পাঠালেন। পরের বাসেই। বুচকুন গিয়ে দ্যাখে মার শরীর দিব্যি ভালোই আছে। বুচকুনকে দেখে মা লজ্জা-লজ্জা হেসে বললেন— "এসেছিস? চল, যাই। এই দ্যাখ না এরা কি যেতে দেয়?"— বুচকুনকেই কি ছেড়ে দিলেন তাঁরা? মামামামী? কি ভাইবোনেরা? অতএব বুচকুনও রইলো।

এবারে ইন্দিরার চিঠি এলো—"মা, আমি আর পারছি না, বাবার মেজাজ ভীষণ খারাপ, দিনরাত্তির রাগারাগি করছেন। পরমেশ্বরকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার বড়ই খাটুনি পড়েছে। তোমরা কি ওখানেই থাকবে?"

বাবাই দোর খুললেন। মা লাজুক লাজুক মুখে অল্প হেসে প্রণাম করে বললেন —"সব ভালো তো?" বাবা জবাব দিলেন না। মা বললেন—"ইন্দু কোথায়?" যদিও জানেন ইন্দু তখন ইসকুলে। বাবা জবাব দিলেন না। মা ডাকলেন—"পরমেশ্ব-র!" এবার বাবা কথা বললেন—"নেই।" মা এটাও জানতেন।—"কবে গেল?"— অনেকদিন। এবারে আমিও যাবো।— তুমি কোথায় যাবে?— তা দিয়ে তোমার দরকার কি? তবে মাথাভাঙ্গাতে নিশ্চয় যাবো না। মাথাভাঙ্গার পবিত্র নাম এমন অশ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হতে দেখে মার তক্ষুনি মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেলো। শক্ত গলায় মা বললেন—যেখানেই যাও, আমার সুটকেসটা নিয়ে যাওয়া হবে না। বাবা রহস্যময় হেসে উদাস সুরে বললেন —আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে সুটকেস লাগে না। এই কথাটিতে মা কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন বলে মনে হলো। ভীতু-ভীতু অপ্রস্তুত চোখে বাবার কাছে ঘেঁষটে এলেন —কোথায় যাবে গা? বলো না? বাবা সুরুৎ করে কিছুটা সরে গিয়ে মার নাগাল বাঁচিয়ে বললেন—রাস্তার কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে এলে হতো না, সব ছোঁয়া ন্যাপা করবার আগে? মা কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি কলঘরে চললেন।

রাত্রে খেতে বসে বাবা বললেন,—কাল সকাল সকাল পুজোটুজো সেরে তৈরি হয়ে নেবে। আমার সঙ্গে কোর্টে যেতে হবে। মার হাতের রুটিটা হাতেই রইলো, তাওয়ায় আর পড়লো না।

—"কোর্টে? আমি? আমি কেন কোর্টে যাবো? আমি বাপু সাক্ষী-টাক্ষী হতে

পারবো না তোমাদের খুড়ো-ভাইপোর ব্যাপারে।"

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাবার কী একটা মামলা চলছিল বহুদিন। জ্যাঠামশাই মারা গেছেন, ছেলের সঙ্গে চলছে। বাবা বললেন—"সে মামলা নয়। এ অন্য মামলা। ডিভোর্সের মামলা। তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে আর আমি তাই সইবো ভেবেছো? আমি কালই তোমাকে ডিভোর্স করবো।" অম্লান বদনে মা বললেন—তা করো না। তার জন্যে কোর্টে কেন যেতে হবে? ডিভোর্সটা তো বাড়িতেই হতে পারে।—

—তোমাকে এই সুখবরটি কে দিলেন শুনি? জানো, ডিভোর্স মানে কি?

—খুব জানি। ওই সই করে সাক্ষী ডেকে বিয়ে ভাঙা তো? তা এ-বাড়িতে কেন হবে না?

—বাড়িতে এইজন্যে হবে না যে এটা আইনগত ব্যাপার।

—কেন? আইনের বিয়ে তো বাড়িতেই হয়। সে বুঝি দেখিনি? বন্দনাকে দিব্যি পুরতমশাই বাড়ি বয়ে এসে সই করিয়ে বিয়ে দিয়ে গেলেন। এ ডিভোর্সের পুরুতমশাই ইচ্ছে করলেই বাড়িতে এসে— বাবা কাতরে ওঠেন— ডিভোর্সের পুরুত! আর পুরুত নয়, পুরুত নয়, সে লোকটা ছিলো গিয়ে রেজিস্ট্রার। কিন্তু ডিভোর্স তো রেজিস্ট্রারে করতে পারে না, ওটা উকিলের কাজ।

—অ! তা না হয় হলো, উকিল বুঝি আর বাড়িতে আসে না? আসুক সে-উকিল বাড়িতে।

—"না না, ও হয় না। কোর্টে যেতে হয়। জজের সামনে সওয়াল করতে হবে না?"

—সওয়াল করার কি আছে। এ কি চোর দায়ে ধরা পড়েছে কেউ? যতো বাজে কথা। বাড়িতেই হোক ডিভোর্স।

—"দ্যাখো বড়বৌ—বাজে বকবক কোর না তো মেলা! বলছি ওসব বাড়িতে হয় না।"—মা এবার একটু আদুরে গলায় বললেন—

—"হ্যাগা, তা বাড়িতে যখন হবেই না, তবে কোর্ট-কাছারিতে কেন, তার চে' বরং কালীবাড়ি গিয়ে ডিভোর্স করলে হয় না? ছোটো খুকিরা তো কলকাতায় গিয়ে কালীবাড়িতেই নিজেরা বিয়ে করে নিয়েছে, অমনি কালীবাড়ির ডিভোর্সও নিশ্চয় হয় আজকাল? সে বরং ভালো।"

—"ও হোঃ! এই গোমুখ্যকে নিয়ে আমি কী করি, কোথায় যাই। বলি বিয়ে আর ডিভোর্স দুটো জিনিস কি এক হলো?"

—"হলো না? গেরো বাঁধা আর গেরো খোলা। একটা হয়েছে ভগবান সাক্ষী রেখে, অন্যটার বেলায় বুঝি শুধু হাকিম-মুৎসুদ্ধি হলেই চলবে? ভগবান চাই না? অমনি বললেই হলো?"

—"হা ভগবান। আমি আর কোনো কথা শুনতে চাইনে, কোর্টে কাল তোমায় যেতেই হবে বড়বৌ। সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিয়ো, পুজো সারতে তিন ঘণ্টা

লাগিয়ে দিয়ো না। ফার্স্ট আওয়ারেই পৌঁছুতে চাই।"

—"কোর্ট-মোটে যেতে আমার বয়েই গেছে। কেন মরতে কোর্টে যাবো? আমি এই পস্টাপস্টি বলে দিলুম, দ্যাখো উকিল যদি ঘরে আনতে পারো তো আমি ভালোয় ভালোয় ডিভোর্স হবো, নইলে তুমি যতো ইচ্ছে কোর্টে গিয়ে একা-একাই ডিভোর্স হওগে যাও। হুঁ!" এবারে বাবা রীতিমতো হুংকার দিয়ে ওঠেন—"বাঃ! একা-একা ডিভোর্স হওগে যাও! বলি—একা-একা কি বিয়েটা হয়েছিল, যে একা-একা ডিভোর্স হবে?"

—"কেন তুমি তো বললে এটা বিয়ের মতন নয়, অন্য ব্যাপার। আবার এখন কেন বলছো বিয়ের মতন?"

বাবা এবার আহতকণ্ঠে খেদোক্তি করলেন—"আহ মেয়েমানুষদের মুখ্যু কি আর সাধে বলেছে? নির্বোধ? বোধ-বুদ্ধি কিস্যু নেই?" আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে মেঝের ওপর ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"বেশ বেশ! মুখ্যু তো মুখ্যু! তা মুখ্যুকে নিয়ে ঘর করতেই বা কে বলেছে, ডিভোর্স করতেই বা কে বলেছে? আমি বলেছি? আমি এই চললুম মাথাভাঙ্গা। ব্যস। ইন্দু আমার সুটকেসটা দে তো মা।"

ঠিক এই সময়ে পড়ার ঘর থেকে বুচকুন চেঁচিয়ে উঠলো—"ব্যাপারটা এখন মুলতুবি থাকুক মা—এসব নতুন আইন তোমরা কেউই ঠিকমতন জানো না—আমার পরীক্ষাটা এ-মাসে হয়ে যাক, তারপর আমিই সব খোঁজখবর এনে দেবো তোমাদের। কিচ্ছু ভাববেন না বাবা, আমিই সব বন্দোবস্ত করে দেবো। মেজজামাইবাবুর কাছে সব আইনকানুনগুলো জেনে এলেই হবে কলকাতা থেকে। আপনারা কেবল বলে দেবেন সেজদি কোন পক্ষে সাক্ষী দেবে, আর আমি কোন পক্ষে। পরমেশ্বরটাকেও ডেকে আনা দরকার। কে জানে সে ব্যাটা কোন পক্ষে যাবে?"

—হুঁ যত্তোসব ইয়ে ছেলে হয়েছে আজকাল। সব কথায় কথা কওয়া চাই। সভ্যতা ভব্যতা কিছুই শেখাওনি তো ছেলেদের—যেমন মা, তেমনি ছেলে—বলতে বলতে বাবা উঠে পড়লেন, চটি ফটফটিয়ে কলে গেলেন আঁচাতে। মা বললেন —"ঠিক আছে, এখনকার মতন থাকলাম। বুচকুনের পরীক্ষাটা আগে হয়ে যাক। কিন্তু এই বলে রাখছি, পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিনই আমি মাথাভাঙ্গায় চলে যাবো। সুটকেস আমার গোছানোই রয়েছে। হুঁঃ।"

বিলেত থেকে ফেরার পরে তিন মাসের মাথায় চন্দনের কাছে বাবার এই চিঠিটি এলো—

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

বাবা চন্দন, তোমার মাকে বিলাইতী সুটকেস উপহার দিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার খরচ ও অসুবিধা দুইটাই যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি করাইয়াছ। আরেক ঝামেলা করিয়াছে এই বাসরুট হইয়া। লাভের মধ্যে তোমার মা মাসের মধ্যে তিনবার সুটকেস

গুছাইয়া বাসে চড়িয়া মাথাভাঙ্গায় গোসা করিতে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্রীমান বুচকুনকেও কলেজ কামাই করিয়া হপ্তায় হপ্তায় মাথাভাঙ্গায় ছুটিতে হইতেছে। খরচের কথা বাদই দাও, ইহাতে বুচকুনের পড়াশুনার যারপরনাই ক্ষতি হইতেছে। তাল বুঝিয়া পরমেশ্বর হতভাগা বাজারে দোহাত্তা চুরি করিতেছে। ইন্দুমায়ের স্কন্ধে রান্নাবান্না সংসারের পাট এবং চাকুরি, সমস্তই আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ইন্দুর স্বাস্থ্য বেশ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এভাবে চলিলে আর কেই বা উহাকে বিবাহ করিবে? আমাদিগের নাওয়া-খাওয়া সকলই মাথায় উঠিয়াছে, প্রাণে স্বস্তি নাই। বাড়িতে অশান্তির সীমা নাই। চূড়ান্ত অনিয়ম সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ অলক্ষুণে সুটকেস আমদানি করিয়া সংসারে ঘুণ ধরাইয়া দিয়াছ। আমার সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, দুর্গাপূজার সময়ে আসিয়া তুমি অই বাহারী বিলাইতী সুটকেস অতি অবশ্যই ফিরাইয়া লইয়া যাইবা। ইহার কোনমতেই নড়চড় না হয়। (এই দু'লাইন লাল পেন্সিলে আনডারলাইন করা।)

আশা করি কর্মস্থলের এবং অন্যান্য সমস্তই কুশল। শ্রীভগবানের নিকটে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। ইতি .৯ই আশ্বিন, ১৩৮২

আঃ শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ চক্রবর্তী।

পুনশ্চ: সুবিধা থাকিলে বরং তোমার মায়ের জন্য একটি ছোট দেখিয়া লোহার আলমারি কিনিয়া দিয়া যাইও।

জগমোহনবাবুর জগৎ

কলকাতা এসেছি দিন কয়েকের জন্যে। কাকার কাছেই উঠব। কাকা বছর কয়েক হলো বাড়ি করেছেন নিউ আলিপুরে। একটু ভেতরদিকে, বাস থেকে নেমে রিকশা নিয়ে যেতে হয়।

দুপুর নাগাদ কাকার বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি বাড়ির সামনে মস্ত জটলা। আফটারনুনে রিটায়ার্ড রিকশাওয়ালা, বাকসো হাতে নাপিত, চাবির গুচ্ছ হাতে চাবিওলা, ছোট খুকির হাত ধরে বিস্ফারিত নেত্র অন্ধ ভিক্ষেওলা এবং অগুন্তি ঝাড়া হাত পা ভিড় করনেওলা—রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দুপুর রোদে ঊর্ধ্বমুখী তপস্যা করছে। কারুর মুখে রা নেই। ব্যাপার কী?

কিছু দেখছে। কী দেখছে?

আরে সর্বনাশ। এ কী কাণ্ড?

কাকার বাড়ির পাশের উঁচু পাঁচিলে মই লাগিয়ে চড়েছেন পক্বকেশ এক বৃদ্ধ, তাঁর পরনে কেবল একটি আজানুলম্বিত গামছা, এবং একগুচ্ছ উপবীত। এবং হাতে একটি দীর্ঘ বাঁশ। বাঁশটা দিয়ে নিষ্ঠাভরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উনি আমার কাকার দোতলার ঘেরা বারান্দার একটি জানালার কাচের সার্সি ভাঙবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু ওঁর হাতের টিপ ভালো নয়। এবং জানলাটার খিল দেওয়া নেই বলে সেটা বাঁশের খোঁচায় সরে যাচ্ছে। রেজিসট্যান্স নেই, কাচও ভাঙা যাচ্ছে না।

এই রোমহর্ষক দৃশ্যে পথচারীদের মহা উৎসাহ এবং কারুর কোনো উদ্বেগ আপত্তি নেই। এমন-কী কাকার বাড়ি থেকেও কাক-পক্ষীটির সাড়াশব্দ হচ্ছে না। এই মহতী জনসভা ও তার সভাপতিকে দেখে বেশি কিছু ভাববার আগেই আমি শুনতে পেলুম রিকশায় বসে বসেই আমি বিকট চেঁচাচ্ছি:

—অ কাকা। অ কাকীমা। তোমরা কি সব মরে গ্যাছো নাকি? এই লোকটা যে তোমাদের জানলাদরজা সব ভেঙে ফেললে—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোতলার বারান্দায় দৌড়ে এলেন কাকীমা, ময়দা মাখছিলেন, দু'হাতে ভিজে ময়দার তাল আর দু'চোখে বিশ্বের বিস্ময়।

বেরিয়েই কাকীমা ফ্রিজ শট।

তারপর শুরু হলো স্লো মুভমেণ্ট। এবং সাউনড।

প্রথমে সস্নেহে—খোকা এসে গেছিস? আয় ভেতরে আয়। তারপর বজ্রনির্ঘোষে —বলি ও জগমোহনবাবু। ওটা কী হচ্ছেটা কী শুনি? বাঁশটা ফেলে দিন।

কাকীমার বাজখাঁই আওয়াজে কেঁপে উঠে জগমোহনবাবু, পাঁচিলের ওপর থেকে পড়তে-পড়তে বাঁশের সাহায্যে অতি চমৎকারভাবে ভারসাম্য সামলে নিলেন। দর্শকদের মধ্যে বাঃ বাঃ শব্দটা শোনা না গেলেও অনুরূপ ভাবখানা ফুটে উঠল। রাস্তায় যারা দড়ি-হাঁটার খেল দেখায় তাদেরও লজ্জা দিত জগমোহনবাবুর ঐ চকিত-চমকিত পটুত্ব।

জবাব না দিয়ে উনি বেশ আস্থার সঙ্গে পুনরপি স্বকর্মে মনোনিবেশ করলেন। কাকীমা এবার ধমক লাগাল:

—"নামুন বলছি এক্ষুনি পাঁচিল থেকে। পড়ে যাবেন যে। বাঁশটা ফেলে দিন।"

জগমোহনবাবু মূর্তিমান বিদ্রোহ। বাঁশও ফেলেন না, নামারও নাম নেই।

—তবে রে? দাঁড়ান তো, দেখাচ্ছি মজা—কাকীমা সবেগে ঘরে ঢোকেন এবং ময়দার তাল রেখে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বাঁশের ডগাটা চেপে ধরে ফেলেন। বাঁশ ধরে টানাটানি শুরু হতেই পাঁচিলে-দাঁড়ানো জগমোহন বাঁশটি ছেড়ে দেওয়াই মনস্থ করেন এবং হাঁকেন— "হরি!"

অমনি জটলা থেকে একটি হাফপ্যান্ট পরা কিশোর ছিটকে চলে আসে পাঁচিলের সামনে। জগমোহন এবার হাঁকেন:

—"মই!" ছেলেটা গিয়ে মই চেপে ধরে। বীরপদক্ষেপে জগমোহন নামেন। নেমেই বলেন—

"ও-কাচ আমি ভেঙে দেবুই!" ডান হাতে ঘুষি পাকানো। ঘুষির বদলে চোখ পাকিয়ে বাঁশটা তুলে নিতে নিতে কাকীমা বলেন—"ভেঙে দেখুন না একবার। অন্যের প্রপার্টি আপনি ভাঙলেই হলো?"

—"বলি বাঁশটা নিয়ে নিচ্ছেন যে? বাঁশটা কি আপনার প্রপার্টি?"

—"যারই হোক এটা দিয়ে আমার কাচ ভাঙা হচ্ছিল। এটা আপনার জরিমানা।"

—"জরিমানা মানে? কাচ তো ভাঙেনি? ভাঙলেও জরিমানা নেই। ওটা ভাঙা আমার রাইট।"

এবার কাকীমার আত্মবিশ্বাস টলে যায়।

—"অন্যের কাচ ভাঙা আপনার রাইট?"

—"বলি মাসটা কি? খেয়াল আছে কিছু?"

—"মাস দিয়ে কী হবে?"

—"হবে, হবে। কী মাস এটা?"

—"মার্চ মাস বোধহয়। নারে খোকা?"

—"মার্চ-ফার্চ নয় বাংলায় বলুন। কোন মাস?

—"চৈত্র।"

—"তবে? জেনেশুনে চোতমাসে আপনি জানলা খুলে রাখবেন, আর আমার ভাঙবার রাইট নেই?"

"চোতমাসে জানালা খোলা যাবে না, কোন, পঞ্জিকায় এমন বিধান আছে শুনি?"

—"রসিকতা ছাড়ুন। বলুন দিকি চোতমাসে কী হয়?"

এবার কাকীমা স্পষ্টত মুশকিলে পড়েন। চৈত্র মাসে তো কতো কী হয়।

—"কী হয়? মেলা? চড়ক? গাজন? নীলের উপোস? গোষ্ঠ? বর্ষ শেষ উৎসব? রবীন্দ্রজয়ন্তী? কখনো কখনো দোলও হয়—" জগমোহনবাবু কেবলই মাথা নাড়েন।

শেষে বলেন—"আপনার মাথা আর মুণ্ডু। চোতমাসে কালবৈশাখী হয়। আর কালবৈশাখী হলেই আপনার ঐ জানলার কাচগুলো সব ভেঙে ভেঙে আমার প্রপার্টিতে পড়বে। আর আমরা আনপ্রিপেয়ার্ড ইনোসেন্টলি ঐ ভাঙা সার্সির টুকরোয় পা দিয়ে ফেলে রক্তগঙ্গা হবো। দেখতেই পাচ্ছেন আপনার ঝুলবারান্দার জানলার পাল্লা আমার গলির ওপরে খুলেছে। ও-জানালা আমি যদি ভাঙি, আমি লিগ্যালি ও-কে, বুয়েচেন? নইলে আর দিনদুপুরে, একগঙ্গা লোকের সুমুখে...হুঃ। শুনুন, নিজের প্রপার্টিতে এসে পড়া ফরেন জিনিস আমি নিশ্চয় ভেঙে দিতে পারি। যেমন গাছের ডালপালা।

তেমনি জানলার পাল্লাই বা নয় কেন? ভেবেচিন্তে আগে থেকেই ভেঙে রাখলে আর পরে যখন-তখন কাচ ভেঙে হাত-পা কেটে উনডেড হবার ভয় থাকবে না। ওই দেখুন। প্রিপারেশন কমপ্লিট।" গলির দিকে আঙুল দেখালেন। চেয়ে দেখি গলিতে রেডকার্পেটের মতো করে চট বিছানো।

—"কাচ ভেঙে ওইতে পড়বে, ওইতে করেই গুটিয়ে নিয়ে গিয়ে কাবাড়িওলাকে বেচে দেবে। এবার বাঁশটা দিয়ে দিন। কাচটা ভেঙে ফেলি।" জগমোহনবাবু কনফিডেন্টলি হাত বাড়িয়ে দেন ওপরদিকে।

দুই চক্ষু কপালে তুলে, ময়দা মাখানো হাত গালে দিয়ে কাকীমা বললেন—

—"অ। বুঝিচি। কবে কালবৈশাখী উঠবে, তখন যদি আমার জানলা খোলা থাকে, তবে কাচ ফাটতেও পারে আর সেই ফাটল যদি বাড়ে তবে একদিন সার্সি ভেঙে যেতে পারে, আর সার্সি ভাঙলে সেই কাচের টুকরো আপনার গলিতে খসে পড়তে পারে, আর আপনি সেই ভাঙা কাচের ওপরে ইচ্ছে করে চোখ বুজে, জুতো খুলে হেঁটে-চলে বেড়িয়ে আপনার পা কেটে ফেলতে পারেন। তাই আগে থেকে সতর্ক হয়ে আপনি আমার নতুন জানলার সার্সিগুলো বাঁশ দিয়ে ভেঙে রাখছেন? বা, বেশ বেশ।

আজ বাদে কাল আপনার ছেলেটা বড় হবে, আমার মেয়ে তদ্দিনে বিদেশ থেকে ফিরতে পারে, আপনার ছেলে তার সঙ্গে ঘুরে-টুরে বেড়াতে চাইতে পারে, সে বড় কেলেংকারি হবে, আমিও বরং সাবধান হই। আপনার ছেলের হাত-পাগুলো এইবেলা ভেঙে রাখি? তখন আর কষ্ট করে গুণ্ডা-টুণ্ডা লাগাতে হবে না?"

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জগমোহনবাবু বললেন, "এই তো আপনাদের লীগ্যাল নলেজ না থাকার ফল। ভুল অ্যানালজি ভুল আরগুমেন্ট, সব ভুল। দুটো কেস মোটেই এক নয়। যা বললেন তেমন কেস যদি হয় তখন লীগ্যালি যা যা করার আমি তা করব। সে যাক। আপনাদের জানলাটা আমি ভাঙবই। আজ না হোক, কাল। দিনে না হোক, রাতে!"

—বলে গটমট করে বাড়িতে ঢুকে গেলেন জগমোহনবাবু। এতক্ষণ মই ঘাড়ে হরি অপেক্ষা করছিল, পেছু পেছু সেও ঢুকল।

কাকীমা একটু বাদে শপথ কঠিন স্বরে বলেন,

—"কী করে কেউ ভাঙে আমার জানলা, আমি দেখব। জানলাটা খুলবোই না।" আশ্চর্য! ও-বাড়ির জানলা থেকে জবাব চলে এল চটপট—"জানলা যদি নাই খোলে কেউ তবে আমিই বা ভাঙবো কেন? আমার প্রপার্টির ওপরে ইনফ্রিনজমেন্ট না হলে তো লীগ্যালি আমি অন্যের জানলা ভাঙতে পারি না?" জগমোহনবাবুর পেছনে হরিও উঁকি মারছে।

—"লীগ্যালি কখনো কেউই কারুর জানলা ভাঙতে পারে না"— এতক্ষণে আমি আসরে নামি। "আপনি তখন থেকে যা-তা বলছেন।"

—"পারে মশাই পারে। ওসব আপনি বুঝবেন না, বড় জটিল তত্ত্ব। লীগ্যাল সেন্স ইজ নট কমনসেন্স বুঝলেন?" তারপর কাকীমার দিকে আঙুল দেখিয়ে— "উনি তো আরোই বুঝবেন না, একটি ঘোর অশিক্ষিত মূর্খ স্ত্রীলোক বৈ তো নন?" মুহূর্তের মধ্যে পিছন ফিরে দৌড়ে জানলা থেকে অন্তর্হিত হন জগমোহনবাবু, চট করে কাকীমাকে মন্দ কথাটি বলেই। পিছন পিছন দৌড়য় হরিও। জানলা ফাঁকা। কেবল একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল পড়ে আছে।

এবার আমি ভয়ানক রেগে উঠি। ব্যাটা কাপুরুষ। কাকীমা কিন্তু রাগেন না! হেসে ফেলেন। এবং আমাকে টেনে ঘরে নিয়ে যান।

—"দূর দূর। ও-পাগলের সঙ্গে কথা বলে কী হবে খোকা? ওটা কি মানুষ? তবে জানলাটা সত্যি সামলে-সুমলে খুলতে হবে! পাগলাকে বিশ্বাস নেই। তুই না এসে পড়লে হয়তো আজই দিত ভেঙে।"

—"পাগলা মানে? এদিকে আইন-বুদ্ধিটা তো টনটনে। শেয়ানা পাগল।"

—"পাড়ার ছেলেরা ওকে পাগলা-জগাই বলে ক্ষ্যাপায়। আর ও তখন ছাতাটা তুলে ওদের মারতে ছোটে।"

কাকা স্নান করে বেরিয়েছেন। ব্যাপার বুঝে নিয়ে বললেন—

—"লোকটা কিন্তু সত্যি সত্যি উকীল। রিকশাওলা, ফিরিওলা, ইঁটপাতা নাপিত ওদের কী সব লাইসেন্স-টাইসেন্স করিয়ে দেয় কোর্ট থেকে। ওরা তো ওকে উকীলবাবু বলেই ডাকে। ও দিব্যি ফ্রী চুল দাড়ি কাটিয়ে নেয়। বাসস্টপ থেকে বাড়ি অবধি ফ্রী রিকশা চেপে আসে। এক ইমপসিবল ক্যারেকটার। জগমোহনবাবুর কাণ্ডকারখানা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না রে খোকা। এই নিউ আলিপুর তল্লাটে ওরকম গামছা পরা বাড়িওলা, ফুটপাতের উকীল তুই আর দুটি পাবি না।"

সারাদিন কেবল জগমোহনবাবুর কীর্তিকলাপ শুনতে শুনতেই কেটে গেল। সত্যি সেলুকাস সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার মতন বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তি। আমার কাকা মোটেই পরচর্চা করার টাইপ নন, কথাই বলেন তিনি অতি সামান্য। সেই কাকাই শুরু করলেন জগমোহন প্রসঙ্গ:

—"এই ফাঁকা প্লটটায় বাড়ি করে অবধি জগমোহনবাবু আমাদের পাড়াসুদ্ধ প্রত্যেকের পেছনে উড়িবেড়ি দিয়ে লেগেছেন। কেবল কি আমার সঙ্গেই? মোটেই না। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে যে যেদিকে আছে প্রত্যেকের ওঁর সঙ্গে ঝগড়া। ওর সরু লম্বাটে একচিলতে জমি পড়েছে মাঝখানে, এধারে পাশাপাশি আমরা দু বাড়ি, আমি আর ডকটর ধর, ওপাশে সামনে দিকের ছোট প্লটে সেনগুপ্তরা, আর পেছন দিকের বড় প্লটে ঐ দশতলা বাড়ি উঠেছে আর ওর পেছনে পুরো উত্তরদিকটা জুড়ে আছেন হৈমন্তী দেবী, তোদের ফিলিম স্টার। জগাই প্রত্যেকটি বাড়ির সঙ্গে কিছু কিছু বাধিয়ে রেখেছে।

"তুই আজ স্বচক্ষে দেখলি, তাই। নইলে আমি যদি থানায় ফোন করে বলি,

বেলা বারোটার সময়ে পাঁচিলে চড়ে বুড়ো জগমোহনবাবু বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে ইচ্ছে করে আমার জানলার সার্সি ভাঙছেন, তুই কি মনে করিস পুলিস আসবে? ওর ওটাই মজা। এমন কাণ্ড করে চোখে না দেখলে, কানে শুনে কারুর বিশ্বাস হবে না। তোর কাকীকে জিজ্ঞেস কর, সব বলবে।"

কাকীমা বললেন—"কত বলব? কত শুনবি? কোনটা দিয়ে শুরু করব? এই ধর সেদিন সেনগুপ্তের মেয়ের বিয়ের ঘটনাটাই। গায়ে-হলুদ হচ্ছে, ছাদে মেয়েরা সবাই গেছি, কোথায় যেন ক্যাচর ক্যাচর করে একটা শব্দ হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। কিসের শব্দ? কিসের শব্দ? শেষে দেখা গেল জগাই এই ঠিক আজকের মতো মই নিয়ে পাঁচিলে চড়েছে, চড়ে, একটা কাটারি দিয়ে সেনগুপ্তের ম্যারাপের বাঁশের ডগাগুলো কুপিয়ে কুপিয়ে কাটছে। সেনগুপ্ত ছুটে গেল। 'ওকী মশাই! ওকী মশাই।'

জগা বললে—ওইসব বাঁশের ডগারা কেন ইললিগ্যালি জগার বাড়ির গলির মধ্যে বেরিয়ে রয়েছে? সেনগুপ্তের বাড়ির সীমানা পেরিয়ে? জগা তার গলির সীমানার মধ্যে অন্যের বাঁশের খোঁচা বেরুনো কখনোই সহ্য করবে না। তাই বাঁশের একটা বে-আইনী ডগাগুলোকে সে কেটেকুটে প্লেন করে 'লীগ্যাল' করে দিচ্ছে! খানিকটা করে বাঁশ যেই কেটে ফ্যালে অমনি টুকরোটার সঙ্গে হাতের কাটারিখানাও খসে পড়ে গলিতে। জগা নিজেও পড়ো পড়ো হয়। কিন্তু বুড়োর ব্যালান্স কী। ম্যারাপটা ধরেই সামলে নিচ্ছে। আর গলির ভেতরে নিরাপদ দূরত্বে মুণ্ডুটি বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রামভক্ত হনুমানের মতো ঐ হরি, জগার একমাত্র পুত্র। পড়ে-যাওয়া কাটারিটা ভক্তিভরে বাপের হাতে তুলে তুলে দিচ্ছে। কাটারিটা ভোঁতা হয়ে যেতেই রান্নাঘর থেকে মায়ের আঁশবটিটা এক ছুটে এনে দিলে। ওঃ! সেদিন জগাইকে থামানো না গেলে কী সর্বনাশই হতে যাচ্ছিল ভেবে দ্যাখ? এভাবে বাঁশ ছেঁটে দিয়ে প্যানডেলের পুরো ব্যালান্স আপসেট হয়ে যাচ্ছিল। বেশ কিছু দড়িদড়াও খুলে গেছিল, সব বাঁধন-টাধন আলগা হয়ে, বিশ্রী ব্যাপার।

"আরেকটু হলেই প্যাণ্ডেলটা ভেঙে পড়তো লোকজনের মাথার ওপরে আলো—পাখা-টাখা সুদ্ধু। কী কেলেঙ্কারী হতে যাচ্ছিল ভাব একবার? আমারই তো কান্না পেয়ে গেছল সেনগুপ্তের অবস্থা দেখে। দমকল ডাকবে, না পুলিশ ডাকবে, ভেবেই পাচ্ছে না—কী উপায়ে জগাকে আটকাবে।"

কাকা বললেন—"জগা যা করে সব সে আইন বাঁচিয়ে করে। ব্যাটা উকীল হয়েছিল যেন কেবল এইসব বেয়াক্কেলে বজ্জাতি করবার জন্যেই। উঃ! পাড়ার লোকের হাড়ে দুব্বো গজিয়ে দিলে।"

আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি—"তারপর? তারপর? শেষ পর্যন্ত থামানো হলো কেমন করে ওকে?"

—"কেমন করে আবার? পাড়ার ছেলেরা মার-মার শব্দে তেড়ে এল যেই

হকিস্টিক নিয়ে, তক্ষুনি বাঁশ কাটা বন্ধ হয়ে গেল। সেই থেকে সেনগুপ্তের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই।" বলে কাকা চুরুট বের করলেন।

—"মুখ দেখাদেখি কার সঙ্গেই বা আছে?" কাকীমা বললেন— "ওপাশের হৈমন্তী দেবীর ব্যাপারটাও বলো খোকাকে।" কাকা চুরুট ধরাতে ব্যস্ত ছিলেন—বললেন —"তুমিই বলো।"

—"হৈমন্তীদের সঙ্গে আরেক কাণ্ড।" কাকীমা মহোৎসাহে শুরু করলেন। হৈমন্তী তো ফিলিম স্টার, গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না, পাড়ার সব যেন লোক না পোক, কারুর সঙ্গেই যাতায়াত নেই। বাড়িটা মস্ত কম্পাউণ্ডে ঘেরা আর কম্পাউণ্ডের চারিদিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের মাথার ওপর তারের জাল, আর সেই জালের গায়ে খুব সুন্দর কী একটা স্পেশাল ফুলের লতা লাগানো। যেমনি সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি তার গন্ধ।

"হৈমন্তীদের বাড়িটাকে পুরো যেন বোরখা পরিয়ে রাখে ঐ লতার বেড়া। ডকটর ধরের বাড়ির গায়েও ঐ কমন উত্তরের পাঁচিল পড়ে, জগার বাড়ির গায়েও। ধরসায়েবরা তো সবসময়ে ঐ ফুলের গন্ধের কথায় বলেন—'বিদেশী একটা রেয়ার ফুল, ফোকটে দিব্যি গন্ধটা এনজয় করতে পারছি—', আমার হিংসেরই জয় মাঝে মাঝে।

"হঠাৎ হলো কী, হৈমন্তীর মালী দেখে জগার বাড়ির গায়ের লতাটা কেবলই ঝামরে পড়ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে, ফুলসুদ্ধু লতা মরে মরে যাচ্ছে। শুকোতে শুকোতে ঐদিকের পাঁচিলের গা থেকে লতা খসে পড়তে লাগলো। হৈমন্তীদের বাড়ির আব্রু গেল ঘুচে। বাগানের পার্টি-ফার্টি সব দেখা যায় জালের ফাঁক থেকে। গাছে পোকা ধরলো, না কী যে হলো কিছুতেই বের করতে পারে না মালী। হৈমন্তী তো মালীর ওপরে খাপ্পা, প্রিভেসি থাকছে না তার বাড়ির।"

—"ফিলিম আর্টিস্টের রহস্যময়তা নষ্ট হয়ে গেলে আর রইল কি?" কাকা ফোড়ন কাটেন।

—"এদিকে জগার বউয়ের খুব মজা, সে তার মেয়েদের নিয়ে দোতলার ছাদে উঠে দূরবীন লাগিয়ে হৈমন্তীর বাড়ির ভেতরের কাণ্ডকারখানা দেখছে মনের সুখে। মালী বেচারাই পড়ল মুশকিলে—খুব ভাবনা তার। বেছে বেছে ঐটুকু অংশের লতাই বা মরে যাচ্ছে কেন? আবার নতুন লতা লাগিয়ে দিলে, আবার কদিন যেতে না যেতেই, যেই একটু বেড়েছে অমনি লতাটা ঘাড়-মুখ গুঁজে নেতিয়ে পড়লো। ব্যাপারটাও বোঝা গেল এবারে।

"জগা প্রতিদিন ইয়া বড়া এক কাঁচি নিয়ে ওই মইতে চড়ে, তারের বেড়ার এদিক থেকে কচকচ করে লতার গুঁড়িগুলো কেটে রেখে দিচ্ছে। গাছ মরবে না তো কি?

"ব্যাপার শুনে হৈমন্তীর সেক্রেটারি তো দৌড়ে এলো কোমর বেঁধে ঝগড়া

করবে বলে। সেক্রেটারিরই বা চাল কী? হাতে বিলিতি পাইপ, গলায় বাহারে বেনারসী টাই।

"জগা স্বীকার করলে, হ্যাঁ, সে রোজ দাড়ি কামানোর সময় নিয়ম করে লতাটা কেটে দেয়।"

—"কেননা ওতে এ-বাড়ির স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। আলোবাতাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতো উঁচু বেড়া দেওয়া বেআইনী কাজ। বেআইনী বেড়া জগা থাকতে দেবে না।"

—"কই অন্যেরা তো আপত্তি করেননি? ধরসায়েব তো এতবড় ডাক্তার, তিনি তো কই বলেননি যে লতাটা অস্বাস্থ্যকর?"

—"জগা বললে ধরসায়েব যাই বলুক, সেটা জগার বেলাতে প্রযোজ্য নয়। অনেকে তো ডাস্টবিনের খাদ্যও কুড়িয়ে খায়? তারা ওটা অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করে না।"

—"ধরসায়েবের আলোবাতাস না লাগতে পারে। জগার লাগবে।"

তখন সেক্রেটারি বললে—কিন্তু ওটা তো উত্তর দিক—উত্তুরে বাতাস না এলে এমন কি লোকসান হবে স্বাস্থ্যের দিক থেকে? আর আলোর কথাই যদি ওঠে, তবে পূবদিকটা অন্ধকার করে ওই যে দশতলা বাড়ি উঠছে— কই সেটা কি জগা কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে পারছে?

"এর উত্তর না দিতে পেরে জগা খেপে টং হয়ে বললে—বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে, ফের প্যানপ্যান করলেই দোবো কেস ঠুকে!"

"এই বলে ছাতিটা তুলে তেড়ে গেল হৈমন্তীর সেক্রেটারিকে।"

আমি খুব ইমপ্রেসড।—"বড়লোকের নোকরকে ছাতি তুলে তেড়ে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। গাটস আছে বলতে হবে।" কাকা বলেন;

—"ও তো পাগলের গাটস। তেড়ে গেলে কী হবে? টাকার জোর যার তার সঙ্গে পারবে কেন? জগার 'কেস-ঠুকবো'-তে ঘাবড়ে না গিয়ে সেও দিয়েছে মুখের মতন জুতো। জগার বাড়ির অংশটুকুতে তাদের বেড়ার বদলে খাড়া কংক্রিটের দেওয়াল তুলে দিয়েছে বিশাল উঁচু করে। এখন সত্যি সত্যি আলোবাতাস আটকে গেছে বেচারার। ভাঙতেও পারছে না। বুঝছে ঠেলাখানা। অকারণে অন্যের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার ফল।"

—"তবুও বিশ্বাস নেই কাকা", আমি বলি—"উনি যেমন মানুষ মনে হচ্ছে, একদিন দিলেন হয়তো ডিনামাইট বসিয়ে পাঁচিল উড়িয়ে। জেদ যদি চাপে।"

—"তা খুব ভুল বলিসনি খোকা।" কাকা নির্বিকার গলায় মন্তব্য করেন—"তাও জগা পারে। কিছুই ওর পক্ষে অসাধ্য নয়। ডকটর ধরের বাগানে তো আগুনের গোলা ছুঁড়ছিল ক'দিন আগেই।"

—"সে কি কাণ্ড!"

—"আর বলিস কেন? ভাগ্যিস উঠোনে কেউ ছিল না। কিন্তু ভিজে কাপড়

শুকুচ্ছিলো! ভাগ্যিস ভালো করে নিংড়োনা হয়নি, ভিজে জবজবে ছিল তাই রক্ষে। যদি কাপড়গুলো শুকিয়ে যেতো তবে কী ঘটতে পারতো ভাব দিকিনি একবার? অগ্নিকাণ্ড হতে হতে বেঁচে গেছি সবাই। গায়ে গায়ে লাগোয়া সব বাড়ি।"

—"আগুনের গোলা? তার মানে?"

—"তার মানে বোঝা রীতিমতো শক্ত বাছা!"

কাকীমা পুনরায় আসরে নামেন।—"ধরগিন্নির কাপড়খানা পুড়ে এই এত বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে পুড়েছে, আগুন যে ধরে যায়নি, এই বাঁচোয়া। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে আমিই প্রথম দেখতে পেলুম যে ধরদের উঠোনে বড় বড় আগুনের বল এসে পড়ছে। চেঁচামেচি করতেই ধরগিন্নি বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন জগা তার বাড়ির গলিতে দাঁড়িয়ে শুকনো পাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে গোল্লা পাকাচ্ছে, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়াল টপকে এদিকে ছুঁড়ছে। ধরগিন্নি বললে—

—"একী কাণ্ড? একী হচ্ছে? একী সর্বনেশে ইয়ার্কি।"

—"ইয়ার্কি কে বললে? আপনাদের গাছের পাতা ঝরে ঝরে আমার ঘরদোর নোংরা করছে। তাই আপনার সাধের গাছের পাতা আবার আপনাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

—"তা আগুনটা কেন?

—"ওটা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, একসট্রা। গাছটা এদিক থেকে আমি তো কেটে ফেলতে পারবো না, ওটা আপনাকেই কাটতে হবে।"

ধরগিন্নি বললেন—"কক্ষনো গাছ কাটবো না।"

জগা বললে:

"অবিলম্বে কাটুন। না যদি কেটেছেন, আর পাতা যদি আরও পড়েছে, তবে কিন্তু আমি ফের পাতার ডেলা পাকিয়ে ছুঁড়বো—এবারে বিকেলের দিকে। ঠিক কাচা কাপড় যখন শুকনো।"—

"বাপরে বাপ। কী লোক।" আমি না বলেই পারি না।—"ডকটর ধর কী করলেন?"

—"করবেন আবার কি? গাছটা সত্যি সত্যি কাটিয়ে ফেললেন। বলা তো যায় না, আগুন লাগিয়ে দিতে কতক্ষণ? যা ডেনজারাস ব্যক্তিটি। সেই থেকে ধরদের সঙ্গেও আদায়-কাঁচকলায়।"

—"কিন্তু ও যা চায় তাই পেয়ে যাবে? কুচক্রী আর পাগলাটে বলে?"

—"কোথায় আর পাচ্ছে? ওই তো হৈমন্তী মুখের ওপর দেড়তলা দেয়াল তুলে দিলে আলোবাতাস আটকে! আমরাও কি আর গ্যারাজটা তুলিনি?"

—"তার মানে?"

—"যখন গ্যারাজটা বানানো হচ্ছে...মানে তোর কাকার তো আগে গাড়ি ছিল না,"—কাকীমা শুরু করলেন,

—"এখন গাড়িটা কিনেছেন, গ্যারাজও তৈরি করাতে হলো। ওমা। রাজমিস্ত্রিরা এসে আমাকে বললে, 'এক বাবু কাম সব গড়বড় কর দেতা হ্যায়, বহুত হল্লাগুল্লা করতা, কাম করনে নেহী দেতা।' কী ব্যাপার ? গিয়ে দেখি, দু হাতে কোমরে গামছাটি চেপে ধরে জগাই ছুটে পালাচ্ছে। সদ্য-গড়া দেওয়ালটুকু লণ্ডভণ্ড ভাঙা। ইঁট সিমেন্ট সব ছরকুট্টে আছে। দেখে তো আমার মাথা গরম হয়ে গেল। এতবড়ো আস্পদ্দা ? আমার বাড়িতে ঢুকে আমার দেওয়াল ভেঙে দেওয়া ? এ আবার কোন আইনে চলে ? তোর কাকাকে গিয়ে বললুম। কাকাও তেমনি। তিনি জগাকে গিয়ে বললেন—

—"কী মশাই ? আপনি নাকি আমার গ্যারাজের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে পালিয়ে এসেছেন ?"

—"পালাবো কী জন্যে ? দেখতেই পাচ্চেন আমি নিজের বাড়িতে বসে রয়েছি।"

—"আমার গ্যারাজ ভেঙে দিয়ে এসেচেন কি না ?"

—"তা দিইচি।"

—"কেন, বলতে পারেন ?"

—"ওটা ইললিগ্যাল কনস্ট্রাকশন। করপোরেশনকে খবরটা দিলে, ওরাই এসে ভেঙে দেবে। আমি বরং আপনার পয়সা বাঁচাতে আগেই ভেঙে দিচ্ছিলুম।"

—"আপনার মাথা। আপনার আইনের নিকুচি করেছে। নিজের তো গ্যারাজ করেননি, ওই আইনগুলো আপনার জানা নেই।"

—"খুনের সাজা কী, তা জানতে নিজে খুন করবার দরকার হয় কি ?"

—"থামুন মশাই, কবে আইন পড়েছিলেন, সব ভুলে মেরে দিয়েছেন, পড়ুন গে আপনার লয়ের টেকসটবইগুলো আরেকবার করে। আইনে বলে আমার বাড়িতে আমি এগারো ফুট পর্যন্ত উঁচু গ্যারাজ করতে পারি, বুঝলেন ? যা পারি, তাই করচি। করবও। বেশি ঝঞ্ঝাট করলে পুলিশ ডাকবো।" নিজের বুকে টোকা মেরে জগা বললে— "পুলিশ ? সেও এই আইনেরই চাকর, বুয়েচেন ?"

পরদিন জগা একটা টিনের চেয়ার পেতে ওর দিকের গলিতে এসে বসলো। হাতে একটা এলুমিনিয়মের গজফিতের কৌটো। যেন আমাদের কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজার। মিস্ত্রিরা দেওয়াল গাঁথে আর মাঝে মাঝে রোককো বলে লাফিয়ে এসে পিড়িং পিড়িং করে কৌটো থেকে স্প্রীংয়ের গজফিতে বের করে জগা এসে হাইট মাপে। এগারো ফুট হতে-না-হতেই—ব্যাস ব্যাস স্টপ-স্টপ করে সে কী চেঁচামেচি।"

কাকা এইবার যোগ দিলেন—

"শুধু কি তাই ? ওই দেয়ালটুকু তুলতে আমার ডবল খরচা করিয়ে দিয়েছে। জগার জন্যে মিস্ত্রিরা দু'দিনের কাজ চারদিনে করে ডবল রোজ নিয়েছে। ওরা কাজ করবে কি, পাঁচিলের ওপাশে জগা ওঁৎ পেতে বসে আছে চেয়ার পেতে।

গলিতে যেই একটু বালিসিমেন্ট ঝরে পড়চে অমনি জগা চেঁচাচ্ছে—এ্যাইও !

ইধার আও। আভী ময়লা সাফ করো। আমার গলি নোংরা হচ্ছে। মিস্ত্রিরা যত বলে এখন একটু অমন পড়বেই, দিনের শেষে গিয়ে একসঙ্গে সব ধুয়েমুছে দিয়ে আসবো,—তা চলবে না। জগা হোল ডে চেয়ার পেতে বসে দেয়াল মাপছে, আর এ্যাইও— করে চুনসুরকি তোলাচ্ছে ওর গলি থেকে। সে কী অত্যাচার, তোকে কী বলবো।"

কাকার মতো স্বল্পভাষী মানুষের মুখে এত কথা শুনে সত্যি সত্যি অবাক লাগছিল। কতটা তিতিবিরক্ত করলে তবে মানুষকে এতটা বদলে ফেলা যায়। চায়ের সময়ে সবাই বারান্দায় বসেছি—জগার বাড়ির দোতলার দিকে চোখ পড়ে গেল। দোতলাটা অদ্ভুত দেখতে। আধখানা সম্পূর্ণ হয়েছে, আধখানা হয়নি। কেমন খাপছাড়া মতন হয়ে, শ্যাওলা ধরে যাচ্ছে। ছাদটাতে বেখাপ্পা এ্যাজবেস্টস, আধখানা দেওয়ালের ইট বের করা, বাকী আধখানা প্লাস্টার করা। এখানে টিন, ওখানে ত্রিপল দিয়ে জোড়াতালি মারা এক কিম্ভূত চেহারা। অথচ একতলাটা বেশ সুন্দর।

—"আচ্ছা কাকীমা, অমন তালি-তাপ্পি মারা কিম্ভূত চেহারা কেন জগমোহনবাবুর দোতলার? অমন আধখ্যাঁচড়া হয়ে পড়ে রয়েছে কদ্দিন ধরে? ওটা উনি কি কমপ্লিট করবেনই না? ছ্যাৎলা ধরে যাচ্ছে যে।"

কাকা-কাকীমার একবার চোখাচোখি হলো। কাকা চুপ। কাকীমা ইতস্ততঃ করে বললেন—

—"ওকথা আর বলিসনি। সে এক বৃহৎ কেলেঙ্কারি।"

—"মনে পড়লে রাগও হয়, দুঃখুও হয়।"

—আশ্চর্য মানুষ বটে একটা, কাকা আবার ফেটে পড়লেন— "হোল ফ্যামিলিটাকে নষ্ট করছে।"

—"কেন কাকা?"

—"কেন আমি বলতে পারবো না, আমার ভাবলেই চড়চড় করে প্রেশার চড়ে যেতে থাকে। ও তোর কাকীর কাছে শুনিস।" বলে কাকা উঠে গেলেন। কাকীমার দিকে প্রশ্নসূচক চোখে তাকাতেই কাকীমা শুরু করলেন,

—"সত্যি, ব্যাপারটা এমন বিশ্রী না—তোর কাকা ওই প্রসঙ্গটাই সইতে পারেন না। ঐ যে ওপাশে দশতলা বাড়িটা দেখছিস না, ওইটে যখন উঠছে, জগমোহনের দোতলাটাও সেই সময় উঠছিল। ঝরঝর করে দিব্যি লিন্টেল অবধি উঠে গেল, এমন সময়ে একদিন রাত্তিরে পাড়ায় প্রবল হইচই। দশতলা বাড়ির দরওয়ানরা চোর ধরেছে।

"কী ব্যাপার? পাড়া সুদ্ধু ভেঙে পড়লো চোর দেখতে। তোর কাকাও গেসলেন। দরওয়ানদের ঘরে এক অপূর্ব দৃশ্য। বেঁটেখাটো এক নেপালী দরওয়ান দু হাতে জাপটে ধরে আছে বিপুল বপু জগা-গিন্নিকে। জগা-গিন্নি যেন পাথর। মুখে একটিও শব্দ নেই। মাথায় এক হাত ঘোমটা। হাতে এক বালতি সিমেন্ট। আর গলিতে

সারবন্দী বালতি ভরে ভরে সিমেন্ট, বালি, চিপস সাজানো, আর নীচু পাঁচিলের মাথায় থাকে থাকে ইঁট রাখা। পাঁচিলের ওধারে জগা। নিজের উঠোনে দাঁড়িয়ে খুব লম্ফঝম্ফ করছে। পরনে গামছা। হাতে বালতি। এ-বাড়িতে না-এসেই চেঁচাচ্ছে—

"এ্যাইও। ছোড় দো আমার পত্নীকে। কার হুকুমে ওসকো পাকড়ায়া? কোন সাহসে তুম উসকো গায়ে হাত দিয়া? রাসকেল কাঁহাকা—আভী হাম কেস কর দেগা তোমাদের প্রত্যেকের নামে—"

এদিকে দরওয়ানরা জগার গিন্নিকে ঘিরে রেখেছে। মোটেই ছাড়ছে না। কেস করবে শুনে বাহাদুর বললে—

—"হাম থোড়াই বিবিজীকো আপকো ঘরসে পাকড়কে লায়া? উও আয়া কিঁউ হমারা ঘরপে?"

—"উনি তো তোমাদের টিউকল থেকে জল আনতে গেছেন—"

—"ইতনি গহ্‌রী রাতমে? তো বালটিমে পানী নেহী, সিমেন্ট কিঁউ?"

—"রাত্তিরে অত দেখতে পায়নি।" জগা ডেসপারেট।

—দরওয়ানরা বললে রোজ রোজ এই কাণ্ড হচ্ছে। এইসব বালতি ভরে উনি পাঁচিলের ওপারে দিব্যি পাচার করেন। ইঁট সিমেন্ট চুন সুরকী সবকিছু। ওদিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েরা জগমোহনবাবুর নেতৃত্বে। আর পাঁচিলে উঠে বসে এপার-ওপার করে, হরি তার বাবা-মাকে সাহায্য করে বালতি-চালাচালির কঠিন কর্মে। সে ঝুপ করে নেমে পালিয়েছে। ধরা পড়েছেন কেবল গজগামিনী জগমোহিনী।

—"হররোজ মাল চোরী হো রহা, কন্ট্রাকটর সাহাব হামলোগকো বহোৎ পরেশানী করতে হেঁ—লেকিন চোর নাহি পকড় যাতা—"

—"আঃ, চুরি কেন হবে?" জগমোহন হাঁক পাড়ে নিজের বাড়ি থেকে—"একে মোটেই চুরি করা বলে না।"

—"রাত মে ঘরকা অন্দর ঘুসকর চীজ উঠাকে ভাগনেকো ক্যা কহ যাতা হ্যায়, বাবুজী?"

—"এ্যাও। একদম চোপ। আভী ছোড় দো হামারা ওয়াইফকো। নইলে আমি এক্ষুনি পুলিশ ডাকবো—", জগা ভাঙে তো মচকায় না। দরওয়ানরাও পুলিশ ডাকতে যাবেই। শেষে পাড়ার সবাই মিলে অতি কষ্টে জগার বউকে বাঁচালে।"

—"তবে যে কাকা বললেন জগমোহনবাবু সর্বদা আইন বাঁচিয়ে চলেন—এর বেলায় তো পুরোই বেআইনী কম্মোটি করলেন?"

কাকা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন চুরুট ধরিয়ে।

—"বেআইনী হলে কি হবে? ব্যাটা ঘুঘু, নিজে ঠিক বেঁচে গেছে। সে তো এপাশে মোটে আসেইনি। চুরি করতে নিজে না এসে মোটা বউটাকে পাঠানো কেন?"

"যা বে-আইন পরে পরে। নিজে তো বমাল সমেত গ্রেপ্তার হয়নি? হয়েছে তার বউ। খুবই চালু লোক।"

—"কী পাজি দ্যাকো।" কাকীমা বলেন—"বউটাকে জেলে পাঠিয়ে নিজে দোতলা বাড়িতে থাকবার মতলব।"

—"তা কেন?" কাকা বাধা দেন। "অত সোজা নয়। ব্যাটা আরও কুটিল। বউকে পাঠানোর মধ্যে তার একটা অনুমান কাজ করছিল—এটা একটা চিরকেলে কৌশল। মহাভারতের যুগের। সেই শিখণ্ডী-ট্রিক আর কি। ঠিক ও যেটা আঁচ করেছিল, তাই হলো। যে-জন্যে ওর মোটা থপথপে বউকে দিয়েই চুরি করানো, চটপটে ছোকরা হরিকে দিয়ে নয়,— সেই প্ল্যানও ওর ফেল করল না। ব্যাটা কম চালু? আমরা পাড়ার কত্তাব্যক্তিরাই গিয়ে দশতলা বাড়ির মালিকদের ধরলুম—জগার বউ বেচারি গিন্নিবান্নি মানুষ, ছেলেপুলের মা, ওকে ধরে চোর বলে পুলিশে দিলে গোটা পাড়ার পক্ষেই বড় লজ্জার কথা হয়। একটা মিটমাট করে নেওয়া ভালো। ওরাও সেটা মেনে নিলে ভদ্রতাবশত। প্রতিবেশী বলে কথা! দরওয়ানগুলো হৈচৈ করে গিয়ে জগার বাড়ি থেকে ওদের সিমেন্টের থলে, চুনের কড়া, থাক থাক ইঁট, বস্তা বস্তা বালি সব ফেরত নিয়ে গেল। ফলে ওদের সাধের দোতলাটি আর কমপ্লিট হলো না।"

—"ওখানেই শেষ", কাকী বললেন—"উপসংহারটুকুও শোন। একদিন দেখি দুটো রাজমিস্ত্রী জগার গলায় জগারই ছাতার বাঁট লটকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। প্রাপ্য শোধ করেনি। বলেছিল টাকার বদলে নাকি সিমেন্টের বস্তা দেবে—তাও দেয়নি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওরা কিছুই করতে পারলে না—কেবল ওর ছাতাটা কেড়ে নিয়েই চলে যেতে হলো ওদের। যাবার আগে জগাকে রাস্তায় রীতিমতো ছাতাপেটা করে গেল। বউ বারান্দা থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। বাধা দিলে না।"

রাত্তিরে খাবার পরে আমরা শোবার উদ্যোগ করছি, এমন সময়ে একটা উত্তেজিত তর্কাতর্কি শোনা গেল সরু মোটা দুরকম গলায়। মনে হলো জগমোহনের বাড়িতেই গোলমালটা চলছে।—"ও কী হচ্ছে কাকা-কাকীমা? জগমোহনবাবুদের বাড়িতেই মনে হচ্ছে?"

কাকীমা চুপ করে একটু শুনলেন কান পেতে, তারপর বললেন— "আজ কত তারিখ বল দিকি? মাসের শেষ কি?"

—"মার্চ মাস প্রায় শেষ হয়ে এল— চৈত্রের মাঝামাঝি।"

—"মার্চের শেষ তো?" কাকীমা উৎসাহের সঙ্গে বলেন,

—"চল খোকা তোকে একটা মজা দেখাচ্ছি, চল।"

কাকা ব্যস্ত হয়ে আপত্তি করতে থাকেন—"না না, ওসব ঠিক নয়, ওসব ঠিক নয়। তোমার যতসব মেয়েলী বুদ্ধি। খবদ্দার ও কুকম্মোটি কোরো না—"

কিন্তু কাকার কথায় কান না দিয়ে কাকীমা খড়খড়ি ফাঁক করে জ্বলজ্বল করে জগমোহনবাবুর ঘরের দিকে তাকিয়ে রইলেন—আমাকেও ডাকলেন। প্রতিবেশীর পবিত্র কর্তব্য যেমন, আমিও সেইমতো কাকীমার পাশে গিয়ে খড়খড়িতে বাধ্য ছেলের

মতো নেত্র স্থাপন করলুম। কাকা যতই বারণ করুন, কাকীমা এবং আমি দুজনে একসঙ্গে ওঁৎ পেতে "কুকর্মটি" করছি দেখে দুঃখ পেয়ে কাকাই ঘর থেকে চলে গেলেন।

ও-বাড়িতে জানলা খোলা। ঘরে বাতি জ্বলছে। ভাগ্যিস লোডশেডিং নয়। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দু'পাশে দুজন দুই চেয়ারে। একজনের পরনে গামছা ও পৈতে। অন্যজনের মাথায় বড় করে ঘোমটা, মুখ দেখা যায় না। শাঁখা রুলি পরা মোটা-সোটা একখানি ফর্সা হাত টেবিলে রাখা, মুঠোতে একটি ফর্দ। অন্য হাতে হাত পাখা। ফিসফিস করে কাকীমা বললেন,

—"ঘরে ফ্যান নেই।"

—"বাজেট মিটিং। প্রত্যেক মাসে হয়।"

জগমোহনবাবুর টিয়াপাখি-নাকে নিকেলের গোল গোল হাফ চশমা, হাতে হেড এগজামিনারদের মতো মোটকা লালনীল পেন্সিল। ফর্দটা কেড়ে নিয়ে ঘ্যাঁচ করে একটা কী কেটে দিলেন। অমনি ঘোমটার নিচে থেকে বিদ্রোহী জেহাদ ঘোষিত হলো। বপুর তুলনায় অস্বাভাবিক কচি গলাতে।

—"হবে না, হবে না, ইয়ার্কি নাকি ? ছেলেমেয়েদের দুধের হিসেবে টাকা কমানো চলবে না—"

—"টাকা নেই।"

—"তবে তোমার নস্যির টাকাটা ছেঁটে দেয়া হোক।"

—"ছেলেমেয়েগুলো তো ধেড়ে-দামড়া হয়ে গেছে, এখনো দুধ খাবে কি ?"

—"তাহলে কি নস্যি নেবে ?"

—"দুধ না খেলেই নস্যি নিতে হবে কেন ? চা খাবে।"

—"চায়েও তো দুধ লাগবে।"

—"রটি দাও। রটি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো। চাইনীজ জাপানীজ জাতগুলোর বড় হবার পেছনের সিক্রেট কী ? ওই রটি। মাথা পরিষ্কার রাখে।"

—"বেশ, তোমাকে কাল থেকে তাই দেব। আমি কিন্তু বিনা দুধে চা খেতে পারব না।"

—"খেতে হবে—দুধ-চা খাও বলেই অত অম্বল হয়—" ঘ্যাঁচ। ফর্দে আরেকটা কী যেন কাটা পড়ল।

—"ওকী। ওকী। ওটা যে কেরোসিন ? ওগো কেরোসিন বাদ দিলে চলবে কি করে ?"

কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না, এদিকে লোডশেডিং, সন্ধে থেকেই অন্ধকার—

—"সন্ধে সন্ধে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে সব। রাত্তিরে কোনো কাজ করবে না।"

—"হরির পড়া তৈরি করা আছে—"

—"করতে হবে না। ভোরে উঠে প্র্যাকটিস করুক। চারটের সময়ে ফর্সা হয়ে যায়। হ্যারিকেন মোটে জ্বালবারই দরকার নেই। চোখের পক্ষে হার্মফুল।"

—"স্টোভ জ্বালবারও কি দরকার নেই? বললুম যে কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"কয়লা নেই, কাঠকুটো জ্বালো। স্টোভ জ্বালতে হবে না।"

—"মরণ। অত কাঠকুটোই বা পাব কোন চুলোয়? তোমার কি সুন্দরবনটা ইজারা নেওয়া আছে?"

—"পাড়ার প্রত্যেক বাড়িতে বাগান রয়েছে, গাদাগুচ্ছের গাছগাছালি লতাপাতার চোটে বাড়িতে আলোবাতাস বন্ধ, শুকনো পাতার জ্বালায় ঘরে টেকা যায় না,—আর বলছ কিনা কাঠকুটো পাবে কোথায়?"

—"তা কাঠকুটো যে চেয়ে নিয়ে আসবো তারও কি উপায় রেখেছো? পেত্যেকের সঙ্গে তো ঝগড়া। সেদিন এক কলসী জল চাইতে গেছল বড় খুকি ও-বাড়ির টিউকল থেকে—ওরা নাকি বলেছে—বাড়িতে আগুন দিয়ে, আবার জল চাইতে আসা হয়েছে। লজ্জাও করে না। আমাদের কেউ ঢুকতে দেবে বাগানে?"

—"তাহলে আর উপায় নেই—রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে আনতে পাঠাও হরিকে—"

—"না। যাবে না হরি। হ্যাঁগো, তোমার কি লজ্জা করে না? বাড়িসুদ্ধ লোককে তো চোর করেছো—এবারে পথের ভিকিরিও করবে? রাস্তায় রাস্তায় কাগজ কুড়োতে যাবে ছেলেটা?"

—"না গেলে গুষ্টির পিণ্ডি রান্না করবে কি দিয়ে?"

—"কয়লা দিয়ে। এবং কেরোসিনের ইস্টোভ জ্বেলে। ও টাকা কমানো চলবে না। ও টাকা আমি কিছুতেই কমাতে দোব না। তুমি তো একটা বদ্ধ উন্মাদ—আমার বাপমা আমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে এর চেয়ে ভালো করতো—একটা ঝি রাখবে না, একটা চাকর রাখবে না—ইসকুল থেকে টেনে বের করে এনে মেয়ে তিনটেকে বিনা কারণে ঘরে বসিয়ে রেখেচো। বিয়ে দেবার নাম নেই, কলেজেও দেবে না—ছেলে-মেয়েগুলো সব ঝি-চাকর হয়ে গেল গো— ঘর মুছতে বাসন মাজতেই দিন যায় তাদের—এখন বলছো রাস্তায় কাগজ কুড়ুনী হতে?—হায় আমার কপাল?"

—"বিয়ে দেবার মতন টাকাটা কোতা? আর কলেজে পড়ে তো কেবল বিবি বনবে। তার চেয়ে এই ভালো।"

—"টাকা নেই? কিপ্টে কোথাকার। টাকা নেই? মোটে একটা মাত্তর ছেলে, সবেধন নীলমণি হরি। সেই ছেলেটাকে পর্যন্ত একটা বাজে ইসকুলে দিয়ে ইহকাল বন্ধ হচ্ছে—"

—"বাজে কেন হবে, চ্যারিটেবল ইনস্টিট্যুশন। অনাথ আতুরদের জন্যে তৈরি—"

—"আমার হরি কি অনাথ? নাকি সে আতুর? তুমিই আসলে একটি ঘোর বজ্জাত—স্যায়না পাগল বুঁচকি আগল—কই, নস্যির টাকার বেলায় তো কক্ষনো বাজেট কমতি হয় না?"

"ওই যে। ওই যে। নিজের বেলায় আঁটিশুঁটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি—", মুখটি উঁচু করে জগমোহনবাবু তখন নস্যি নিচ্ছিলেন, খড়খড়িটা নামিয়ে দিতে দিতে কাকীমা ফিসফিসিয়ে বলেন,

—"এবারে মারামারি হবে। চ উঠে যাই। যত উন্মাদের কাণ্ড।"

—"জগা মারেও?" আমি চোখ কপালে তুলি।

—"জগা নয়। জগার বউ। হাতপাখার বাড়ি দু'চার ঘা দেয়। দিয়ে তবে দুধের টাকা, কেরোসিনের টাকা পাস করিয়ে নেয় বাজেটে। এই একই কাণ্ড প্রত্যেকবার। বউটার জন্যে কষ্টও হয়।"

একটু পরেই শোনা গেল দমাদ্দম শব্দ আর—"ও কে, ও কে, দুধ সাঁইতিরিশই রইলো। দুধ সাঁইতিরিশ, পরের আইটেমে চলে এসো।" জগার গলা।

—"পরের আইটেম কেরোসিন।" জগার বউ। তারপরেই আবার ধপাধপ আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গেই জগার স্বর—

—"অলরাইট। অলরাইট। কেরোসিন পাঁচ লিটার। নেকসট আইটেম। নেকসট আইটেম?"

—"নেকসট আইটেম মেয়ের বিয়ে। ফাগুনে দিলে না, চোত পড়ে গেল। বোশেখ মাসে দিতেই হবে—নইলে—"

ক্লান্ত স্বরে কাকীমা বলেন—"তোর কাকা সত্যি ঠিকই বলেছিল। না শোনাই উচিত। এ আর সহ্য হয় না। চল, চলে যাই। এবারে জগার পালা। জগা তড়পাবে, বউটা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে— মেয়েদের জন্যে, সে বড় বিচ্ছিরি"— সত্যি সত্যিই আমরা উঠে গেলুম।

কিন্তু কাকীমার কথা ফললো না। গিন্নির কান্না শোনা গেল না। বাজেটসভার চেঁচামেচিও আর কানে আসছে না। ব্যাপার দেখে কাকা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। মহা দুশ্চিন্তায় পড়া গেল। হলো কী? কাকা সমেত এবার আমরা তিনজনেই খড়খড়িতে ফিরে যাই। গিয়ে দেখি: গিন্নি হাতপাখাটি নাড়তে নাড়তে হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছেন, ঘোমটা তুলে। আর জগমোহনবাবু পা নাচিয়ে নাচিয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে বলছেন——"ওদের বাড়িতে একটা সোন্দরপানা ছেলে দেখলুম আজ! রিকসো থেকেই চেঁচাচ্ছিল— কাকী কাচ ভেঙে ফেললে, কাচ ভেঙে ফেললে! স্যায়না ছোঁড়া— জামাই করলে মন্দ হয় না!"

পরীক্ষা

সর্বদাই হুহু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন। বন্ধুকে বন্ধু বলে মনে হয় না, শত্রুকে তেমন শত্রু শত্রু লাগে না। মানুষমাত্রেই সুদূর। মোহমুদগরই জগতে একমাত্র সত্য—একটু বদলে নিয়ে, কান্ত কান্ত কা তে কন্যা কিছুই ভালো লাগে না। মেয়ে যে কেবলই খেলে বেড়াচ্ছে! হয় আগাথা ক্রিস্টি, নয় ব্যাডমিন্টন, নইলে ঘুম। সারাদিন সারারাত ঘুম। পড়বে কখন? কিছু বলতে গেলেই তার দিম্মা বলেন, —"আহা, ও বড়ো দুর্বল। ঘুমুতে দে।" ঘুমতে ঘুমতে প্রিটেস্ট হয়ে গেল।

এই সময়ে চার নম্বর অঙ্কের স্যার চাকরি ছেড়ে দিলেন। এইট থেকে টেনের মধ্যে এই নিয়ে চারবার। অসিতবাবুর পর প্রদীপ। প্রদীপের পর শ্যামলবাবু। শ্যামলবাবু বহু চেষ্টা করেছিলেন। হাফ ইয়ারলির রেজাল্ট বেরুনোর পরই হাসপাতালে গেলেন। পেটে মস্তবড়ো আলসার। অপারেশনের পরে আবার সাহস করে পড়াতে এলেন, কিন্তু আমিই সাহস পেলুম না। শ্যামলবাবুর পরে অলোকবাবু। অলোকবাবু একদিন টাকাটা খামসুদ্ধ ফেরত দিয়ে বললেন—"ও টাকা আমি আর নিতে পারি না।" আমি তো থ। তিনি সবিনয়ে খাতা খুলে দেখালেন—"এই দেখুন খাতা। এত মাসে একটাও অঙ্ক কষাতে পারিনি। প্রত্যেকটা আমি নিজে কষেছি। নিজে অঙ্ক কষেছি বলে অন্যের কাছে টাকা নেব কেন?" ধরে-বেঁধে আধখানা মাত্র নেওয়ানো গেল, বাকিটা টেবিলে রেখে গেলেন।

দেখতে দেখতে টেস্টও হয়ে গেল। স্যার-বিহীনভাবেই। প্রিটেস্টে ইতিহাসে উনতিরিশ ছিল, টেস্টে হলো সাতাশ। তার মানে ফাইনালে হওয়া উচিত পঁচিশ, এইরকম নিউমেরিক্যাল প্যাটার্ন অনুযায়ী—মেয়ে জানালো রসিকতা করে—"দুই দুই করে কমছে।"—হাতে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট।

—"কলেজে উঠলে কক্ষনো হিস্ট্রি নেব না; যা ট্রেচারাস সাবজেক্ট!"

—"কলেজে ওঠ তো আগে?"

—"সে উঠে যাবো।" র‍্যাকেটের ওপরে শাটলককটা শূন্যে নাচাতে নাচাতে ঊর্ধ্বমুখেই মেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

"উঠে যাবো" বললেই তো হলো না। পড়তে হবে। ইতিহাসের জন্য এক স্যারের বাড়িতে ওকে ধরে নিয়ে গেলো আরাধনা। টিউটর পাই কোথায়? টেস্টের পরে কেউই নতুন ছাত্র নেন না। শেষটায় আমার এক গুণ্ডা বোনপোকে যিনি পড়িয়ে শায়েস্তা করেছেন, পাসটাস করিয়ে কলেজেও গুঁজে দিয়েছেন, তাঁকেই ধরে আনা হলো। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখি সিলেবাসটা।" মেয়ে বললে, "দাঁড়ান, ফোন করে জেনে নিচ্ছি। আমার বন্ধুরা জানে।"

—"তুমি জানো না? লেখা নেই তোমার কাছে?"

—"ছিল তো, —হারিয়ে ফেলেছি। ফোন করি?"

—"অঙ্ক বইটা দেখি। কে. সি. নাগটা। ফোন পরে হবে।"

—"টেস্টের সময়ে স্কুলে ফেলে এসেছিলাম, আর পাইনি।"

—"দেখি, কলমটা আর খাতাটা দাও।"

—"বোন স্কুলে নিয়ে গেছে কলমটা। এই যে খাতা।"

—"বাঃ বাঃ বাঃ। বাড়িতে আর কলম নেই?"

—"থাকতেও পারে। এই নিন পেনসিল।"

—"এতটুকুনি? এ তো ধরাই যাবে না।"

—"দাঁড়ান, ম্যানেজ করে দিচ্ছি। পেনসিলটাকে এই ঢাকনিতে ফিট করে নিন, ব্যাস তাহলেই ধরা যাবে। এভাবে ছোট পেনসিলও কাজে লাগে।"

—"চমৎকার। একটা জিনিস শিখলুম।" এমন সময়ে চা-ডালমুট এলো।

—"এসব কে খাবে?"

—"আপনার জন্যে।"

—"এ তো বিষ। চা-ডালমুট দুটোই লিভার ড্যামেজ করে। আমি ওসব খাই না।"

—"দুধ? সন্দেশ খাবেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।"

—"ইয়ার্কি হচ্ছে?"

—"সে কি? ইয়ার্কি হবে কেন? এই তো ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ওটা খাবেন না এটা খাবেন তা তো মা জানেন না? আগের স্যার চা-ডালমুট ভালোবাসতেন।"

নতুন স্যার বললেন, "আপনার মেয়ে তো যত্ন-আত্তি খুব করে, বুদ্ধি-সুদ্ধিও আছে। কিন্তু মহা ফাঁকিবাজ। আর আপনিও হয়েছেন যেমন, দিনরাত্তির লেখালিখি পদ্যফদ্য নিয়েই আছেন। অমন মেয়েকে নিজে না পড়ালে হয়?"

মরমে মরে গিয়ে মনস্থির করলুম। ইংরিজি বাংলা ছাড়া আমার আর কিছুই পড়ানোর ধৈর্য নেই। তাই বললুম, "বাংলা বইটা নিয়ে আয়।"

—"টাকা দাও।"

—"টাকা কেন?"

—"বই তো দোকানে।"

—"এটাও হারিয়েছিস?"

—"হারাবো কেন? কেনাই হয়নি এ-বছরে।"

—"হয়েছিল না?"

—"সে তো নাইনে কিনে দিয়েছিলে।"

—"সেটাই তো টেনের টেক্সট।"

—"নাইনের বই টেনে থাকে? তুমি যে কী!"

বই কিনে এনে ফোন।

—হ্যালো, আরাধনা? বাংলার সিলেবাসটা কী রে? মা জিজ্ঞেস করছেন। হ্যাঁ, মার সঙ্গেই কথা বল।

খানিক পর—হ্যালো ভাস্কর? অঙ্কের পুরো সিলেবাসটা কী রে?

—"আরাধনাকেই তো জিজ্ঞেস করতে পারতিস। দুবার দুটো ফোন করবার কী দরকার ছিল?"

—"সে তুমি বুঝবে না। আরাধনা কী ভাবতো? আমি কোনো সিলেবাসই জানি না মনে করতো।"

—"সে তো জানিসই না।"

—"জানতুম তো। এখন না হয়ে ভুলে গেছি। দু'বছর ধরে কখনো মনে থাকে? মা, তুমিই বলো?"

পড়ানো চলছে। এপ্রিলে পরীক্ষা। আমার এক প্রিয় ছাত্রীকে টিউটর রাখলুম ফেব্রুয়ারী মাসে। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়িয়ে দিতে। একটা ছোট ভাই ফিজিওলজির ভালো ছাত্র ছিল। তাকে বললুম বায়োলজিটা দেখিয়ে দিতে। ছাত্রীটির সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গেল মেয়ের। আড্ডা, গল্পের বই এক্সচেঞ্জ, পরচর্চা। একটু একটু পড়াও দিব্যি চলতে লাগলো ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু এই মামা বেচারীর সঙ্গে তার পিঠোপিঠির মতো সম্পর্ক—নিত্যই যুদ্ধ।

বই নিয়ে বসাই হলো না। দুপক্ষ থেকেই অনবরত নালিশ। তবে দীপুমামা বাঁশীটা বাজায় ভালো। বায়োলজি শেখা না হোক, টেস্টের পরই মেয়ে "এ আর এমন কি" বলে হঠাৎ আড়বাঁশী বাজানো রপ্ত করে ফেললো। দিবারাত্রি বাঁশী বাজছে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে। নীরোর বেহালার মতো। কিছু বললেই বলে,—"একটু রিল্যাক্স করছে।"

ইতিমধ্যে একদিন একটি বাউল আমার কাছে তার দোতারাটি বিক্রি করে গেল একশো টাকায়। আর যাবে কোথায়। কোথায় অঙ্ক, কোথায় ইতিহাস—দোতারা নিয়ে পড়লেন মেয়ে। দুদিনের মধ্যেই বাউলের দোতারাতে "হোয়্যার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ার্স গন লং টাইম পাসিং" বাজতে লাগলো। ঠিক গীটারের স্টাইলে! সঙ্গে ছোট বোন গান গাইতে লাগলো। এবং মামার বাঁশী। সুন্দর একটা ফ্যামিলি কনসার্ট গ্রুপ তৈরী হয়ে গেল। অগত্যা দোতারা এবং বাঁশী নিয়ে মূর্তিমতী শিল্পশত্রুর মতো আলমারিতে তালাচাবী দিয়ে রাখলুম।

মেয়ে খুব সিভিলাইজড, নিয়মিত তিনখানা কাগজ পড়ে। ইন্দিরা, মোরারজী, চরণ বিষয়ে গভীর জ্ঞানী। ভুট্টোকে নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। পরীক্ষার দিন সকালে বিশেষত টেস্টের সময়ে রেগুলারলি দেখেছি। ইদানীং দেখেছি খবরের কাগজ খুলে শিস দিতে দিতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।—যাক, তবু পরীক্ষার ভাবনাটা মাথায় ঢুকেছে। এমন সময়ে মেয়ে একদিন কথা কয়ে উঠলো— "আজকাল বেড়ালছানারা আর ছানা নেই মা। ওদের দুধটা কমিয়ে মাছটা বাড়াতে হবে। নইলে

ওদের গ্রোথ হবে না ঠিকমতন!"

—"ও! তুমি শিশ দিতে দিতে বেড়ালের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিলে? নিজের নয়?"

—"নিজের? নিজের কী চিন্তা?"

—"কোনো চিন্তা নেই?"

—"না, মানে কোন স্পেসিফিক চিন্তাটার কথা বলছো?"

—"পরীক্ষাটা"—হার মানা গলায় বলি।

—"সে—তো আছে-ই। জানো মা, বন্যা আর বিদ্যুৎ সঙ্কট essay আসছে।"

সেইজন্যে বিদুৎ সঙ্কট নিয়ে গভীর ভাবনা হয়েছে মেয়ের। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা ভাবছে। আলো নিবলেই ভাবতে শুরু করে— সকাল ২টো পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র ভাবনা। মাঝে শতবার আলো ফিরলেও ডেকে তোলা যায় না।

সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছেন আমার কাছে। কলকাতার বাইরে একটা সাহিত্য উৎসবে নিয়ে যেতে চান ১লা বৈশাখ। মেয়েরা পাশে এসে যথারীতি বসে আছে। চোখ গোলগোল করে শুনছে—তিনি কত যত্ন করে নিয়ে যাবেন টানা মোটরে, ওখানে কী কী দ্রষ্টব্যস্থান। যেই বললুম—"এখন তো যাওয়া অসম্ভব, পরীক্ষাটা হয়ে যাক",— অমনি মেয়ে বাধা দিয়ে ওঠে—"চল না মা, চল না? কি সুন্দর। খুব ভালো লাগবে, চল না মা—"

—"আরে! পরীক্ষা না তখন?" আমি তো তাজ্জব!

—"কী পরীক্ষা? ও! তখন এম-এ চলবে বুঝি?" একেবারেই সরল চোখ। অসহ্য রাগ হয়। রাগ চেপে রাখা আমার স্বভাব নয়। তবু যথাসাধ্য দাঁতে দাঁত চেপে বলি—"কী পরীক্ষা? জানো না পয়লা বৈশাখ মানে চোদ্দই এপ্রিল। সতেরোই এপ্রিল থেকে কার পরীক্ষা?"

—"সতেরোই...? ওঃ হো! স্যরি স্যরি, বুঝেছি।" লজ্জায় একগাল হেসে ফেলে বলে, "স্কুল ফাইনাল! আমাদের তো?"

আমি মরিয়া হয়ে বলি—"এটা মার্চ মাসের সাত তারিখ। একমাস দশদিন মাত্র বাকী। এখনও জিজ্ঞেস করছো, কার পরীক্ষা মা? আমি কি বিষ খেয়ে মরব?"

সভ্যতাভব্যতা বিস্মৃত হয়ে জনসমক্ষে ইতরজনের মতো কাতরে উঠি। বেগতিক দেখে ভদ্রলোক—"আচ্ছা, নমস্কার। এবার তাহলে থাক। বরং সামনের বছরে—" বলে ছুটে পালিয়ে যান। খুব অপ্রস্তুত মুখে মেয়ে গিয়ে পড়তে বসে। বাঁহাত কুকুরের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে। তাতে পড়া ভালো হয়।

লক্ষ্মী এসে নালিশ করে—"বড়দিমণি রোজ রোজ নিজের দুধ আর সন্দেশটা মাস্টারমশাইকে খাইয়ে দিয়ে, নিজে চা-ডালমুট খাচ্ছেন।"

—"সে কি কথা?"

—"আমি রোজ দেখতে পাই বড়দিমণি পড়তে পড়তে ডালমুট চিবোচ্ছেন,

আর মাস্টারমশাইয়ের গোঁফে সর।"

—অ। কাল থেকে দুজনকেই দুধ-সন্দেশ। চা-ডালমুট মোটে টেবিলে দিবি না।

তিন মাস আমি কোনো নেমন্তন্ন যাই না, সভা-সমিতিতে যাই না, লৌকিকতা বন্ধ। মেয়ে এদিকে শনি-রবিবার নিয়মিত টিভিতে সিনেমা দেখে, বেস্পতিবার চিত্রমালা দেখে, বন্ধুদের জন্মদিনে কার্ড আঁকে, দীর্ঘ দীর্ঘ ফোন করে। বুকফেয়ারে গেলে সময় নষ্ট হবে বলে আমি সন্ধেবেলায় না গিয়ে দুপুরবেলায় নিয়মরক্ষে ঘুরে এলুম। মেয়ে কিন্তু তিনদিন পরপর মাসিপিসিদের সঙ্গে সন্ধেবেলায় রাত দশটা পর্যন্ত বুকফেয়ারে বেড়িয়ে ঘুগনি খেয়ে এল! আমি উদ্বেগে অস্থির। আমার শুভার্থীরা আমার থেকেও বেশী অস্থির। সবাই আমাকে বকছেন। আমার মেয়ের জন্য সবার চিন্তার শেষ নেই।—"কেবল হিল্লিদিল্লি লেকচার মেরে বেড়ালে আর গপ্পোকবিতা লিখলে কারুর ছেলেপুলে মানুষ হয়? কেবল নিজের পড়া আর নিজের লেখা নিয়েই মত্ত। তার ওপরে আজ হাঁপানি, কাল হার্টের রোগ, পরশু হাই প্রেশার, অসময়ে যত ঝামেলা বাধিয়ে তুই-ই বরং ওকে আরো ডিসটার্ব করিস। মেয়েটা পড়বে কখন?"

সবই সত্যি। মেয়েটা সত্যি খুব সেবা করে। অবোলা কুকুর বেড়াল, রুগ্ন মা, ছেলেমানুষ বোন, বুড়োমানুষ দিম্মা প্রত্যেকের। আবার এও সত্যি যে সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা ওর পেছনেই আছি। ভোরে পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে উঠি। উঠে মেয়েকে তুলে দিই। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। সাড়ে পাঁচটায় আবার উঠি। আবার মেয়েকে তুলে দিই। আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ফাইনালি ৬টায় উঠে চা খেয়ে গায়ে জোর পেয়ে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করি। এবার মেয়ে ওঠেন। গজগজ করতে করতে পড়তে বসেন। আশ্চর্য! পড়ে প্রধানত Test Papersটা। কেবলই মন দিয়ে প্রশ্নগুলো পড়ে আর হিসেব কষে। তার পড়ার ঘর থেকে টেবিল নামিয়ে এনে আমার ঘরে পেতেছি। দিনরাত প্রশ্ন ধরে আনছি আর টুকছি। প্রশ্ন ধরা মানে মেয়ের বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খাতা চেয়ে আনছি, স্কুলে সাজেস্টেড প্রশ্নগুলো (আমার মেয়ে ওসব টোকে না, যদিও রোজই ক্লাসে উপস্থিত থাকে। শুনতে শুনতে নাকি লিখতে পারে না) টুকে নিচ্ছি। মায়েতে আর ছোটো বোনেতে খাতার পর খাতা ভরে ফেলছে—উত্তর না-জানা প্রশ্নের মালায়।

What is hydro-static paradox ? What is blood ? What is mitosis? What is Sannyasi Bidroha ? What is $K_2Cr_2O_7$? এরপর বই দেখে দেখে উত্তরগুলোও লিখতে হবে। যদি মেয়ে না লেখে। উপায় কি?

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি বিহারী দত্তকে, তাঁর সেই জাহাজে আমিও ভেসে যাচ্ছি। আমার শুভার্থী বন্ধুরা কী এসব ঘটনা জানেন? বিহারী দত্তের সমুদ্রযাত্রা? আমাকে উত্তর লিখতে হয়। আমাকে জানতে হয়।

What did the Selfish Giant see ? How was Tenner rewarded ?

আমাকে পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বোরিকতুলো, কাঁচি, ডেটল, ব্যাণ্ডেজ আরো পঞ্চাশ রকম টুকিটাকি কিনে আনতে হয়, একটা ভালো দেখে বক্স যোগাড় করে তাতে ধপধপে কাগজ আঠা আঁটতে হয়, তাতে লাল কাগজে রেডক্রস কেটে লাগিয়ে First Aid Box তৈরী করে দিতে হয়। এই বাক্সের জন্য দশ নম্বর মাত্র বরাদ্দ, আমাকে প্রত্যেকটা Practical খাতা ভাস্করের খাতা দেখে দেখে এঁকে দিতে হয়। আমি বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলেই কতরকম প্যাটার্ন দেখতে পাই—কক্রোচ-এর এ্যালিমেন্টারি সিস্টেম, ফ্রগ-এর ইউরিনো-জেনিটাল সিস্টেম—ফীমেল টোড-এর রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম। এত কষ্টের মূল্য নাকি মাত্র দু নম্বর। তাছাড়া কিছুদিন হলো মেয়েকে ভাত খাইয়ে দিতে হচ্ছে। তার হাতটা জ্বলে গেছে। কেননা ওয়ার্ক এডুকেশনে সাবান তৈরি করেছেন তিনি। সে সাবানের সোডা পোটেন্সি ? একটা কাঠের ট্রেতে রাখা ছিলো। তাতেই ট্রেটাতে ঠিক শ্বেতীর মতো ছোপ ধরে গেছে। এ সাবান কিন্তু গায়ে মাখার জন্যে। নীল, হলুদ, গোলাপী, লোভনীয় স্প্রিল প্যাস্টেল রঙে, ফ্রী পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে এখনও গোটা দশেক আছে। চাই ?

ওয়ার্ক এডুকেশনের জন্যে মেয়েরা না হোক আমাদের হোল ফ্যামিলির যেমন ওয়ার্ক তেমনি এডুকেশন হলো। মাটি মাখা, মাটি ছানা, মূর্তি গড়া কতকিছু আমি করতে পারি এখনও ! সেই মূর্তি থেকে প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচটা শিবুই বানিয়ে দিয়েছে অবশ্য। সেই ছাঁচে ফেলে final মূর্তিটা বের করেছে মেয়ে নিজেই। দীপু ওটাকে স্প্রে-পেন্টিং করে দিয়েছে টুথপেস্ট-টুথব্রাশের ছিটে মেরে— ভাস্করের ইনস্ট্রাকশনে। মেয়ে বলছে, "চলবে।"

পিঠে একটা বিশাল নম্বর আঁটা, ওর final পরীক্ষার ছাপানো রোল নম্বর।

—কিরে ? হয়ে গেল ?

—কথা বোলো না ! সময় নেই ! স্কুল পারফরম্যান্স খাতা লাগবে এক্ষুনি—কেউ কি দেখেছো খাতাটা কোথায় ?

মেজাজ একেবারে মিলিটারি। যেহেতু সবগুলো খাতায় সযত্নে বাহারী মলাট লাগানো আমারই বৈধ কর্তব্য, আমি তক্ষুনি মনে করতে পারলুম স্কুল পারফরম্যান্স খাতাটা কোথায় দেখেছি—এবং খাতা বগলে "থ্যাংকিউ" বলেই মেয়ে ছুটলো। রিকশার পেছন পেছন ছুটতে লাগলো বোনটি এবং মামাটি। রিকশা দাঁড়ালো না। বিকেলে ফিরে শুনলুম তারা ছুটতে ছুটতে স্কুল অবধিই গিয়েছিল—"ঢুকেই শুনি ঠিক দিদিরই রোল নম্বরটা ডাকা হচ্ছে। পি টি পরীক্ষার জন্য। দিদি তক্ষুনি দৌড়োতে দৌড়োতে হলে ঢুকে গেল। বগলে খাতা। আমাদের দিকে তাকালোই না।"

—"অমন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কেমন পি টির কায়দা দেখিয়েছে কে জানে !"

পরীক্ষার তিনদিন বাকি। মেয়ে এসে বললে—জানো মা, আরাধনাটা এত অন্যমনস্ক—অ্যাডমিট কার্ডটাই হারিয়ে ফেলেছিলো। অবশ্য এখন খুঁজে পেয়েছে।

—তোরটা আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আছে। জানো মা, অলকা লাহিড়ীর ব্যাপারটা আরো খারাপ। ধোপার বাড়িতে চলে গিয়েছিলো, কুড়মুড়ে হয়ে ফিরে এসেছে। কী হবে?

—তোরটা কই? বের কর তো?

—কী হবে বের করে? এই তো ড্রয়ারে।

—তবু, একবার দেখা না?

—এই দ্যাখো বাবা, দ্যাখো!—খুব কনফিডেন্টলি ড্রয়ার খুলেই মুখ শুকিয়ে এতটুকুনি! তারপরেই ড্রয়ার তোলপাড়! তারপর সারা বাড়ি তোলপাড়। মুহূর্তেই প্রবল মাস মোবিলাইজেশন ঘটে যায়। বাড়িসুদ্ধু প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা আনাচ-কানাচ, বাক্স-ড্রয়ার, তন্নতন্ন করে ঘাঁটছে। ঘাঁটতে ঘাঁটতে যে যা খুঁজে পাচ্ছি নিয়ে নিচ্ছি। ছোট মেয়ে নিল একটা শক্ত ইরেজার, আমি পেলুম মর্চেপড়া কাঁচিটা, মা পেলেন একটা জর্দার ডিবে, শিবু পেল স্ক্রু-ড্রাইভারটা।—শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজের ডাঁই থেকে বেরিয়ে পড়লো মেয়ের অ্যাডমিট কার্ড, আর মায়ের হারিয়ে-যাওয়া মাইনের চেকটা। পরীক্ষার ডামাডোলে খুঁজে পাচ্ছিলুম না, গত মাস থেকেই। কাউকে বলিনি। এখন কে কাকে বকবে? ডবল কেলেঙ্কারী। আমি দুটোই চটপট আলমারিতে তুলে ফেলি। মেয়েকে যেই বলেছি—"অ্যাডমিট কার্ডটা না পেলে তুই কি করতিস?" অমনি আমার মা জবাব দেন—"বোর্ডে গিয়ে তোমাকেই ডুপ্লিকেট নিয়ে আসতে হতো। কিন্তু চেক না পেলে তুমি কী করতে?"

হোলনাইট প্রোগ্রামগুলো আমাদের মা-মেয়ের এখন যুগলবন্দী হয়ে গেছে। ঠিক লুচিভাজার প্রসেসে কাজ দ্রুত এগুচ্ছে। বেলা, ভাজা, খাওয়া। লুজশীটে আমি একটা একটা প্রশ্নের গরম গরম উত্তর লিখে এগিয়ে দিচ্ছি, আর শেষে লুফে নিয়ে একটা একটা প্রশ্নোত্তর কপাকপ গিলে ফেলছে।—হ্যাঁ। এগুলো সব আগেও লিখে দিয়েছিলুম—প্রিটেস্টের আগে। টেস্টের আগেও খাতাতেই। কিন্তু সেইসব খাতা এখন আর নেই। জন্মের শোধ কিছু হারিয়ে গেলে আমার মেয়ে বলে—"কোথাও মিসপ্লেসড হয়েছে।" মেয়ের শরীরে উদ্বেগ নেই। সত্যি "স্থিতধী" প্রাণী। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ। মন্দ রেজাল্টেও ভীত নয়, ভালো রেজাল্টেও স্পৃহা নেই।

পরীক্ষার আগের দিন বাড়িতে বিজয়ার মতো জনসমাগম—ফোনের পরে ফোনে শুভেচ্ছা আসছে—প্রণাম, মিষ্টান্ন, উপদেশ, স্মৃতিচারণ, অ্যাডভান্স সান্ত্বনা, আগাম সহানুভূতি, ফ্রী। লাস্ট মোমেন্ট সাজেশ্যনস। পুরো দিনটাই গেল। অত শুভেচ্ছায় শেষ মুহূর্তে মেয়ের অমন লোহার নার্ভও ফেল করলো। মোটা মোটা চশমার কাঁচের পেছনে ভীতু জল চকচক করে উঠলো— সদ্য পঞ্চদশী হয়েছেন, ঠিক টেস্টের আগেই। খুবই গ্রোন-আপ ভাবছিলেন নিজেকে। এমন সময়ে দিম্মা কোলে নিয়ে বললেন—"ভয় কি রে? তোর মা আরো ফাঁকিবাজ ছিল, ঘাবড়াসনি তুই!"

মেয়ের মন ভালো করতে একটা নতুন ক্লিপবোর্ড কিনে তাতে নাম লিখে দিলুম। ওপরে শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ লিখতে গিয়ে কী রকম একটু লজ্জা করলো। লিখলুম, "জয় বাবা ফেলুনাথ।" ফেলুদের নাথ তিনিই। মা সরস্বতীকে কেন আর কষ্ট দেওয়া?

পরীক্ষার দিন। ভোর চারটেয় উঠেছি। মেয়েও চারটেয় উঠেছে। আমি এখনও দ্রুত উত্তর লিখছি—কালকের সাজেস্টেড প্রশ্নের। মেয়ে অলস চোখ বোলাচ্ছে, বোরড মুখে। তুমি কার। কে তোমার। বোনও চারটেয় উঠেছে। কলমে কালি ভরছে, পেন্সিল কাটছে, ইরেজার, রুলার মোজা রুমাল এইসব গুছিয়ে রাখছে—জুতো পালিশ করছে, বোতলে জল ভরছে। দিম্মাও চারটেয় উঠেছেন। পরীক্ষার ভাত রেডি হচ্ছে, টিফিন তৈরি হচ্ছে। পোশাক প্রস্তুত। র‍্যাশন কার্ডের খাপ থেকে কার্ড বের করে ফেলে দিয়ে, অ্যাডমিট কার্ড ভরে দিলুম। যাতে ছিঁড়ে না যায়। মেয়ে চান করতে গেল। যেন গায়ে-হলুদের সকাল। বাড়িময় এমন তাড়া লেগেছে ভোররাত্তির থেকে। মেয়ের চান হতে হতে মায়েরও চান হয়ে গেল—মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাও গরম গরম ভাত খেয়ে রেডি—পৌঁছুতে যেতে হবে তো? মায়ের গাড়ি যখন-তখন বিগড়ে যায়, তাই বিশ্বস্ত গাড়ি এসে গেছে অনেকক্ষণ, গাড়িতে আরেক প্রস্থ টিফিন, এবং মামীমা বসে।—কিন্তু মেয়ে কোথায়? রান্নাঘরে। কুকুর-বেড়ালের লাঞ্চ বেড়ে দিতে গেছেন। ধরে এনে দিম্মাকে প্রণাম করাতেই তিনি যাত্রা করার মন্ত্র জপ করে দিলেন নাতনীর মাথায় হাত রেখে। মেয়ে এবার দিম্মাকেও প্রণাম করলো। তার পরেই ছোট বোনকে—"ও কি দিদি? ও কী করছো?" বোনটি কুল-কুলিয়ে হেসে ফেলে। —"ওঃ স্যরি।" গাম্ভীর্য একটুও না হারিয়ে স্থিতধী দিদি বলেন—"লাইনে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? স্টুপিড?" দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, হঠাৎ আমি দৌড়ে আবার ওপরে উঠতে থাকি।

—আবার কোথায় যাচ্ছ মা?

—যাই, মাকে প্রণামটা করে আসি?

—"তুমি?" মেয়ে এবার গাম্ভীর্য হারিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে— "তুমি প্রণাম করবে? তোমার কি পরীক্ষা? পরীক্ষা তো আমার!"

অট্টহাসির রোলের মধ্যে তো দুগগা বলে রওনা হলুম। গেটে দু-চারজন, বারান্দায় দু-চারজন হাত নাড়তে লাগলো—মেয়ে যেন বিলেত যাচ্ছে।

পরীক্ষার হলে মেয়েকে পৌঁছে দেওয়া আরেক পর্ব। জগৎ পারাবারের তীরে মায়েরা করে খেলা। কিছু কিছু বাবাও আছেন। আমরাও তো একদিন পরীক্ষা দিয়েছি, মা তো ধারেকাছেও যেতেন না? বন্ধুরা বন্ধুরা মিলে চলে যেতুম, টিফিন বাক্স সঙ্গে নিয়ে— আজকালকার ছেলেমেয়েরা বেশি বেশি আদুরে হয়েছে। তারা বাপমার কথা কম শোনে, আদর-আহ্লাদ তত বেশি পায়। আমাদের কালে টিউটর থাকতেন একজন (যদি অ্যাট অল থাকতেন), এখন প্রতি সাবজেক্টে অন্তত একজন। যেসব

ছেলেমেয়েরা একা একা বটানিকসে-ডায়মণ্ডহারবারে চলে যেতে পারে, পরীক্ষার হলে তাদেরও কিন্তু প্রত্যেকদিন বাপ-মাকে পৌঁছে দিতে হবে। ফের দুপুরবেলায় অঞ্জলিতে টিফিন নিয়ে মা-বাবারা অফিস কামাই করে হত্যে দেন ইস্কুলের গেটে। বিকেলে ছুটতে ছুটতে পুনরায় হাজির, নীলমণিদের ফেরত নিতে। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক। বাপ-মায়ের এই পুণ্যে যদি-বা ছেলেমেয়েরা তরে যায়! যাক, শুরু হয়ে গেল বড় খেলা।

পরের দিন সকালে, আজ অফ ডে। মেয়ে দরজা বন্ধ করে ফোন করছে। আমাদের বাড়িতে এটার চল নেই। আমি তো জোর করে ঢুকবোই ঢুকবো—গোপন ফোন চলবে না চলবে না!—অন্তত ষোলো বছর তো হোক? মেয়ে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়ে ফোনে ফিরে গেল।

—আছে? কী দেখলি? আছে তো? এই, প্লীজ একটু দিয়ে যাবি? আচ্ছা, থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। দশটার মধ্যে, কেমন? ফোন খতম।

—কী ব্যাপার রে?

—কিচ্ছু না। বায়োলজির বইটা। আরাধনার কাছে ছিল।

—কালই তো ইংরিজি আর বায়োলজি? কবে থেকে তোর বই ওখানে আছে?

—টেস্টের পর থেকেই। আচ্ছা মা, আমাকে তো ও কতোবার কতো খাতা ধার দিয়েছে। দেব না বই?

—এতদিন কী দিয়ে পড়লি?

—কেন খাতা? অন্য অন্য সব বই—কত তো বই আছে।

—কিন্তু ওটাই তো টেক্সট বইটা!

—ও কিছু না

তিনদিন পরে।

—"সকালে ফিজিক্যাল সায়েন্স, বিকেলে সংস্কৃত। এই সংস্কৃত খাতাগুলো টিফিনের সময়ে নিয়ে যেও ঠিক মা!" মনে করিয়ে দিল মেয়ে বেরুনোর সময়ে। গাড়ি থেকে নামতে নামতে দেখলুম ইস্কুলের সামনে আরাধনা দুলে দুলে সংস্কৃত পড়ছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে।—"ও কি রে?" আমার মেয়ে যেচে জ্ঞান দিলেন—"এখনই সংস্কৃত পড়ছিস? এখন যেটা পরীক্ষা সেইটে পড়বি তো?" আরাধনা অবাক হয়ে তাকায়।

—"সেইটেই তো পড়ছি। এখন স্যান্সক্রিট না?"

—"কী?" আমি বিষম খাই। "এখন স্যান্সক্রিট? তবে যে বললে এখন ফিজিক্যাল সায়েন্স— সংস্কৃত বিকেলে?"

—"আবা-র?" আরাধনা আর্তনাদ করে ওঠে। "আবার তুই টেস্টের মতন করলি?" আমিও আর্তনাদে জয়েন করি। এবার স্থিতধী কন্যা আমাদের প্রতি সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করেন—"যাগগে মা— ওবেলা না-হয়ে এবেলায়। কী এসে যায়?

দিনটা তো ঠিকই, স্যান্সক্রিট খাতাপত্তর আর আনতে হবে না।" স্থিতধী নাচতে নাচতে ভেতরে চলে যান। আমরা ব্যাকুল মা-বাপেরা ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষায় হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময়ে শুনি শূন্য থেকে দৈববাণী হচ্ছে: "মা! মা! এই দ্যাখো, আমরা কোথায়?" ভীষণ রোদে ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ উঁচিয়ে দেখতে পাই—ঠাঠা রোদ্দুরে চিলের ছাদে দু-তিনটে ইউনিফরম পরা ঝাঁকড়া-চুল মূর্তি—একগাল হাসতে হাসতে হাত নাড়ছে, যেন এভারেস্টের চুড়োয় তেনজিং ইত্যাদি।

উপসংহার: এরপর নিশ্চয় স্কোরবোর্ডটা দেখতে চান? যেমন খেলোয়াড়, যেমন পিচ, তেমনি খেলা; আর তেমনই রেজাল্ট। হোল ফ্যামিলির অসামান্য টীমওয়ার্কের টোটাল স্কোরিং সাড়ে তিয়াত্তর পার্সেন্টি। দুটোমাত্র লেটার। তার একটা আবার বায়োলজিতেই। ঘরময় দৌড়ে দৌড়ে ধপধপ শব্দে একটা বল বাউন্স করতে করতে মেয়ে বলল—

—"মা, তোমাদের সত্তর, আমার সাড়ে তিন—এফর্টওয়াইজ। দিম্মাকে সেই প্রণামটা তুমি যদি করতে, স্টারই পেয়ে যেতুম নির্ঘাত।"

জীবে দয়া

মা টেরেসা নোবেল পুরস্কার পেয়ে অবধি দেশে জীবে দয়ার ট্রেনিং শুরু হয়েছে। আমাদের এক প্রতিবেশী সেদিন দেখলুম একজন ভিখিরিকে ডেকে এনে ছেঁড়া লুঙ্গি দিচ্ছেন। সেজপিসেমশাই একজোড়া আস্ত স্যানডাল চটি দিয়ে দিলেন রিকশাওলাকে (গত বছর এক বেচারী চোর ও-বাড়িতে চুরি করতে ঢুকে, চটি জোড়া ফেলে পালিয়েছিল)। লতুবৌদি এক খাঁচা বদ্রীপাখি কিনে দিলেন ছেলেকে।—"যা দিনকাল পড়েছে, একটু মায়ামমতা প্র্যাকটিস করুক। প্রাইভেট টিউশন ছাড়া কিছুই তো শেখে না ছেলেপুলেরা, পাখিদের যত্ন করতে করতে যদি জীবে দয়া শেখে।"

জীবে দয়া করে যদি ক'লাখ টাকা ঘরে আসে, তো আসুক না, ক্ষতি কি? জীবে দয়ার যে এতটা আর্নিং পোটেনশিয়ালস আছে তা কি আগে জানা ছিল? যেমন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পরে কবিতার আর্নিং ক্যাপাসিটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে গেল, আর গাদা গাদা ইংরাজি কবিতা লেখা হতে লাগলো।

কিন্তু আমাদের বাড়ির ব্যাপার স্যাপার আলাদা। এ-বাড়িতে প্রচণ্ডরকম জীবে দয়ার ট্র্যাডিশন—আমার মেয়েরা অষ্টাবক্র মুনির মতো জীবে দয়ার ট্রেনিং সমেত ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাদের দয়ামায়ার অত্যাচারে বাড়িসুদ্ধু অতিষ্ঠ। কিছু বলতে গেলেই আমার মা বলেন, "বোঝো এখন নিজে আমার কষ্টটা! মা যেমন, মেয়েরা তেমনিই হয়েছে।" এর ফলে তাদের জীবে-দয়া বাধাবন্ধহারা হয়ে আরও দিগ্বিদিকে ধাবিত হয়। দিকের চেয়ে বিদিকেই বেশি। ওদের বুকে জীবে দয়া যত বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারের অশান্তিও চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে যাচ্ছে।—অথচ, মুশকিল এই যে, সংসারটাকে আমার কিছুতেই খুব সীরিয়াস ব্যাপার বলে মনে হয় না। মার সংসার ছিল আসল সংসার। আমারটা যেন খেলাঘর। সেই বাড়িঘর, সেই মা, সেই আমি, এবং আমার মেয়েরা—এবং গাদা গাদা পুষ্যি (যেমন আমারও ছিল)—নেই কেবল বাবা। বাবা ছিলেন—মায়ের সংসারের মাথা ছিল। আমার খেলার সংসারে কোনো মাথা নেই, তাই সংসার নিয়ে আমার মাথাব্যথাও নেই। যেমন রান্নাবাড়ি খেলছি-–ঘরকন্নাটাকে কিছুতেই আমার বাস্তব বলে আর বিশ্বাস হতে চায় না। এ-সংসার যেন ভবসংসার —এর কাণ্ডারী সত্যি করে তিনিই, যিনি এই অখণ্ডমণ্ডলাকার ব্রহ্মাণ্ডটিতে চালাচ্ছেন। আমার সংসারে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা আছে দ্বার।

ছেলেবেলায় আমি যখন কানাখোঁড়া কুকুর বেড়াল, ডানাভাঙা পাখি, বাসাভাঙা কাঠবেড়ালী, কাকের ছানা, এমন-কী চামচিকে পর্যন্ত ধরে এনেছি—মা কখনো কখনো সইতেন, কখনো গুনিয়াভাইকে দিয়ে পগারপারে ভাগিয়ে দিতেন। আমি পারি না। ফলে আমার সংসারে জীবজন্তু আসে, আসে, আসে। এবং থাকে, থাকে, থাকে। আমাদের নিজেদের যত কৌটো চাল লাগে, কুকুর বেড়ালদের চাল লাগে তার চেয়ে বেশি। নিজেরা মাছমাংস খাই না-খাই—কুকুরের হাড়, বেড়ালের মাছ চাই-ই।

মা মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহ করেন। যখন অতিথিরা এসে দাঁড়িয়ে থাকেন সবগুলো কোচের গদিতে এক-একটা আদুরে বেড়াল রোঁয়া ফুলিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। ঠেললেও ওঠে না। 'এহ বাহ্য', টুল, মোড়া, মাদুর পেতে অতিথিদের বসাই। যাবার সময়ে তাঁদের অনেক সময়ে খালি পায়ে যেতে হয়। জুতোগুলি এ-বাড়ির কুকুর ইতিমধ্যে চিবিয়ে রেখেছে। কেউ কেউ খালি পায়ে যেতে রাজী হন না, আমাদের জুতো পায়ে দিয়ে যান। প্রত্যেকটি পর্দা, চাদর, টেবিলক্লথ চিবোনো, ঝুল্লি ঝুলছে। প্রত্যেক চেয়ার টেবিল আলমারির পায়া চিবোনো এবড়ো খেবড়ো। প্রত্যেকটি চেয়ারের সমস্ত চামড়ার গদি ছিন্নভিন্ন, তুলো বেরুনো—ওতে বেড়ালরা নখে শান দেয়। সর্বত্র ওডোনিল ঝুলছে, প্রত্যেকটি ঘরেই তাজা, ফ্রেশ স্যানিটারি সুবাস। যেমন দামী হোটেলের বাথরুমে। (নইলে মনে হবে চিড়িয়াখানা)।

মা দুঃখে হাসেন। হাসবেন না? তিনি যখন গিন্নি ছিলেন, তখন সংসারে

লক্ষ্মীশ্রী ছিল। জীবে দয়া করতে-করতে কী বাড়ি কী হয়ে গেল লণ্ডভণ্ড।

কিন্তু এহেন বাড়িতে আরো জীবে দয়া করা সম্ভব। সেই স্কোপ এখনও আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? ঘটনাটা শুনুন, বিশ্বাস হবে।

অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে। সন্ধেবেলায় হঠাৎ রাস্তায় একটা গণ্ডগোল। পড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মেয়েরা তো জানলায়। একটু পরে ছোট এসে বলল—"মা! মা! শিগগির এসো! একটা কুকুরছানাকে না, (কী সু-ঈ-ট, ছো-ওট্টো, এখনও চোখই ফোটেনি ভালো করে) দুষ্টু ছেলেগুলো ঢিল মারছে, পা দিয়ে লাথি মেরে বল খেলছে, এমন মাড়িয়ে দিয়েছে যে পেছনের দুটো পা কেমন লম্বা হয়ে গেছে!" এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সাংসারিক ভূমিকা কী হওয়া উচিত ছিল কে জানে, আমি তো আবাল্যের অভ্যেসে লাফিয়ে উঠেছি—

—"কই- কই? কোথায়? চল তো দেখি—"

—"দিদি ওদের বকে দিয়েছে। ছেলেরা পালিয়ে গেছে।"

—"আর কুকুরছানাটা?"

—"দিদির কোলে।"

—"আর দিদি?"

—"গেটে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আনবে কি?"

মুহূর্তেই বুঝে ফেলি ব্যাপার। ঢোকেনি যখন, তখন নিশ্চয় সে গৃহে প্রবেশের যোগ্য নয়। সেবারে যখন কাকে ঠুকরে একচোখ গলে-যাওয়া, পেছনের পা-প্যারালাইজড বেড়ালছানাটাকে এনে ওরা শোবার ঘরে খাটে শুইয়ে পরিচর্যা করেছিল, আমার মা কুরুক্ষেত্র করেছিলেন। এবারে তাই সাবধানতা নিয়েছে মেয়ে। মুহূর্তেই আমার কর্তব্য স্থির।—"খবরদার, ভেতরে আনা হবে না। ওই সামনে, সদর উঠোনে যে-কোণটায় একটু ঢাকামতন আছে, সেখানে রেখে দাও।"—"রাখি? থ্যাংকিউ! থ্যাংকিউ! মা, তুমি সত্যি খুব ভালো।" তারপরেই ছুটোছুটি।—"মা একটু দুধ? একটা সসার? বোরিক তুলো? ডেটল?"

আমি তো জীবনে মাকে থ্যাংকিউ বলেছি বলে মনে পড়ে না যদিও শ্বাস-প্রশ্বাসে আমার মায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা। এরা বলছে, বলুক। বলতে বলতেই কৃতজ্ঞতা আসে হয়তো আজকাল।

রাত্রে খেতে বসে আলোচনা হচ্ছে দুই বোনে। দিদি বলছে—"ফ্রিজের দুধ দিসনি, একটু গরম করে দে, নইলে কিন্তু খাবে না।"

—"একটু মাংসের স্টু দেব, দিদি? তুলোর পলতেয় করে?"

—"ও ভীষণ উইক, ঠিক কুকুরের মতো ডাকতেও পারে না মা, বেড়ালছানার মতো ডাকে।"

—"বেড়ালছানাই নয় তো?" মা ফোড়ন কাটেন।

—"কী যে বল দিমা। আস্ত কুকুর। দিই স্টু?"

—"পাগলা!" বড়মেয়ে বলে, "স্টু দেয় না। চোখই ফোটেনি, নুন খাওয়ালে মরে যাবে। বরং এক ফোঁটা ভিটামিন ড্রপ দিতে পারিস।"

—"খবর্দার এখন ভিটামিন দিস না।" মা হাঁ হাঁ করে ওঠেন— "সর্বনাশ হবে, পেটের অসুখ করবে যে। সদর উঠোন একেবারে নষ্ট করে ফেলবে।" তারপরেই যথানিয়মে—"আর তোমাকেও বলিহারি যাই খুকু। মেয়েদুটোকে কী নষ্টই করছিস। অ্যানুয়াল পরীক্ষার মধ্যে পড়শুনো ছেড়ে উঠে গিয়ে ঐসব নোংরা জিনিস ঘাঁটছে —ছি ছি!—"

—"মাদার টেরেসা তো কুষ্ঠরুগী ঘাঁটেন।" বড় মেয়ে উত্তর দেয়।

ছোট মেয়ে সগর্বে বলে,—"দিদি তো বড় হয়ে মাদার টেরেসা হবে। না দিদি।"

—"আর তুমি? সিস্টার নিবেদিতা?"

—"আমি? লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প!" এ বছরে ওদের টেক্সটে আছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ঝুপ করে আলো নিবে গেল। সারমেয়-জননী ব্যাকুল।

—"ওমা! দশটা বেজে গেল যে? এক্ষুনি ওকে দুধ খাওয়াতে হবে। চার ঘন্টা হয়ে গেছে।"

—"হোক গে, অন্ধকারে নিচে যেতে হবে না।"

—"অন্ধকার তো কী? আমি টর্চ ধরে থাকবো।"

লেডি উইথ দা ল্যাম্প জবাব দেন। টেরেসা জুনিয়র দুধ, তুলো, টর্চ নিয়ে রেডি। শুশ্রূষাপার্টি লোডশেডিং উপেক্ষা করে সদরে বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন গেল চঞ্চলা আর লক্ষ্মী। যেন গায়ে-হলুদের তত্ত্ব যাচ্ছে। ওরা যাচ্ছে পাহারাদার হয়ে। খোঁড়া কুকুরছানাকে কোলে তুলে অতি যত্নে দুধ খাইয়ে, ওপরে এসে ডেটলে হাত পা ধুয়ে সে-পোশাক বদল করে, দুই দয়াবতী পড়তে বসলেন মোমবাতি জ্বেলে। এগারটায় আলো ফিরবে।

আজকাল বাড়িতে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়া। অ্যানুয়াল পরীক্ষা বলে কথা! রাত্রে খাবার পরেও পড়তে বসা হয়। পৌনে বারোটার সময়ে মা তাড়া লাগাতে শুরু করেন—"বারোটা বেজে গেছে, উঠে পড়। আর পড়তে হবে না।" অবশেষে সাড়ে বারোটায় তাঁরা উঠে ফ্রিজ খুললেন।

—"মা, দুধ?" মা টেরেসার প্রশ্নের উত্তর দিই,—"আজ সকালে দু' বোতল দুধ কেটে গেছে। যা ছিল তোমার দশটার ফীডেই খতম।"

—"দুধ নেই? তা হলে কী খাবে ও?"

—"কিছু ভাবিস না। ঠিক হয়ে যাবে।" বোনকে সান্ত্বনা দেয় দিদি।—"দেশলাই আছে? দীপুমামা?" ঘুমন্ত দীপুমামাকে ঠেলা মেরে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

—"যা যা; ঝামেলা করিস না। এত রাত্তিরে দেশলাই দিয়ে কী হবে? কারেন্ট এসে গেছে।"

—"গ্যাস জ্বালবো।"

—"গ্যাস?" দীপুমামার একটা চোখ খুলে যায়। "কেন রে? চা হচ্ছে বুঝি?" দেশলাই বেরিয়ে পড়েছে বালিশের নিচে থেকে।

—"চা না। দিদি জল গরম করবে, নিউট্রামূল গুলবে।"

—"কে খাবে, নিউট্রামূল? এত গুডগার্ল কে হয়েছে?"

—"কেউ না। কুকুরছানা।"

—"এই মাঝরাত্তিরে নিউট্রামূল খাবে ব্যাটা কুকুরছানা? দে আমার দেশলাই ফেরৎ দে!"

—"খিদে পায় না তার? সেই দশটায় খেয়েছে।"

—"ঘন্টায় ঘন্টায় খাবে নাকি? হোলনাইট প্রোগ্রাম? তার চেয়ে ওকে চা করে খাওয়া না বাপু? চা খুব নিউট্রিশাস ড্রিংক। আমিও একটু খেতুম।"

—"দুধ নেই।"

—"যাব্বাবা।"

রাতবিরেতে গ্যাস জ্বেলে জল গরম হয়। কাচের গেলাসে প্রচণ্ড সিরিয়াসলি চামচ নেড়ে ঠনঠনাঠন মহাশব্দ করে পাড়া জাগিয়ে নিউট্রামূল তৈরি হতে থাকে। সব ঘরে আলো জ্বলছে। যেন বিয়েবাড়ি। সবাই সজাগ, কাজের লোকেরাই কেবল যা নিদ্রাবিহ্বল। দুই মেয়ের সেবাসুন্দর মাতৃমূর্তি দেখলেও চোখ জুড়োয়। মধ্যরাত্রে কী প্রবল ব্যস্ততা। দীপুমামা বলেছে, "তুলোয় করে কত খাওয়াবি? ড্রপারে করে তাড়াতাড়ি খাবে।" তাই কালি ভরবার একমাত্র প্লাস্টিকের ড্রপারটি গরমজলে ধুয়ে ধুয়ে নিষ্কলুষ তথা স্টেরিলাইজ করা হচ্ছে। পরিষ্কার ড্রপারে টাটকা নিউট্রামূল নিয়ে হাতের উল্টোপিঠে ফোঁটা ফোঁটা ফেলে পরীক্ষা করা হচ্ছে, উষ্ণতা ঠিক সারমেয় শাবকের নরম জিভের যোগ্য কিনা। বড় মেয়েকে দেখে মনে হচ্ছে আঁতুড়ঘরের ডিউটিতে এক্সপার্ট নার্স। বোনটি একটু কম এক্সপার্ট। আয়া। ইনস্ট্রাকশন ফলো করে সে দিদির।

—"চল। সব রেডি? পোশাকটা বদলেছিস তো?"

—"কিন্তু এখন রাত্তির একটা। এত রাত্রে আমরা একা একা সদরের উঠোনে বেরুবো?" বোনের প্রশ্ন।

—"দীপুমামাকে ডাক।"

—"নো। নেভার।" দীপুমামা গর্জন করে। "চা করবার বেলায় পারলি না। আমি যেতে পারব না। একা একাই যা। ওখানে জ্যোতিবাবুর পুলিশরা বেড়াচ্ছে। ওরা দেখবে'খন।"

—"ঠিক আছে। চলরে, আমরা যাই।"

—"কি হচ্ছে কি! তোমাদের মার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? কুকুরছানা না খেয়ে থাকে থাকুক।" হায়ার অথরিটি থেকে ইনজাংশন জারী হয়ে যায়।

—"দীপুমামা, প্লীজ ওঠো, মা যাবেন না, দিম্মা বকছেন—" অগত্যা দীপু ওঠে।

— "হয়েছেও বাবা এক আজব বাড়ি! রাত্তির দুটোর সময়ে দুটো বাচ্চামেয়ের চোখে ঘুম নেই। কী? না—রাস্তায় কুকুর খাওয়াবে!—চল চল।" আর যাবে কোথায়! দীপুর গজগজানি থেকে শুরু হয়ে গেল মার লেকচার।— "খুকুরই আহ্লাদ দেবার কুফল এসব। তুমি ছেলেপুলে মানুষ করতে জানো না খুকু!" আমি দুড়দাড় করে পালিয়ে যাই, যাবার আগে বন্যার মুখে খড়কুটো ধরার মতো আউড়ে নিই—"রাত্তির একটা বেজে গেছে, মা—এটা কি বকুনি দেবার সময়?"

মাকে যুক্তিতে বাগ মানাবো তুচ্ছ আমি? ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়েকে?

—"যদি দুটো কচি মেয়ের পক্ষে, এই শীতের রাত্তিরে, মাথায় হিম ঝরিয়ে, সদর রাস্তায় হটর হটর করে বেরিয়ে গিয়ে পথের নেড়িকুকুরের রুগ্ন ছানা নিয়ে খেলাধুলো করবার পক্ষে সময়টা উপযুক্ত হয়, তাহলে তাদের গার্জেনকে বকবার পক্ষেই বা এটা সুসময় নয় কেন?"

আমি বারান্দায় পালাই। উঁকি মেরে দেখি বড় মেয়ে পাঁচিলের ধারে বসেছে সিঁড়িতে। কুকুরছানা কোলে করে দুধের বদলে মধ্যরাত্রের অমূল্য ভালোবাসা গুলে, ড্রপারে করে খাওয়াচ্ছে। কোলে একটি ন্যাপকিন পেতে নিয়েছে। ওই ন্যাপকিনটা ফেলে দিতে হবে।

ছোট কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হুকুমের অপেক্ষায়। রকের ওপরে একটা সিগারেট জ্বলছে। অর্থাৎ দীপুমামাটি সেখানে। পাহারা দিচ্ছে আর জ্ঞানের বাণী উচ্চারণ করছে।

—"ওটার গায়ে গ্যামাক্সিন পাউডার দিয়েছিস তো? দিসনি? এবার দ্যাখ কি সর্বনাশ হয়। তোদের মাথায় রাস্তার কুকুরের পোকা চড়ে বসবে, সেই পোকা এসে উঠবে বাড়ির অন্য কুকুর-বেড়ালের গায়ে। তখন ঠেলা বুঝবি।"

—"যা তো টুমপুস, সেভিন পাউডারটা নিয়ে আয়! প্লীজ। কী সর্বনাশ।"

—"কোথায় আছে? এখন তো অনেক রাত্তির।"

—"এখন তবে থাক, কাল সকালে দিলেই হবে।" দীপু বলে।

—"বাঃ! ততক্ষণে যদি আমাদের মাথায়—"

দীপুমামা ফের সলিউশান দেয়।—"ওপরে গিয়ে বরং তোরা মাথায় সেভিন পাউডার মেখে শো। সকালে শ্যাম্পু করে নিবি।"

—"সকালবেলায় তো পরীক্ষা। কখন মাথা ঘষবো?"

আমি বারান্দা থেকেই স্থানকাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠি—"খবর্দার! সেভিন দিবি না মাথায়। মানুষের মাথায় কখনো কুকুর-বেড়ালের পোকা হয়? অ্যাদ্দিন জীবজন্তু পুষছিস, এও জানিস না?"

এমন সময়ে টহলরত দুটি পুলিশ এসে দাঁড়ায় পাঁচিলের পাশে। উঁকি দিয়ে দেখে এত রাত্রে কী অঘটন ঘটছে এ-বাড়ির উঠোনে। কুকুরসেবা দেখে একজন

পুলিশ সন্দেহে জিজ্ঞেস করে—"মর গিয়া?" ব্যাস, দুই বোনে একসঙ্গে বকুনি লাগায় —"কিঁউ মরেগা? দুধ পীতা দেখতা নেই?" ছোট যোগ করে দেয়—"ঠক ঠক করে কাঁপতা হ্যায়, দেখতা নেই?" পুলিশরা হেসে বলে যায়—"আবতক জিন্দা হ্যায়? তাজ্জবকি বাত!"

এমন সময়ে ছোট মেয়ে ওপরে মুখ তুলে বলে—"মা! একটা সোয়েটার দাও শিগগির।"

—"কেন রে? শীত করছে?"

—"আমি না, কুকুরছানার জন্যে। ও শীতে কাঁপছে।" পেছন পেছন দীপুমামার ফোড়ন—

—"ও রাইগার জগতের কোনো সোয়েটারে থামাতে পারবে না। ও হলো মরবার আগের কাঁপুনি।"

গুম গুম করে কিলের শব্দ এবং দীপুমামার গলায় 'বাপরে মারে'। তারপরে দেখি মেয়ে ওপরে চলে এসেছে—হাতে নিজের ছোট্টবেলার একটা লাল-নীল সোয়েটার নিয়ে নেমে যাচ্ছে। ওরই পুতুলখেলার বস্তু।—"এটা নিচ্ছি?"

—"নে! কিন্তু সোয়েটার তো ওকে পরাতে পারবি না। ওর আসলে শীত করছে ঠাণ্ডা সিমেন্টের মেঝেয় শুয়ে আছে বলে।"

—"পাপোশটা নিয়ে নেবো তাহলে, গেট থেকে?"

—"মোটেই নেবে না পাপোশ"—ও-ঘর থেকে মা বাধা দেন। ফাইনাল গলায়। জীবে দয়ার কারণে বাড়িসুদ্ধু সবাই জাগ্রত। সব দরজা খোলা। সব আলো জ্বালা।

—"তবে কী নেবো?"

—"গোটা কয়েক স্টেটসম্যান আর আনন্দবাজার ভাঁজ করে বিছানা পেতে দে। দিব্যি গরম হবে।"

—"ওই সোয়েটার পরা কুকুরছানাটাকেই কাল ইস্কুলে পাঠিয়ে দিস খুকু। তোর মেয়েদের পরীক্ষাগুলো দিয়ে-টিয়ে আসবে!" মা বলেন।

একটু পরে, ফের ডেটলে হাত-পা ধুয়ে, শোবার পোশাকে, কোলের কাছে শুয়ে বড়টি বললো—"কাল ওকে তুমি বন্দেল রোডের ভালো ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাবে, মা? ওর পেছনের পা দুটোতে সেই বেড়ালছানার মতন প্যারালিসিস না হয়ে যায়—ভেঙেই গেছে মনে হচ্ছে।"

—"হবে হবে। এখন তো ঘুমো।"

সকালে উঠে নেজাল ড্রপের ড্রপারটা দিয়েই মেয়ের কলমে কালি ভরে দিলুম। পুনরায় সাড়ম্বর কুকুর-পরিচর্যার পর্ব সমাধা করে, তাঁরা পরীক্ষায় বেরুলেন।—"জিওমেট্রি বক্স যে পড়ে রইল"— আমি পেছন পেছন ছুটি। নির্বিকারভাবে ফিরে এসে জিওমেট্রি বক্স নিয়ে ছুটতে ছুটতে জীবে দয়াবতী রিকশায় ওঠেন গিয়ে। যেন এটাই নিয়ম।

—"আমি দেড়টায় এসে ফের খাওয়াবো।"

—"দুগগা দুগগা! ভালো করে লিখিস।"

সেদিনই আমার ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে ফিরতে রাস্তার আলো জ্বলে গেল। বাড়ির সামনে এসে দেখি এক নাটকীয় দৃশ্য!

পাঁচিলের ওপরে একটি দীর্ঘ মোম জ্বলছে, তার পাশে গেটে হেলান দিয়ে একজন, পাঁচিলে কনুই ভর রেখে একজন, মাথা নত করে অ্যাটেনশন হয়ে মিলিটারি কনডোলেন্সের স্টাইলে আর একজন— একটি মৌন মিছিল স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। দেখেই বুঝেছি কী হয়েছে।—দীপুই দৌড়ে আসে।

—"দিদি, সর্বনাশ হয়েছে। সেই ছানাটা—"

—"মরে গেছে তো? যাবেই, জানতুম।"

—"ও কি? অমন করে বলতে হয়? বাচ্চাদের খুব মন খারাপ—"

—"মা, এখনই গাড়ি তুলো না। একটু গঙ্গার ধারে যেতে হবে"—বড় বলে।

—"কিংবা পার্ক স্ট্রীটের সেমিট্রিতে"—ছোট বলে।

আমি সিধে গাড়ি গ্যারেজে তুলে দিই।

—"ওকি? যাবে না?"

—"ওই কুকুর নিয়ে? পেট্রল কে দেবে?" উঠোনের সেই কোণটাতে গিয়ে দেখি সিঁড়ির ওপরে একটি জুতোর বাক্সে স্প্যানের কাগজ বিছিয়ে শবশয্যা প্রস্তুত। ছোট্ট কফিন। কিছু ফুলদানি থেকে তোলা রজনীগন্ধার মঞ্জরী তার পাশে, আর চন্দনধূপ জ্বলছে। একগাদা খবরের কাগজের বুকে, মোমবাতির রহস্যময় মৃদু উদ্ভাসে, স্বয়ং একটি শোক সংবাদের মতো নিজেই নিজের অবিচুয়ারি হয়ে শুয়ে আছে ছোট্ট, অতীব খুদে একটি প্রাণহীন প্রাণী। তার গায়ে আমার মেয়ের রংচঙে সোয়েটার। খুব মায়া হয়। কিন্তু হতকুচ্ছিত। একেই ওরা বলেছিল "সুইট?" কেমন জামাই পছন্দ করে আনবে কে জানে? মোমবাতি, ধূপ, ফুল, কফিন সব রইল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজগুলোর দুপাশে ধরে স্ট্রেচারের মতো তুলে ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে নামিয়ে দিলুম রাস্তায়, নর্দমাতে। ঠিক নাকবরাবর টুল পেতে বসে দুজন পুলিশ আমার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গেটের বিপরীতেই এটা ঘটছে। মুদ্দোফরাসীতে মনে হলো আমার এতই নৈপুণ্য যেন এই কর্মই করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনভর বুঝি মড়া ফেলতে ফেলতে রপ্ত হয়ে গেছে কাজটা।

ওপরে এসে গা ধুয়ে কাপড় বদলে চা খেতে বসেছি, মেয়ে বললে—"ও কি ওখানেই থাকবে?"

—"তা কেন? ভোরবেলা জমাদার এলে নিয়ে যাবে। মন খারাপ করিস না, ও বাঁচত না রে।"

—"বাঁচলে তো হাঁটতে পারত না, সে ভীষণ কষ্টের বাঁচা হতো। ছানাটা মরে

বেঁচেছে।" মা সান্ত্বনা দেন। মেয়েরা কিছুই বলে না! চুপচাপ পড়তে বসে। ফের পরশুদিন পরীক্ষা। বেড়ালাগুলো গিয়ে ওদের পড়ার বইয়ের ওপর চড়ে বসে। ওরা সরিয়ে দেয় না।

—"কই জমাদার তো নেয়নি, মা?"—সকালে উঠেই উঁকি মেরেছে।— "কিন্তু খবরের কাগজগুলো নেই।"

—"ঠিক চারটের সময়ে ঝাঁটার শব্দ পেয়েছি।" মা বলেন। "খবরের কাগজগুলো তখনই নিয়ে গেছে নিশ্চয়।" যে-গেট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি বেরুবে, লাল নীল সোয়েটার পরা কুকুরছানা নর্দমায় শুয়ে রইল তার সামনেই। যেন দোলনায় ঘুমুচ্ছে।

—"এতগুলি গণ্যমান্য পুলিশের সামনেও ফেলে গেল? ধন্যি পৌরকর্মী!"

—"দশটার আগেই ক্লিয়ার করে দেবে, ভাবিস না"—দীপুমামার টিপ্পনী।—"চীফ মিনিস্টার বেরুবেন তো।"

দশটায় জ্যোতিবাবু যাত্রা করলেন। উঁকি মেরে দিপু বলল—

—"নেই। নিয়ে গেছে। যা বলেছিলুম।"

—"নেয়নি। ওই তো, সরিয়ে রেখেছে কেবল—"

—"এই তো ফুটপাতে, ঘাসের ওপরে—"

—"এই তো আমাদের বাড়ির গায়েই—"

—"এই তো আমাদের গেটের ধারেই—"

—"কত মাছি এসেছে, ঈশশ।"

মাছি? শকুন নয় তো? যাক বাঁচা গেল। ঐ সোয়েটারের দৌলতেই কিনা জানি না—এখনো যে কাক চিল শকুনিরা টের পায়নি তবুও রক্ষে।

ছোট বলে—"এখন কী হবে, ওখানেই থাকবে?"

বড় বলে—"তখনই বললুম গাড়ি তুলো না—শুনলে না তো—"

—"দ্যাখ, জীবে দয়া ভালো। কিন্তু আমিও তো একটা জীব? সারা দিনের শেষে ফেরামাত্র ওপরে উঠতে দেবে না, মরা কুকুর সৎকার করতে নিয়ে যেতে হবে? ভোর থেকে উঠে তোমাদের খাবার তৈরি, জামা ইস্ত্রি, কলমে কালি ভরা, জিওমেট্রি বক্স নিয়ে পেছু পেছু ছোটা—আমাকে তোরা পেয়েছিস কী?"

বকুনি খেয়ে মেয়েরা করুণ মুখে চুপ করে থাকে। তখন আবার বলতে হয় —"দেখি ওই জুতোর বাক্সটা কোথায়? এখন তো তাহলে গাড়িটা বের করতেই হয়—"

—"ওই কুকুরের বাসি মড়া কি এখন ফুলের মালা দিয়ে গাড়িতে তোলা হবে?" মা বলেন।

"তা ছাড়া আর উপায় কী?"

"উপায় করপোরেশনে খবর দেওয়া।"

মা আমার সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ। কতকিছু জানেন। রাস্তায় কুকুর মরে

পড়ে থাকলে কী করতে হয় তা জগতে কজনে জানে? আমার মা জানেন।

—"দি করপোরেশন অফ ক্যালকাটা, হেলথ ডিপার্টমেণ্ট ডিরেক্টরি খুঁজে বের করে নে। ঠিকানা দিয়ে বল, মুদ্দোফরাস পাঠাবে। অরডিনারি জমাদারে মড়া ফ্যালে না, ওদের ওটা কাজ নয়।"

খুব সোজা ব্যাপার। মাত্র সাতবারের চেষ্টাতেই টু-থ্রি এক্সচেঞ্জ পাওয়া গেল। দুই মেয়ে হাঁটুতে চিবুক রেখে স্থির বসে আছে। উদ্বিগ্ন মাতৃমূর্তি। মা টেরেসা জুনিয়র। অ্যাণ্ড অ্যাসিস্টান্ট্! অনেকক্ষণ ফোন বেজে গেল, বেজে গেল। তারপর একজন ধরলেন। মনে হলো না, নামানুযায়ী ইনিই হেলথ অফিসার।

—"কুত্তা মর গয়া? কাঁহা? জ্যোতি বসুকা ঘরকা সামনে? কওন জ্যোতি?"

"ওহো, চীফ মিনিস্টর? ঠিক ঠিক, আভী সাফাই হো জায়গা। ইয়ে সেণ্ট্রাল অফিস হ্যায়—আপ ডিস্ট্রিক ক' অফিসমে ফোন কীজিয়ে— ফাইভ সিক্স।"

—"লিখে নে, লিখে নে, শিগগির—"

এক মেয়ে কলম এগিয়ে দেয়, অন্য মেয়ে হাতের পাতায় চটপট লিখে নেয় ফাইভ সিক্স।—"ডিস্ট্রিক্ট 'ক' অফিস, টালা ব্রিজকো পাসমে বরানগর ও হী এরিয়া হ্যায়।"

—বরানগর যেন বলল? ভাবতে ভাবতে ফোন করি।

—হ্যালো, 'ক' হেলথ অফিস? আজ্ঞে, চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে একটা কুকুরছানা কাল থেকে মরে পড়ে আছে।

—তা এখানে কেন? জ্যোতিবাবু কি এখানে থাকেন? বরানগর তাঁর কনস্টিট্যুয়েন্সি, তাঁর রেসিডেন্স নয়। এও জানেন না? এমন লোক এখনো আছে এ শহরে?

—আজ্ঞে? তা তো জানিই—আমি তাঁর বাড়ির সামনে থেকেই বলছি তো। হিন্দুস্থান পার্ক থেকে।

—তা এখানে কেন? এটা তো কাশীপুর—

—কিন্তু আমাকে তো করপোরেশন থেকে এই নম্বরই...

—আঃ হা—তাতে কি হয়েছে? মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। ভুল করেছে। আপনি ফোন করুন ডিস্ট্রিক্ট 'খ'তে। ফোর টু...। এটা ভুল পাড়া। বুঝেছেন তো?

—লিখে নে, লিখে নে, ফোর টু...ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। খুব বুঝেছি।

—হ্যালো, ফোর টু...?

—হ্যাঁ, বলুন।

—চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে একটা মরা কুকুরছানা পড়ে আছে। দয়া করে যদি—

—চীফ মিনিস্টারের বাড়ি? অর্থাৎ হিন্দুস্থান পার্কে? ওখানে একটা কুকুরছানা মরেছে?

—ভীষণ মাছি উড়ছে—হেলথ হ্যাজার্ড...

—বুঝেছি বুঝেছি। খুব মুশকিলের কথা। কিন্তু এটা তো ডিস্ট্রিক্ট 'খ'র অফিস। আমরা কী করতে পারি বলুন?

—আজ্ঞে দয়া করে যদি একটু সরিয়ে নেন—

—তা তো বুঝছি, মুশকিলটা কী জানেন, আপনারা তো আমাদের অফিসের আনডারে পড়েন না?

—পড়ি না? আমরা ডিস্ট্রিক্ট 'খ' নই? তবে আমরা কী?

—উদ্বেগের কিছু নেই। আপনি বরং ডিস্ট্রিক্ট 'গ'র অফিসে, ফোর ফাইভ-এ ফোন করুন। ওরা পারবে।

—লিখে নে! ফোর ফাইভ...মেয়ের হাতের খুদে চেটো উপচে পড়ে এখন কনুইয়ের কাছাকাছি লেখা হচ্ছে ফোন নম্বরের তালিকা।

—ফোর ফাইভ-এ ফোন করব তো?

—হ্যাঁ। করে ডিসিওকে চাইবেন। শুনুন, শুনচেন, যাকে-তাকে বললে দেরি হবে, সোজা ডিসিওকে চাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কিছু মনে করবেন না, এটা তো ভুল অফিস—মানে, আপনারা ভুল এরিয়া—বুঝেছেন।

—থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। লিখে নে, ডিসিও—বুঝেছি, আমরা ভুল এরিয়া।

—হ্যালো! ফোর ফাইভ? ডিস্ট্রিক্ট 'গ'র হেলথ অফিস?

—ইয়েস।

—সিডিও আছে? সিডিও?

—কে? কাকে চাইছেন?

(নেপথ্যে এদিকে মেয়েদের চীৎকার)—

—সিডিও নয় মা! সিডিও নয়! ডি সি ও। বল, ডি সি ও। এই যে, লেখা আছে—

—স্যরি! সি ডি ও নয়, ডি সি ও! উনি আছেন? ডি সি ও? (নেপথ্যে ফোনের ভেতরে আকুল প্রশ্নোত্তর শোনা যায়। "ডিসিও কে চাইছে। কী বলব? আছে, না নেই?")

—"আমি কি জানি? দেখে আয়। থাকলে বলবি আছে, না থাকলে বলবি নেই।"

—এইরকম বলব তো?

—আবার অন্যরকম কী বলবি? তুই সত্যি যাচ্ছেতাই—ইতিমধ্যে আর একজন ফোন ধরলেন—হ্যালো। কাকে চাই আপনার?

—ডিসিওকে।

—কেন- কী দরকার?

চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনের উল্টোদিকের ফুটপাতে একটা কুকুরছানা মরে পড়ে আছে।

—অ। তা আমাকে বলে কি হবে? ডিসিওকে বলুন।

—তাঁকেই তো চাইছিলুম।

—একটু ধরুন—

—হ্যালো। হ্যালো! শুনছেন?

—আবার কী হলো?

—আচ্ছা, ডিসিও মানে কী, বলতে পারেন?

—তাও জানেন না? আচ্ছা লোক তো? ডিস্ট্রিক্ট কনজারভেটরি অফিসার। ডি সি ও। বুঝেছেন? আপনারা ওসব বুঝবেন না, এই নিন— কথা বলুন।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, কনজারভেটরি? না কনজারভেন্সি?

—ফের ঝামেলা? ওই একই হলো। ধরুন—

—হ্যালো! ডিসিও বলছেন? নমস্কার। নমস্কার। আমি বলছি হিন্দুস্থান পার্ক থেকে। (তখন চীফ মিনিস্টার ইত্যাদি...)

—"ওঃ। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে কুকুরছানা মরেছে? ঠিক আছে। কিছু ভাববেন না। এক ঘণ্টার মধ্যে ক্লিয়ার করিয়ে দিচ্ছি।"

—ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।

—কী আশ্চর্য, ধন্যবাদের কি আছে। এ তো আমাদের ডিউটি। এখুনি লোক যাচ্ছে।

ফোন নামাতেই মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়লো।

—কেন তুমি সিডিও বলছিলে?

—কিসের ইনিশিয়ালস তা না জানলে আমার অমন অক্ষর মনে থাকে না —বিডিও এসডিও-র মতোই সিডিও বলেছি। বেশ করেছি।

—ওরা তোমাকে কী ভাবলো?

—আমাকে চেনেই না। তা ছাড়া আমি মরলে তো ওদের খবর দিলে চলবে না, হিন্দু সৎকার সমিতির নম্বরটা ফোনের খাতায় লিখে রেখে যাবো। যাও তো এক কাপ চা করে আনো দেখি। বাপস রে! এর থেকে গাড়িতে নিয়ে গেলেই হতো।

বলেছিলুম তো। এই বেলা বারোটায় চা?

—কেন? রাত দুটোয় নিউট্রামূল তৈরি করতে পারো—

—রাত দুটো নয়। একটা। ছোট মেয়ে শুধরে দেয়।

—আর অসময়ে খাওয়াবার ফলটাও তো চোখে দেখলে! বড় মেয়ে মন্তব্য করে।

—তোমাদের যত এনার্জি সব জীবজন্তুদের বেলায়— আমি কিছু বললে হাত পা নড়ে না—

—ছি ছি মা, তুমি কুকুরছানাটাকে হিংসে করছো?

—তা করছি। আমি যখন বুড়ো হবো, তখন তোমাদের এই মনগুলো কোথায় চলে যাবে কে জানে?

—দিম্মা তো বুড়ো হয়েছেন। তোমার মনটা কি কোথাও চলে গেছে? এতক্ষণ ফোন করল কে?

এমন সময়ে ওপর থেকে মার গলা পেলুম—"খুকু! মেয়েদের নিয়ে ওপরে আয় দিকিনি এইমূহূর্তে। মুসম্বির রসগুলো পড়ে পড়ে তেতো হতে লাগলো—বেলা বারোটা বাজে! ভোর থেকে কেবল একটা মরা কুকুর নিয়ে নেত্য করছিস? আমি তো একটা বুড়ো মানুষ, আমার প্রতি কি তোদের দয়ামায়া হয় না রে?"

হুড়মুড়িয়ে ওপরে ছুটি পাল্লা দিয়ে তিনজনে—মা ক্ষেপে গেলে সর্বনাশ, জীবে দয়া বেরিয়ে যাবে প্রত্যেকের।
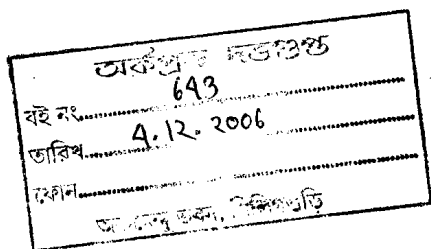
স্বপন, নমিতা, মিলিন্দ-কে

হাওয়া-ই-হিন্দ

"বার বার অত যাওয়াই বা কেন, বারবার বাক্সপ্যাঁটরাগুলো খোওয়ানোই বা কেন? একেবারে কলকাতা থেকে না বেরুলেই তো সবদিক রক্ষে হয়।"

এতবড়ো দুঃসংবাটা শুনে স্বয়ং মামণি যখন এহেন অকরুণ মন্তব্য করলেন তখন চোখের জল বাঁধ মানতে চাইল না। এতদিন ধরে বিদেশ-বিভুঁয়ে তো গুচ্ছের হেলাচ্ছেদ্দা সহ্য করতেই হয়েছে, স্বদেশে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেও কিনা এই সমবেদনার নমুনা? নিম্নগামী চিরস্রোতা স্নেহেরই যদি এই চেহারা হয়, তবে অল্পস্বল্প রিপু/টিপু ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্যের কারবার যেখানে আছে, যা নাকি লকলক করে ঊর্ধ্বগামী, বা সর্বত্রগামী, সেইসব সম্পর্কগুলোর তবে কেমনধারা চেহারা হবে? কে জানে!

একটা ব্যাপার একদম নিশ্চিত, যে আবার আমার সুটকেস হারিয়ে গেছে শুনলে এবারে কারুর কোনো দুঃখ হবে না, মুখে হয়তো কেউ কেউ বলবে—"ওমা, সত্যি? ঈশ, কি কাণ্ড! চুক-চুক-চুক—এয়ারলাইন্সগুলো আজকাল যা তা হয়েছে—" কিন্তু মনে মনে সকলেই ঐক্যতানে গাইবে—"বেশ হয়েছে। খুব হয়েছে! যেমন যাওয়া! গেছলে কেন? যাও না, আরও যাও?"—থাক্, কাউকে বলে কাজ নেই। খুঁজে এনে তো দিতে পারবে না কেউই। বেশ, আমার ক্ষতি হয়েছে জানিয়ে তোমাদের ওটুকু উপকার করবো না আমি। কেনই বা মনের আহ্লাদ বাড়াবো আমি তোমাদের? তার চেয়ে, থাকো তোমরা মন-গড়া ভাবনা নিয়ে বসে।—"না জানি কত কি ফরেন ইম্পোর্টেড মালপত্তর নিয়ে এসেছে নবনীতা। ঈশশ...গুচ্ছ গুচ্ছ নাইলন শাড়ি, ডজন ডজন টেরিলেন শার্ট,...তাড়া তাড়া ব্লু জীনস...থলে থলে লিপস্টিক আর কার্টন ভরতি পারফিউম।" ভাবোই না তোমরা। দ্যাখোই না তোমরা মনশ্চক্ষে—আমার কাঁধের হাতব্যাগের থেকে বেরুচ্ছে গণ্ডা গণ্ডা ক্যামেরা, ক্যালকুলেটর, রেডিও, ক্যাসেট, টেপরেকর্ডার। ইলেকট্রনিক হাতঘড়ি, বোতল বোতল ব্রাণ্ডি-হুইস্কি-শ্যামপেন। বেশ! তাই হোক। যা ইচ্ছে করে তাই ভেবে নিয়ে কষ্ট পাও তোমরা, যারা হিংসুটে, যারা আমাকে ভালোবাসো না। আমার যে এদিকে পরনের শাড়িটি ছাড়া সর্বস্ব চলে গেছে মহারাজা এয়ারওয়েজের খপ্পরে, সেটি ফাঁস করে আমি তোমাদের প্রাণের আরাম আর আত্মার শান্তি বাড়তে দেব না, যাও।

এইরকম নীচস্যনীচ কথাবার্তা ভেবে, মনস্থির করে ফেললুম, শীতল শয়তানের মতো এবার নিস্পৃহ থাকবো। যে যা বলবে, শুধু তারই জবাব দেব। সেধে কাউকেই আমার সুটকেস হারানোর দুঃখটা জানাবো না। যে স্নেহময়ী মামণি আমাকে এত ভালোবাসেন, আমার জন্যে আলাদা কত কাণ্ড করে বড়ি, আচার তৈরি করে দেন, তাঁরই যখন এরকম অনীহা! মনস্থির করবার খানিকক্ষণ পরেই রুনুদি এলেন।—

"কি রে? কবে ফিরলি? সাতদিন আগেই ফেরবার কথা ছিল না? একবার বিদেশ গেলে আর বাড়ি-টারি ফিরতে ইচ্ছেই করে না বুঝি?"

শুনলুম উত্তরে আমি বলছি—কাতর এবং উত্তেজিত গলায়, "দেরি হবে না? দেরি কি আর ইচ্ছে করে? ওদিকে আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে যে!"

"কী সর্বনাশ হলো আবার? সুটকেস হারায়নি তো? অ্যাঁ?" হাসতে হাসতে বলেন রুনুদি।

"হ্যাঁ। ঠিক তাই। দুটোই, রুনুদি।"

"দুটো মানে?"

"দুটো মানে দুটো সুটকেসই।"

"হারিয়ে গেছে?" মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে তাঁর।

"লণ্ডন টু নিউইয়র্কের মধ্যে।" আমি আরও গম্ভীর।

"প্লেনের ভেতর? দূরদূর। তুমি এসব নিশ্চয়ই বানাও। একই লোকের বারবার এরকম হতে পারে কখনও? নাও বের করো দিকিনি কী কী এনেছো আমাদের জন্যে।"

"তোমাদের জন্যে কী আর আনবো ভাই, নিজের পরনের শাড়িটা ছাড়া কিছুই তো সঙ্গে ছিল না—"

"সে তো প্রত্যেকবারেই শুনি। যত বাজে কথা। তা, কী করে পাওয়া গেল এ-যাত্রায়? পুজোসংখ্যার জন্য নতুন কোন গল্পটা বানিয়ে আনলে, বল শুনি?"

"যায়নি পাওয়া।"

"যায়নি? অ্যাঁ? সে কি কথা?" মুহূর্তেই রুনুদির মুখ সমব্যথায় ঝুলে পড়লো। নাঃ, সবাই মোটেই হিংসুটে হয় না। এই তো সমব্যথী পাওয়া গেছে।

—"মানে অফিশিয়ালি যায়নি।"

"কী কী ছিল ভিতরে? কাগজপত্তর ছিল কিছু? গয়নাগাঁটি?"

"নাঃ—সেসব ঠিক আছে। ব্রীফকেসটা তো হারায়নি? কাগজপত্তর আমি সর্বদা ব্রীফকেসে রাখি। আর গয়নাগাঁটি তো তেমন পরিই না।"

"তবু ভালো। তা কী কী গেল? কাপড়চোপড়?"

"কাপড়চোপড়, আর ইংলণ্ডে যা যা কিনেছিলুম, সব।"

"কী কী কিনেছিলি?"

"অনেক ঘুরে অনেক খুঁজে কেনা একগাদা ভালো ভালো বই গেল। দালির রেট্রসপেকটিভ এগজিবিশন থেকে কেনা টেট গ্যালারীর স্যুভনির বইটাও গেল। রেয়ার জিনিস। কয়েকটা অফপ্রিন্টও গেল অন্যদের দেওয়া। যাবার সময় প্লেনে কেনা পারফিউমটাও।

"বই যায় যাকগে। বইপত্তর ঢের পাবি। ভালো কাপড় কী কী খোওয়া গেল? পারফিউমটার জন্য কষ্ট হচ্ছে। আহা রে!"

"সেই ব্রাউন টেম্পল শাড়িটা—"

"ঈ-শ। সেই টেম্পল—", দুঃখে রুনুদির বাকরোধ হয়।

"এর চেয়ে যদি আমাকেও ওটা দিয়ে দিতিস। আর? আর কী গেল?"

"তিনটে কাঞ্চিপুরম, একটা বাটিক (ফুলশয্যার সেই হলুদ রঙের, সুমনের সইকরা শাড়িটা)—একটা বেনারসী, দু'খানা কাশ্মীরী শাল—"

"ঈশ—এ-ত! তি-ন তিনটে কাঞ্চিপুরম? কত টাকা লোকসান হলো? বেশ ভালোরকম?"

ও কি? একটু একটু করে রুনুদির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেন? হ্যাঁ, ঠিকই। মুখে স্পষ্টই আহ্লাদ।—

"আর বেনারসী? বেনারসী কোনটা গেল? ব্লু-টা নয়তো? অ্যাঁ? সত্যি? ব্লু-টাই?"—আনন্দে রুনুদির মুখে এখন আলো ঝলমল করছে। দেখে বুকে যেন ছোরা বসে গেল। ঈশ—রুনুদিও এরকম?

"আর ভেবে কী হবে রুনুদি, চলো ওপরে চলো—মামণি চমৎকার পাটিসাপ্টা করেছেন—"

"প্রসূনকে একবার বল"—রুনুদি পাটিসাপ্টা দিয়ে চা খেতে খেতে বলেন—"প্রসূন ঠিক পারবে হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে তোর বাক্সো উদ্ধার করে দিতে।"

"প্রসূনকে কি বলিনি নাকি? ওই তো চেষ্টা-চরিত্র চালাচ্ছে যেটুকু সম্ভব! কিন্তু ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।"

"তবে কি জগদীশকাকুকে একবার লিখবি? উনি তো ওখানেই রয়েছেন।"

"কত হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল? এর ভেতর জগদীশকাকু কী করবেন শুনি? ওখানে থাকলেই বুঝি হলো? শুনবে তুমি ব্যাপারটা কদ্দূর গড়িয়েছিল? শুনলে তো আবার বিশ্বাস করতে পারবে না। আবার বলবে—'এই খালি খালি যতোসব গপ্পো বানাস।' কী না করেছি আমি সুটকেস উদ্ধারের জন্যে? গোড়া থেকে বলি তবে শোনো।"

[কিন্তু আসল ক্ষতিটার কথা তো কাউকে বলতেই পারছি না। মুশকিল সেইখানে। বাক্স-বাক্স করে প্রাণটা বের করে ফেলছি কেন যে, আসলে তো কাঞ্চিপুরমও নয়, বেনারসীও নয়। এ ছটফটানি কিসের জন্যে, তা তো কেউ জানেই না। কোনো

তালিকায় উল্লেখ নেই সেই হারানো বস্তুটার। উল্লেখ করা যাবেও না। এ হলো চোরের মায়ের কান্না]।

২

গণ্ডগোলটা হয়ে গেছে আসলে আগেই। নিউইয়র্কে প্লেনবদল করে লস এঞ্জেলেসে যাব। হাতে ঘণ্টাদুই সময়। লাগেজ কালেক্ট করে কাস্টমস চেকিং করে, অন্য বিলডিঙে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে। এদিকে লাগেজ আর বেরোয় না! প্লেনে এক দাড়িওয়ালা বেহালাবাদকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, সে স্ট্যাটেন আইল্যানডে থাকে, বলেছিল আমাকে লস এঞ্জেলেসের প্লেনে মালপত্তর সুদ্ধু তুলে দেবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কখন যেন সে কেটে পড়ল। আরেক বৃদ্ধ দক্ষিণী, যাবেন মিনেসোটা, তাঁকে ধরলুম। অতবড়ো দুটো বাক্স নিয়ে অন্য এয়ার টার্মিনালে গিয়ে প্লেন ধরা মুখের কথা নয়। বহুক্ষণ সঙ্গ দিয়ে তিনিও শেষটা মার্জনা চেয়ে চলে গেলেন, নইলে তাঁর প্লেন ধরতে পারতেন না। এখনও আমাদের ফ্লাইটের বেশ কয়েকজনের মাল চাতালে আসেনি। এ কী রে বাবা? এমন তো হয় না? একটি শিখ ছেলে দেখছি ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের সহায়তা করছে, হাওয়াই-ই-হিন্দ-এর পোষাকপরা। তাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—"ব্যাপার কী? আমার প্লেন যে চলে যাবে? মাল কখন বেরুবে?" —শান্ত হয়ে যুবকটি বললো—"ক'টায় প্লেন?" টাইমটা শুনে সবিনয়ে জানালো—"ওটা আপনি মিস করেই ফেলেছেন। এখন ধরবার সময় নেই। তাছাড়া এখানে এখন আপনার কিছু করণীয় কাজকর্মও আছে। আপনি কি ভিক্টোরিয়া বাসটার্মিনাসে মাল জমা দিয়েছিলেন?"

ছেলেটি কি হাত গুনতে পারে? জানলো কেমন করে? "আজ্ঞে ঠিক তাই। কি করে বুঝলেন?"

"তাহলে আপনার মালপত্র আসেনি। ওইখানে কমপ্লেন্ট কাউন্টার খোলা হয়েছে। যান, ফর্ম ফিল আপ করুন আগে। তারপরেই নতুন ফ্লাইট বুক করতে ছুটবেন, মনে করে।"

আমাদের এই ফ্লাইটের মালের গোলমালের জন্যে বিশেষ কাউন্টারে ফর্ম দিচ্ছেন শাড়ি ব্লাউজ পরা একটি প্লাস্টিকের তৈরি ভারতীয় নারী। খুব গম্ভীর। একটু রুক্ষ। অথচ কী রংচং কী সাজসজ্জা। ক্ষণে ক্ষণে বেঁটে চুল ঝামরে তুলছেন কপাল থেকে ওপরে। যারাই বাসে করে হীথরো এসেছিলেন, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে মাল চেক ইন করে, তাদের কারুরই মাল আসেনি। কিন্তু থেকে-যাওয়া মালগুলির তালিকা ও রসিদ নম্বর এসে গেছে টেলেক্সে। ছাপানো ফর্মে হারানো মালের জন্যে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। যাতে মাল লোকেট করা সহজ হয়। আমি একা নই। একসারি যাত্রী কিউ দিয়ে ফর্ম ভর্তি করছেন। এক ফরাসী দম্পতিও তাঁদের শিকাগো ফ্লাইট মিস করে ছটফট করছেন। ছুটে ছুটে যাচ্ছেন অন্য লোকদের মালপত্রের দিকে।

আর ফিরে আসছেন কাঁদো কাঁদো মুখে। আমার দুটি মালের একটি টেলেক্স তালিকায় আছে। অন্যটির নো-পাত্তা। এটা কোনটা অবশ্য জানি না। কালো ছোটোটা না বড়ো বাদামীটা। কালোটা পার্থ'র। [বাদামীটাই আমার] মাত্র একটা বাক্স এনেছি অথচ দুটি নিয়ে যাওয়া যায়। ফ্রম দি ইউ. এস. এ. এবং টু দি ইউ. এস. এ. মাল আজকাল ওজন হয় না কেবল গুণতি হয়। টু প্লাস ওয়ান। পীস কনসেন্ট। না ভিয়েৎনামের পীস নয়, মালপত্রের মাথাগুণতি অন্যের বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে যেতে অসুবিধা নেই। এভাবেই গতবারে অঞ্জলিদির বাক্সটা নিয়ে গিয়েছিলাম। এবারে পার্থ'রটা নিয়ে যাচ্ছি ইংলণ্ড থেকে, ভায়া আমেরিকা, কলকাতায় কিন্তু টেলেক্সে যেটার নম্বর নেই, সেটার জন্যে আমাকে আলাদা করে কমপ্লেন্ট ফর্ম ভরতে হলো—ও কমপ্লেন করা যে-সে লোকের সাধ্য নয়। ওই ফর্ম দেখেই লোকে বলবে, "থাক আমার বাক্সে দরকার নেই।" এমনিই জটিল। গোলমেলে। তার জন্য আলাদা এলেম থাকা চাই।—প্রথমে ৫/৬ রকমের সুটকেসের নকশা দেখানো হলো। ১০/১২ রকমের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপগুণ চরিত্র চিত্রণের বর্ণনা পড়ানো হলো। এবার বল কোনটি তোমার? রূপগত বৈশিষ্ট্য, গুণগত পার্থক্য? বিশেষ চিহ্ন? তিল-জড়ুল? আমার যা বে-মালুম স্বভাব। প্রত্যেকটা বর্ণনাই মনে হয়— "ঠিক এইরকম আমারটাও।" কে আর কবে মাল-বিশারদ হবার জন্যে সুটকেসের রূপগুণ মুখস্থ করে রাখে? নিজেরটা যদিও বা জানি, পার্থ'রটা তো ভালো করে দেখিওনি। তার গুণাগুণ কিছুই মনে নেই, কালো, জিকাওলা, এবং আমারটার চেয়ে ছোটো, এটুকু ছাড়া। তার পাশের স্ট্র্যাপ আছে, কি নেই? থাকলে এদিকে, না ওদিকে? হাতলটা চ্যাপ্টা? না গোলালো? প্লেন? না কিরকিরে? সাইডপকেট আছে কি? ক'টা? তাতে জিপ? না বোতাম? চাকা লাগানো? চাকা একজোড়া, না দু জোড়া? "এ কি আমার পাত্রী পছন্দ করছি নাকি? এত খবর কে রাখে?" অমনি প্লাস্টিকের মহিলা এক ধমক লাগান—"নিজের বাক্স নিজেই জানেন না কেমন দেখতে, তো আমরাই বা জানব কী করে কোনটি আপনার?"

"আমার একটা বাক্সের রসিদ নম্বর তালিকায় নেই কেন?"

"আমি জানব কেমন করে? আমিই কি টেলেক্সটা পাঠাচ্ছিলাম, [illegible] থেকে?"

"বাক্সটার কী হবে এখন?"

"সেটাই বা আমি জানব কোত্থেকে? আমার তো কাজ কেবল ফর্ম জমা নেওয়া। আচ্ছা জ্বালাতন করলে তো এরা? যত বাজে কথা!"

"কিন্তু, আমার বাক্স—"

"হায়ার অফিসারদের বল গে যা। এই দ্যাখো নাম ছাপানো আছে। এই ফোননম্বর। এখন যা, ভাগ। নে, সইটা কর। সই করে যা।"

কে বলেছে ইংরিজিতে "তুই" সম্বোধন নেই? ইনি যে ইংরিজিতে 'তুই' বলছিলেন, তা যে-কোনো ভারতীয়ই অনায়াসে বুঝতে পারত। ভয়ে ভয়ে দুটো

ছবিতে "যা থাকে কপালে" বলে টিক্ মার্ক দিয়ে ফর্ম সই করে দিলুম। ছোট্ট ছোট্ট চৌকো চৌকো অনেক খুপরি। ঠিক গ্রাফপেপারের মতন। ঢ্যাড়া আর টিক দিয়ে খসখস করে আধ মিনিটে ভর্তি করে দিচ্ছে মেয়েটাই। আমি তো ভালো করে পড়তেই পারছি না। চশমাটা ফিরে গিয়েই বদলাতে হবে। বড্ড খুদে হরফে লেখা। ফর্ম ভরতি করতেই ঘন্টা উৎরে গেল।

৩

ফর্ম ভর্তি শেষ হতেই আমি কাঁদুনি শুরু করি। " অ মা-জননী, আমার লস এঞ্জেলেস যাবার কী হবে? বাক্সপ্যাটরা সব তো গেল, কানেকটিং ফ্লাইটও মিস হয়ে গেছে- —নেক্সট ফ্লাইটটা আমাকে ধরিয়ে দাও?"

মা-জননী খিচিয়ে ওঠেন—"আমাকে এসব বলে কী হবে? এটা কি ফ্লাইট বুকিংয়ের কাউন্টার, মাথায় কিছুই ঢোকে না দেখছি।"

"কোথায় যেতে হয় তাহলে?"

"কেন, ঐ তো সামনেই আর একটা কাউন্টার রয়েছে।"

"অ মশাই"—নতুন কাউন্টারে গিয়ে সুরু করতেই তিনি বলেন—"এ কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরের কাউন্টারে গিয়ে বলুন যা বলার।" এবার বেরিয়ে যাচ্ছি —অমনি কাস্টমসের লোকটি আটকায়—"বাক্স কই? ক্লিয়ারেন্স হয়েছে?"

"বাক্স ? অল ক্লিয়ার ভাই। বাক্সই আসেনি। আমি এখন ট্র্যাভলিং লাইট।"

"অঃ। যান। আর কিন্তু ঢুকতে পাবেন না।"

"ঢুকবার দরকারও নেই।"

স্মার্টলি চলে যাই। কাস্টমসের এত সহজ ক্লিয়ারেন্স জীবনে হয়নি। বেরুচ্ছি, পেছন থেকে হঠাৎ কে বলল "বুকিং হয়ে গেছে তো?" সেই শিখ ছেলেটা।

"না, এই যাচ্ছি।"

"যান, যান, শিগগিরি—ওকি বাইরে কেন, এখানেই হলো না?"

"বন্ধ হয়ে গেছে।"

বাইরের কাউন্টারে কিউ। আমার টার্ন আর আসে না।

"অ মশাই, শুনছেন? আমি অমুক ফ্লাইটে লণ্ডন থেকে এসেছি, আমার তমুক ফ্লাইটে লস এঞ্জেলেস যাবার কথা, আমার লাগেজ আসেনি বলে ওয়েট করতে করতে ফ্লাইট মিস করে গেছি,—দয়া করে একটু—"

"ভেতরের কাউন্টার। ভেতরের কাউন্টার।"

"ওটা বন্ধ।"

"বন্ধ নয়। বন্ধ নয়। খোলা।"

"ওরাই পাঠিয়ে দিলে এখানে।"

"হতে পারে না। আবার যান। এখানে হবে না। নেক্সট প্লীজ?"

যেদিক দিয়ে বেরিয়েছিলুম সে দরজা দিয়ে ঢোকা যাবে না। যেদিক দিয়ে ঢুকতে হবে, তাতে প্রচুর ঘুরতে হয়। ঘুরে ঘুরে যখন ঢুকলুম, ভেতরের কাউন্টারটাতে যেতে হলে আবার সেই কাস্টমসের দরওয়ানটিকে পেরুতে হবে। সে আটকে দিল।

"আবার কোথায় যাচ্ছেন?"

"টিকিট বুকিং করতে"—

"এই যে গেছলেন বুকিং করতে"—

"ওখানে হলো না"—

"এখন ঢোকা অসম্ভব—একবার বেরুলে—"

"তাহলে কী করব? ওরা বলছে ভেতরে যাও, আপনারা বলছেন বাইরে যেতে, আমি কী করি মশাই, পাগলা হয়ে যাব যে—কেন যে মরতে"...

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, যান তবে পাসপোর্টটা রেখে যান।"

পাসপোর্ট রেখে ফের "বন্ধ" কাউন্টারে দৌড়োই। কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ ভেতরে দাঁড়িয়ে অবসর বিনোদন করছেন। গল্পসল্পের আমেজ, তাকালেই বোঝা যাচ্ছে।

"এক্সকিউজ মি, আমার লস এঞ্জেলেসের"...একসঙ্গে তিনজন হাওয়া-ই-হিন্দের উর্দিপরা স্ত্রী-পুরুষ আমাকে মারতে উঠলেন।—"ইংরিজি বোঝেন না নাকি? তখন থেকে এক কথা বলে বিরক্ত করছেন। বলছি না এ কাউন্টার বন্ধ? বাইরের কাউন্টারে যান?"

"ওরা বলল করবে না। ভেতরে পাঠিয়ে দিল। কেউ একজন প্লীজ করে দিন?"

"দেখেছ, দেখেছ, কী বদ? ইচ্ছে করেই ভেতরে ফেরৎ পাঠিয়েছে। দেখি কেমন করে ওরা কাজটা না করে? হবে না। যান। বাইরে যান। এটা বন্ধ। আচ্ছা, এটাকে ঢুকতেই বা দিল কী করে? আশ্চর্য তো? ইনএফিশিয়েন্সির চূড়ান্ত হয়েছে! শুনুন! উই আর ক্লোজ। প্লীজ গো এলসহোয়্যার। আণ্ডারস্টুড?"

"হোয়্যার এলস?"

"টু দি আউটসাইড কাউন্টার। অ্যাজ উই হ্যাভ অলরেডি টোলড ইউ সেভারেল টাইমস।"—এবারে একটি স্বাস্থ্যবান লোক দাঁতে-দাঁত দিয়ে এমনভাবে শান্ত সুরে কেটে কেটে কথা বললো, যে রীতিমতো মর্মে মর্মে ভয় করলো। হিন্দি ছবির ভিলেনরা এভাবে শান্ত হয়ে কথা বলবার পরেই ঘুষি মারে।

পাসপোর্ট ফেরৎ দিয়ে সাহেব পুলিশটা হাসলো।

"ডান? নট ইয়েট? গুড লাক নেক্সট টাইম।"

৪

আবার সেই কিউ।

এবার কিউ ভেঙে গোড়ায় গিয়ে রেগেমেগে বলি: "ওরা বন্ধ। মিছিমিছি আমাকে দৌড় করালেন। লস এঞ্জেলেসের নেক্সট ফ্লাইটটা—"

"ট্র্যাভলার্স লজ। ট্র্যাভলার্স লজে চলে যান, আপনাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিন। কাছেই। কাল সকাল ৮টায় আসবেন। প্রচুর ফ্লাইট আছে।"

"কী? কোথায় যাব?"

"ট্র্যাভলার্স লজ মোটেল। খুব কাছেই।"

"ইয়ার্কি পেয়েছেন? আপনাদের দোষে একটা মালপত্র নেই, কনেকটিং ফ্লাইট নেই, লস এঞ্জেলেসে আমার বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করে গেলাম—এখন থাকব গিয়ে মোটেলে?"

"খরচা আপনার নয়। চলে যান। একটু রেস্ট করুন। কাল সকালে—"

"খরচা যারই হোক। আমি কি সিধে মোটরে চেপে লনডন থেকে এলুম? হাওয়া-ই-হিন্দ কি মোটরগাড়ির টিকিট বেচেছিল? কিসের জন্যে মোটেলে যাব? ভদ্র এয়ারলাইনস এরকম অবস্থায় পড়লে ফাইভস্টার হোটেলে তোলে, শেরাটন-হিলটনে তোলে"—

"যান না আপনি শেরাটন-হিলটনে। নিজের পয়সায়। কে বারণ করছে—"

"কেন যাব? নিজের পয়সাতে তো সোজা লস এঞ্জেলেস যাচ্ছি—দয়া করে এক্ষুনি কনেকশনটা বুক করে দিন—এটা আপনার আবশ্যিক দায়িত্ব।"

"বুকিং দিন বললেই বুকিং দেয়া যায় না। এখন ইউনাইটেডে কোনো ফ্লাইট নেই।"

"না থাক। আমেরিকানে দেখুন। টি. ডবলু. এ. দেখুন—হাজারটা এয়ারলাইনস আছে"...

"হাজারটা আর দু-হাজারটা যাই থাক, তাতে বুকিং নেই আপনার।"

"দোষটা আপনাদের। বুকিং চেঞ্জ করে দিন অন্য এয়ারলাইনসে।"

"যা হয় না—তা"—

"একশবার হয়।"

"জায়গা নেই।"

"কে বলল? জায়গা করে দিতে হবে।"

"জায়গা হবে না।"

"দেখুন, বাজে কথা বলছেন কেন? আমি তো দেখতেই পাচ্ছি আপনি খোঁজই নিচ্ছেন না। কনেকশন দেবার দায়িত্ব আপনার। আজ আপনাদের দোষেই আমি এখানে স্ট্র্যানডেড হয়ে গেছি।"

"দোষের ব্যাপার নয়। স্ট্র্যানডেড হবার দায়িত্ব আপনারও যতটা, আমাদেরও ততটা। কাউকে ব্লেম করা বৃথা।"

"আমার দায়িত্বটা কি রকম? হ্যাঁ, একটা অবশ্য দায়িত্ব আছে, ভুল করে হাওয়া-ই-হিন্দে এসেছি। মোটেলে আমি যাব না। একটা ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে নিয়ে চলুন।

এবং ওভারনাইট থাকার ক্ষতিপূরণটা দিয়ে দিন।"

"কিসের ক্ষতিপূরণ?"

"আমি নিয়ম জানি না ভেবেছেন? রাত্রিবাস, বাথরুমের স্লিপার, মাজন-সাবান-বুরুশ ইত্যাদি, তোয়ালে, সোয়েটার, একপ্রস্থ বিজনেস স্যুট—সবকিছুই আপনাদের দেবার কথা। এক্ষুনি। কই, দিন?"

[এরা যে লং ট্র্যাভলে সত্যি বেরোয় কী করে? হাতে একটা ওভারনাইট কেসও রাখেনি?] "কি? এখন চাইছেনটা কী? 'সাম ডো?' মালকড়ি? জেনে রাখুন এখন ওসব হবে না। কাল সকালে অ্যাকাউন্টস ওপন করলে আসবেন। অন্য লোকে ওসব ব্যাপার দ্যাখো। আমি না। কিন্তু কাল আপনাকে স্যুটকেসই দিয়ে দিচ্ছি আমরা।"

"ওসব লম্বা বাক্য ছাড়ুন। আমি সব নিয়ম জানি। ক্ষতিপূরণ হাতে হাতে দেবার কথা। আগেও আমার বাক্স কি হারায়নি নাকি? সাত বছর আগে আমেরিকান এয়ারলাইনস ইন্টারনাল ট্রাভলেই পঁচিশ দিয়েছিল, রাত বারোটার সময়ে। এখন, ইন্টারন্যাশনালে রাত নটায় কেন দেবেন না শুনি? অন্তত পঞ্চাশ তো নিশ্চয়ই হয়েছে—ক্ষতিপূরণের নতুন অঙ্কটা সাত বছরে বেড়েছে নিশ্চয়?"

"ডলার কি গাছে ফলে ম্যাডাম? আর হাসাবেন না। যান, ট্র্যাভেলার্স লজে চলে যান—"

"একটা সস্তা স্লিপিং স্যুট বারো, সস্তা হাউসকোট আঠারো, চটি—পাঁচ ছয়, সস্তা মাজন সাবান বুরুশ চিরুণী—চার, আণ্ডার গারমেন্টসের চেঞ্জ এক সেট আঠারো, তোয়ালে প্রভৃতি দশ, বিজনেসসুট বাদই দিচ্ছি—কত হলো? ষাট-সত্তর? তাও তো অন দ্য স্পট মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টসের তালিকা এতেই শেষ হয়নি—আরো আছে—"

"কেন বাজে বকছেন? অ্যাকাউন্টস বন্ধ হয়ে গেছে। শুনলেন না?"

"এটা অন্য অ্যাকাউন্ট। এত লোকের এত ব্যাগেজ আসেনি, একটা নতুন কাউন্টারই খুললেন, অ্যাকাউন্টেরও নিশ্চয় নতুন কাউন্টার খোলা হয়েছে। টাকা আমি চাই না, জিনিসপত্তরগুলো কিনে দিন। আর এগুলো রাখবার জন্যে একটা ওভার নাইট কেস! তিরিশ। এই ধরুন একশো মতন লাগবে।" ভদ্রলোক প্যান্টের দুই পকেটে দুই হাত ভরে, পাইপটা কামড়ে দাঁতের ফাঁকে হেসে বললেন, "ম্যাডাম, ইউ আর ওয়েস্টিং মাই টাইম। নট আ সেন্ট। নট আ ফার্দিং। আই ক্যান গিভ ইউ নাথিং। চাপ দিয়ে লাভ নেই। হাওয়া-ই-হিন্দ আপনাকে কিছুই কিনে দিতে বাধ্য নয়।" তারপর পাইপ সরিয়ে বলেন, "চলে যান, মোটেলেই তোয়ালে সাবান দেবে। বাকীগুলো ছাড়া এক রাত্রি দিব্যি চলে যায়। অ্যাটাচড শাওয়ার। হাউসকোট দিয়ে কী হবে? আর আমার তো শার্ট প্যান্ট পরেই দিব্যি ঘুম হয়। শাড়ি তো আরো কমফরটেবল গারমেনট।"

"আপনিই বরং এবার থেকে শাড়ি পরে কমফর্টেবলি ঘুমোবেন।—আমি এক্ষুনি লস এঞ্জেলেস চলে যেতে চাই, কনেকশনটা করে দিন। দেখি, বরং সেখানে গিয়ে যোগাড় করব ক্ষতিপূরণ।"

"কনেকশন নেই। আর দেরি করলে ট্রাভেলার্স লজেও বুকিং পাবেন না।"

"ঐ এ-বি-সি গাইডটা একটু দেখি তো?"

"নট ফর দ্য প্যাসেনজারস। স্যরি।"

"নিজেও কনেকশন করে দেবেন না? আমাকেও খুঁজতে দেবেন না? যত দেরি করছেন—তত ওদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছে না?"

"না। ওটা পশ্চিম। ওখানে দেরিতে রাত হয়।"

ভদ্রলোক অন্য কাজে মন দেন।

নাঃ, আর 'আয়রণ উওম্যান' ইমেজ থাকছে না। এবার আমি কাতর হয়ে পড়েছি মনে মনে।

"কেন মিছিমিছি এত ঝামেলা করছেন ভাই, বলুন তো? লং জার্নি করে এসেছি, বাক্সটাক্স সব হারিয়ে গেছে, সামনে আরেকটা লং জার্নি, কেন বাজে ঝুট-ঝামেলা করছেন? দিন মশাই, কনেকশনটা করে দিন—", ঠিক তক্ষুনি, "একি! আপনি এখনও এইখানে?" একটি বিস্ময়বিদীর্ণ ধ্বনি কানের কাছে বাজলো।

৫

সেই শিখ ছেলেটি।

কেনেডি এয়ারপোর্টের এই ট্র্যাজিডিতে যে বারবার ভগবদ-প্রেরিত দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

"এখানে কী করছেন? লস এঞ্জেলেসের প্লেন যে সব বেরিয়ে গেল—আরো দেরি করলে আজ যেতেই পারবেন না—ইশ! চলুন চলুন, দেখি সাড়ে ন'টা নাগাদ একটা ফ্লাইট আছে বোধহয়—কিন্তু আমেরিকানের না ইউনাইটেডের ঠিক মনে পড়ছে না—", কথা বলতে বলতেই, সামনের টেলিফোনের সুরেলা বোতামগুলো টিপতে থাকে ছেলেটা—"হ্যালো, ইউনাইটেড?" দু-চারটে কথা হয়, তারপরেই প্রচণ্ড একটা তাড়া পড়ে যায় আমাকে ঘিরে—হঠাৎ হাত থেকে ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়েই ছেলেটা দৌড়ুতে থাকে। আমাকেও প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে—"ছুট ছুট ছুট—সময় নেই একটুও—আমাদের অন্য টার্মিনালে যেতে হবে—পথে ট্যাক্সি ধরতে হবে—" বলতে বলতে সে আগে আগে ছোটে, পেছন পেছন কোঁচা ধরে হাইহিল খটখটিয়ে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে আমিও ছুটি, চেঁচাতে চেঁচাতে।

"কিন্তু আমার কাছে যে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই—আগে ব্যাংকে, আগে ব্যাংকে—।"

"ব্যাংক পরে হবে—আগে প্লেন—।"

কেনেডি এয়ারপোর্টের সব চোখ মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় এই অপরূপ শোভাময় যাত্রার দিকে। ছুটে বাইরে বেরিয়েই যে-কোনো একখানা লিমুজিন থামিয়ে চট করে ছেলেটা দোর খুলে আমাকে ঠেলে ভেতরে পুরে দেয়, নিজেও ঢুকে প্রায় আমার কোলের ওপর বসে পড়ে শোফারকে বলে—"ইউনাইটেড, জলদি" —লিমুজিনটায় অন্য কোন একটা এয়ারলাইনের নাম ছিল। শোফার হাসতে থাকে। পিছনের সীটে বসা তার যাত্রীরাও। ছেলেটার কানে হাসি-টাসি ঢুকছে না। উদগ্রীব হয়ে বসে আছে আমার ব্রীফকেসটা বগলে চেপে। "টিকিট বের করুন, টিকিট" —বলতে বলতে ইউনাইটেডের বাড়ি এসে যায়। নেমে, একগাল দেঁতো হেসে লিমুজিনওলাকে ধন্যবাদ দিয়েই সে আমাকে নিয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢোকে—"সোজা এই পথে দৌড়ে যান, অমুক নম্বর গেটে গিয়ে টিকিটটা দেখান, আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে আসছি—এই নিন ব্রীফকেসটা—।"

আমার মুখের অবস্থা দেখে তার কী মনে হয়, পিঠে হাতটা রেখে, মিষ্টি হেসে বলে—"সব ঠিক হো জায়গা। ডরনেকা কুছ নহী হ্যায়—আইল বি ব্যাক ইন আ মিনিট—।"

কান্নার স্বভাব কুকুর জাতীয়।

প্রশ্রয় পেলেই কান্না চোখের মাথায় চড়ে বসে।

ছুটলুম অমুক নম্বর গেটের দিকে।

বাপ রে বাপ। এয়ারপোর্ট বটে একটা! এক একটি টার্মিনালই এক একটা নেতাজী স্টেডিয়াম। একগেট থেকে আরেক গেটে যাওয়া মানে নেতাজী স্টেডিয়ামের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি দৌড়ে পার হওয়া। বুড়োমানুষ হলে কী করতুম কে জানে?

হাঁপাতে হাঁপাতে যাকে টিকিট দেখালুম, সে হেসে বললে—"রিল্যাক্স। সীট খালি নেই। ওয়েটিংয়ে রাখছি তোমাকে। কেউ যদি নো শো হয় তখন যেতে পারবে।"

বসে আছি তো বসেই আছি।

এত তাড়াহুড়ো করে এসে কী লাভ হলো? প্লেনও বসে আছে। একে একে অন্য অন্য জায়গার প্লেনগুলো ছেড়ে দিল। ঘর এখন প্রায় খালি। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করি—কিছু হলো?

সে হাসিমুখে বলে—এখনো না।

পাগড়ীর চিহ্ন নেই।

বুঝতেই পারি, পালিয়েছে। আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যখন দেখেছে হলো না, তখন লজ্জায় পালিয়েছে। এসে করবেই বা কী সে? জায়গা তো হলো না। এখন আমি কোথায় যাবো? ব্যাংকে। টাকা ভাঙাবো। ব্যাংক কি খোলা? তারপর ট্র্যাভলার্স লজে? নাকি বন্ধুবান্ধবদের ফোন করে দেখবো, কে কে আছে। এইটে

সামারের মুশকিল, কেউই থাকে না শহরে।

এবার এঞ্জেলেসের ফ্লাইট ঘোষিত হলো। ডাক শুরু।

হলো না। আমার যাওয়া হলো না আজ। এটাই নিউ ইয়র্ক থেকে শেষ প্লেন। শিখ ছেলেটাও কেটে পড়ল? "ম্যানেজারের ঘরে যাচ্ছি" বলে চলে গেল। এটাতেই বড়ো বেশি মর্মাহত লাগছে। কেননা মুহূর্তের জন্যে ওকে মনে হয়েছিল, আমার স্বজন। মানুষ সত্যি আজকাল বড্ড সামান্য হয়ে গেছে, বড়ো তুচ্ছ।

এসে বলে তো যেতে পারতো, "স্যরি, পারলুম না?" আসলে কেউ কারুর জন্যে কেয়ার করে না। জগৎটাই এইরকম হয়ে গেছে। সবাই এক। ক্যালাস। স্বার্থ না থাকলে, কিছু করে না। হেনকালে এ কী হেরি?

ছুটন্ত একটি পাগড়ি। হাসিমুখে হাত নাড়ছে। সোজা কাউন্টারে গিয়ে কিছু বলল, তারপর আমার কাছে এসে আবার বলা নেই, কওয়া নেই, ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "—ভেরি স্যরি। কিছুতেই ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না। ফুললি বুকড —অবশেষে পেরেছি। যাক বাবা, লাস্ট ফ্লাইট ফ্রম নিউ ইয়র্ক আজ এটাই—।" ততক্ষণে আহ্লাদে ছেলেটাকে জাপ্টে ধরেছি আমি।

"আরে আরে করেন কি! করেন কি।"

তুমি কী করেছো, তা মুখে তো বলতে পারলুম না। আরেকটু হলেই ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল আমার। লাস্ট ফ্লাইট ফ্রম নিউ ইয়র্কই তো কেবল নয়, আরেকটাও খুব জরুরি ফ্লাইট ধরিয়ে দিয়েছো যে ভাই! যার গন্তব্য সুদূর বিস্তার, অনেক গভীরে, অন্তর্লীন ভবিষ্যতের মধ্যে সেই যাত্রা। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।

"আপনাকে কেউ নিতে আসবে তো?"

"এসেছিল নিশ্চয়। আমার তিন বোন। ফিরেও গেছে নিশ্চয়।"

"তবে? এখন কী করা? পয়সা ভাঙানোরও তো আর সময় নেই। এটা তো আবার পৌঁছুবে গিয়ে ইন্টারনাল টার্মিনালে, সেখানে ব্যাংক খোলা না থাকতেও পারে।" সত্যি সত্যি চিন্তিত দেখায় তার তরুণ মুখ।

"এঞ্জেলেসে নেমে বাড়িতে ফোন করতে হলেও তো পয়সা চাই", পকেট থেকে একমুঠো খুচরো বের করে সে আমার হাতের মুঠোতে গুঁজে দিতে যায় —"এগুলো রেখে দিন—"

"কি মুশকিল, আমার দরকার নেই—।"

"যদি নেমে ফরেন কারেন্সি ভাঙাতে না পারেন? যাচ্ছেন মাঝরাতে। ব্যাংক বন্ধই হয়ে যাবে ততক্ষণে। এটা তো ইন্টারন্যাশনালে যাচ্ছে না—অত রাত্রে ট্যাক্সি করে একা মেয়েদের যাওয়াটাও লস এঞ্জেলেসে খুব নিরাপদ নয়। কেউ যদি নিতে আসতো—।"

"তুমিই একটা ফোন করে দাও না ভাই আমার বোনকে?"

"গ্রেট! সেই-ই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। তিনঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয় খবরটা দিয়ে দিতে পারবো।

দেখি নম্বরটা।" ফোন নম্বরটা হাতের পাতায় লিখে নিতে নিতে চোখ তুলে ছেলেটি বলে—"ডোণ্ট ওয়ারি, যদি ফোনে আপনার বোনেদের নাও পাই, তবুও সামবডি উইল বি দেয়ার। আপনার নম্বরটা না পেলে আমার কাকাকেই বলে দেবো—কাকা-কাকীও লস এঞ্জেলেসে থাকে—নামটা ডাকটর দেও সেন তো? সামবডি উইল টেক চার্জ অফ ইউ দেয়ার অ্যাট দি এয়ারপোর্ট!" ধবধবে হাসে ছেলেটা—সিকিউরিটির দরজায় ঢুকতে ঢুকতে ওর হাত থেকে ব্রীফকেসটা নিই—শেষ মুহূর্তে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি—"তোমার নাম কী ভাইয়া?"

"বেদী। বেদী ইন দি এয়ার ট্রাফিক..."

৬

নেমে দেখি ভগ্নীদ্বয় খেপে লাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে আবার খুদে ভগ্নীটি, রিনিও হাজির। নামবামাত্র প্রথম বাক্য—

"প্রত্যেকবার? প্রত্যেকবার সুটকেস হারিয়ে আসবে? ফ্যাণ্টাস্টিক!"

"ইচ্ছে করে হারিয়েছি নাকি? কিন্তু তোরা জানলি কী করে?"

"একমাত্র তোমারই অনবরত এমন হয়। এত লোক তো আসে, কারুর তো হারাচ্ছে না?"

"কেন? প্রসূনেরও তো হারিয়েছিল?"

"সেও তোমার মহারানী এয়ারওয়েজেরই দৌলতে।"

"পেয়ে তো গেছল শেষপর্যন্ত। অনেক ঝঞ্ঝাট করে।"

"তুমিও তো পাও পেশ অবধি। আমসত্ত্ব-টত্ত্ব সবসুদ্ধুই। কিন্তু বেড়ানোর মেজাজটা মাটি!"

"দুটোই গেছে রে এবার। দুটো বাক্স ছিল।"

"আমাদের আমসত্ত্ব ছিল?"

"ছিল।"

"বেদী বলে একটা লোক ফোন করেছিল নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট থেকে—বলল, তোমার বাক্স আসেনি বলে পর পর প্লেন মিস করেছ। জার্নি ডিলেইড—এই ফ্লাইটে আসছো, সঙ্গে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই—লোকটাকে বেশ ভালোমানুষ বলে মনে হলো—অতি অবিশ্যি এয়ারপোর্টে থাকতে বলল কাউকে।"

"এত কথা বলেছে ছেলেটা?"

"আরও বলে দিল তোমার কাছে কমপ্লেন্ট-ফর্মে নাম-ঠিকানা-ফোন-নম্বর সব দেওয়া আছে, নিউ ইয়র্কের হাওয়া-ই-হিন্দের অফিসে টেলিফোন করতে হবে—কলেক্ট কল করলে পয়সা লাগবে না, ফোনে খোঁজ নিতে হবে বাক্সোর কী হলো। এল কিনা।"

"আশ্চর্য তো! ছেলেটা কটা মিনিটই বা দেখেছে আমাকে?"

"তারই ভেতর বুঝে নিয়েছে তুমি কী অপরূপা বস্তু। বয়স কত?"

"কার?"

"তোমারটা জানি। সেই বেদী ব্যক্তিটির?"

"কত আর? তোদের থেকেও ছোটো, খুবই ছেলেমানুষ—"

"তাই এখনও এতটা ওয়ার্মি আছে আর কি।"

"কিন্তু আরেকটাও লোক ছিল, বুঝলি? অতি পাজী, সে না—?"

"বয়েস কত?"

"এই পঁয়তাল্লিশ?"

"ওটা পেজোমিরই বয়েস, দিদি!"

সকালে উঠেই খুকু বললো, "দাও কমপ্লেন্ট ফর্মটা আর টিকিটটা। আগে কয়েকটা জেরক্স কপি করে নিই। এক্ষুনি তো দু' একটা হারিয়ে ফেলবে। তাহলেই সব গেল। মালের রসিদ দুটো আছে? তারও জেরক্স কপি করানো দরকার।"

রুঙ্কু বললো, "দুখানা বাক্সই হারিয়ে এলে? নাঃ, তোমার সত্যি এলেম আছে। চলো, কিছু দরকারী জিনিসপত্তর কিনে দি তোমাকে যা যা লাগে। এবারে আর অক্সফ্যামে বা স্যালভেশন আর্মিতে নয়, ভালো দোকানে চলো।"

জমানা বদল গয়া। গতবারে যখন বাক্স হারালো, তখন ওরা ছোটো। ছাত্র। কিছু পয়সাকড়ি নেই। আর এখন? মান্যগণ্য ভদ্রলোক। চাগরি বাগরি করছে, রোজগারপাতিও মন্দ নয়—সারি সারি ফুলন্ত ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার বীথিতে ছবির মতন লাল টুকটুকে বাংলো বাড়িটি নিজেদের পয়সায় কেনা। তাতে সিল্কের রুমালের মতন সবুজ একটুকরো ঘাসজমি পাতা, শ্যাওলামাখা পাথরের ফোয়ারা আঁটা। গ্যারাজে আবার দু' দু'খানা গাড়ি। অবশ্য মনীষার কাকুর মতন এখনও নয়। মনীষার কাকুর একটা গাড়ি বাইরে পড়ে থাকে। মনীষা বললো, "কাকু, সাদা গাড়িটা বাইরে কেন?"

"গ্যারাজে যে জায়গা নেই রে।"

"কেন? কী ভরেছো গ্যারাজে?"

"আবার কী? দামী গাড়িগুলো।"

"চেহারা দেখে ওটাও তো বেশ দামী গাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। অমন লম্বা ফিনফিনে দেহ, আবার কনভার্টিবল ছাদ—কী গাড়ি ওটা?"

"ওটা? ক্যাডি।"

"আঁা? ক্যাডিলাক হচ্ছে গিয়ে তোমার শস্তা গাড়ি? অন্যগুলো তবে কী কী?"

"একটা মার্সিডিস, অন্যটা", একটু লজ্জা পেয়ে কাকু বলেন, "রোলস।" এখন, তাঁদের হলো গিয়ে 'ভ্যানডারবিলট' জীনসের কোম্পানীতে হংকং থেকে মাল সাপ্লাই-এর ব্যবসা। লণ্ডন-নিউ ইয়র্ক-প্যারিস।

আমার বোনেরা এখনও অতটা এগোয়নি। একজন মাস্টারী, আরেকজন

এঞ্জিনিয়ারী করে। ছোটটার পড়াশুনো শেষ হয়নি। এখন, ওরা তো বললো দোকানে চল। কিন্তু আমি বললুম, "এক্ষুনি কী হবে কিনে?" আজকাল তো সবাই সব সাইজ পরে। তোদের জামাকাপড়েই ক'দিন চালিয়ে দিই। ততদিনে পেয়ে যাবো বাক্সোটাক্সো।"

"তবু হাতে পেয়েছো যখন কিছু, কিনে নাও।"

"কত দিলে?"

"কী দেবে?"

"কমপেনসেশন?"

"কিছু দেয়নি রে হাওয়া-ই-হিন্দ।"

"সে কী গো?"

"যাঃ! হতেই পারে না।"

"হয়েছে। কিছু দেয়নি।"

"হাওয়া-ই-হিন্দ কি খেপেছে?"

"না তুমিই খেপেছো?"

"ওরা খেপবে কেন? যদি না দিলেও চলে, তবে দেবে কেন? টাকাটা হয়তো নিজেরাই নিয়ে নেবে, প্রত্যেক প্যাসেনজারের নামে অ্যাকাউন্ট দেখাবে। প্যাসেনজারেরা কে আর লেগে থাকবে ওই টাকার জন্যে? লোকের টাইম কই?"

"দোষটা দিদিরই। তেমন করে চায়নি আর-কি।"

"তুমি ছেড়ে দিলে কেন? আদায় করে নেওয়া উচিত ছিল।"

"তোমার মতন গা-ছাড়া প্যাসেনজারদের প্রশ্রয় পেয়েই ওদের চোরামি চালাতে পারছে—"

"ওরে! দিল না রে, দিল না। সে বড় কঠিন ঠাঁই। চাইনি কি আর? অনেক করে চেয়েছিলুম। কিছুতেই দিল না। উলটে ট্র্যাভলার্স লজে পাঠিয়ে দিচ্ছিল আরেকটু হলেই—"

"কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছিল?"

"ট্র্যাভলার্স লজে—"

"সেটা কী জিনিস?" রুক্কুর ভুরু কুঁচকে ওঠে।

"মোটেল—"

"মোটেলে কেন?" খুকুর মুখ হাঁ হয়ে যায়।

"হাওয়া-ই-হিন্দের প্যাসেনজারদের ঐখানে সস্তায় বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্টে পাঠিয়ে দেয়।"

রিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসে। "যাঃ। মোটেলে? এয়ারলাইনস? দিদিটা যে কী বলে!"

"হ্যাঁ মোটেলে। আমাকেও দিচ্ছিল, কিন্তু আমি যাইনি।" খুকু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—"রুক্কু, বুঝেছিস ব্যাপারটা? আজকাল যে গাদা গাদা অশিক্ষিত গ্রাম্য ভারতীয় ইমিগ্রান্টস আসছে, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা!"

"ভাগ্যিস যাওনি! বোকা পেয়ে দিদিকেও ঠেসে দিয়েছে তাদের মধ্যে। সবাইকে নিশ্চয়ই ওখানে পাঠায় না। কেবল বোকাদের। ঐভাবে পয়সা বাঁচায়।"

"তাই তো বলছি।"

"কিন্তু এ তো খুবই অন্যায়। একই ভাড়া সবাই দেবে, অথচ দু'রকম সার্ভিস পাবে? এ তো চিটিংবাজী—"

"এই প্লেনটা যদি না ধরতে পারতুম, এতক্ষণে ট্র্যাভলার্স লজে! তার ওপর ট্যাক্সিভাড়া যেত, এবং খাবার খরচ।"

"ভাগ্যিস প্লেনটা ধরতে পেরেছো—! টাকার জন্য ওয়েট করনি?"

"কিসের পরওয়া কর তুমি? ফুঃ—"

"ঠিক! কে চায় ও-ব্যাটাদের টাকা? চল, চল কী কী চাই, সব কিনে দিচ্ছি।"

"কিছু চাই না রে বলছি তো, তোদের পোশাকপত্তরেই আমার চলে যাবে ক'টা দিন—"

"দেখি তো দিদি, হাওয়া-ই-হিন্দের নিউ ইয়র্কের ফোন নম্বরটা—এক্ষুনি কমপ্লেন কর—"

"দিদিকে ফোন করতে দিস না খুকু, সব গুবলেট করে দেবে। তুই নিজে কথা বল—"

"সে আর বলতে? আমিই কথা বলছি, দাঁড়া—এই তো নম্বর, কলিং কলেক্ট —টু ওয়ান টু—"

৭

"হ্যালো, টু ওয়ান টু—ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স—লস এঞ্জেলেস থেকে বলছি, হারানো লাগেজ বিষয়ে—মিস্টার গিজদার আছেন? ও, গিজদারই বলছেন? এটা আপনার নিজস্ব নম্বর? ও। সুপ্রভাত। আমি ডক্টর সেন বলছি," অম্লান বদনে খুকু বললো, "অমুক ফ্লাইটে আমার দুটি কেস গতকাল—কমপ্লেইন্ট নম্বরটা চাই?"

"এই যে—"

"এক মিনিট? হ্যাঁ, ধরে আছি। কী বলছেন? আপনারা বাক্সটা পেয়ে গেছেন? বাঃ। পালোস ভের্দেসের ঠিকানায় পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে? ইউনাইটেড এয়ারলাইনসে খোঁজ নেবো? বাঃ, থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ—শুনুন...হ্যালো? হ্যালো? হ্যালো?...উফ—দিলে কেটে, কথা শেষই হলো না। আচ্ছা লোক তো? অন্য সুটকেসটার কথা মোটে বলাই হলো না!"

"আগে একটাই তো আসুক?" রুক্কু সান্ত্বনা দেয়।

"দেখি ইউনাইটেডে একবার ফোন করে।"

"হ্যালো? ইউনাইটেড? গুড মর্নিং। আপনাদের কার্গো ডিভিশনকে একটু—হ্যালো, গুড মর্নিং। আজ সকালে হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে কি একটি বাক্স ডক্টর সেনের জন্যে পালোস ভের্দেসের ঠিকানায়—কী বলছেন? হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে কোনো বাক্সই আসেনি? কোনো জরুরি মেসেজ? তাও না? ডক্টর সেনের জন্য—? কী বললেন? ডাক্তার-পেশেন্ট কারুর জন্যই কিছু নেই? ধন্যবাদ।"

"হলো তো? নো নিউজ। কি আশ্চর্য। সত্যি। সায়েবগুলো একদম পালটে গেছে, দেশটাই আর হেলপফুল নয়। চেনা যায় না আমেরিকান বলে।—হ্যালো মিঃ গিজদার? ইউনাইটেড বললো ওরা কোনো মেসেজ পায়নি হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে। ভুল বলেছে? লস এঞ্জেলেসে বাক্স পৌঁছে গেছে? বেলা দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে বাড়িতে থাকবো? এখানেই পৌঁছে দিয়ে যাবে? বেশ বেশ। ওঃ, থ্যাংকিউ। থ্যাংকিউ। কিন্তু অন্যটার কী হবে? মানে আমার আরেকটা বাক্সও তো বাকী আছে? নেই? সে কি কথা। [দিদি, নেই বলছে যে?] আরে আছে আছে। আমার কাছে রসিদ রয়েছে তো। নম্বর? এই যে, রসিদ নম্বর—দশ মিনিট পরে? আচ্ছা আচ্ছা, নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার নম্বর? থ্রি ওয়ান টু জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ...হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়িতেই আছি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।"

"দিদি, দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে তোমার লাগেজ পৌঁছে দিতে আসবে। ওই গিজদার খুব হেল্পফুল মনে হচ্ছে—ও নিজেই ফোন করে অন্য সুটকেসটার কথা জানাবে বলেছে। একটু খবর নিয়ে নিচ্ছে।"

দশ মিনিট কেন সারাদিনেই কোনো ফোন এল না। বাক্সোও না। তিনদিনের মধ্যে না। খুকুর সঙ্গে রোজই ফোন হচ্ছে।

"কী? বললেই হলো? দেব না মানে? ট্রেস নেই? নো ট্রেস? তবে সেটার দায়িত্ব কার? আমার? বাঃ, আপনারও না? কী চমৎকার! তবে কি সুটকেসের নিজের?" খুকুর গলা উত্তপ্ত হতে থাকে—

"আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি এখানে। সব নষ্ট হয়ে গেল আপনাদের জন্য। দেখুন মশাই, ওরকম বেলা দেখিয়ে কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি—তিনদিন সারা দুপুর ২-৫ বাড়িতে বন্দী হয়ে আছি। ইউনাইটেড আবার জানিয়েছে, ওদের কোনো ফ্লাইটেই আপনারা কোনো মালই পাঠাননি। দে হ্যাভ রিসিভড নো মেসেজ ফ্রম ইয়ু। নো লাগেজ আইদার। হোয়াট? হুজ লাইং? আই অ্যাম মেকিং ইট অল আপ? আই অ্যাম বিইং প্যানিকি? আ নুইসেন্স? ফর নো রিজন?

"ওয়েল, মাই ডিয়ার মিস্টার গিজদাঘিচাং, লিসিন কেয়ারফুলি, আয়াম গোয়িং টু স্যু ইওর প্যান্টস অফফ ইউ। ইউ হিয়ার মি? ইউ ডোন্ট? আই সী।"

"ও কে, ইউ শ্যাল হিয়ার ফ্রম মাই ল্যইয়ার দেন। রাইট? [খটাস]। অতি পাজী লোক এই গিজদার।"

"ও কি! ও কি! খুকু! ওতে কী জীবনে আর বাক্সো ফেরত পাব ভেবেছিস? হয়ে গেল! যাঃ—জন্মের শোধ—", প্রায় কেঁদেই ফেলি।

"থামো তো দিদি। বাক্সো-বাক্সো করে লাইফ হেল করে দিচ্ছো। জীবনে বাক্সোটাই সব নয়। আত্মসম্মান সবচেয়ে আগে। ব্যাটা আমাকে অপমান করেছে, ব্যাটা অতি দুঃসাহসী। বলে কিনা—"

"যাক গে, পাঁচটা তো এখনও বাজেনি"—রুঙ্কু সান্ত্বনা দেয়, "এসে যেতেও তো পারে আজকে?"

"যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ"—বলেই আমি এক ধমক খাই—

"এখনও ইয়ারকি?"—সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস কথা বলি:

"আর কোনোদিন হাওয়া-ই-হিন্দে চড়বো না।"

"হ্যাঁ, সেটা যেন মনে থাকে।"

"আসলে বাক্সোটায় আমার কিছু জরুরি জিনিস—"

"জরুরি জিনিস ব্রীফকেসে রাখোনি কেন?"

এর উত্তর নেই। সত্যিই ব্রীফকেসে রাখা উচিত ছিল।

৮

সেদিনও এল না। ছ'টা বেজে গেল।

রিনি ঠাণ্ডা মানুষ। চট করে মাথা গরম করে না রুঙ্কুও। তারা দুজনে কনফারেন্সে বসল পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

"অত ধমকাধমকি করলে হবে না, স্বার্থটা আমাদেরই।"

"মিষ্টি করে বলতে হবে। তাতে যদি উদ্ধার হয়।"

খুকু ধমক দেয়—"তুই নিজেই বলগে যা মধুর স্বরে। আমি আর পারব না। গিজতাঘিচাং ব্যাটা আমাকে বলে কিনা মিথ্যেবাদী? নিজে মাইল মাইল লম্বা মিথ্যে কথা বলছে—ব্যাটা চোর—"

আমি বলি, "বেশ তো রঙ্কুই কথা বল না একটু এবারে—"

"আমি বাবা অঙ্ক-কষিয়ে মানুষ, কথাবার্তা বলতেই পারি না! বরং রিনি বলুক—"

"বেশ তো, তোমরা যদি বল, আমিই না হয় একটু দেখি চেষ্টা করে—"

"হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল।"

এটাই লিমিট। রিনিটা একদম গুড়গুড়ে। খুকু রুঙ্কুর চেয়েও অনেক বছরের ছোটো। সেও কিনা আমার চেয়ে নিজেকে বেশি এফিশিয়েন্ট বলে বিশ্বাস করে!

রিনিই ফোন করল এবারে, তার কচি গলায় "হ্যালো—ও? ইজ দ্যাট মিস্টার গিজদার? গুড মর্নিং মিস্টার গিজদার। হাও আর ইয়ু দিস মরনিং? স্যরি অ্যাবাউট ইয়েস্টারডে। মী? ওঃ, চিনতে পারছেন না? আশ্চর্য—ডক্টর সেন! ফ্রম লস এঞ্জেলেস।

রিমেমবার? মাই ভয়েস? ও, ইয়েস। হাউ রাইট ইউ আর। হ্যাঁ, গলাটা বড্ড ভেঙে গিয়েছিল ক'দিন, ইন দ্য স্ট্রেস অ্যানড স্ট্রেইন অফ লিভিং উইদাউট মাই বিলংগিংস আই সাপোজ, তা, বাক্সোদুটোর কী হবে? একটা ব্যবস্থা করুন? ইউনাইটেড থেকে তো কালও দেয়নি। আজও বলছে কোনো বাক্সো বা মেসেজ আপনারা ওদের দেননি। অন্য বাক্সোটার খবর পেলেন? পাচ্ছেন না? ওটার জন্য তবে কমপেনসেশনটা দিয়ে দিন। কত? চল্লিশ ডলার? মাত্র? সেকি কথা। প্রতি কেজিতে বিশ ডলার?

কি বললেন, দু' কেজি? অন্য সুটকেসের ওজন ছিল দু কেজি। এটা আপনি কী বলছেন? বত্রিশ ইঞ্চির সুটকেস, খালি অবস্থাতেই ওজন অন্তত ছ' কেজি তো হবেই। এটা মালপত্রে ভর্তি ছিল।

—কী? মোট মালের ওজন লেখা আছে বিশ কেজি? একটাই আঠারো? যেটা পাঠিয়েছেন? অতএব অন্যটা দুই হতে বাধ্য?

পাগল হয়েছেন নাকি? বললেই হলো যা খুশি। এটা কি মগের মুলুক! আপনার উপরওলাকে ডেকে দিন। হবে না? ব্যস্ত? নামটা বলুন। এবার ফোন নাম্বারটা দিন। ঠিক আছে। গুডবাই। উঃ, কী অ্যাবসার্ডলি বজ্জাত এই লোকটা দিদিভাই।"

"কী? হলো? মিষ্টমধুর সম্ভাষণে কাজ কিছু এগুলো?"

"একবার লোকটাকে আই শ্যাল স্যু ইওর প্যান্টস অফফ বললে কি আর তাকে দিয়ে কাজ এগোয়?"

"বেশ তো আই শ্যাল কিস ইওর ফেস ক্রিমসন, বলেই দ্যাখ না।"

"আসলে লোকটা ভালো নয়। নইলে এত শত্রুতা করবে কেন? ওর লাভ কী হচ্ছে এতে? জাস্ট ম্যালিশাস ডিলাইট? আশ্চর্য সত্যি।"

এদিকে আমার যে ক্ষতিটা হলো, সে লোকসান তো চল্লিশ ডলারে অথবা চারশো ডলারেও মাপা যাবে না। কিন্তু একথাটা বলাও যাচ্ছে না কাউকেই—খালি বুক ভেঙে চোখে জল এসে যাচ্ছে, আর ওরা ভাবছে শাড়ির জন্যে দিদি কেঁদে ভাসাচ্ছে—

৯

"হ্যালো, ইউনাইটেড? সুপ্রভাত। ডক্টর সেন বলছি। আই বিলীভ দেয়ার ইজ আ সুটকেস ফর মি ফ্রম, হাওয়া-ই-হিন্দ—"

"প্লিজ ডু নট বিলীভ ইন সাচ রিউমারস। আমাদের কাছে কারুর কোনো সুটকেস নেই—"

"কিন্তু আমি যে শুনেছি ৮ই এসেছে? পাঁচ নম্বর ফ্লাইটে, নিউ ইয়র্ক থেকে—? প্লিজ একটু খুঁজে দেখুন না?"

"অনেক কিছুই শুনতে পাওয়া যায় জগতে ডক্টর সেন। গুজবে কান দিতে নেই। আর এই নিয়ে একশো তিরাশীবার আপনি আমাদের ফোন করলেন।"

"দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। কিন্তু একটু যদি খুঁজে দেখতেন?"

"যথেষ্ট খোঁজা হয়েছে। আপনি কি ভেবেছেন খুঁজে না দেখেই আমরা উত্তর দিচ্ছি? এতই দায়িত্বহীন আমরা?"

"না-না, তা-কেন, তা-কেন, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। নেই তা'হলে? কিছুই আসেনি বলছেন? আমি দুঃখিত। বা-ই।"

"আচ্ছা।"

"আচ্ছা দিদি এটা কী? সত্যি দিদি, এসে অবধি কেবল সুটকেসের ধ্যান-ধারণায় রইলে? কিছু দেখলে না, বেরুলে না, রোজ সকালে উঠে নিউ ইয়র্কে নিয়ম করে কালেক্ট কল করা, আর সারা দুপুর—'এই বুঝি বাক্সো আসে—' বলে ঘর আগলে বসে থাকা। রবার্ট ব্রুসের বড় বোন তুমি ভাই, তোমায় নমস্কার করি।"

"এই করে হপ্তা ঘুরে গেল, না পেলে একপয়সা কমপেনসেশন না একটাও বাক্সো। এর মানে কী?"

"এ-যাত্রা তোমার নিশ্চয় ত্রয়স্পর্শে যাত্রা ছিল। অযাত্রা।"

"সঙ্গে আচার, ডিম কি কলা এনেছিলে কি?"

"বেস্পতিবারের বারবেলায় লণ্ডন ছেড়েছিলে কি?"

"ইয়ারকি মারিসনি বলছি। প্রত্যেকের তো এলেম দেখলুম। কেউ কিছু পারলি? আমি ইচ্ছে করে ঘরে বসে আছি? আমার বাক্সো—"

"কে কী পারবে? হাওয়া-ই-হিন্দ তোমাকে যে-মোগলাই ট্রিটমেণ্ট দিচ্ছে, সেখানে আমরা তো কচুকাটা হয়ে যাচ্ছি—"

"বাপু-বাছা করেও হচ্ছে না। শালা-শূয়োরের বাচ্চা বলেও হচ্ছে না। ওরা একেবারে চোখের চামড়াকাটা দিদি। তুমি বরং নিউ ইয়র্কে চলে যাও—"

"গিজদার নিশ্চয় সেই লোকটা, যাকে আমি এয়ারপোর্টে দেখেছিলুম। যে আমাকে প্লেনের কনেকশন পর্যন্ত দিচ্ছিল না, কেবল ট্র্যাভেলর্স লজে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। সেই অতি পাজীটাই—"

"ওর বসের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে হবে। সত্যি সত্যিই পাওয়ারফুল পোস্টে যারা থাকে, তারা ছোট ব্যাপারে এমন হাতের সুখ করে নেয় না।"

"ফোন করেই দ্যাখো না। তুমি নিজেই কর এবার।"

"হ্যালো, গুড মরনিং। মিস্টার আইখমান? আমি আপনাদের এক প্যাসেঞ্জার, ডক্টর সেন, গত অমুক তারিখে...ফ্লাইটে হীথরো থেকে আসার সময়—"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সুটকেস আসেনি? আপনি এই নম্বরে—"

"মিস্টার গিজদারকে তো? তিনি খবর পর্যন্ত দিতে পারেননি আমার বাক্সোগুলো কোথায়।"

"তিনিই পারবেন। তিনি না পারলে আমিও পারব না, এটা তাঁরই ডিপার্টমেণ্ট।

দেখুন মালপত্র বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, আমি বরং বলে দিচ্ছি মিস্টার গিজদারকে—"

"উনি একটাকে মোটে ট্রেসই করতে পারেননি, অন্যটা বলছেন পাঠিয়েছেন ইউনাইটেড মারফৎ লস এঞ্জেলেসে, কিন্তু ইউনাইটেড বলছে কিছু আসেনি। আমি কিছুই পাইনি। ওভার নাইট কমপেনসেশনটুকু পর্যন্ত নয়—আপনারা যে এতটা ইন-এফিশিয়েন্ট এবং আনহেলপফুল—"

"সেকি কথা? আপনি পঞ্চাশ ডলার নেননি?"

"দিলে তো নেব?"

"এক কাজ করুন। যা যা কিনেছেন তার রসিদগুলো সমেত লস এঞ্জেলেসের অফিসে চলে যান। সাতদিনের মতো হতে চলল এখনও নেননি? কী আশ্চর্য! তবে দেড়শর বেশি খরচা করবেন না। অবশ্য একটা সুটকেস তো পেয়েই গেছেন?"

তাহলে আর বলছি কী? পাইনি, পাইনি। একটাও পাইনি। দুটোই আপনারা হারিয়ে দিয়েছেন।"

"সেকি কথা? দাঁড়ান একমিনিট। একটু অপেক্ষা করুন।"

"এই যে, ডক্টর সেন, এখানে কথা বলুন।"

"হ্যালো।"

"দেখুন ডক্টর সেন, এই নিয়ে আপনি আম্পটিনথ টাইম আমাকে একই কথা বলতে ফোন করছেন। অকারণে মিস্টার আইখমানকে বিরক্ত করছেন। একটা, অর্থাৎ কালো সুটকেসটা আপনি পেয়ে গিয়েছেন, আমরা জানি।"

"কে বলল পেয়ে গিয়েছি? ইউনাইটেড বলেছে? আমাকে রসিদটা দেখাবেন! আমি তো পরশু নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি, বলে আসবো আপনাদের অফিসে।—"

"আপনিই ডক্টর সেন কথা বলছেন?"

"অফ কোর্স। হু এলস?"

"হাউ মেনি পার্সনস আর মাস্কারেডিং অ্যাজ দিস ডক্টর সেন, আই ওয়ানডার? আপনাকে নিয়ে তিনরকম গলা হলো। একজন তো আমাকে মামলা করে সর্বস্বান্ত করে দেবে বলেছিল। আপনিই বোধহয়। নাকি আর কেউ? মোস্ট মিস্টেরিয়াস।"

"কি যে বলেন! অমন কথা কখনো আমি বলতেই পারি না। কিন্তু নো-ট্রেস বাক্সোটারই বা কী হবে?"

"ঐ বাক্সোটারই খোঁজে আমরা ছ'বার লণ্ডনে ফোন করেছি—সতেরোটা টেলেক্স পাঠিয়েছি। নো-ট্রেস। নো-ট্রেসের জন্যে চল্লিশ ডলার কমপেনসেশন। আর কালোটা তো অলরেডি ডেলিভারড অ্যাট ইওর রেসিডেন্স। ও কে? অল সেটলড?"

"আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মিস্টার গিজদার। ইউ মাস্ট বি ক্রেজি।"

"আয়াম নট! ইউ আর। ডক্টর সেন। আর ডক্টর জেকিল। হু-এভার উড মাইট বি। অ্যাণ্ড ইউ আর ড্রাইভিং আস ক্রেজি।" ঠং করে রিসিভার নামিয়ে রাখল নিউইয়র্ক।

১০

"আমাকে ডক্টর জেকিল বলল, খুকু। শুনছিস?"

"তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? আইখমানকে অমন গিজদার গিজদার বলছিলে কেন? তাই বলেছে।"

"গিজদারই তো কথা বলল।"

"সে কি? প্রথমে তো মনে হলো আইখমানই ধরেছিল।"

"ধরেছিল, তারপর গিজদারকে ধরিয়ে দিল তো।"

"যাচ্চলে।"

"তুমি নিজে নিউ ইয়র্কে না গেলে কিছু হবে না দিদি। ব্যাটারা যা তা করছে।"

"কিন্তু আমাকে যে ডক্টর জেকিল বলল।"

"ও কিছু না। কত কথাই বলে লোকে, সবকিছুতে মন দিতে নেই দিদিভাই। খুকুদি, আমি, তুমি—তিনজন মিলে কথা বলেছি কিনা, তাই ঘাবড়ে গেছে।"

"কিন্তু কালো বাক্সো যে 'ডেলিভারড অ্যাট ইওর রেসিডেন্স' বলল? কিছুতেই শুনল না আমার কথাটা।"

"বললেই তো হলো না? তুমি দুটো সুটকেসের জন্য কমপেনসেশন চেয়ে অ্যাপ্লিকেশন করে দাও। রাজা-কুমকুমদেরও বাক্সো হারিয়ে গিয়েছিল। ওরা সাত হাজার টাকা মোট ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলো।"

"সা-তা হাজা-র? বলিস কি?"

"তা আর এমন কী? দুটো সুটকেস, আটশো ডলার তো পেতেই পারে। শুনতেই অত।"

"আমিও পাবো?"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু টাকা কে চায়? আমি চাই বাক্সোটা।"

"ফের যতো।"

"বোকা কথা? দিদি?"

"ঐ টাকা দিয়ে তুমি অনেক বেশি শাড়ি কিনতে পারবে।"

"কিন্তু ওই শাড়িগুলো তো পাবো না? আমার ফুলশয্যার তত্ত্বের কাঞ্চিপুরম তিনখানা, সাধের বেনারসী শাড়িটা, একুশ বছরের জন্মদিনে পার্সেল করে বিলেতে পাঠানো মায়ের উপহার, আরেকটা শাড়ি শাশুড়িমায়ের, (হায়রে—আসল শোকের

কথাটা তো বলতেই পারছি না, যে জন্য এত অস্থির হাহাকার! যে জিনিসটা ঐ বাক্সোর সঙ্গে হারিয়ে গেল সেটা শাড়ি নয়—কিন্তু তোদের বলা তো যাবে না। —তোরা ভাবছিস দিদির কী বিশ্রী শাড়ি-শাড়ি স্বভাব হয়েছে)।"

"এনেছিলে কেন গুচ্ছের দামী কাপড়-চোপড়?"

"তুমি কি ইন্দিরা গান্ধী?"

"খবর্দ্দার, এই ভুলটি আর করবে না।"

"কেবল নাইলন, আর জীনস। বুঝলে?"

"বাইরে কক্ষণো দামী কাপড় নিয়ে আসবে না।"

"দেশেও তো পরা যায় না কিছু, ট্রেনেও ডাকাতি, ট্যাক্সিতেও ছিনতাই। সত্যি আর পারি না। ভালো ভালো জিনিসপত্তর কখন পরবে লোকে?"

"পরবে না। ইন্দিরা গান্ধী হও, তখন পরবে। ততদিন নাইলন। চল, বাজারে।"

"চল—। যথা লাভ। রসিদগুলো তো জমা দিতে হবে।"

"তাছাড়া নিউ ইয়র্কে যাবার আগে পরনের জিনিসপত্তর কিছু কিনতেই হবে। ওখানে তো তোরা নেই? পরবো কী?"

"তাও তো বটে। ক'দিন থাকা তোমার নিউ ইয়র্কে?"

"তা পাঁচ-ছ' দিন তো বটেই।"

"তাহলে তো শ'দুই ডলারের জিনিসপত্র এমনিতেই লেগে যাবে। ওরা কত দেবে বললি? দেড়শো, না?"

"হাওয়া-ই-হিন্দ লেজ ডাউন দ্য রেড কার্পেট ফর ইউ।"

লস এঞ্জেলেসে অফিসে ঢুকতেই রংবেরঙের চমৎকার বিজ্ঞাপন। ঘামতে ঘামতে রশিদ-টশিদ নিয়ে জমা দিতে গেলুম যে ভদ্রলোকের কাছে, সেই সাহেবি ছদ্মবেশে পার্শি ছেলেটি সত্যি খুব ভদ্র। যথাসাধ্য সহানুভূতি প্রদর্শন এবং দুঃখ প্রকাশ করে বলল: "রেখে যান, যথাসাধ্য শীঘ্র বিল তৈরি করে চেক পাঠিয়ে দেব।" কিন্তু কোথায়? এখানে? না ইনডিয়াতে? বোনেদের ঠিকানাই দিয়ে দিই।

"এদের কাছে ধার করেছি। টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেবেন এদেরকেই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। একজনকে অথরাইজ করে যান। তবে, কত টাকা যে দেবে, তা বলতে পারছি না। নিউ ইয়র্কের ওপর সবটা নির্ভর করে তো?"

"সে কি?"

"হ্যাঁ হাওয়া-ই-হিন্দ-এর মেন অফিস ওইটেই। আমি তো নগণ্য শাখামাত্র।"

"কি সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কী হয়েছে?"

"নাঃ। ইউনাইটেডের কাছে বাক্সের খবরটা পেলেন কিছু?"

"কিসের ইউনাইটেড?"

"ইউনাইটেড এয়ারলাইনস। আপনারা ওদের কনট্যাক্ট করেননি আমার সুটকেসের জন্য?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছেন না? শুনুন তবে। হাওয়া-ই-হিন্দ—আমার একটা সুটকেস নাকি ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের মাধ্যমে গত ৮ই লস এঞ্জেলেসে পাঠিয়েছে এবং বলছে যে আপনারা সেটা আমাকে ডোর-টু-ডোর ডেলিভারি দিয়েছেন। এসব খবর আপনারাই কি দেননি মিস্টার গিজদারকে?"

"কেন দেব? এসবের অর্থ কী?"

"ইউনাইটেডে আপনাদের কোনো মালপত্তর আসেনি সম্প্রতি? নিউইয়র্ক থেকে?"

"না তো। আমার অজ্ঞাতসারে আসাটা হাইলি আনলাইকলি। আমিই তো এখানে ইনচার্জ। দাঁড়ান, তবুও একটু জেনে নিচ্ছি। মেরিলিন ডিয়ার, ইউনাইটেডে একবার খোঁজ নাও তো প্লীজ—ডক্টর সেনের"—

"কী হলো মেরিলিন? খোঁজ পেলে?"

"স্যরি, জামশেদ, ওরা কিছুই জানে না। কোনো বাক্সোটাক্সো আসেনি ওদের ওখানে—আমাদের এয়ারওয়েজ থেকে।"

"দেখলেন তো?" ছেলেটি কাঁধ ঝাকায়।

"আপনিই দেখুন। আপনি আজই জানান এটা মিঃ গিজদারকে। তিনি তো বলছেন বাক্সো পাঠিয়েছেন। সেটা নাকি বাড়িতে পৌঁছেও দেওয়া হয়ে গেছে। তাই তার জন্য আর কমপেনসেশন দেওয়া হবে না আমাকে। আর তার ওজন আঠারো বলে হারানো বাক্সোটার ওজন মাত্র দুই। কিছু বুঝলেন?" পার্শি ছেলেটির মুখে এবার নীরক্ত ভদ্রতার কঠিন মুখোশ। হাসিমুখেই সে বলল, "দেখুন, এটা আমার বোঝবার ব্যাপার নয়। ওটা মিস্টার গিজদারেরই বোঝার কথা।"

"যে আসে লংকায়, সে হয় রাজা।"

"এক্সকিউজ মি?"

"কিছু না। তুমিও ব্রুটাস।"

"ব্রুটাস? ব্রুটাস একেরমান? ইউনাইটেডের? ওকে চেনেন নাকি?"

"নাঃ। অন্য লোকের কথা বলছি। ঠিক আছে। চলি। থ্যাংকিউ।"

১১

শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে। নিউইয়র্ক যাচ্ছি। বিষণ্ণবদনে তিনবোনই এসেছে আমাকে প্লেনে তুলতে। এসেও বকুনি দিচ্ছে।—

"দিদিভাই, তোমার এবারের আসাটা ঠিক আসাই হলো না কিন্তু।"

"কেবল সুটকেস-সুটকেস করেই কাটালে। একটা কিন্তু অস্বাভাবিক চেঞ্জ হয়েছে

তোমার। এতটা জিনিসপত্র-সর্বস্ব মন যে তোমার কবে থেকে হলো? এমন তো একটুও ছিলে না আগে? মোস্ট মেটিরিয়ালিস্টিক অ্যাণ্ড বোরিং কম্প্যানি।"

"যাক না তোমাদেরও দু' বাক্সো 'সর্বস্ব' খোয়া! বিদেশ-বিভুঁইয়ে ব্রীফকেস বগলে ঘুরে বেড়াও না! দেখবো কেমন মোস্ট স্পিরিচুয়ালিস্টিক অ্যাণ্ড ইনস্পায়রিং পার্সোনালিটি হয়ে থাকো!"

একটা সুটকেস যা হোক কিনতে হয়েছে, কাপড়চোপড় সাবানগামছাও কিছু তাতে ভরতে হয়েছে, নিউ ইয়র্কের সাতদিন যাতে কেটে যায়। কিন্তু মনে শান্তি নেই। গেল। সেগুলো সব গেল। কেন যে সঙ্গে ব্রীফকেসে রাখলুম না? ওদিকে প্রকৃতপক্ষে নো-ট্রেসই হয়ে গেল পার্থ'র বাক্সোও। ওদেরই বা কী বলব।

সময়ের অনেক আগে পৌঁছেছি। আমেরিকান এয়ারওয়েজের টার্মিনালে অলস চোখে বসে আছি। চারদিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ চোখে পড়লো ওদের অফিসঘরের বাইরে সারিবাঁধা ৭/৮টা সুটকেস।—ওগুলো কাদের রে? কেন আছে ওখানে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কেউই জানে না ওগুলো কাদের। কেনই বা আছে। আনক্লেমড ব্যাগেজ পড়েই থাকে ওরকম। তারপর লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড অফিসে জমা চলে যাবে।

"যদি আমারগুলোও ওরকম পড়ে থাকে কোথাও?"

"হতেই পারে। তবে হীথরোতেও নেই। জে. এফ. কে. তেও নেই। ওগুলো তো খোঁজা হয়েছে তন্নতন্ন করে।"

"যদি এখানেই পড়ে থাকে? এই এয়ারপোর্টেই? আর জীবনে পাওয়া যাবে না।"

"ওরা বারবার জোর দিয়ে বলছে একটা লস এঞ্জেলেসে পাঠিয়েছে—"

"দিদি, তুমি সত্যি গল্প লিখতে লিখতে বড্ড ইম্প্র্যাকটিকাল হয়ে গেছো। ওসব গল্পেই হয়। লাইফে হয় না। ওরা বলুকগে।"

"তবু ঘুরেই আসবি নাকি ইউনাইটেডের টার্মিনালটায় একবার? যদি ঐরকম আনক্লেমড পড়ে থাকে? ধর গিয়ে, দেখলুম আমার বাক্সোও একধারে পড়ে আছে ঐরকম?" ভয়ে ভয়ে যেই বললুম, অমনি খুকু-রুঙ্কু এই মারে তো এই মারে। "কী যে পাগলামি শুরু করেছো দিদিভাই। পড়ে থাকলে কি ওরা পাঠিয়ে দিত না? অতবার করে তুমি তাগাদা দিলে, আমরা অত অনুনয় বিনয় করলুম? থাকলে ওরা নিশ্চয় এতদিন পাঠিয়ে দিত। পড়ে থাকতে পারে না। এরা আমাদের মতন অত ক্যালাস নয়, এখনও কিছু সিভিক সেন্স, কিছু সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির ট্রেস আছে ওদের চরিত্রে। নইলে এতদূর এগোতে পারত না।"—ভাগ্যিস রিনিটা ছোটো আছে। এখনও চাকরি-বাকরিতে ঢোকেনি। ওকে একটু সাধ্যসাধনা করতেই রাজী হলো ইউনাইটেডে নিয়ে যেতে। চিনিও না তো কোথায় কী? এয়ারলাইনের বাড়িগুলো সব দূরে দূরে আলাদা আলাদা। বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। খুকু-রুঙ্কু এখানে গার্জেনের রোলে। ওরা বলল, "আমরা তোমার পাগলামিকে বৃথা প্রশ্রয়

দেব না। তুমি নিজেই ঘুরে এস। হাতে সময় আছে। যাও, মনের শান্তি করে এস।"

গিয়ে দেখি ইউনাইটেডেরও একটি ক্ষুদ্র কিউ রয়েছে আনক্লেমড ব্যাগেজের। ঠিক ওদের অফিসঘরের কাচের দরজা, কাচের দেয়ালের গায়েই ঠেশ দেওয়া আছে গোটা চার-পাঁচ সুটকেস। নানান সাইজের, নানা রঙের। একটা কালো। সাইজে পার্থ'র সুটকেসেরই মতন। অবিশ্বাসী চোখে এগিয়ে যাই। পায়ে পায়ে। অবশ্যই হতে পারে না, নিশ্চয়ই নয়, তবুও, দেখতে ক্ষতি কী? বাক্সোটার গায়ে দুটো লেবেল সাঁটা। একটা হাওয়া-ই-হিন্দ-এর। আরেকটা গ্রেট ব্রিটিশ এয়ারলাইনসের। আরও একটা ট্যাগ হাতলে বাঁধা। ইউনাইটেডের। তাতে লালকালিতে লেখা—immediate % RUSH—এবং আমার নাম, তথা লস এঞ্জেলেসের ঠিকানা। সঙ্গে তারিখ—৮-ইয়ের। ৬ দিন হয়ে গেছে। রিনি এবং আমি চোখাচোখি করলুম, দুজনের চোখেরই ভাষা এক। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে স্বপ্নচালিত ব্যক্তির মতন এগিয়ে গিয়ে আমরা দুজনে সুটকেসটি হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে এলুম। কেউই আমাদের কিছু বললে না। দুটি মহিলা চেকার ব্যাজার মুখে তাকিয়ে রইলেন দরজার দুই পাশে। কিছু প্রশ্নও করলেন না। ব্যাগেজের রসিদও দেখতে চাইলেন না। রিনি খুশি খুশি গলায় বলল,"দিদিভাই, চলো যাই আমরা আরও গোটাকতক বাক্সো-প্যাঁটরা তুলে আনিগে। সবগুলো তুলে নিলেও তো ওরা কিছুই বলবে না দেখছি।" "কী কাণ্ড বলতো? আমাদের যথাসর্বস্ব এতটা আনসেফভাবে পড়ে থাকে? যে কেউ তো যখন খুশি তুলে নিয়ে যেতে পারে! আর কখনো ইনশিওর না করে ট্রাভেল করছি না।"

উদ্ধৃত সুটকেস হাতে যখন খুকু আর রুক্কুর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো হলো, তখন তাদের মুখের জ্যামিতিক সারল্য দেখবার মতন। এমনও যে হয়, হতে পারে, এই বেগবান, সর্বশক্তিমান, এফিসিয়েন্ট ইউ. এস. এ.তে, এটা ওদের পক্ষে অভাবনীয়। RUSH লেখা, নাম ঠিকানা সমেত বাক্সো বসে রইল হপ্তাখানেক। কেউ জানলও না? বারবার নানাভাবে খোঁজ নিলুম, তারা প্রত্যেকবারই না দেখে মিছে কথা বলল। অম্লানবদনে ভুলভাল জবাব দিল। এমনকী একটা এয়ারওয়েজকে পর্যন্ত বাজে খবর দিল? সত্য সেলুকাস!

এবার বোনেরা পই পই করে শিখিয়ে দিল। নেকস্ট স্টেপে কী কী করণীয়।

"খবর্দার, তুমি গিয়েই যেন ব্যাটা গিজতাঘিচাংকে জানাবে না যে কালো বাক্সোটা পাওয়া গেছে। তোমার পাগলামির জন্যেই ওটা কুড়িয়ে পেয়েছ। নেহাৎ বদ্ধ পাগল বলেই। আমাদের মতো নর্মাল লোকজন হলে ওভাবে লাস্ট মোমেন্ট ইললজিকাল অ্যাকশন একেবারেই নিত না—খুঁজতেও যেত না। পেতও না। তুমি সোজা নিউ ইয়র্কে চলে গেলে ওটা কি আর জীবনে পাওয়া যেতো? ওদের হাতে কোনো রসিদ নেই, কোনো প্রমাণ নেই, কে বাক্সোটা নিয়ে গেছে। ওদের অকারণ

হ্যারাসমেন্টের দাম এবারে তুমি তুলে নাও।

এবার ওদের তুমি খানিকটা হ্যারাস কর। সমানে দুটো সুটকেসই ক্লেম করে যাও। ওদের প্রমাণ করবার কোনোই উপায় নেই যে এটা কদাচ রিকভার করা হয়েছে। বুঝলে? খবর্দার ওদের বলে দিও না যেন যে এটা কুড়িয়ে পেয়েছ। ওরা বড়টাকে মাত্র দু'কেজি বলছে অন্যায় করে। অন্ততপক্ষে তো ওটা বিশ কেজি ছিল? অতএব এটার কথা আর বলো না। তাহলে বিশ কেজিই পাবে। নাকের বদলে নরুণ তো হোক।"

"কিন্তু দিদি তো পৌঁছেই আগে ঐ কথাটা বলে দেবে।" রিনি হতাশসুরে বলল।

"পেটে কোনো কথা থাকে ওর?"

১২

"এতবড় আস্পর্ধা? এমন কথা বলেছে? 'ডক্টর জেকিল' বলেছে? উপরন্তু বাক্সো না দিয়ে-টিয়েও বলে কিনা 'দরজায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে'? নাঃ! সত্যি হাওয়া-ই-হিন্দ বড্ড পেয়ে বসেছে দেখছি।"

ইলুদি তো খেপেই গেলেন। বললেন, "দাঁড়াও! আমি কাপাদিয়াকে বলছি। ওরা দস্তুরী-মিস্তিরি থেকে গাদা গাদা টিকিট করে। হিন্দকে কাঁদিয়ে ছাড়বে।"

নিউ ইয়র্কে ইলুদি-সুহাসদাদের চেনে না এমন ভারতীয় প্রায় নেই। ইলুদির বাবা ছিলেন বিখ্যাত গান্ধীবাদী—স্বাধীনতা সংগ্রামী। গুজরাটের সকল মানুষের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে গেছেন। আর সুহাসদার চাকরি ইউনাইটেড নেশনসে বহুৎ বছর হলো।

"তোমার বোনেরা অ্যাবসলুটলি করেক্ট", বললেন সুহাসদা। "ঐ সুটকেস ফেরৎ পাওয়া সম্পূর্ণ ভাগ্যচক্র। তার ক্রেডিট হিন্দ-এর নয়। তাছাড়া হিন্দ তো তোমাকে মস্তবড় প্রতারণা করছে, বত্রিশ ইঞ্চি সুটকেসের ওজন দু কেজি ধরে নিচ্ছে! তুমি কেন ওদের 'নিজেদেরই রসে নিজেরা সিদ্ধ' হতে দেবে না? টিট ফর ট্যাট।"

"হ্যালো! মিস্টার গিজদার?"

"ডক্টর সেন, আই প্রিজিউম।"

"ঠিক ধরেছেন।"

"একটা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অন্যটা নো-ট্রেস। চল্লিশ ডলার। ব্যাস। হয়ে গেল?"

"শুনুন মিস্টার গিজদার, আমি এখন নিউ ইয়র্কে।"

"কনগ্রাচুলেশনস। তাতে আমার কী?"

"আপনার কাছে আসব শিগগিরই।"

"তাতে এক্সট্রা কোনো লাভ হবে না আপনার, তবে হ্যাঁ, ঐ চল্লিশ ডলার

হাতে করে ক্যাশ নিয়ে যেতে পারবেন।"

"ঐ চল্লিশ ডলার আপনাকেই দিলুম মিঃ গিজদার, কীপ ইট ইওরসেলফ। ইটস আ প্রেজেন্ট।"

"কী ভেবেছেন আপনি নিজেকে? প্রেসিডেন্ট অব ইনডিয়া?"

"কী ভেবেছেন আপনিই বা নিজেকে? প্রেসিডেন্ট অব দি ইউনাইটেড স্টেটস?"

"উই ও ইউ ওনলি ফর্টি ডলারস। নাথিং মোর।"

"আচ্ছা জেদী জানোয়ার তো! জন্মে দেখিনি বাপু।"

"যার সঙ্গে যেমন।"

"ঠিক আছে।"

"ঠিক আছে।"

"আপনাদের মতো অপরূপ পাবলিক রিলেশনস কিন্তু আর কোনো এয়ারলাইনসের নেই।"

"নেই তো নেই। আমরা কিছু লোকসানে চলছি না তার জন্যে। আপনার মতো যাত্রী না পেলে আমাদের কোম্পানি লাটে উঠবে না।"

"সত্যি? উঠবে না তো?"

"সত্যি! বিশ্বাস করুন ডক্টর সেন, আপনি একটি মাথাব্যথা ভিন্ন কিছু নন।"

১৩

সন্ধেবেলায় আমার সব জেরক্স-করা ডকুমেন্ট সমেত ইলুদি আমাকে দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্তিরির বড়কত্তার বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা ডিনার চলছিল। সকলেই প্রায় দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্তিরির লোক। দু'জন বঙ্গসন্তান ইনক্লুডেড। ছোটখাটো একটি প্রবাসী ভারতবর্ষ। উঁচুতলার। মুহূর্তের মধ্যে ইলুদির কল্যাণে (নাকি রাই-হুইস্কি বার্বনের গুণে?) উপস্থিত নিমন্ত্রিতরা প্রত্যেকেই হাওয়া-ই-হিন্দ-এর অবর্ণনীয় আচরণে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

"মোটেই ছেড়ে দেয়া হবে না। যা খুশি তাই করবে?"

"আপনাকে একা স্ত্রীলোক পেয়ে ওরকম শুরু করেছে—"

"দেখি, অমন করা বের করছি। মাসে প্রায় তিরিশটা ইন্টারন্যাশনাল টিকিট কাটি একমাত্র এই অফিস থেকেই আমরা? নো-ট্রেসকে কী-উপায় ট্রেস করা যাবে, দেখছি, দাঁড়ান না—"

নানারকম সান্ত্বনা পাচ্ছি। যত্ন করে গৃহকর্তা কাগজপত্তরগুলো নিলেন। কালই বাঁশ দেয়া হবে।

"হ্যাঁ, একটু বেগ দেওয়া হোক ওদের—সত্যি বড্ড বাড় বেড়েছে। সেবার আমারও ভেনেজুয়েলা থেকে জাপান যাবার পথে, বাক্সোটা দিলে হারিয়ে—"

"আর আমার? রোম টু কোপেনহাগেন ঐটুকু ছোট্ট ট্রিপ, তার মধ্যেই বাক্সোটি আমার চলে গেল অস্ট্রেলিয়া। দু' হপ্তা পরে দেশে ফিরে পেলাম। ওঃ, বাইরে কী কষ্টেই না দিন কেটেছে। ঐ শীতের দেশে!—তবে খুবই ওদের ব্যবহার ভালো, ডাচ এয়ারলাইনস তো হাওয়া-ই-হিন্দ নয়..."

মুহূর্তেই বাক্সো হারানোর সরস কাহিনীতে জমে উঠলো ঘর। সরস কাহিনীই —কেননা সব বাক্সোই শেষটায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। ট্রাজিক কেস ছিল না একটাও।

কাপাদিয়া পরদিন টেলিফোন করে বললেন, "আপনাকে ঐ বাক্সোটার জন্য ৪০ ডলারের বেশি কিছুতেই দেবে না। অন্য বাক্সোটার কথা বলব? ওটার জন্যই চেপে ধরা যাক। ওরা আপনাকে নির্লজ্জভাবে ঠকাচ্ছে।"

তা ঠকাচ্ছে। তাই বলে—? ভাবতেই আমার ভেতো বাঙালী পেটের মধ্যে হিহি করে ঠাণ্ডা বাতাস বইল। বাক্সোটা হাতে পেয়েও আবার তারই জন্যে টাকা চাইব?

না বাবা।

ও পারব না।

কাউকে শাস্তি-টাস্তি দিয়ে আমার কাজ নেই।

"নাঃ, থাকগে। ওটা তো পেয়েই গেছি।"

"কিন্তু ওরা তো দেয়নি? ওটার জন্য আপনি সহজেই কমপেনসেশন পাবেন কিন্তু। আমি বলছি।"

"নাঃ, থাক।"

১৪

ইলুদি চটে লাল।

" 'নাঃ? থাকগে'? ওরা জোচ্চুরি করে জোরগলায় বিশ কেজিরটাকে দু' কেজি বলবে, চারশোর জায়গায় চল্লিশ ডলার দেবে, আর তুমি বলবে 'নাঃ থাকগে'? এ হতেই পারে না। এ তোমার অন্যায়টাকে সাপোর্ট করা। 'অন্যায় যে সহে' সেও দোষী। না, এবারে আমি নিশানকে বলছি, দাঁড়াও। দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্তিরি যদি না পারে, কোকাকোলা কোম্পানী তো পারবে?"

গড়গড় করে ছোট্ট সাদা টেলিফোনে কয়েকটা নম্বর ঘোরালেন ইলুদি।

"হ্যালো? নিশান?" তারপরেই শুরু হয় বিশুদ্ধ গুজরাতিতে আমার দুরবস্থা বর্ণনা। "ভাই নিশান, ওর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, ওর স্বামী আমার ছোটো বোনের ক্লাসমেট ছিল, ও নিজেও আমার ছোটো বোনের মতন, খুব ভালো মেয়ে, গল্প-কবিতা লেখে—ওর এমন হেনস্থা তুমি সহ্য করবে?"

নিশান পটেল বিখ্যাত ভি. আই. পি. লোক। দেশেও যেমন শক্তিমান ছিলেন, এখানেও তেমনি। আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে কোকাকোলা কোম্পানীর অধিনায়কত্ব তাঁরই।

দেশে থাকতে পুরো কোকাকোলা কোম্পানীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। বড় সোজা কথা নয়! স্ত্রীটি শান্তিনিকেতনের মেয়ে। সুন্দরী, সুরুচি-সম্পন্না, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন ভালো। নিশান নিজেও সাহিত্যে-শিল্পে উৎসাহী। ইলুদির তিনি ক্লাসমেট।

"নিশ্চয় করে দেবে তো? এই নাও, সব রেফারেন্স নম্বর-টম্বরগুলো। ফোনেই দিয়ে দিচ্ছি। রসিদ নম্বর এই..., কমপ্লেন্ট নম্বর এই..., আমার বন্ধুটির নাম এই...। দ্যাখো ভাই, উদ্ধার করে দাও। বাক্সোটার জন্যে অত না, যতটা জরুরি ওদের শিক্ষা দেওয়া। অকারণে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে মেয়েটাকে। শুধু শুধু ওকে অপমান করছে, গিজদার বলে একদম বাজে লোক। বত্রিশ ইঞ্চি মালভর্তি বাক্সোর ওজন জবরদস্তি করে বলছে, দু' কেজি। বুঝতেই পারছো, কী পাজি!"

ঠিক এমন সময় একটা টেলিফোন এল। ইলুদি বললেন—"তোমার ফোন।"

"কি, ডক্টর সেন? কী ভেবেছেন? ভেবেছেন দস্তুরী অ্যাণ্ড মিস্ত্রিরিকে দিয়ে বলালেই চল্লিশটা চারশো-তে তুলতে পারবেন? ও-গুড়ে বালি। চল্লিশের এক সেন্ট বেশি নয়। আমিও গিজদার। হুঁ। আপনার ফর্মে লেখা আছে ওজন মোট বিশ কেজি। আপনার যতই কানেকশনস থাকুক, আমার পক্ষে আছে আইন। বুঝলেন?" ঠাক করে রিসিভার নামিয়ে রাখল গিজদার! গুডবাইও বলল না। আমি তো 'হ্যালো' আর 'ইয়েস' ছাড়া কিছুই বলিনি।

ইলুদি বলল, "কে ফোন করল? সেই পাজি লোক? বেশ করেছো, কথা বলনি।"

"আমি বলিনি তো নয়, বলার চান্স দেয়নি।"

"সে যাই হোক। ওর সঙ্গে আর একটাও কথা নয়।"

আবার একটা ফোন এল।

"নিশান, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।" ইলুদি বললেন।

"নমস্কার। নবনীতা বলছি! হ্যাঁ, বলুন? বলুন? অ্যাঁ? বয়েস? হঠাৎ? ওটা পাসপোর্টেই তো আছে। ওরা? আমাকে কখনো দেখেনি। কেন বলুন তো?"

"পার্সোনাল কারণে? আমার বয়েসটা আপনিই জানতে চাইছেন, আপনারই পার্সোনাল কারণে? অ। কী? আমি ইলুদির ছোটো বোনের চেয়ে বয়সে ঠিক ক'বছরের ছোটো? আমি আপনার কথা ঠিক শুনছি তো? ঠিক?—মাত্র পাঁচ বছরের। কেন বলুন তো? কী বলছেন?—বেঁচে গেলেন? মানে? কী ব্যাপার বলুন তো? কিছুই বুঝতে পারছি না। এর সঙ্গে হাওয়া-ই-হিন্দের যোগ আছে কি? আছে? কী বলুন তো?"

"ওঃ। হাঃ হাঃ হাঃ। সত্যি? না না না ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংকিউ, থ্যাংকিউ। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। কিছু মনে করবেন না মিস্টার পটেল।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। দেব ইলুদিকে? আচ্ছা রাখছি। থ্যাংকিউ।"

ইলুদির মুখের চেহারা অস্থির।

"কী বলছিল নিশান?"

"কিছু না। উনি বলছিলেন, আমার বয়স কত।"

"কেন? কী দরকার? হঠাৎ? মেয়েদের বয়েস দিয়ে নিশানের কী দরকার?"

"আমিও তো তাই ভাবছি। তা...উনি বললেন..."

"অত হেসো না। আগে বলো কী ব্যাপার।"

"উনি প্রথমেই বললেন, 'আপনাকে মহারাজা এয়ারওয়েজে কেউ দেখেনি তো?' আমি বললুম—'না, কিন্তু কেন?' তখন উনি জানতে চাইলেন, অপুর চেয়ে আমি ঠিক কত বছরের ছোটো। মাত্র পাঁচ শুনে খুব নিশ্চিন্ত হলেন।"

"কেন? কেন? কেন?"

"উনি বললেন, আমি এক্ষুনি ওদের জেনারেল ম্যানেজারকে বলেছি, যে আপনি আমার পঁচিশ বছরের পুরনো বন্ধু। তারপরেই দুর্ভাবনা হলো—কে জানে আপনার বয়েস কত? অ্যাট অল পঁচিশ হয়েছে কিনা? অপুর থেকেও ছোটো যখন! তাই জানতে চাইছিলাম!"

"এ—ই, হাঃ হাঃ হাঃ—"

"এই!"

"নিশানটা যা ছেলেমানুষ রয়ে গেছে না, সত্যি? কে বলবে অতবড় চাকরি করছে।"

"উনিই ঠিক পারবেন, মনে হয়।"

"তা পারবে না? কোকাকোলা কোম্পানী যদি তেমন চাপ আনে, হাওয়া-ই-হিন্দ হাওয়া হয়ে যাবে। হুঁঃ..."

"দেশে তো উল্টোটাই হলো। কোকাকোলাই তো—"

আধঘণ্টা বাদে আবার ফোন। আমিই ধরি।

"এই যে ডক্টর সেন। নেক্সট স্টেপটা কি পেন্টাগন?"

"তার মানে?"

"দস্তুরিকে দিয়ে হলো না, এবার দেখছি কোকাকোলাকে দিয়ে চাপ আনা হচ্ছে। ওসব ওপরওলাদের দিয়ে কিছুই হবে না। সাকুল্যে চল্লিশ ডলার আপনার কপালে নাচছে। যে যাই বলুক না কেন, আমি তাদের ঠিক বুঝিয়ে দেব। আইন আমার দিকে। যতই যার দড়ি-খিঁচবার শক্তি থাক না কেন। লাভ হবে না।"

"কোনো আইনেই মালভর্তি বত্রিশ ইঞ্চি চামড়ার সুটকেসের ওজন দু' কেজি হয় না, গিজতাঘিচাং। আমিও দেখে নেব।"

"সে তো বুঝতেই পারছি। আমার বসকে ধরা হয়েছে। এত বড় আস্পর্ধা।"

"এর পরে যে কী করব, তা তো জানেন না।"

"এর পরে আপনি যাই করুন, পেন্টাগনকে দিয়ে বলান, আর হোয়াইট হাউসকে দিয়েই বলান, ইউ গেট ওনলি ফর্টি ডলারস। নট এ সেন্ট মোর, সী?"

১৫

"এত বড়ো কথা?"

এবার সুহাসদাও আর সইতে পারলেন না।

দাঁড়াও মজা বের করে দিচ্ছি। তুমি কবে যাচ্ছ? পরশু? তার দরকার নেই। যাওয়া ক্যানসেল কর। পরশুদিনই আমাদের বিদেশমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে আসছেন। ইউ এন-য়ে তাঁর রিসেপশন আছে। তোমাকে আমি সেখানে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি নিজেই তাঁকে প্রবলেমটা বলবে।—দয়া করে উনি যদি ওঁদের একটা ফোন করে দেন, দেখি কোন শালা হাওয়া-ই-হিন্দ তোমাকে চল্লিশটি ডলার ঠেকায়, দু-দুখানা মালভর্তি বাক্সো হারিয়ে দিয়ে।"

"একটাকে তো—"

"ওটা পাওয়া নয়। ওটা অ্যাকসিডেন্ট।"

"তবু—"

"ফরগেট ইট।" কিন্তু সুহাসদা প্রকৃতপক্ষে বড়ই এভার-সং ভালোমানুষ বঙ্গসন্তান। শেষ পর্যন্ত "অধর্ম" করতে সাহস নেই। অতএব পাঁচ মিনিট পরেই —"ঠিক আছে। তোমার কথাই থাক। উই শ্যাল ওভারলুক দেয়ার শ্যাবি ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ব্ল্যাক কেস, কিন্তু ব্রাউনটার জন্য বলতেই হবে বিদেশমন্ত্রী মশাইকে। হুঁ হুঁ, দেখি কেমন করে না দেয় বেটারা!"

সুহাসদার কথায় বাধা দেন ইলুদি: "কিন্তু নিশান তো বলেছে, ফলো আপ চালিয়ে যাবে। ল'-এর সাহায্য নিতে হলে তাও নেবে। ও বলছে, ঐ বাক্সোটাকে মাত্র দু' কেজি বলবার মধ্যেই ওদের মরণবাণ লুকিয়ে আছে। ওটা ইমপ্রবেবল একটা সিলি থিওরি। কেননা, নিশান সব দেখে বলল, ওদের কমপ্লেন্ট-ফর্মটাতেই বাক্সোটার বর্ণনায় আছে, ওটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কত। তাতেই ৬/৭ কেজি ওজন অন্তত হয়। শূন্য হলেও। ভেতরে কী কী আছে, তারও তালিকা দেওয়া আছে। তারও ওজন ঠিক করে দেওয়া যাবে খুব সহজেই। নিশান বলেছে, হিন্দ-ব্যাটাদের আর কিছুতেই এসকেপ নেই। মিনিমাম চারশ ডলার ফর ঈচ কেস। তার ওপর পেনালটি ফর দা বদারেশন। মন্ত্রীকে এসবের মধ্যে জড়িয়ে কী হবে? মশা মারতে কামান?"

"সে নিশান যেটা করে করুক না? এখানে যা চলছে তা চলুক না? তা বলে নবনীতা এতবড় সুযোগটা ছাড়বে কেন, ওদের কড়কে দেবার? উনি তো ওর ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্টই পরিচিত—সেই যে লিখেছিল না ওর কুম্ভমেলার গল্পে? ও একবার মিনতি করে মন্ত্রীমশাইকে বললেই, উনি ভড়কে দেবেন নিশ্চয়—"

"যখন ওঁকে চিনতুম, তখন তো মন্ত্রী ছিলেন না। এখন কি চিনবেন? কে জানে!"

"খুব চিনবেন। দাও বুকিং ক্যানসেল করে।"

"গোল বাধালো হাওয়া-ই-হিন্দ। বুকিং ক্যানসেল করা গেল না। তাহলে আরও একহপ্তা বসে থাকতে হবে নেক্সট বেস্পতিবারের ফ্লাইটের জন্যে। রাও আমায় এককালে স্নেহ করতেন বলে 'বকে দাও' বললেই যে আজ তিনি কাউকে বকে দেবেন তার কোনোই ঠিক নেই।—তার জন্যে এত কাণ্ড করে থেকে যাব?"

"দেবে দেবে। কেন দেবে না? শুধু-শুধুই গোলমাল করছো তুমি। অকারণ বজ্জাতি করছে হাওয়া-ই-হিন্দ।"

"অথচ ওরাই আগে কত হেলপফুল ছিল।"

"দোষটা কোম্পানীর তো নয়। দোষটা হচ্ছে ইনডিভিজুয়াল-এর। বাক্সো তো হারাতেই পারে। তা বলে এই দুর্ব্যবহারটা করবে কেন?"

"চিটিংবাজীই বা চালাবে কেন?"

"না দিয়েছে অ্যাপলজি চেয়ে চিঠি, না দিয়েছে ক্ষতিপূরণ, প্রথম থেকেই ব্যবহারটা যা করছে—সেই মোটেলে পাঠানোর কথাটাও যেন রাওকে বলতে ভুলো না—"

"দেশের নাম ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে—"

"সেটা দিচ্ছে বলে মনে হয় না। এই আচরণটা নিশ্চয় রিজার্ভড ফর দেশওয়ালী ভাইয়োঁ ঔর বেহেনোঁ। ফরেনারদের সঙ্গে ওদের রেড কার্পেটের সম্পর্ক। তখন আলাদা মূর্তি দেখবে ঐ গিজদারেরই।"

"যত ডাবল স্ট্যানডার্ড—এ শুধু ইনডিয়ার বৈশিষ্ট্য।"

"এবার মন্ত্রীমশাই এসে বাঁশটি দেবেন, তখন উচিত-শিক্ষা হবে গিজদার বাছাধনের।"

১৬

কিন্তু আমার লজ্জা করল।

ফ্লাইট ক্যানসেল করে একহপ্তা চাকরি কামাই করে, পরের বাড়িতে বসে থেকে কী করছি? নালিশ করে বালিশ পাচ্ছি! দূর! পাগল নাকি! ওই নিশানই যা করেন করুন। কাগজপত্র থাক। আমি চলে যাই। এতক্ষণে ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। ওই জিনিসগুলো যদি কোনোদিনই না থাকত?—মা'র ফিলসফিটা মনে করবার চেষ্টা করি। যাবার আগে গিজদারকে ফোন করে বলে যাব বরং কালো বাক্সোর গল্পটা। ওটা ভেতরে খোঁচাচ্ছে।—ওদেরও জানা দরকার ইউনাইটেড কত দায়িত্বহীন।

"হ্যালো। মিঃ গিজদার?"

"এখনও যাননি? এখনও এখানে? পেন্টাগন কী বলল?"

"আপনি কি জানেন, আমার কালো বাক্সোটা এখন কোথায়?"

"আপনারই কাছে।"—গলায় অসীম ধৈর্য গিজদারের।

"কী উপায়ে এলো, ওটা আমার কাছে? সেটা জানেন কি?"

"আমরাই ডেলিভার করেছি আপনার দরজায়। মনে পড়েছে?"

"কে বলল আপনাকে এই খবরটা, গিজতাঘিচাং?"

"আমার কাছে সমস্ত কাগজপত্র মজুত আছে। বাজে বকবক করবেন না ম্যাডাম। আমরা ব্যস্ত।" খটাং করে রিসিভার নামানোর শব্দ হয়।

সত্যি কথায় কারুর প্রয়োজন নেই। একে বলার আর দরকার নেই, বাক্সোটা কী করে পেয়েছি। সত্য সেলুকাস! কী দায়িত্ববান এই কোম্পানি! দুটো বাক্সোর জন্যেই পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ চাওয়াই এদের যোগ্য উত্তর হবে। বেশ তাই করবো। দেখাক গিজদার কী তার কাগজপত্র।

ইলুদি, সুহাসদা, কাপাদিয়া, নিশান পটেল, টুনুদা, এককালে তিনি আবার হাওয়া-ই-হিন্দেরই একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন—এখন অবসরপ্রাপ্ত, সবাই বললেন, থেকে যাও। বিদেশমন্ত্রী একবারটি বললে ওরা ঝেড়ে কাশতে বাধ্য হবে। হয় বাক্সো, নয়তো ভালোরকমের উচিত খেসারত অবশ্যই পাবে। কিন্তু আরও থাকতে আমি কিছুতেই রাজী নই। বাক্সো যাকগে চুলোয়। জীবনের যেটুকু অমূল্য সৌরভের জন্যে এই আয়াস, আয়াসেই তার সুরভি সব ধ্বংস করে দিচ্ছে।

কিন্তু এখন আমি আর বাক্সো চুলোয় যাক বললেই বা কী হবে? এটা রীতিমতো একটা জনগণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ লড়াই মানের লড়াই। এ এখন চলছে —চলবে, স্টেজে চলে গেছে। অতএব, উঁহু, ছাড়া চলবে না। টুনুদা স্বয়ং ফিলডে নামলেন, "দিল্লীতে তো তুমি নামছই। সোওজা চলে যাও—ট্যুরিজমের মন্ত্রীকে ধরগে। ওঁর একটা টেলেক্স তাগাদা এলে বিদেশমন্ত্রীর চেয়েও ভালো ফল হবে। উনিই ওদের খাস মনিব কিনা? আবার ভুলে যেও না যেন, কোন মন্ত্রী, তুমি যা ভুলো, খেয়াল রেখো—দিল্লিতে, ট্যুরিজমের মন্ত্রী। এ-ঠ্যালা সামলানো গিজদারের এলেমে কুলোবে না।"

এবার সবাই বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই সবচেয়ে সোজা হবে। সেটাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।" অমনি কনফারেন্স বসল। সবাই মিলে আমার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বর্গের সিঁড়িও তৈরি করে দিলেন। কোথায় গিয়ে কাকে ধরলে কার কাছে যাওয়া যাবে। কোন ধাপে পা রেখে কোন বারান্দায় উঠলে শেষ অবধি ট্যুরিজম মন্ত্রীর মসনদের সামনে পৌঁছুব। খাতা খুলিয়ে ফোন নম্বর ঠিকানার পর ঠিকানা লিখিয়ে দিলেন বন্ধুরা মিলে। এই ব্যাপারে সমবেত টিউশন এতটা নিখুঁত হলো যাতে ডিস্টিংশনে পাস করা বিষয়ে সন্দেহ রইল না। দিল্লীতে মাত্র একদিনের মধ্যে কাজটি উদ্ধার হয়ে যাবেই। এবং তারপর, হিন্দ সামলাক ঠ্যালা!

১৭

প্লেনে বসে বসে মনে হতে লাগল: "নিয়ে নিলেই হতো চল্লিশ ডলার! শেষ পর্যন্ত তো কিছুই পাব না। আমার যা অলস স্বভাব, একদিন কেন, গোটা একমাস দিল্লিতে থাকলেও ঐসব মহান ব্যক্তি, যাঁদের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বরে আমার ডায়েরি ওঁরা ভরে দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে না। মন্ত্রীপাকড়ানো আমার কম্মো নয়! ও বাক্সোটা জলেই গেল। দেখি, কলকাতা গিয়ে প্রসূন, কিংবা চাওলাকে ধরব।"

এসব ভাবতে ভাবতে, আর বীভৎস একটা নির্বাক সিনেমা দেখতে দেখতে (পয়সা দিয়ে হেডফোন নিইনি, তাই শুনতে হচ্ছে না) আর অল্প অল্প ঘুমোতে ঘুমোতে হীথরো এসে গেল। এখানে চার ঘণ্টা বিশ্রাম।

নেমেই ট্রানজিট লাউনজে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের টেলিফোন করতে লাগলুম। হাওয়া-ই-হিন্দ-এও ফোন করে বাক্সো-হারানোর ডিটেলস দিলুম। ওরা বলল, হ্যাঁ, নিউইয়র্ক থেকে কয়েকটা টেলেক্স এসেছিল বটে কিন্তু বাক্সোটার নো-ট্রেস।

এবার মন খারাপ করে লাউনজেই ঘুরছি। নানান এয়ারলাইনসের ছোটো ছোটো কাউণ্টার আছে এই ট্রানজিট লাউনজে।—হঠাৎ দেখি, হাওয়া-ই-হিন্দয়ের কাউণ্টারে একটি স্বদেশী তরুণ ঠ্যাং টেবিলে তুলে নিজের মনে হ্যাডলি চেজ পড়ছে।

অমনি মনে হলো, যাই, ওকেই বলে দেখি। ওই ইউনাইটেডের মতন এখানেও যদি কোনো আনক্লেমড ব্যাগেজের গুচ্ছ পড়ে থাকে, আর আমার বাদামী ফেদার-ওয়েটটি যদি সেখানেই জমা পড়ে থাকেন? কপাল বলে কথা। কিছুই তো বলা যায় না? ছেলেটি ব্যস্ত নেই যখন, তখন ওকে ধরতে দোষ কী?

সত্যি সত্যি, একটা কাজ পেয়ে সে ছেলেটা দেখি মহা খুশি। সিন্ধি ছেলে। এয়ার ট্রাফিকে কাজ করে। ঠিক যেমন নিউ ইয়র্কে বেদী। এখানে তেমনি এই, নিজহানী। কী চমৎকার ছেলে! আমার কমপ্লেণ্ট ফরম আর টিকিট, দুটোই ভালো করে নেড়েচেড়ে, ঘেঁটে দেখে, বলল—"ওরা ওই 'বিশ কেজি' ওজনটা পাচ্ছে কোথায়? হীথরো-টু-নিউইয়র্ক তো মাল ওজন করা হয়নি?"

"তবে কেন বলছে, যে—"

"ওটা তো মাত্র একটা সুটকেসের ওজন। কলকাতা থেকে তো একটাই এসেছিল হীথরো অবধি। সেটা বিশ কেজি ছিল। ও হিসেব দমদম-হীথরো সেকটরের। ওটা ক্যানসেলড। এখান থেকে গেছে দুটো। ওজন না-করা বাক্সো। চল্লিশ কেজি তো ধরাই যায়। একটা যদি আঠারো হয়, অন্যটা তবে বাইশ? তারও দরকার নেই। পীস-কনসেপ্টে একটা বাক্সো ত্রিশ কেজি পর্যন্ত ধরে নেওয়া যেতে পারে। ওজন যেহেতু করা হয়নি, আপনি ক্লেম হাজির করবেন ত্রিশ কেজির জন্য। পেয়ে যাবেন। কালোটা অবশ্য,—যখন লাকিলি পেয়েই গেছেন—আর না-ঘাঁটাই উচিত। তবে যেভাবে

পেয়েছেন সেটা মিরাক্ল ছাড়া কিছুই না।"

"ভাই নিজহানী, যদি কালোটার মতো বাদামীটাও পেয়ে যাই? মিরাক্ল তো বারবার ঘটে? আমি ছ'শো ডলার চাই না—বাক্সোটা চাই। ওই বাক্সে আমার খুব জরুরি একটা জিনিস আছে ভাই। একটু খুঁজে দেখবেন? এদিকে ওদিকে? যদি কোথাও পড়ে থাকে, ওই কালোটার মতন? দি গ্রেট ব্রিটিশ এয়ারলাইনসের বাসে চড়ে এয়ারপোর্টে এসেছি, তাদেরই কাউনটারে বাক্সো জমা দিয়েছি। হয়তো তাদেরই কোনো প্লেনে উঠে অন্যত্র চলে গেছে? কিংবা পড়ে আছে লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড গুদামে? কিংবা আনক্লেমড কাউন্টারে?"

"আমি অবসর সময়ে খুঁজে দেখতে পারি পার্সোনালি। আমাকে বরং একটা তালিকা দিয়ে যান জিনিসপত্তরের। আর বাক্সোর বর্ণনা।"

"এই তো জেরক্সকপি আমার কমপ্লেন্ট ফর্মের, এবং টিকিটের। আপনি রেখে দিন না?"

"এই লিস্ট তো অকেজো। ইনডিয়ানদের সব বাক্সোতেই শাড়ি থাকবে, শাল থাকবে, জুতো থাকবে। ডিটেইলস কই? কী-রকম শাড়ি? দু' একটার বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিন। সুমনের সই করা বাটিকের শাড়ি,লাল কাশ্মীরি শালের ড্রেসিং গাউন, বাদামী টেম্পলশাড়ি—যা যা মনে পড়ল বললুম। ছেলেটা অধৈর্য হয়ে বলে—

"এনিথিং স্পেশাল? সামথিং দ্যাট মে আইডেনটিফাই দিস কেস অ্যাজ ইওরস?"

"এনিথিং স্পেশাল?" বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে থাকে—ওকে বলবো? ওকে বললে ক্ষতি নেই। বলেই দি,—যদি এতে পাওয়া যায়?

"ইয়েস। দেয়ার ইজ সামথিং ভেরি স্পেশাল। একটা সিল্কের স্কার্ফে জড়ানো, একটা প্লাস্টিকের থলিতে ভরা আ বাঞ্চ অফ লেটার্স ইন বেঙ্গলি।" যার জন্যে এত হাহাকার—যার জন্যে এই অসীম চেষ্টা—সেই গোপন কথাটি শেষ পর্যন্ত নিজহানীকে বলে ফেলতে হলো। কেন এই বাক্সোর জন্যে মাথাকোটা। এ জীবনে যা আর ডুপ্লিকেটেড হবে না।

"বাঞ্চ অফ বেঙ্গলি লেটার্স...র‍্যাপ্ট ইন আ সিল্ক স্কার্ফ...গুড। ভেরি গুড। এতেই হবে। দেখি, কী পারি।" নিজহানী উপদেশ দেয়—"জীবনে আর এভাবে কদাচ নাম-ঠিকানাবিহীন বাক্সো নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। ওপরে তো বটেই—বাক্সোর ভেতরেও একপ্রস্থ নামঠিকানা লিখে রাখবেন। ওপরেরটা অনেক সময় ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। দেশের ঠিকানা রেখে যান। আমি খুঁজতে চেষ্টা করব। ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম। হয় বাক্সো, নয়তো ত্রিশ কেজির ক্ষতিপূরণ, এ আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।"

১৮

কেবল চিঠির অংশটা বাদ দিয়ে বিশিষ্ট বস্তুটি কী? না "এ বুক অফ বেঙ্গলি পোয়েমস" বলে গল্পটা রুনুদিকে বললুম।

রুনুদি শুনে বলল—“সত্যি সত্যি তোর কপালেই ঘটেও বাপু! তা দুটোই হারিয়েছিস, এটা তো সত্যি নয়? ফেরত পেয়েছিস তো বাবা একটা! অবশ্য পার্থরটা না পেয়ে, নিজেরটা পেলেই ভালো হতো, কি বল? তা যেটা কিনলি হাওয়া-ই-হিন্দের পয়সায়, সেইটে কেমন দেখি?”

ইতিমধ্যে বেশ খানিকক্ষণ হলো দাদামণিও এসে পড়েছেন, রুনুদিকে নিয়ে যেতে।

নতুন বাক্সো দেখে রুনুদি বলল,—“ওমা। এই? এর চেয়ে একটু ভালো দেখে কিনতে পারলি না? পরের পয়সাতেও কিপটেমি? স্বভাব যাবে কোথায়!”

দাদামণি বললেন, “এবার থেকে যেখানেই যাবি, ‘ক্যারি-অন-ফ্লাইট’ ব্যাগ নিয়ে যাবি। আর তাতে কেবল নাইলন কাপড়।”

রুনুদি ফুটুনি কাটে, “আর ভালো কাপড়-চোপড় তো রইলও না বিশেষ। কুম্ভে কতগুলো ভালো কাপড় জলে চুবিয়ে শেষ করে আনলি, আর এখানে তো বাকীগুলো জন্মের শোধ ঘুচিয়েই এসেছিস।”

আমিই এবার পজিটিভ একটা স্টেটমেন্ট করি। “তবু লাভ এই যে শিক্ষাটা হলো!”

দাদামণি এক হুংকারে সেটা উড়িয়ে দেন। “আর শিক্ষা। যাই হোক, অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলো তাড়াতাড়ি। দেরিটা যেন করো না। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা তো করলে না দিল্লিতে। করলেই ঠিক হতো। একটা চিঠি অন্তত দিয়ে দাও। তাইতেই হয়তো কাজ বেশি হবে।”

“দেখি।”

দাদামণি অধৈর্য হয়ে পড়েন। “দেখি দেখি করে দেরি করিসনি খুকু—অ্যাপ্লিকেশনটা করে দে। ঐ নিজহানী যেমনটি বলেছে, তেমনি করে।”

“করব।”

দাদামণি যাবার সময়ে বারবার তাড়া দিয়ে গেলেন—“করব করব নয়। এক্ষুনি অ্যাপ্লাই করে ফেলো।”

ঠোঁট উল্টে মামণি বললেন—“যা গেঁতো, ও আর করেছে অ্যাপ্লিকেশন। যদিও-বা লেখে, সেটা ওর টেবিলেই থাকবে। ডাকে আর যাবে না।”

১৯

কলকাতায় এলে যা হয়। কাজকর্মে, রোগে-রাগে-অনুরাগে বাক্সোটা উদ্ধারের চেষ্টা আর হলো না। মনে মনে ধরে নিলুম—যা গেছে তা গেছেই। চিঠির চেয়ে বড় জিনিসই তো চলে গেছে। আর চিঠির জন্যে কেঁদে কী হবে। এই উল্টোপাল্টা দুঃখ করা কাঁদুনি-গাওয়া এবং সহানুভূতি না-পাওয়াতেই গল্প শেষ হতো, যদি-না

হঠাৎ একটা টেলিফোন আসতো হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে। ফেরার পর মাস তিনেক হয়ে গেছে তখন।

"ডক্টর সেন? একটা মেসেজ এসেছে আপনার জন্য। মিঃ নিজহানীর কাছ থেকে।"

"কার কাছ থেকে?"

"মিঃ নিজহানী। লণ্ডনের।"

"তিনি কে?"

"হীথরোতে এয়ার ট্রাফিকে কাজ করেন—"

"ও হো, হ্যাঁ হ্যাঁ—বলুন, কী মেসেজ?"

"আপনার বাক্সোটা পাওয়া গেছে।"

"অ্যাঁ!"

"উনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন, দু'তিনদিনের মধ্যেই পাবেন।"

"অ্যাঁ।"

"এলে আমরা আবার খবর দেব।"

"ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।"

"এ তো কর্তব্যমাত্র।"

দু-দিনের মধ্যেই বাক্সো এসে গেলো। শীলমোহর করা অবস্থায়। আমাকে দমদমে গিয়ে কাস্টমস ক্লিয়ার করিয়ে আনতে হলো। ইনট্যাক্ট আছে। সব আছে। সেগুলোও কিছু এদিক-ওদিক হয়নি। নিজহানীর মুখখানা কিছুতেই মনে পড়ল না। কেমন দেখতে ছিল ছেলেটাকে? এ-বাক্সো কোথায় পেল সে? কী করে উদ্ধার করল? সেদিনই একটা কাজে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে দক্ষিণে রওনা হচ্ছি। চিঠিপত্রের বাক্সো খালি করে ব্যাগে ভরে নিলুম। ট্রেনে উঠে দেখি, আরে দাদামণি যে! দাদামণিও যাচ্ছেন সঙ্গে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত। চিঠিপত্রগুলো খুলতে খুলতে দেখি মহারাজার দুটো চিঠি এসেছে। একটি হাওয়া-ই-হিন্দ হীথরো থেকে, আরেকটি হাওয়া-ই-হিন্দ নিউ ইয়র্ক। দাদামণি বললেন—"হীথরোটাই আগে খোলো।" মোটাসোটা মোড়ক। নিজহানীর নিজহাতে লেখা লম্বা চিঠি। দাদামণি বললেন, "জোরে জোরে পড়, শুনি।"

"ম্যাডাম, আপনি হয়ত আমাকে চিনতে পারবেন না। কিন্তু আমি আপনার বাক্সের কথা ভুলিনি। ঐ দু' কেজির ব্যাপারটা মনে হলেই ভয়ানক রাগ ও লজ্জা হতো। এরকম লোকদের জন্যেই কোম্পানির নিন্দে হয়। তাই হাতে সময় থাকলেই আমি গ্রেট ব্রিটিশের এবং হাওয়া-ই-হিন্দের লস্ট প্রপার্টি আর আনক্লেমড ব্যাগেজ-এর ওয়্যারহাউসে ঘুরে আসতাম। একদিন দেখি একটা বাদামী বিলিতি কেস আপনার সেই বর্ণনামতো, চারটে দেশী ক্লাম্পস আঁটা তাতে। নাম লেখা আছে মিসেস কাপুর। কিন্তু তিনি ওটা রিফিউজ করেছেন। এসেছে টোকিও থেকে। আমি তখন আপনার

কাগজপত্তর নিয়ে গিয়ে ওটা খোলানোর ব্যবস্থা করলাম। খুলে দেখি হ্যাঁ, এই তো রয়েছে আপনার", ইয়ে, (একটু কেশে নিয়ে বলি): "বুক অব বেঙ্গলি পোয়েমস র‍্যাপ্ট ইন আ সিল্ক স্কার্ফ—" [খুব একটা মিথ্যে বলাও হয় না। যে-চিঠির গুচ্ছটি হারাতে বসেছিলুম, তা কি কবিতার চেয়ে আলাদা?] "ব্যস, আর সন্দেহ রইল না। টেলেক্সটা পাঠিয়ে দিলাম। আপনি খুবই ভাগ্যবতী। আমিও। যে আপনাকে সত্যিই সাহায্য করতে পারলাম। আপনি কখনও জাপান ও কানাডা গেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আপনার বাক্সটি ভ্যাঙ্কুভার, টোকিও দুই-ই ঘুরে এসেছে। আশাকরি ঠিকমতো পাবেন সব কিছু। ইতিমধ্যে কি টাকাটাও পেয়ে গেছেন? পেলেও ক্ষতি নেই। স্যরি ফর দ্য ট্রাবল। প্রীতি নমস্কার নেবেন। আপনার, বিশ্বস্ত, নিজহানী।"

দাদামণিকে চিঠিটা পড়ে শোনাতে হলো পুরোটা। ভাগ্যিস ওঁর চশমা সুটকেসে! পড়তে চাইলেই তো হয়ে গিয়েছিল! দাদামণি বললেন—"জামাই করবার মতন যুবক। কিন্তু তোমার কন্যারা এখনও জামাই পাবার যোগ্য হয়নি এই যা দুঃখ। কী? কবিতার খাতাটা হারিয়েছিল বুঝি? তাই অত আপশোস? যাক, এবার অন্যটা পড়ো।" অন্যটা এসেছে আইখমানের কাছ থেকে। যিনি বলেছিলেন আমি কিছু জানি না, গিজদারকে বলো। খুবই বিনীত চিঠি। খানদানি কাগজে, আই. বি. এম. টাইপরাইটারে, ছাপার হরফে।

"প্রিয় ডক্টর সেন,

আমরা খুবই দুঃখিত যে আমরা অনেক চেষ্টা করেও আপনার এত নম্বর (বাদামী) এবং এত নম্বর (কালো) সুটকেসদুটির কোনোটিকেই ট্রেস করতে পারছি না। এ দুটির জন্য যথাযোগ্য রীজনেবল ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়ই আমরা দেবো। এ বিষয়ে দিল্লিতে অমুক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি। আপনার অসুবিধা সৃষ্টির জন্য হাওয়া-ই-হিন্দ যারপরনাই দুঃখিত। আশাকরি অবিলম্বেই সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। ইতি। আন্তরিকভাবেই আপনার, ইত্যাদি।"

বুঝলুম একগুঁয়ে নিশান পটেল সত্যি সত্যিই হাওয়ার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। পেন্টাগনে কি বিদেশমন্ত্রকে যেতে হয়নি, বিশুদ্ধ কোকাকোলার বোতলই যথেষ্ট হয়েছে। কলকাতায় কে না জানে সোডার বোতলের মহিমা? ইলুদির জয় হয়েছে।

দাদামণি বললেন—"দাও এবার অ্যাপ্লিকেশনটা ঠুকে। ওদের ডান হাত কী করছে বাঁ হাত জানতে পারে না। হীথরো কী করছে জে. এফ. কে. যেমন জানে না, তেমনি দমদমে কী এলো, তা পালামে জানবে না। দাও, দু-খানার জন্যে ত্রিশ-ত্রিশ ষাট কেজি. ইনটু কুড়ি ডলার, ইজ ইকুয়ালটু বারোশো ডলার. এক্ষুনি অ্যাপ্লাই করে দাও। দেরি নয়। শালারা পাকা চোর। বাটপাড়ি করলে ক্ষতি নেই।"

বাটপাড়ি করবার বদ ইচ্ছেটা বোধহয় মাথায় ঢুকেছিল। নইলে ভগবান শাস্তি দিলেন কেন?

ব্যাঙ্গালোরে নেমেই ব্যাগসুদ্ধ চুরি হয়ে গেল। সে দু'খানা চিঠিও গেল, ফেরার

টিকিটও গেল, সভার পেপারখানাও গেল। ব্যাগটা আর উদ্ধার হয়নি। কে দেবে? ব্যাঙ্গালোরে তো কোনো নিজহানী নেই, নিশান পটেলও নেই। এমনকী দাদামণিও না।

রুনুদি যখন ব্যাঙ্গালোরের গল্পটা শুনবে, কী বলবে কে জানে? আর মামণিই বা বলবেন কী?

দেশ, শারদীয় ১৯৮২

টাংরী কাবাব

"আরে, পরীক্ষা যে দিলি, তা কী কী দেখে যাত্রা করেছিলি?"—চুরুট ধরিয়ে কুমারকাকা বলেন। বি. এ. পরীক্ষা শেষ হয়েছে, মনে সীমাহীন শান্তি। না, ভুল হলো। ঠিক সীমাহীন নয়। তিনমাসের মতো সুগভীর শান্তি। পরেরটা পরে দেখা যাবে। তার মধ্যে এ কী প্রশ্ন? রোববার সকালে হঠাৎ যেদিন কুমারকাকু এসে পড়েন সেদিনটা এক্সট্রা-স্পেশাল হয়ে যায়। কুমারকাকু সত্যি সত্যি রাজার ছেলে। এখনও ওঁদের দু'চারটে রাজপ্রাসাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উত্তরবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে, এ-পাহাড়ে, সে-পাহাড়ে, এ-তীর্থে, সে-তীর্থে। কুমারকাকুর বাবা-ঠাকুর্দারা সবাই রাজত্বই করতেন। কুমারকাকু ঠিক সেটা পারেননি, ব্যারিস্টারি পাস করে একের পর এক নানারকমের চাকরি করেছেন, স্বদেশী করে জেলেও গেছেন, স্বদেশী ব্যবসা করে ডুবেও গেছেন, এখন একটা খুব ভালো মনের মতন চাকরি করেন। কাজটা যে ঠিক কী, আমি অতো জানি না, দিনরাত দিল্লি-টোকিও ঘুরে বেড়ানো, আর জাপানীদের সঙ্গে দহরম-মহরমটাই দেখতে পাই। ফিরে এসে নানারকমের গপ্পো বলেন। আধা-সাহেব, আধা-জাপানী, আধা-বাঙাল, আর পুরোটা মিলে অখণ্ড রাজপুত্তুর এই কুমারকাকা ঢুকলেই বাড়ির রং পালটে যায়। মা পর্যন্ত হাতের সব কাজ ফেলে রেখে এ-ঘরে এসে বসেন গল্প শুনতে। কুমারকাকার কথাবার্তার লেভেলটাই আলাদা।

"কী কী দেখে যাত্রা করেছিলি বল, আমি বলে দিচ্ছি কত পার্সেন্ট মার্কস পাবি। সবটা ডিপেনড করছে ঐ যাত্রা করার ওপরে।"

"কী আবার? ঐ বাবা-মাকে প্রণাম, ঠাকুরঘরে প্রণাম, দইয়ের ফোঁটা, রুমালের কোণায় পেসাদী ফুল—ব্যস।"

"ব্যস?"

"ব্যস। আর মাথার ওপরে মা ইষ্টমন্ত্র জপ করে দেন।"

"যা বাবা। মাত্র এই? তাহলে পারলুম না। এ তোমার মায়ের ইষ্টমন্ত্রজপের হাতযশ আর তোমার লাক। আমাদের সময়ে ছিল মোট উনিশটা শুভ জিনিস দেখে বেরুনো নিয়ম। আর কুড়ি নম্বর হচ্ছে পূজ্যপাদ প্রণাম। প্রত্যেকটাতে পাঁচ নম্বর। সবগুলো করতে পারলে একশোয়-একশো। কেউ মারতে পারবে না। আমরা কখনো যে একশোয়-একশো পাইনি তার কারণ কখনোই বিশটা একসঙ্গে হয়নি। তবে অনেকগুলোই হতো।"

প্রায়ই বাবা-মা জমিদারিতে গ্রামে থাকতেন, আমরা শহরে ইশকুলে পড়তাম। পরীক্ষার সময়ে মা রওনা করিয়ে দিতে পারতেন না, তাই আমাদের বাড়িতে যিনি গার্ডিয়ান টিউটর থাকতেন তিনিই এই ভারটা নিতেন। আমরা দুই ভাই পরীক্ষা দিতে বেরুবার আগে সারা বাড়িতে কেন পুরো পাড়া জুড়ে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার শুরু হয়ে যেতো। আমাদের গার্ডিয়ান টিউটর ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, জানকীবল্লভ চক্রবর্তী, ভয়ানক কড়া শাস্ত্রজ্ঞ। ত্রিবেদী ছিলেন তিনি। শাস্ত্রের বিধান প্রত্যেকটি তিনি পই-পই করে মেনে চলতেন। নিজের জীবনেও যেমন মানতেন, তেমনি আমাদেরও জোর করে মানাতেন। যেদিনই আমরা পরীক্ষা দিতে রওনা হতাম, ঠিক তার আগেই একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল লেগে যেতো বাড়িতে। মাস্টারমশাই একটি দীর্ঘ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতেন, আর বাড়িসুদ্ধু সবাই, গয়লা, গোমস্তা, বাবুর্চি-বামুন, দারোয়ান, মালী, সহিস, মাহুত প্রত্যেকেই অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াত। তারপর ক্রমশ রওনা হবার ব্যবস্থা একে একে কমপ্লিট হতো—প্রস্তুতি এবং রিহার্সাল শেষ হলে, তবে সদর খুলত। আমরা দুই ভাই ভাত খেয়ে চুল আঁচড়ে জুতোমোজা পরে পেনসিল কলম রুলার নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দোরগোড়ায় প্রথম পা-টি ফেলতাম। মাস্টারমশাই বলতেন—"রামপ্রসাদ!" রামপ্রসাদ আমাদের রাখাল এবং গোরুপালক। সে টানতে টানতে নিয়ে আসত একটি দুগ্ধবতী গোরু—এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হতো বাছুরটাকে। সকাল থেকে তাকে দুধ খেতে দেওয়া হয়নি। ছাড়া মাত্র সে দৌড়ে গিয়ে বাঁটে মুখটি লাগাতো। এই দৃশ্যটাই শুভ। অমনি জানকীবল্লভ চক্রবর্তী নিশ্চিন্ত হয়ে বলতেন—"ওয়ান। ধেনুর্বৎস-প্রযুক্তা। একসেলেণ্ট। এইবার দুই। রামপ্রসাদ!" রামপ্রসাদ ততক্ষণে গোরু-বাছুর সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গোরু কিঞ্চিৎ গোবরময় করে ফেলেছে সদরের পাশটা। সেই নিয়ে দরওয়ান রামপ্রসাদকে বকছে—এটা তো রিহার্সালে ছিল না। বকুনির মধ্যেই রামপ্রসাদকে ফিরতে হলো ষাঁড় সঙ্গে নিয়ে। কখনও মাঠের হালচাষের বলদ, কখনও-বা শিং না-ওঠা এঁড়ে বাছুর—কখনও রাস্তা থেকে ধর্মের ষাঁড় বিশ্বনাথকে—যখন যেটা হাতের কাছে পেতো, ধরে এনে, 'বৃষ' বলে চালিয়ে দিতো সে। পণ্ডিতমশাই তাতেই তুষ্ট। "টু। বৃষ। ফাইন। চৈতরাম। হাথী লাও। থ্রি।" চৈতরাম মাহুত, সে রেডিই ছিল লিলিকে নিয়ে। ঠাকুর্দার লিলি হচ্ছে ঠাকুর্দার প্রিয় হাতি। লিলি এসে শুঁড় তুলে

সবাইকে নমস্কার করত। আমরা শুঁড়ে টাকা গুজে দিতাম। সেটা নিয়ে সে আমাদের আশীর্বাদ করত। তারপর টাকাটা সোজা চৈতরামকে দিয়ে দিত। স্যার বলতেন—"থ্রি। গজ। ফিনিশড। এবার তুরগা। লক্ষ্মীচন্দ! লক্ষ্মীচন্দ্র সহিস।" সেও ওপাশে রেডি থাকত। চৈতরাম লিলিকে নিয়ে সরে যাওয়ামাত্র খটখট শব্দে ডার্কলেডিকে নিয়ে চলে আসত সামনে। বাবা তাঁর প্রিয় ডার্কলেডিতে চড়ে বেড়াতেও যেতেন, শিকারেও বেরুতেন। গ্রামে-গঞ্জে ট্রাভেলও করতেন। তখন নৌকো, ঘোড়া আর পাল্কিই ছিল আমাদের প্রধান ট্রান্সপোর্ট। লোক দেখাতেই থাকত মোটর। রাস্তা কৈ? ঘোড়াটিকে দেখা হয়ে গেলেই, স্যার এক নিশ্বাসে বলতেন, "ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তাবৃষগজতুরগা।" আমরা ডার্কলেডির গলায় হাত বুলিয়ে দিতাম। স্যার বলতেন, " 'বৃষগজতুরগা' হয়ে গেল। এবার নাম্বার ফাইভ। দক্ষিণাবর্ত বহ্নি। ওরে ডানদিকে একটা প্রদীপ জ্বেলেছিস?" এটা প্রত্যেকবার একরকম হতো না। কোনোবার উঁচু পিতলের দীপদানে ১০৮ শিখা জ্বালা হতো—কোনোবার বা মালী শুকনো পাতা দিয়ে বাগানেই আমাদের ডানদিকে একটা ছোট বনফায়ার জ্বালাত। স্যার বলতেন —"দক্ষিণাবর্ত বহ্নি? হয়েছে। ও. কে.। এখন নাম্বার সিক্স। দিব্য স্ত্রী, পূর্ণকুম্ভা— ওরে, মাকে একটু ডেকে আন। জলভরা কলসী দিয়ে দিবি হাতে।" আমাদের সংসার স্ত্রী-হীন সংসার ছিল। কর্মচারী সকলেই পুরুষ। কেবল এই গার্ডিয়ান টিউটরের বর্ষীয়সী স্ত্রী, আর তাঁর বুড়ি ঝি একদিকে থাকতেন। তাঁর ছেলেরা বড় বড়, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মহিলা মোটেই অসুন্দরী নন। কিন্তু দিব্য-স্ত্রী বলতে কিশোরের চোখে যা ভেসে আসে, স্যারের গিন্নির সঙ্গে সেটা তো মেলে না? আমার তখন বয়স অল্প, কথাটা শুনে আমি বলেই ফেললাম—"কিন্তু স্যার, জ্যাঠাইমাকে...দিব্য-স্ত্রী?" স্যারের নির্দেশে জ্যাঠাইমা যখন জরির দাঁত দেওয়া লালপাড় কড়িয়াল শাড়ি, নাকে মস্ত ফাঁদি নথ, এক-গা গহনা, কপালে মস্ত সিঁদুর টিপটি পরে লাজুক হেসে সদরে এসে দাঁড়ালেন কাঁখে সোনার মতো ঝকঝকে পেতলের কলসিটি নিয়ে, তখন তাঁকে ঠিক মা দুগগার মতন দেখাচ্ছিল—এবং 'দিব্য-স্ত্রী' নন বলে মোটেই মনে হচ্ছিল না। তবু স্যার একটু ফিসফিস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাদের কানে কানে বললেন—"এখন এমন দেখছিস তাই,—বয়েসকালে এই জ্যাঠাইমারই ছিল রে— দিব্যরূপই ছিল! সিক্স, সেভেন, দিব্য-স্ত্রী, পূর্ণকুম্ভা। কমপ্লিট। এবারে নাম্বার এইট। দ্বিজ।" নিজের পা দুটি জোড়া করে, পৈতেটি ছুঁয়ে দাঁড়াতেন। দ্বিজদর্শন শেষ। "আইটেম নাইন। নৃপ। বড়কর্তার ছবি।" অমনি জম্পৎ রাই, আমাদের বৃদ্ধ কর্মচারী, আমার ঠাকুর্দা মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর মস্ত ছবিটা দু-হাতে জাপ্টে এনে ধরতো চোখের সামনে। "ফাইন। আইটেম নাইন নিয়ে যাও—নৃপদর্শন শেষ। এবারের আইটেম টেন—গণিকা—ও. কে.—টেন কমপ্লিট, গণিকা হলো, এবার পুষ্পমালা— মালী!" দাদা এতক্ষণে কথা বলে—"কৈ স্যার? টেন কোথায় কমপ্লিট? গণিকা তো হলো না? গণিকা দেখতে হবে না স্যার?" আমি অবাক হয়ে বললুম—"কিন্তু,

গণিকারা তো খারাপ স্যার? খারাপ জিনিস দেখতে আছে?" স্যার একটু মুশকিলে পড়লেন। দাড়িহীন গাল চুলকে নিয়ে প্রথমে দাদাকে উত্তর দিলেন—

"থাক, আইটেম টেন দেখে আর কাজ নেই। ওটা কেবল শ্রুত্বাই চালিয়ে নাও।" তারপর আমাকে জ্ঞান দিলেন—"ঠিকই বলেছ তুমি। এই বয়েসে গণিকা-টনিকা না দেখাই ভালো। যদিও গণিকাগৃহের দোরগোড়ার মাটি নিয়ে এসে পুজোর প্রতিমা তৈরি হয়। যাত্রারম্ভেও গণিকার মুখদর্শনে পুণ্য। তবু, সব কিছুরই যথাযথ সময় আছে—এখন ওটা শ্রুত্বার ওপর দিয়েই চলুক। নেক্সট—পুষ্পমালা। মালী! পুষ্পমালা, পতাকা কৈ? ইলেভেন, টুয়েলভ?" মালী অমনি গাঁদাফুলের মালা নিয়ে, আর হরনাথ বাগচি উল্টোদিক থেকে রঙিন ফ্ল্যাগের তৈরি মালা হাতে করে হাজির —আগেরদিন রাত্তিরে বসে বসে গঁদ, কাঁচি, রঙিন কাগজ আর সুতো নিয়ে গেঁথেছেন। —"ব্যস ব্যস—পুষ্পমালা, আর পতাকা।—বাবুর্চি?" বাঁয়ে বাবুর্চি অমনি একটা ডেকচি হাতে করে এসে দাঁড়ায়, তাতে টাটকা পাঁঠার মাংস, কাঁচারক্ত মাখা, দেখলেই গা গুলোয়। সদ্য ভাত খেয়েছি! "থার্টিন—সদ্য মাংস। বাঃ ঘি, ঘি কই? ঘৃতং বা? ফোর্টিন; ঠাকুর! ঘি নিয়ে এসো।" বলতে না বলতে ডাইনে বামুনঠাকুর এসে দাঁড়ায়, হাতে ঘিয়ের পাথরবাটি। গরম ঘিয়ের গন্ধে সদরটা ম ম করে...। কাঁচা-মাংসের স্মৃতিটা মুছে যায়। "—দধি, মধু, রজতং, কাঞ্চনং, শুক্লধান্যং—কই গো?" পাঁচটা জিনিস রুপোর থালায় যত্ন করে সাজিয়ে ধান, দই, মধু, রুপোর টাকা, সোনার গিনি সমেত সামনে এনে ধরে ঝি—একনজর সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে আমরা স্যারকে, আর স্যারের স্ত্রীকে প্রণাম করি। স্যারের স্ত্রী দইয়ের ফোঁটা পরিয়ে দেন কপালে।—"টোয়েন্টি আইটেমস কমপ্লিট—যাত্রা শুরু। এইবার—ড্রাইভার।" হাঁক পাড়েন স্যার। সদর থেকে হাতি-ঘোড়া সব কখন সরে গেছে—ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে আসে। টিউটর বিড়বিড় করেন, আর ভুরু কুঁচকে আঙুলের কড় গোনেন—"দেখি, কটা হলো—

ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা
দক্ষিণাবর্ত বহ্নি দিব্য-স্ত্রী পূর্ণকুম্ভা।
দ্বিজনৃপগণিকা পুষ্পমালাপতাকা
সদ্য মাংস ঘৃতং বা দধিমধুরজতং
কাঞ্চনং শুক্লধান্যং দৃষ্টা শ্রুত্বা পঠিত্বা।
ফলমিহ মানবে গন্তুকাম। পূজ্যপদে প্রণাম।

যাত্রা সুফলা হোক। শিবমস্তু। জয়মস্তু।" বলতে বলতেই উঠে বসতেন গাড়িতে। গাড়ি এবার রওনা হতো আমাদের নিয়ে ইশকুলের দিকে। পিছনে চেয়ে দেখতে পেতাম বাড়ির সামনে ভিড়। বিশাল এক বিচিত্র শোভাযাত্রা— গোরু বাছুর ষাঁড় হাতি ঘোড়া—কী নেই। তার মধ্যে স্যারের স্ত্রী ও কলসীভরা জল, আগুন, ঠাকুর্দার

ছবি নিয়ে জম্পৎ রাই, মালা নিয়ে মালী, পতাকা নিয়ে হরনাথবাবু, কাঁচামাংসের ডেকচি নিয়ে খুদাবক্স বাবুর্চি, ঘিয়ের বাটি নিয়ে শংকর ঠাকুর, দধি মধু রজত কাঞ্চন ধান্যসমেত থালা নিয়ে সুভদ্রা ঝি। সবাই মিলে আমাদের আপ্রাণ শুভকামনা করছে। কেবল গণিকাটিকে দেখা যেত না। অন্যলোকেরা দেখতে পেত না, কিন্তু সে থাকতো আমাদের মনে মনে একটা অচেনা বিচিত্র ভয়মাখানো প্রবল কৌতূহল হয়ে।—অবিশ্যি না দেখলেও তো ক্ষতি নেই। দৃষ্টা না হোক, শ্রুত্বা; সেও না হোক, পঠিত্বা হলেও সমান পুণ্য! আমাদের শাস্ত্রকাররা খুবই কনসিডারেট লোক ছিলেন। কী বলিস? আর স্যার ছিলেন আবার নিদারুণ শাস্ত্রজ্ঞ।"—চুরুটে লম্বা টান দিয়ে কুমারকাকা বলেন, "তাঁর ছাত্র হলে কি হবে, আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানটা আবার একেবারেই ঠিকমতন হয়নি। এই হিন্দুশাস্ত্রপাঠ নিয়েই আমার একবার দারুণ ঝামেলা হয়েছিল। তখন কোরিয়ান ওয়ার চলছে, আমি জাকার্তায়। একটা কাগজে পলিটিকাল করেসপণ্ডেট, কোরিয়া থেকে বঙ্গে পর্যন্ত আমার এরিয়া। (ওই সময়ই তো এই জাপানী যোগাযোগটা হলো)। একবার দুটো বক্তৃতা দিতে বললে আমাকে জাকার্তায়, একটা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। প্রথম বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু কোরিয়ার যুদ্ধ। কোনোই অসুবিধা হলো না বলতে। আমারই তো সাবজেক্ট। দ্বিতীয় দিন বক্তৃতা দিতে বললে, 'অন মন্দোদরী'। আমি তো ট্যারা। মন্দোদরীর উপরে বক্তৃতা? কী বলব? ওরা বললে—'আসলে এটা একটা ইনডিয়া-ইনডোনেশিয়া কালচারাল এক্সচেঞ্জের প্রশ্ন।'—মন্দোদরীর মন্দির আছে অনেক, ইন্দোনেশিয়ায়। মন্দোদরী সেখানে মহাসতী; সতীত্বের প্রতীক। আমি বেচারী ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেলাম। আমার কেবলই মনে পড়ে যেতে লাগল, ছেলেবেলায়, দেশে, সাহেবালির কাছে শোনা মন্দোদরীর গপ্পোটা। সেটা বললে তো চলবে না!

সাহেবালি ছিল পাঠান বডিগার্ড, আমার বাবার। বাবাকে ছেলেবেলা থেকেই সে সামলাচ্ছে। ঠাকুরদার পলিসি ছিল—"পয়লা দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারি।" প্রথমেই চেহারাটা কেমন, তার ওপর ঠাকুর্দা প্রচুর গুরুত্ব দিতেন। ফলে বাড়ির কর্মচারীরা সবাই কাজের হোক না হোক, দেখতে প্রত্যেকেই খুব টুকটুকে ফুটফুটে ছিল। সাহেবালি খান সবচেয়ে ভালো দেখতে। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, জোব্বাজাব্বা সব পেশোয়ারী, মাথায় লাল কুল্লা পাগড়ি, আরো এতখানি উঁচু হয়ে আছে—কোমরে ইয়াবড়া তরোয়াল ঝুলছে (ভারী কী!) জরির কোমরবন্দ থেকে, গোলাপী রঙের চামড়া, নীল চোখ, আমাদের সাহেবালিকে দারুণ পছন্দ ছিল। সারাক্ষণ ওর পিছু-পিছুই ঘুরঘুর করি। সন্ধ্যাবেলায় রোজ কর্মচারীদের গল্পের আসর বসে। কোনোদিন জম্পৎ রাই গল্প বলে, কোনোদিন হরনাথ বাগচি বলেন, কোনোদিন ঠুনোবুড়ো। এই ঠুনোবুড়োর যে বাড়িতে কী কাজ ছিল, কেন এবং কবে যে সে এসেছিল, তা আমরা জানতাম না। তখন সে থুত্থুরে বৃদ্ধ। তিনমাথা এক করে বসে থাকে, আর খুব ভালো ভালো গল্প বলে। আমরা ভাবতাম গল্প বলাই ঠুনোবুড়োর চাকরি।

তার পৈতৃক নামও কেউ জানতো না। কিন্তু এক-একদিন শংকর ঠাকুর, কি ড্রাইভার হরিরামও এসে উড়িশা, বিহারের গল্প বলত আমাদের। সাহেবালি একদিন বললে—আজ সে গল্প বলবে। সাহেবালির ধারণা হয়েছে, আমরা বড় বেশি সাহেবি হয়ে যাচ্ছি, নিজের দেশের পুরাণ-টুরাণ শেখা হচ্ছে না। তাই সেটা সে নিজেই শেখাবে। —"রামায়ণের গল্প জানো?" আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। জানি, আবার জানিও না। রামসীতার গল্পটা কে না জানে? আমরাও ওটা মোটামুটি জানি, তবে ওর যে বহু ডিটেলস আছে যা আমরা জানি না, সে খবরও জানি! সাহেবালি আমাদের অনিশ্চয়তা দেখে খুব বিরক্ত হলো; এবং বলল—"আপনা দেশঘরকা কহানিয়াঁ সবসে পহেলে সুননা চাহিয়ে। এক বহুৎ বঢ়িয়া রাজা থা, উসকা নাম থা রাবণা। রাবণা রাজানে সুনা রামকো এক খুবসুরৎ জরু হ্যায়—বাস, উসনে জলদি গিয়া, ঔর রামাকো জরুকো উঠাকে আপনা প্যালেসমে লায়া। লেকিন রামা ভি বঢ়িয়া ফাইটার থা। উসকা মিলিটারি উলিটারি কুছভি নহী থা তো উসনে ক্যা কিয়া? জঙ্গল কা ভল্লু-উল্লু বান্দর-উন্দর সব একসাথ করকে অ্যায়সা ট্রেনিং দে দিয়া, বাস ওহী লে কর রাবণাকো অ্যাটাক কিয়া। মার বি ডালা, খতম। রাবণাকো এক বেগম থী, মান্দৌদুয়ারী। উসনে রামাকো গোড় লাগ গিয়া, ঔর কহা, রামা, হাম রাবণাকো প্যার নহী করতী, হাম তুমসে প্যার করতী হুঁ, তুম হামকো শাদি কর লো। রামানে তো বাৎ সুনাই নেহী, সীতা কো উঠা লেকর ঘর ভাগ রহা।—তব মান্দৌদুয়ারী নে উসকা পিছে পড়া ঔর ফিরসে কহা: রামা, তুম হামকো শাদী কর লো। তব রামানে কহা—মান্দৌদুয়ারী, মেরী প্যারী, মেরে পাস তো এক জরু হ্যায়। হাম তুমকো শাদি নহী কর সকতা—লেকিন—হাঁ, নিকাহ কর সকেঙ্গে।"—রাম মন্দোদরীকে নিকাহ্ করেছিল কিনা, শেষটা আর সাহেবালি বলতে পারেনি। এতদূর গল্প শুনেই হরনাথ বাগচি ক্ষেপে উঠে লাঠি তুলে ওকে মারতে গেলেন। ফলে গল্পের আসর ভেঙে গেল। ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয় লেকচারটাও আমার তাই স্থগিতই রইল। চিরদিনের জন্য।"

মা ইতিমধ্যে গরম গরম কাটলেট নিয়ে এলেন, তার গা থেকে মুরগীর ঠ্যাং বেরিয়ে আছে খোঁচা হয়ে, দেখেই কুমারকাকা বলেন, "টাংরী কাবাবের কথাটা মনে পড়ছে। বহুকাল আগের কথা। তখন আমাদের বাড়িতে পাঁঠার মাংস ছাড়া আর কোনো মাংস ঢোকে না। কুমড়ো বলি হতো পুজোর সময়, মহিষ-ছাগল কিছু না। অতি কষ্টে বাবা বাড়িতে পাঁঠার মাংসটা ঢোকালেন। তাও বাইরের বাড়ির উনুনে রান্না হতো। ভেতর-হেঁশেলে নয়। আমাদের গার্জেন টিউটর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যেহেতু তাঁর আপত্তি। মুরগীর ডিমও রান্নাঘরে ঢোকানো বারণ, মুরগীর মাংস তো দূরস্থান। অথচ বাবা মুরগী খান, আমাদের চিকেন স্যাণ্ডউইচ প্রচুর খাওয়ান। কিন্তু বাড়িতে নয়। বাবা-মা কলকাতায় নেই, কিন্তু আমরা তখন আছি। বাধ্য হয়ে। দাদা পরের বছর

এন্ট্রেস দেবে। আগেকার সেই গার্ডিয়ান টিউটরের হেফাজতেই আছি। পণ্ডিত জানকীবল্লভ চক্রবর্তী। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরেই মামারবাড়ি। বড়মামা রোজই খোঁজ নিয়ে যান। আমাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত।"

"বাবা খুব কুস্তি পছন্দ করতেন। বসার ঘরে বাবার গম্ভীর সব ফ্রেমে বাঁধানো ফোটো ছিল, গোবরের সঙ্গে, বড়মামার সঙ্গে। ফলে আমাদের জন্যে রোজ ভোরবেলা কুস্তিগীর আসতো, কুস্তি শেখাতে। ভোর পাঁচটায় দিন শুরু হতো হুপহাপ করে কুস্তি দিয়ে। ছ'টায় স্নানের পর গার্ডিয়ান টিউটর সংস্কৃত বেদমন্ত্র, গীতা, শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়াতেন। প্রথমে গায়ত্রী পড়িয়ে, কোশাকুশি নিয়ে জপ-টপ করিয়ে নিতেন। প্রত্যূষে শাস্ত্রপাঠের পরে ব্রেকফাস্ট। তারপর অঙ্ক স্যার। তারপর ইংরিজি স্যার। এইরকম সারাদিন চলত। গার্ডিয়ান টিউটরই সব রুটিন তৈরি করতেন, কোন টিচার কখন এসে কী পড়াবেন। সন্ধ্যাবেলা আমরা নিজেরাই পড়তে বসতুম। তত্ত্বাবধান উনি নিজে করতেন। এবং সংস্কৃত টেক্সট, যাবতীয় পাঠ্য তখনই আমাদের পড়াতেন। ব্যাকরণ, ট্রানস্লেশন ইত্যাদি। কলকাতায় থাকার কিছুদিন পরে আবিষ্কার করলুম সন্ধ্যাবেলায় আমরা দু'ভাই নিজেরাই বসে বসে পড়ি। ঠুনোবুড়ো আধঘুমন্ত হয়ে পাহারা দেয়। কিংবা সাহেবালি তরোয়াল নিয়ে পাহারা দেয়। সংস্কৃত পড়াই বন্ধ। এদিকে দাদার টেস্টও এসে গেছে। সন্ধেবেলায় কোনোদিন আর স্যার বাড়িতে থাকেন না। স্যার যান কোথায়? সাহেবালিকেই বললুম—'রোজ সন্ধ্যাবেলায় স্যার কোথায় যাচ্ছেন? জেনে দাও।'

শুনে সরল সাহেবালি বললে—"স্যার কো পুছো না?" বেশ! স্যারকে পুছতে তিনি বললেন—একটা জরুরি রিসার্চের কাজ করতে বেদান্ত সোসাইটির লাইব্রেরিতে যান। কাজটা শেষ হলেই আর যেতে হবে না। দাদা বলল, "বাজে কথা। স্যার অনেক রাত করে ফেরেন আজকাল। লাইব্রেরিতে অতক্ষণ থাকতে দেবে নাকি? হতেই পারে না।" ফের ধরো সাহেবালিকে।

এবার সাহেবালি ঠিক খবর এনে দিল। নিজেও কম বিচলিত হয়নি। স্যার নাকি প্রত্যেকদিন আমারই মামারবাড়িতে যান। সেখানে কোনোই বেদান্ত সোসাইটি নেই!

যদিও আমাদের মতো অতবড় তালুক মামাদের নেই, তবু মা যে আমাদের রাজকন্যা, এতে সন্দেহ ছিল না। দাদামশাই ধরণীকান্ত স্বদেশী করলে কি হবে, বড় হয়ে মামারা সবাই বিলেত গিয়ে বখে গেছেন। মামাবাড়ির বৈঠকখানা যেন একটা বিলিতি ক্লাব। যে যত খুশি বিলিতি মদ খাচ্ছে, তাস পিটছে, জুয়োয় টাকা হারছে এবং কষে মুরগী মাটন কাবাব রোস্ট খাচ্ছে। আমাদের মামাবাড়িতে বেড়াতে যাওয়া বারণ ছিল, এক "কাজের বাড়িতে" ছাড়া। সেই নিষিদ্ধ মামাবাড়িতেই কি না আমাদের বেদজ্ঞ পণ্ডিত প্রত্যহ যাচ্ছেন? রোজ রোজ ওখানে তাঁর কী এত কাজ? বড়মামার সঙ্গে ওঁর হিন্দু স্কুলের ক্লাস-ফ্রেণ্ড হিসেবে ছোট থেকেই অবিশ্যি বন্ধুতা আছে, তা বলে এত? আমাদের সন্ধেবেলার পড়াশুনো মাথায় উঠেছে, সংস্কৃত

ভুলেও গেছি। একদিন বড়মামা আসতেই দাদা বললে, "বড়মামা, স্যার আর আমাদের সন্ধেবেলায় পড়ান না। বেদান্ত সোসাইটি লাইব্রেরিতে রিসার্চ করতে চলে যান প্রত্যেকদিন। এতে আমাদের খুব ক্ষতি হচ্ছে, সামনেই পরীক্ষা। তার ওপর এত বৈদান্তিক পড়াশুনো করে স্যার বেজায় কনজারভেটিভ হয়ে যাচ্ছেন, হপ্তায় মাত্র একদিন মাংসরান্না হয়। কলকাতায় সবাই মুরগীর ডিম খায়, মুগরীও খায়, কেবল আমাদের বাড়িতেই সব বারণ। এত বামনাই কি আজকালকার দিনে কেউ করে? আপনি প্লিজ একটু ওঁকে বুঝিয়ে বেদান্ত সোসাইটি বন্ধ করুন—আমাদের টেস্ট পরীক্ষা সামনে। ওজনও কমে যাচ্ছে।"

"তাই তো? ডিম খেতে দেয় না? মুরগীও না? জানকীটা তো আচ্ছা গোলমেলে বামুন হয়েছে?" বড়মামা চোখ বড় বড় করে নকল রাগ করলেন। "নাঃ, ওকে তো বলতেই হবে দেখছি। ঠিকই বলেছিস, ঐ বেদান্ত সোসাইটি করে-করেই ওর মনটা আরোই পিছনদিকে চলে যাচ্ছে।" বড়মামা কিছুক্ষণ হাসি-হাসি মুখে চুপ করে ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোরা দুজনে এক কাজ কর। কালকে সন্ধের মুখে আমাদের বাড়ি চলে আসবি। বৈঠকখানায় পর্দার আড়ালে চুপটি করে লুকিয়ে বসে থাকবি। দেখবি কী হয়। খুব মজা হবে, দেখিস! জানকীকে বলিস না!" আমরা তো বিকেল থেকেই নাচছি। স্যারকে না-বলে মজা দেখব!—"সাহেবালি, নিয়ে চলো। বড়মামা বলেছেন।" কিন্তু গার্ডিয়ান টিউটরের অনুমতি ভিন্ন আমাদের কিছুতেই সাহেবালি নিয়ে যাবে না। বড়মামা তো এদিকে বারণ করেছেন স্যারকে বলতে। কী করি? মহা মুশকিল হলো।

গার্ডিয়ান টিউটরের অনুমতি ভিন্ন আমাদের বাড়ি থেকে এক পা বেরুনোর নিয়ম ছিল না। তা তিনি যখন বলেননি, তখন ড্রাইভারও নিয়ে যাবে না। এক সাহেবালিই ভরসা। সে বাবাকে মানুষ-করা বডিগার্ড বলে কথা। এখানে বাবা তাকেই আমাদের কাছে রেখে দিয়েছেন, বাবার কাছে আছে সাহেবালির ছেলে, গোলামালি। মামার বারণ আছে শুনে সাহেবালি খানিক কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, "ঠিক আছে। কাপড়া লাগাও।"

আমাদের মামাবাড়িতে যেতে খুব ভালো লাগত। নিষিদ্ধ ছিল বলেই বোধহয়। আর দিদিমা ছিলেন বলে মামাবাড়িতে গেলে রাণী ভবানীর কালের অনেক গল্প দিদিমার মুখে শোনা যেত। পিতৃকুলে, মাতৃকুলে, আমরা দু'পক্ষেই কেমন করে যেন রাণী ভবানীর সঙ্গে জড়ানো। আমাদের বাড়িতে দু-হাজার কলসী গঙ্গাজল লাগতো বছরে। দিদিমাদের লাগতো আরেকটু কম। কিন্তু আমাদের উত্তরবঙ্গের বাস তো গঙ্গার ওপর নয়। খুব কষ্ট করেই প্রত্যেক বছর অন্যের জায়গা থেকে জল আনতে হতো। রাণী ভবানী, তাই, জামাইকে গঙ্গাজলের সুবিধার জন্য বহরমপুর মৌজাটি লিখে দিলেন। যদিও রাজা-জামাইয়ের অবস্থা মোটেই খারাপ ছিল না, তবু জামাইবাড়ি থেকে মেয়ে যখন লিখল, "এইসব অঞ্চলে তেমন ভালো রেশমী বস্ত্র পাওয়া যায়

না," তার উত্তরে তখন রানী ভবানীর খাগের কলমে মোটামোটা করে লেখা একটা সই করা কাগজ এল, এই বলে যে, 'রেশমবস্ত্রের জন্য বগুড়ার ডামাজানী জামাতা বাবাজীবনকে মৌজা দেওয়া হইল'। ডামাজানী তখন বগুড়া সিল্কের ঘাঁটি, শ্রেষ্ঠ এণ্ডির কাপড় তৈরি হতো সেখানে। দিদিমা বলেন, "এমনি করে-করেই আমরা দিনে দিনে চন্দ্রকলার মতো বৃদ্ধি পেয়েছি। আর তাঁরা কমেছেন।"

দিদিমার কাছে গেলে আমাদের খুব ভালো লাগে। অথচ মা-মাসী কেউ সঙ্গে না গেলে ও-বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ। মদে-মাংসে-জুয়ায় ওটা একটা বিলিতি ক্লাবহাউসের মতো হয়েছিল। ছোট ছেলেদের পক্ষে বিষবৎ। তবে এসব কাণ্ড হতো বারবাড়িতে। তারপর লন, বাগান পেরিয়ে অন্দরে দাদু-দিদিমার মহল। সেখানে একেবারে আলাদা আবহাওয়া। মামাবাড়িটা ছিল সাহেবপাড়ার মাঝখানে। আমরা মামাবাড়ি গিয়ে দিদিমার কাছে না গিয়ে বারবাড়িতে ঢুকছি, সাহেবালি তো মহা আপত্তি শুরু করেছে। ওখানে ছোটদের যাওয়া নিষেধ। আমি বললুম, "বড়মামাকে জিজ্ঞেস করে এস, যাও।" বড়মামার অনুমতি নিয়ে এলেই হবে না, দিদিমার মতও চাই। সাহেবালিকে শেষ পর্যন্ত রাজি করানো গেল। আমরা তো ফাঁকা বৈঠকখানায় ঢুকে বিরাট বিরাট ফ্রেঞ্চ উইনডোর সামনে বিশাল ভারী মখমলের পর্দার পিছনে লুকিয়ে বসে আছি। একসময়ে মাইফেল শুরু হলো। মশাদের খুব মজা। আমাদের বাগে পেয়ে মনের সুখে কামড়াচ্ছে। পাগলের মতন কেবল মশা মারছি, শব্দ না করে, আর মুগ্ধ নেত্রে 'নিষিদ্ধ দৃশ্য' দেখছি। অবশ্য ক্রমশ ঘরে এতই হৈ চৈ হল্লোড় শুরু হয়ে গেল, যে চড়চাপড়ের তুচ্ছ শব্দ কারুর কানেই যেত না। মামারা তিন ভাই আছেন, তাঁদের মোসায়েবরা আছেন। কয়েকজন সাহেবও আছে। হুইসকি চলছে। ফ্ল্যাশ, রামি, ব্রিজ খেলা হচ্ছে। আর শামী কাবাব, টাংরী কাবাবের পাত্র আসছে তো আসছেই। আর তারই মধ্যে গলায় গরদের চাদর, মাথায় শিখা, পায়ে বিদ্যাসাগরী লাল চটি, আমাদের স্যারমশাই বসে বসে খুব ফুর্তিসে বেদান্ত সোসাইটির জরুরি রিসার্চ করছেন। দুইহাতে সুদীর্ঘ টাংরী কাবাব ধরে দাঁতে বসাচ্ছেন। টাংরী কাবাব জানিস তো? মুরগীর ঠ্যাং দিয়ে তৈরি হয়। দেখে ফিসফিস করে দাদা আমাকে বললে, "চল, বেরুই। এই হচ্ছে দ্য রাইট মোমেন্ট।" আমি ভয় পাচ্ছি। এই তো শেষ মোমেন্ট নয়, তারপর তো বাড়ি যেতেই হবে। দাদা বললে, "ধুৎ, কিছু হবে না, ক্যট রেড হ্যানডেড। টাংরী হ্যানডেড।" আমরা গুড়ি মেরে পর্দার পিছন থেকে বেরিয়ে স্যারের পিছনে গিয়ে ডুয়েটে ডাকলুম, "স্যার!" স্যারের হাত কেঁপে কাবাব পড়ে গেল। বড়মামাই ধরে ফেললেন। স্যার কিন্তু দারুণ স্মার্ট! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে কথা! আমরা মুখ খোলবার আগেই, "কার সঙ্গে এসেছ? দরওয়ান কেন তোমাদের বেরুতে দিয়েছে এত রাতে? ড্রাইভার কেন তোমাদের এনেছে? কার অনুমতিতে তোমরা এখন হোমওয়ার্ক না করে—", দাদা বললে, "স্যার, আপনি নিজে কাছে না বসলে আমাদের হোমওয়ার্ক কে করাবে? তাই তো আপনাকে ডাকতেই এসেছি!" স্যারের সেই

এক কথা। "কিন্তু দরওয়ান কেন? কিন্তু ড্রাইভার কেন—?" দাদা বললে, "আমরা হেঁটেই এসেছি।" কাবাবের গন্ধে ঘর ম ম করছে। স্যার খেতে-খেতে জেরা করছেন। "আমরাও একটা করে কি টাংরী কাবাব খেতে পারি স্যার?" আমি আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললুম। চোখ কপালে তুলে স্যার বললেন, "কুক্কুট মাংস? মোটেই খাবে না। তোমাদের না উপনয়ন হয়েছে? তোমরা কুক্কুট মাংস স্পর্শমাত্র করবে না। ব্রহ্মচর্যের মধ্যে যত ম্লেচ্ছাচার।" বলে টাংরী কাবাবে মন দিলেন।

"আপনার উপনয়ন হয়নি স্যার?" দাদা বললে।

"আমার কথা আলাদা। আমি যা করি, তা ভেবেচিন্তেই করি। প্রথমত, আমি এখন ব্রহ্মচারী নই, গার্হস্থ্য আশ্রমে আছি। সেটা অনেক কম কঠোর। দ্বিতীয়ত, এটা রাজদ্বার। আমি রাজকুমার যামিনীকান্ত, রজনীকান্ত, রমণীকান্ত তিনজনের সামনে বসে আছি। রাজদ্বারে সবই মার্জনীয়। এমনকী ভিতরবাড়িতে স্বয়ং রাজা ধরণীকান্তও আছেন। মনে রেখো, রাজদ্বারে সব মার্জনীয়। তৃতীয়ত, অধিকারী ভেদ আছে। অধিকারী হওয়া চাই। আমি বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ। অধিকারী বলেই এমন অনেক কিছু করতে পারি, যা ব্রহ্মচারী অবস্থায় তোমরা আপোগণ্ডরা এখনই পারো না। আমার হৃদয়ে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত, আমি যাই খাই, যেখানেই যাই, অশুচি হই না, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং—বুঝলে হে ছোকরাদ্বয়, টাংরী কাবাব আমার চলতে পারে, কিন্তু তোমাদের চলে না।"

"কিন্তু আমরাও তো রাজদ্বারে"—দাদা তবু কথা কয়।

"না, তোমরা মাতুলালয়ে।" স্যার দাদাকে মাটিতে মিশিয়ে দেন।

এবার বড়মামা এগিয়ে এসে আমাদের হাতে টাংরী কাবাব তুলে দিয়ে, হেসে বললেন, "এই নে। নে, তোদের অধিকারী করে দিলাম। আর তিনবার মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ বলে নে, তোরাও ইন অ্যাণ্ড আউট শুচি হয়ে যাবি, ও-মন্ত্রসকলের জন্য। সবার বেলায়ই এক কাজ দেবে। কেন ভাই জানকীবল্লভ এদের এত কষ্ট দিচ্ছ? বারবাড়িতে বাবুর্চির কিচেনে মুরগীটা চালু করে দিলেই পারো এবার। মাংস তো হচ্ছেই। তাহলে তুমিও বাড়িতে বসেই রুচিমতন মুরগী খেতে-টেতে পারো—হুইস্কিতে তোমার তো আসক্তি নেই। তাসেও না।"

সাহেবালির সঙ্গে আমরা তিনজনেই ফিরলাম। হেঁটে। পরদিন থেকে স্যারের বেদান্ত সোসাইটির রিসার্চের পরিসমাপ্তি ঘটল। খুদাবক্স আমাদের বাড়িতেই টাংরী কাবাব তৈরি করতে লাগল, ব্রেকফাস্টে মুরগীর ডিমের পোচ খাওয়া চালু হলো এবং যথানিয়মে রোজ সন্ধ্যায় আবার আমরা সংস্কৃত পড়তে বসলাম।

দাদামণির আংটি

কী কুক্ষণেই যে অতোবড়ো শান্তিনিকেতনী চামড়ার থলেটা এনেছিলুম। ওঃ! না-হয় সস্তাই হয়েছে ফুলকপি, তাব'লে এ্যাতো কিনতে হবে?

—হ্যাঁ, হবে। ফুলকপির সিঙাড়া, ফুলকপির ডালনা, ফুলকপি ভাজা, এ্যাতোরকম গুষ্টির পিণ্ডি হবে কিসে? মেনু অরডারের বেলায় তো বাদশাই চাল।

—তোমার ভাষাটা একটু বদলাও। এ-যুগে ওরকম প্রাইমিভাল ল্যাংগুয়েজ আর চলে না। বুঝলে গিন্নি? একটু পালিশ চড়াও।

—আর ফিউড্যাল অরডারগুলো চলে, না? হ্যান বাঁধেগা, ত্যান বাঁধেগা, তারবেলা? বিয়ে তো করেছো একটা রাঁধুনিকে, দরকার কী ছিল ইংরিজি অনার্সের? শুনি? নো নীড...পালিশ তো ছিলই। সব উঠে গেছে—

—কী করবো, কুকিং অনার্স তো এখনো চালু হয়নি, হোটেল ম্যানেজমেণ্ট লেভেলে এখন যদি-বা! তোমাদের উইমেন্স লিব-এ এই সমস্তই করা উচিত। মেয়েদের নিজস্ব জগৎ গড়ার ব্যবস্থা নেই—

—কে বলেছে নেই? নিউট্রিশানের অনার্স কোর্স হয়, হোমসায়েন্সে হয়। কিন্তু, এই সবই যে উইমেন্স লিব সেটা তোমাকে কে বলেছে? বরং এর উল্টোটাই।

—উইমেন্স লিব তাহলে কী? উইমেন্স ঔন ওয়ার্লড তো? তার মানেই কিচেন? —দা ওয়ে টু আ ম্যানস হার্ট ইজ থ্রু...

—নিকুচি করেছে কিচেনের। এক্ষুনি ছুঁড়ে ফেলে দোবো তোমার ফুলকপির থলি—কে চায় পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে? নোংরা জায়গা, কেবল অ্যামবিশান দিয়ে ভর্তি, আর লোভ দিয়ে। তোমরা ভাবো মেয়েদের আর কাজ নেই, কেবল পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশের জন্যে হন্যে হয়ে অলি-গলি খুঁজছে?—সে-সব দিন আর নেই গো—গন ফরেভার! ওইসা দিন ঔর নেহী আয়েগা—বুঝলে স্যার?

—এই ফুলকপির পাহাড় রান্না তোমাকে নিজেই করতে হবে জেনে-শুনেও তো কিনলে? কেন কিনলে? কেউ কি সেধেছিল? টেল মি দ্যাট। হু ফোর্সড য়ু। যত্তোসব।

বেশ করেছি। অসম্ভব সস্তায় পাচ্ছি, তায় রিকশায় চড়ে আসতেই হবে, রাত হয়েছে, তোমার পকেটে অতগুনো টাকা। পথে একটু বাজার করে নিলে ক্ষতি কী? বইতে তো হচ্ছে না।

—কিন্তু এই যে পায়ের কাছে কয়লার বস্তার মতন এক বিপুল, যতই কারুকার্য করা হোক, সব্জীর বস্তা—এতে জার্নিটা খুবই আনকমফর্টেবল—

—রোজ রোজ তো যাওয়া হয় না ওদিকে, এক হপ্তার বাজার যে হয়ে গেল, সেটা ভাবছো না?—জার্নি আনকমফর্টেবল তো এরপরে হেলিকপ্টারে বাড়ি ফিরো।

গাড়ি তো একটা কিনতে পারলে না। পঁচিশ বছর ধরে শুনে গেলুম কিনছি কিনছি।

—ট্যাক্সি থাকতে গাড়ি কেনে কেবল মূর্খরা আর কালোবাজারিরা। পঁচিশ বছর আগে আমি মূর্খ ছিলাম। অবভিয়াসলি।

—আমিও। ট্যাক্সি তো জীবনেও ধরতে পারো না। ধরো তো কেবল রিকশা।

—ট্যাক্সিশালারা যেতে চায় না যে! রিকশাওলারা ভদ্রলোক, প্রপার জেন্টেলমেন। চাইলেই পাবে—এবার থলেটা তোমার পায়ের দিকে শিফট করছি। অনেকক্ষণ শিটিয়ে বসে বসে ডান পাটা কেমন মানকচুর মতন হেভী ফিল করছি—

—"এই রিকশা, রোককে"—কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল রাস্তায়। সাঁ-করে হঠাৎ একটা মোটরসাইকেল পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল। আর থামা দূরের কথা, রিকশাওলা রেসের ঘোড়া হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলে। দাদামণি অমনি অস্থির—

—আশ্চর্য তো। থামতে বলছে আর তুমি ছুটছো? নিশ্চয় দে নীড সামথিং। এ্যাই রিকশা। রোককে! রোককে! সামবডি মাস্ট বি ইল। নির্ঘাৎ শালারা ট্যাক্সি পাচ্ছে না তাই রিকশা খুঁজছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কাউকে—নাও, এবারে বওগে তোমার একমণ সস্তার সব্জীর বস্তা—ইতিমধ্যে মোটরসাইকেল রিকশার সামনে এসে ব্যাঁকা হয়ে থেমেছে। রিকশাওলার না দাঁড়িয়ে উপায় নেই, কিন্তু রিকশা সে নামায়নি। চড়া গলায় বললে—ক্যা মাংতা? রুখা কাহে কো? পাসিঞ্জার হ্যায়—

—চুপ রও, উল্লু কাঁহাকা। ছুটতা থা কিঁউ? বলতে বলতে আরোহী দু'জন মোটরসাইকেল গাছতলায় পার্ক করে নেমে এল। একজন দাদামণির পেটে একটা খোলা ভোজালি ধরল। অন্যহাতে সব্জীর থলেটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে মোটরসাইকেলের পার্শ্বস্থ ক্যারিয়ার-খাঁচায় ভরে দিল। তারপর বাঁ হাতটা পেতে বললে—"যা আছে দিয়ে দিন।" কালবিলম্ব না করে স্বয়ংক্রিয় অঙ্গুলি তুলে ইনোসেন্টলি দাদামণি সোজা বউদির দিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—"যথাসর্বস্ব ঐ ভ্যানিটি ব্যাগে দাদা। পকেটে কেবল প্রাণটি।" অন্য ছেলেটি ইতিমধ্যে বউদির দিকে একটা বেঁটে নলপানা যন্ত্র তুলে ধরে বলছে—"গয়নাগাটি গা থেকে সব খুলে দিন বউদি—", তার কথায় কর্ণপাত না করে রুদ্ধশ্বাসে বউদি চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওগো, ওই বোধহয় সেই জিনিস না গো, পাইপগান না কী যেন বলে? কাগজে ওটার নাম সেই কবে থেকে পড়ছি—এ্যাদ্দিনে স্বচক্ষে দেখা হলো—এটাই তো পাইপগান, না ভাই?" বন্দুক-হাতে ভাইটি তার ফলে বউদির হাঁটুতে ঠাঁই করে হঠাৎ একটা ঠোক্কর মেরে বললে—"মেলা চেল্লাবেন না বউদি, দয়া করে—গয়নাগুলো খুলে দিন—", এদিকে বউদির পা'টি ঘা খেয়েই ডাক্তারী হাতুড়ি-পরীক্ষার মতো সাঁ করে লাফিয়ে উঠে ছেলেটার বুকে অটোমেটিক্যালি লাথি মেরে ফেলল, ফলে ক্ষিপ্ত ছেলেটি বউদির পায়ের হাড়ে, আরেক ঘা ঠাঁই করে মেরে বললে, "লাথি মারছেন? সাহস তো কম নয়?" স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বউদি বললেন—"তোমার বন্দুকে গুলি নেই বোঝাই যাচ্ছে। থাকলে অমন

রুলারের মতো ঠাঁই-ঠুঁই যত্রতত্র চালাতে না। আর ওটাকে বলে অটোমেটিক রিফ্লেক্স। এটাও পড়নি?" দাদামণির বুকে ভোজালি-ধরা ছেলেটা বাঁ হাত বাড়িয়েই বউদির ব্যাগটা কেড়ে নিলে এবার। পাইপগানওলা ছেলেটা যেই বউদির ঘড়িটা খুলতে হাত বাড়িয়েছে—"ছোঁবেন না বলছি—ছোঁবেন না বলছি, মেয়েছেলের গায়ে হাত দিলে এ্যাইসা শিক্ষা দিয়ে দেবো—" বলে বউদি বিনা নোটিসে হঠাৎ চিল চেঁচিয়ে উঠলেন—"ঘড়ি কি আমি নিজে খুলতে জানি না? ছিনতাইও করবেন, অথচ ঘড়িটা খুলতে দু-মিনিট ধৈর্যি নেই গা?" বউদি ঘড়ি খুলে ধীরে-সুস্থেই ছেলেটার হাতে দিলেন। এবং বললেন—"হাতের চুড়িও নকল, কানের ফুলও নকল, আর গলার মালাটা পুঁতির। চাই? পরে ধরে থাপ্পড়-টাপ্পড় মারলে কিন্তু ভালো হবে না! কেউ এত রাত্তিরে আপনাদের উবগার করবে বলে সোনার গয়না পরে বের হয় না রাস্তায়।" ছেলেটা বললে—"কোনো কথা না বলে হাতের চুড়ি কানের রিং—",

—"ও ভাই, ব্যাগে আমার অ্যানুয়ালের নম্বরগুলো আছে, ঐ দরকারী কাগজগুলো বেছে নিতে দিন, কেমন? আপনাদের তো—"

—"অতো কথা বলবেন না। কাগজপত্র সর্ট-আউট করবার সময় নেই।—চুড়ি খুলে দিন, আসল-নকল আমরা বুঝবো। মালাটা পুতির হলে চাই না।" ভোজালি ততক্ষণে দাদামণির বিয়ের ঘড়িটাও বাগিয়ে নিয়েছে, আর বুকপকেট থেকে পার্সটা তুলে নিয়েছে। রিকশাওলা বললে—"আবতো কামউম সারে খতম? হামকো ছোড় দো। ভুখ লাগা,সাড়ে দশ বাজ গিয়া—" তাকেও এক গোত্তা মেরে পাইপগান বললে —"আগে গেঁজে খোল। গেঁজে খোল। দে, টাকা বের করে দে"—এবার ক্ষিপ্ত রিকশাওলা বললে—"বাবু, ইয়ে আপ ক্যা কর রহেঁ হ্যায়, হাম গরীব আদমি—হামকো পৈসা চোরি করনা ঠিক নাহী, আপলোক তো রইস আদমী", ভোজালী বললে— "আরে আরে, ওকে ছেড়ে দে—চ' আর দেরি করিস না, শেষে ওরা রাউণ্ডে এসে পড়বে"—গোবদা শান্তিনিকেতনী চামড়ার ব্যাগে ছদ্মবেশী সজ্জির থলি, দু-দুটো ঘড়ি, দাদার পার্স আর বউদির হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে ওরা গরর করে মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। মনে হলো, যাবার সময় কী যেন ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।

২

ইতিমধ্যে সামনে এক বাড়ির দরজা খুলে গেল। আলোর ফ্রেমে এক ভদ্রমহিলাকে আলুথালু বেশে ছুটে আসতে দেখা গেল। তিনি চেঁচাতে লাগলেন। পিছু পিছু পাজামা-পরা এক ভদ্রলোক পাল্লা দিয়ে ছুটে, তাঁর আঁচল ধরে টানতে লাগলেন—"থামো! ওগো, থামো! কই যাও"—ভদ্রমহিলা চেঁচিয়েই চললেন—"চোর! চোর! ছিনতাই! ছিনতাই! পালালো! পালালো! পাকড়ো! পাকড়ো!" বউদিও সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলালেন। রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল। হাল ছেড়ে, রিকশাওলা এবারে হাতলটা মাটিতে নামিয়ে, সরে গিয়ে ফুটপাথে বসে পড়ল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে আপনমনে

বলল, "রাম! রাম! শালে ডাকু, বদমাস!"

বউদি বললেন—"শান্তিনিকেতনী থলেতে সব্জী আছে বুঝলে, ওরা ওটা নিত না। অল্পবয়সী ছেলে তো। বুঝতে পারেনি। ভেবেছে হয়তো কাপড়চোপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছি"—

দাদামণি বললেন—"পার্সটার দাম সাড়ে সাত টাকা। আর ভিতরে ছিল সাড়ে পাঁচ টাকার মতন—যাক বাবা, তের টাকার ওপর দিয়ে গেছে। আমার টাকাটা কিন্তু ইনট্যাক্ট আছে, হিপপকেটে, সীটের সঙ্গে লাগোয়া। ভাগ্যিস রিকশাটা নাবায়নি! রিকশাওলার গুণেই টাকাটা বেঁচে গেল। সাধে বলি ওরা জেণ্টেলম্যান।"

—"আর আমার বাবার দেওয়া ঘড়িটা? সেটা যে গেল?"

—"ওটার তো পঁচিশ বছর হয়েছিল। অনেকদিন ধরেই আমার একটা জাপানী কম্পিউটার ঘড়ি কেনার ইচ্ছে—নেহাত ওটা ছিল বলেই—"

—"ওঃ, তাহলে তো বিয়ের ঘড়িটা গিয়ে খুব খুশিই হয়েছো—কী বলো? আপদ গেছে—"

—"আজকাল বড্ড স্লো হয়ে যাচ্ছিল—তোমারটাও তো নিয়ে গেছে—তার বেলায় দুঃখ করছো না তো?"

—"কেন করবো? তুমি জাপান থেকে এনে দিয়েছো বলে বড়োমুখ করে যাকেই দেখাতে যাই, বলে, এরকম তো এসপ্ল্যানেডে চল্লিশ টাকাতে পাওয়া যায়। গেছে গেছে, আপদ গেছে। বাড়িতে আমার বিয়ের ঘড়িটা তোলা আছে। সোনার ঘড়ি।"

—"আর হ্যাণ্ডব্যাগ? ওতে কত খসলো?"

—"হ্যাঁ! হ্যাঁ! ব্যাগ! ব্যাগ! টাকাকড়ি তো সব বাজার করতেই বেরিয়ে গেল —কিন্তু ইশকুলের অ্যানুয়েলের নম্বরগুলো সব ওতে ছিলো গো—ব্যাটাদের আমি অতো করে বললুম, বলে কি, পেপার্স সর্ট করবার নাকি সময় নেই!"

—"ওর তো রাফ কপি পাবে বাড়িতে। নম্বরের তো কপি রাখো—অমন কচ্ছো কেন? আর কী কী ছিল? টাকা তাহলে ছিল না? তবু ভালো—"

—"মানিব্যাগটাই তো বিলিতি—মিনি ম্যানচেস্টার থেকে—ওর মধ্যে নবনীতার আনা মার্কিনি লিপস্টিকটা ছিল, আর তারার দেওয়া জাপানী কমপ্যাক্ট—আহাহা— ও-সব জিনিস আর কোথায় পাবো গো?"

বউদির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মহিলা বললেন, "দেখুনগে যদি ফেলে দিয়ে গিয়ে থাকে। ওরা অনেক সময়ে শুধু টাকাটা নিয়ে, ব্যাগটা ফেলে দেয়—", দাদামণি তখুনি ছুটলেন—"চলুন, চলুন, দেখি"—ইতিমধ্যে আরেকটি দরজা খুলে গেল। একটি দীর্ঘ ভয়ংকরদর্শন বল্লম হাতে নিয়ে স্লিপিংস্যুটপরা এক ভদ্রলোক বেরুলেন। বেরিয়েই, ওপরে বারান্দার দিকে একপলক তাকিয়ে নিলেন। সেখানে দেখা গেল একসারি দর্শক। নারী-পুরুষ-শিশু কিছু বাদ নেই। প্রত্যেক তলার বারান্দাতে মানুষ ভর্তি।

এরা এতক্ষণ ছিল কোথায়? বল্লম হাতে ভদ্রলোক বললেন—"ব্যাগটা ওইখানে ফেলে দিয়েছে। ঐ যে। আমরা বারান্দা থেকে দেখিচি।" ভেংচে উঠে বউদি বললেন —"দেকেচেন তো নামলেন না কেন নিচে? চেঁচালেন না কেন? এখন এসে কী হবে?"

—"নামতেই তো চেষ্টা করচি সমানে। আনআর্মড হয়ে তো নামা যায় না! চেঁচালে যদি আপনাদের কোনো ক্ষতি করে দেয়? গুলিটুলি মেরে দেয়? এই রমলার জন্যেই তো যত গোলমাল হলো।"

—বারান্দা থেকে উত্তর এল—"ওঃ, রমলার জন্যেই বুঝি গোলমাল? কে বললে যে, ছিনতাই হচ্ছে, দেখবে এসো? কে বললে নাগাল্যাণ্ডের বল্লমটা দেয়াল থেকে নাবিয়ে নিয়ে তেড়ে যাও?"

—"বল্লমটা তুমি দড়ি দিয়ে বেঁধে না রাখলেই তক্ষুনি আসা যেত। অ্যাবসার্ড যত বুদ্ধি! বেঁধে রেখেছে!"

—"দড়ি দিয়ে না-বেঁধে কেউ বসবার ঘরে ট্রাইবাল অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে রাখে না। হাওয়া দিলেই ঘাড়ের ওপর পড়ে যায়। হুকে টাঙানো থাকে না। পুরুলিয়ার তীরধনুক তো রোজই পড়ে যেত।" এতক্ষণে খেয়াল করি মস্ত একটা তীরধনুক হাতে করে বছর-বারোর একজন ছেলে্ও ওই বারান্দায় শূন্যে তাক করছে।—সেও বললে—"তীরধনুকটা সময়মতো মা নামাতে পারলেই আমি লোকদুটোকে এখান থেকেই খতম করে দিতে পারতাম। কিন্তু মা এমনই গেট বেঁধে রেখেছিলেন— যে সেটা খুলতে খুলতেই ডাকাত পালিয়ে গেল—।" নাগাদের বল্লম হাতে ভদ্রলোক আবার বললেন, "ঐ তো আপনার ব্যাগ।" এমন সময় দাদামণি, হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল, এমনভাবে বললেন,—"আচ্ছা, তোমার চুড়ি, কানের ফুল সবই নকল ছিল, সত্যি? আমি তো ভাবতুম সোনারই। নাকি গুল মারছিলে?"

—"নাঃ। নকল। কেবল গলার মঙ্গলসূত্রটাই সোনায় গাঁথা। যেটা ওরা পুঁতির মালা বলে নিলে না।" বউদি সগর্বে গলার মালাটা ছোঁন। সস্নেহেও। দাদামণি কাতরে ওঠেন—"আংটি? তোমার আংটি কই? ওটা তো কমলহীরে।"

—"আছে আছে—গায়ে হাত দেবেন না বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ওটাকে ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছি।" বউদি মহান এক তৃপ্তির হাসি হাসেন। ওটাই যা এক দামী গয়না। দাদামণির ফুলশয্যের রাত্রের উপহার। যতই ঝগড়া করুন, বউদি ওটা হাত থেকে খোলেন না। হীরেটাকে ভেতরদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে পথে চলাফেরা করেন। ব্যাগটা নিয়ে এলেন ঐ ভদ্রমহিলা। ব্যাগটা খালি। ভেতরে কিচ্ছু নেই। তাড়াহুড়োতে চেনের ক্লিপটাও ছিঁড়ে ফেলেছে। তবু ব্যাগটা তো পাওয়া গেল! ভেতরে অবশ্য ম্যানচেস্টারের মানিব্যাগ নেই। বৌদি ব্যাগ বগলে করে বললেন—"হতচ্ছাড়ারা আমার বিদেশী লিপস্টিক, জাপানী কমপ্যাক্ট, সবগুলো নিয়ে নিলে? মায় অ্যানুয়ালের নম্বরগুলো পর্যন্ত? মানিব্যাগ যে নেবেই সেটা না-হয় বুঝি।"

—"আর তোমার ফুলকপি-কড়াইশুঁটির জন্যে দুঃখু হচ্ছে না?"

—"বাজে বোকো না।"

—"চলিয়ে বাবুজী চলিয়ে—ঔর কুছ নাহি মিলেগা—", রিকশাওলা এবার উঠে দাঁড়ায়। ভদ্রমহিলা বললেন—"আপনারা পুলিশে এফ. আই. আর. করুন। এই নিয়ে এখানে অনেকবার ছিনতাই হলো। আমিই তো সেকেণ্ডবার দেখলুম। উনি কিছুতেই বেরুতে দিলেন না, নইলে ব্যাটাদের ঠিক আটকানো যেত। জাপটে ধরে রইলেন, এত বীরপুরুষ।" স্বামী ককিয়ে ওঠেন—"বেরুতে দিলেন না? না দিলে বেরিয়েছ কী করে?"

—"সে চোর পালালে বেরিয়ে কী লাভ? অন্যলোকে একটু চেঁচামেচি করলেও তো লাভ হয়? পালিয়ে যেত"—

বউদি বলেন—"হয়তো! আপনারা কিন্তু বল্লম খোলাখুলি না করে যদি ঐ দোতলা থেকেই একটু হাঁকডাক করতেন, 'চোর চোর' বলে চেঁচাতেনও, তাহলেই ব্যাটারা পালাতো। ওদেরও তো প্রাণের ভয় আছে!"

—"আচ্ছা,এর পরের বারে তাই করবো"—দোতলার ভদ্রমহিলা জানালেন। —"ওপর থেকেই চেঁচাবো, যদি তাতে কিছু হয়। আমি তো খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, স্বচক্ষে সবটাই দেখেছি। একটা লোক ওঁর পার্সটা বের করে নিলে, সেই লোকটাই এঁর হ্যাণ্ডব্যাগও নিয়ে নিলে। অন্যটা কেবল ভদ্রমহিলার হাঁটুতে ঠাঁই-ঠাঁই করে মারছিল—গয়নাগুলোর জন্যে—" শুনেই বউদি চেঁচিয়ে ওঠেন—"বাপ রে, হাঁটুতে আমার একেই আরথ্রাইটিস। খুব টনটন করছে"—

বউদিকে থামিয়ে দাদামণি বলেন, "এতটাই দেখেছেন? তবে আপনিও থানায় চলুন, সাক্ষী দিতে হবে তো?"—দাদামণি হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠতেই, স্লিপিংস্যুটের ভদ্রলোক বল্লম উঁচিয়ে বললেন—"পাগল নাকি? এত রাত্তিরে কে থানায় যাবে? ওর যত বেশি বেশি কথা বলা অভ্যাস।" বউদি ব্যাপারটা হাল্কা করতে বললেন —"তা, অল্পের ওপর দিয়েই গ্যাছে—ওঁর পকেটে ন'শো টাকা ছিল"—

—"আংটিটা কোথায়?" দাদামণি এক ধমক দেন।

—"এই যে"—বলেই বউদি জামার ভেতর হাত পুরে, আর কিন্তু আংটিটা খুঁজে পেলেন না। আঁতিপাঁতি খুঁজেও না। রিকশাতেও পড়েনি। তবে কি রাস্তায়? উপস্থিত কৌতূহলী ব্যক্তিবৃন্দ প্রত্যেকেই এবার পথের ওপর উপুড় হয়ে একমনে চাঁদের আলোয় কমলহীরের আংটী খুঁজতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। কে বলে বাঙালী পরের জন্যে করে না? কে বলে বাঙালীর ঐক্য নেই? রাস্তা খুবই স্বল্পালোকিত। যদিও লোডশেডিং নয়, তবু অন্ধকারই। ঠিক এইখানটাতে আবার একখানা গাছের ধ্যাবড়া ছায়া। ঝিরঝিরে চাঁদের আলোয় আংটি খোঁজা রীতিমতো রোমান্টিক হয়ে দাঁড়ালো। তবুও ইনস্ট্যান্ট সার্চ পার্টি কাজে লেগে গেল। অনেকক্ষণ খোঁজ চলল। পরস্পরের দিকেও নজর আছে কড়া। অন্য কেউ না-পেয়ে যায়। কিন্তু পাওয়া

গেল না। রিকশাওলাও খুঁজছিল, দাদা-বউদির সঙ্গে।

—"নকল গয়নাগুলোর সঙ্গে আপনি ওটাও নির্ঘাৎ দিয়ে দিয়েছেন"—

—"জামার মধ্যে আর ভরা হয়নি, হাতেই ছিলো মনে হয়"—

—"এফ. আই. আর-এ আংটিটাও মেনশন করে দেবেন"—

—"নিশ্চয়ই ওরাই নিয়ে গেছে। নইলে হীরের আংটি তো, এত খুঁজে ঠিকই পাওয়া যেত।" উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মতের সঙ্গে দাদামণিরও মত অভিন্ন। বউদিই জীবনে প্রথমবার প্রায় নির্বাক।—"কিন্তু, কিন্তু আমি সত্যিই জামার মধ্যে"—দাদামণি এক ধমক লাগান—"বাজে কথা বোলো না, জামার মধ্যে হলে যাবে কোথায়?"

রিকশাওলা ক্লান্ত গলায় বললে—"বাবু, আব ক্যা করেগা? থানেমে যায়েগা? চলিয়ে"—

—"মোটেই না। আগে বাড়ি যাবো। আমার বেচারা ছেলেপুলেগুলো ভয়েই মরে গেল এতক্ষণে। এবং খিদেতেও। কে যাবে থানায়? আগে ওদের দুটো ভাত বেড়ে দিইগে যাই—চলো হে রিকশাওলা, পয়লে যিধার বোলা থা, ওই ঘরমে চলো।" বউদি রিকশাওলাকে ডিরেকশন দিয়েই পড়শীদের ধন্যবাদ দিতে থাকেন: "আচ্ছা ভাই! থ্যাংকিউ! থ্যাংকিউ! অনেক করলেন আপনারা—এই মাঝরাত্তিরে শীতের মধ্যে—বল্লম-টল্লম নিয়ে"—

—"কী আর করেছি, কিছুই তো করিনি। এ আর এমন কি, এ তো সবাই করে, নইলে মানুষ সমাজে আর বাস করবে কেন—এফ. আই. আর.-টা কিন্তু দাদা আজই করতে ভুলবেন না—ভেরি সরি, আমাদের পাড়ায় এসে আপনাদের ক্ষতি হয়ে গেল"—এইসব মধুর আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে রিকশাওলা দাদামণির বাড়ির দিকে ছুটলো।

৩

খাবার টেবিলে তুলকালাম বেধে গেল।—"রিকশাওলাকে দশটাকা দেবার কী হয়েছিলো, শুনি?"

—"ওরই জন্যে তো নশো টাকা বেঁচে গেছে। ও যদি রিকশাটাকে একবারও রাস্তায় নামাতো, তবেই ওরা আমাদের টেনে নাবিয়ে বডি সার্চ করতোই এবং টাকাটি পেয়ে যেতো—দারুণ নার্ভ এবং উপস্থিত বুদ্ধি ঐ রিকশাওলাটার"—

—"খুব সম্ভব দলেরই লোক—ষড় ছিলো কিনা কে জানে?"

—"বাজে কথা বোলো না। তাহলে রোককো বলতেই অমন ছুটতো না। রিকশাটি নাবিয়ে, পিটটান দিতো—নাঃ, সত্যিই তুমি বড্ডোই মীন-মাইনডেড।

"চলো এবার থানায় যাই। সত্যি, এফ. আই. আর. করতেই হবে। হলো তোমার কাঁটা চিবুনো? রাত বাড়ছে।"

—"আগে অনুপদাকে বরং একটা ফোন করে দাও? আর বাচ্চুদাকে? ওদের তাড়া না খেলে থানা আঙুল নাড়বে?"

—"বাচ্চুকে করেছি। অনুপ বোসকে এসব ছোট ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটানো চলে না, বুঝেছো? বাচ্চুকেও চলে না, তবে কিনা, সে ক্লাসফ্রেণ্ড।"

—"যদি খুন করে দিত? ছিলো তো পাইপগান, ভোজালি।"

—"তাহলে নিশ্চয় বলতুম। খুন তো করেনি। দিব্যি বহালতবিয়তে কাঁটা চিবুচ্ছ।"

—"করলে খুশিই হতে মনে হচ্ছে।"

—"তা বলতে পারি না। ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই অনেস্ট ওপিনিয়ন, মাঝে মাঝে আমারই তো তোমাকে খুন করতে ইচ্ছে করে।"

—"আমারও। জেনে রেখো আমারও করে। নেহাৎ হিন্দুঘরের বিবাহিত স্বামী, তাই বেঁচে রয়েছো। মাছকাটা বঁটিটা আমার হাতেই থাকে। তোমার ঐ লেটার-ওপনার দিয়ে খুন হয় না।"

—"হয় হয়, তেমন কায়দা জানলে আলপিন দিয়েও খুন হয়।"

—"মা, তোমরা কাল বরং থানায় যেও। এখন দ্যাখো আলপিন আর লেটার-ওপনার দিয়ে কদ্দূর কী হয়।"

—"তুই চুপ করে থাক দিকিনি খোকন। সব কথায় কথা!" এবার বাবলুও বলে।

—"রাত প্রায় বারোটা বাজে, মা। যাবে তো যাও। নিচের ব্যানার্জিকাকু কখন গাড়ি বের করে ওয়েট করছেন তোমাদের থানায় নিয়ে যাবার জন্যে। ওঁরাও তো শোবেন, নাকি?"

৪

বুটপরা দু'পা টেবিলে। সামনে এক ভাঁড় চা। বাঁ-কানের ফুটোয় দেশলাইকাঠি ঘুরছে। এক চোখ খুলে ভদ্রলোক বললেন—"এগুলোকে কে এখানে ঢোকালে?" সেপাই কাঁপতে কাঁপতে বললে—"আমি ঢোকাইনি স্যার। অনেক বারণ করিছিলুম, জবরদস্তি ঢুকে পড়লো। এফ. আই. আর. করবেই। ছিনতাই কেস।"

—"হুঁ। নিকাল দো। এখন রাত বারোটা। কাল হবে।"

—বউদি হঠাৎ ফেটে পড়লেন, যেন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটল। "ক্যানো, ইয়ার্কি পায়া? নিকাল দো? ক্যানো? সরকারি পয়সায় টেবিলে ঠ্যাং তুলে সরকারি পয়সায় চা খেতে খেতে ভারি তেল হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ঠ্যাং নাবিয়ে ভদ্রলোকের মতন বসুন তো? ট্যাক্স-পেয়ার্স-মানিতে আপনি মাইনে পান। বুঝলেন? এবং ইউ আর অন ডিউটি নাউ। বুঝলেন? খাতা বের করুন। এফ. আই. আর. নিতে আপনি বাধ্য। নইলে আপনার নামেই এফ. আই. আর. করবো।" ভদ্রলোকের কানের ফুটোতে দেশলাই থেমে গেছে। সত্যিসত্যিই পা নাবিয়ে খাড়া হয়ে বসে, চিবিয়ে চিবিয়ে

বললেন—"এটা পুলিশ থানা। আপনাদের কেমন করে সিদে করতে হয় সেটা আমরা জানি। রঘু।" হুঙ্কারে একটুও ভীত না হয়ে বউদি বললেন, "আর আপনাদেরও কেমন করে সিদে করতে হয় সেটাও আমরা জানি। উঃ হু, কী হচ্ছে কী? অত জোরে চিমটি কাটে? জানো না আমার হাঁটুতে কীরকম ব্যথা? তার ওপরে হাঁটুতেই অতবার ব্যাটারা মারলে, পাইপগান দিয়ে—উহুহুহু—"

—"রঘুবীর! শুনতা নেহি?"

—"জী হুজুর।"

—"ইসকো নিকাল দো। নেহিতো লকআপমে—"

এবার দাদামণি অত্যন্ত ভদ্র, নিচু গলায়, প্রায় লজ্জা দেবার মতো সুরে প্রেমনিবেদনের মতো বললেন—"আপনিই কি এই থানার ও. সি.? আপনি এফ. আই. আর.-এর খাতাটা বের করবেন? আমরা ছিনতাই কেস রিপোর্ট করতে চাই।"

—"চান তো বেশ ভালো কথা। রাত বারোটায় ওসব হবে না। কাল সকালে আসবেন। এখন যান।"

—"ছিনতাইটা এখনই হয়েছে কিনা।"

—"ছিনতাই রাতে হবে না তো কি দিনের আলোয় হবে? ও আকচার হচ্ছে মশাই। ও নিয়ে মাথা ঘামালে থানাগুলো উঠে যেত।"

—"থানা তো উঠেই গ্যাচে যা বুঝছি—", বউদি ফের কথা বলে ওঠেন। —"আপনারা কি পুলিশ? অ্যাঁ? কুঁড়েমির পাহাড় এক-একজন। দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে। নিন, খাতা বের করুন। কাল সকালে সবার আপিস আছে। এখানে বসে রগড় করবার সময় নেই আপনার মতন।"

ও.সি.-কে দেখে মনে হলো ভদ্রলোক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ এই সময়ে বললেন—

—"আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি। আপনারা কাজটা মিটিয়ে আসুন। শেষে গাড়িটাও চুরি হয়ে গেলে, এরা তো কিছুই করবে না। যা বুঝচি। যত্তোসব কেলোর কীর্তি। এ্যাদ্দিন শুনিছিলুম বটে থানাগুলোতে কীরকম কী হয়, এবারে চোখে দেখলুম। এ্যাদ্দিন বিশ্বাস করিনি।" শব্দ করে বেঞ্চিটা ঠেলে, ব্যানার্জিসায়েব, এমনিতে নেহাৎ শান্ত নিপাট ভালোমানুষ, ঘুম পেয়েছে না কী হয়েছে কে জানে, রেগে গটমট করে বেরিয়ে গেলেন।

—"কই, খাতা কই?" —খাতা বের না করেই ভদ্রলোক বললেন।

—"কোন রাস্তায় হয়েছিল?" দাদামণি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিতে শুরু করেন।

—"অমুক রোডের সঙ্গে তমুক লেনের মোড়ে।"

—"কটার সময়ে?"

—"দশটা। সাড়ে দশটায়।"

—"দশটায়। না সাড়ে দশটায়?"

—"দশটা পনেরো।"

—"কজন লোক ছিল?"

—"আমরা দুজন। আর রিকশোওলা।"

—"রিকশোওলা কই?"

এবার বউদি মুখ খোলেন।

—"সে চলে গেছে। সে খাবে না? শোবে না? ওকে জ্বালিয়ে লাভ কী?"

—"ধরে আনুন। মেইন উইটনেসকেই ছেড়ে দিয়েছেন?"

বউদি—"আপনারাই ধরে আনুন। আপনারাই পুলিশ। এবার খাতা বের না করলে একটা কথারও জবাব দেব না। একে. এফ. আই. আর. করা বলে না, লিখে নিচ্ছেন না কিছুই। গপ্পো মারছেন।"

—"সেটা আমি বুঝব।"

বউদি—"আপনি বুঝলে খাতা বের করতেন।"

—"কজন লোক ছিল?"

—"আমরা দুজন। আর রিকশাওলা। কবার বলব?"

—"সেকথা হচ্ছে না। ছিনতাই পার্টির মেম্বারদের কথা—"

—"দুজন।"

—"পায়ে হেঁটে? না সাইকেলে? বয়েস কত? আপনি থামুন, ওঁকে বলতে দিন।"

—"মোটরসাইকেলে। বয়েস বেশি নয়। ত্রিশের নিচে।"

—"কোন মেক? কী রং?"

—"রাজদূত। ব্ল্যাক। যদ্দূর মনে হয়, ছায়া ছিল কিনা গাছতলায় তো?"

—"আঃ! কেন যে বকছো শুধু শুধু? দেখছ না কিছুই লিখে নিচ্ছে না?"

—"লেখা হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা আপনাকে ভাবতে হবে না। প্রশ্নের জবাব দিন।" এমন সময় ফোন বাজলো।

৫

রঘুবীর ধরলো ফোনটা। তারপরেই দৌড়োতে দৌড়োতে এলো—ও.সি. বললেন, —"কে? বীরুবাবু তো? বলে দে এখন হবে না।"

—"ন্না স্যার, আই. জি.!"

—"কক কেঃ?"

—"আই. জি.! কথা বলবেন স্যার। আপনার সঙ্গে।" মুহূর্তের মধ্যে তড়াক

করে লম্ফ দিয়ে ও. সি. ফোনে। কথাবার্তা হলো। অল্প কিছুক্ষণই মাত্র। তারপরেই ম্যাজিক। ফিরে এসে টেবিলে সামনেই পড়ে থাকা একটা লম্বাটে বিলবুক টাইপের খাতা টেনে নিয়ে ও. সি. বললেন, গলায় বিনয় ঝরে পড়ছে, "নমস্কার! নমস্কার! আপনারাই কি ডক্টর চক্রবর্তী? আরে, আরে, কীঃ আশ্চর্য! আগে বলবেন তো? কী মুশকিল। রঘুবীর। চা লাও। চা খাবেন নিশ্চয়ই? গাড়িসে ওই বাবুকো বুলাও। গাড়ি পর ছট্টু সিংকো নজর রাখতে বোলো। এ্যাতো আজেবাজে লোক এসে সময় নষ্ট করে। বুইলেন না? আগেই তো খুলে বলতে হয় আপনি আইজির ফ্রেণ্ড? বলুন, বলুন কী ব্যাপারটা হয়েছিল। সত্যি এ শালাদের জ্বালায় একটু রাত করে আর পথে বেরুনোর উপায় নেই।" খাতা খুলে কলম বাগিয়ে বললেন—"অমুক রাস্তার মোড়ে, অতটার সময়ে একটা কালো রাজদূতে চড়ে দুজন কালপ্রিট, কত যেন বয়েস? হ্যাঁ, তিরিশের নিচে, কী কী নিলে? আরে সঙ্গীর থলে? হাউ স্ট্রেঞ্জ। এতদিন এত ছিনতাই হওয়া শুনিচি মশাই— ঘড়ি, চুড়ি, হার, হ্যাণ্ডব্যাগ, এসবই নেয়, সঙ্গীর থলে এই ফার্স্ট টাইম। হ্যাঁ সঙ্গীর থলে, ডিটেল চাই না, আর কী? দুজনের দুটো ঘড়ি—কী কী মেক? ফেভার-লিউবা, আর ক্যাসিও? লেডিজ? না? আর? পার্স? কত ছিল? সাড়ে পাঁচ টাকা? ধুর মশাই, ওটা আবার একটা অ্যামাউন্ট হলো? হ্যাণ্ডব্যাগে? সামান্যই? কত ঠিক মনে নেই? জাপানী পাউডার-কমপ্যাক্ট, আর আমেরিকান লিপস্টিক, আর বিলিতি মনিব্যাগ ছিল? আর? অ্যানুয়ালের মার্কস? সে যাগগে, আর? গয়নাগাটি কী কী নিলে? কেন যে গয়না পরে ঘুরে বেড়ান। ওঃ নকল? কানের ফুল, আর চুড়ি? অ্যাঁ কী বলছেন মশাই? কমলহীরের আংটি? রিয়্যাল? কোন আক্কেলে ওটা পরে ঘুরছিলেন পথে পথে? অ। সেন্টিমেন্ট। তা গেল তো? দেখি, যদি এইবেলা চেপে ধরলে উদ্ধার হয়। চলুন, সাইটেও একবার যেতে হবে। মোটরসাইকেলটা রাজদূতই ছিল তো? কী করে বুঝলেন অন্য কিছু নয়? কোথায় পার্ক করা ছিল? গাছতলায়? কী গাছ? জানেন না? বড় গাছ? ঝিরঝিরে পাতা? কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া? বাঁদরলাঠি, শিরীষ? যে-কোনো কিছু হতে পারে? ছায়া-ছায়া ছিল? তবে কেমন করে এত ডেফিনিট হচ্ছেন যে ওটা রাজদূত, ইয়াজদানি না? ছায়াতে গাছ চিনতে পারছেন না, অথচ মোটরসাইকেলের মেক পড়তে পারছেন?"

—"আহাঃ", দাদামণি এবার অস্থির—"আমাদের অফিসের একজন আমার কাছে খানিক ধার নিয়েছিল একটা রাজদূত কিনবে ব'লে। কেনার পর আমাকে প্রায়ই চড়াতো যে। রাজদূতটা আমি তাই চিনি", বলেই বউদির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে নিলেন।

—"বেশ। সে লোকটার নাম-ঠিকানা? রাজদূতটার নম্বর কত?

—"আরে সেই লোকটা তো ছিনতাই করেনি। তার নাম-ঠিকানা দিয়ে আপনার কী হবে?"

"—এই যে বললেন রাজদূতটা চেনেন।"

"—মেকটা চিনি বলেছি। যেমন লোকে ফিয়াট চেনে, মারুতি চেনে, মার্সিডিজ চেনে। ওটা রাজদূত ছিল। নম্বর জানি না। কালো রঙ।"

—"লোকগুলো কেমন দেখতে?"

—"ভালো করে দেখিনি মশাই। সাধারণ চেহারা, তবে ভদ্রলোকের মতন দেখতে। কথাবার্তার টানেও মনে হলো লেখাপড়া শিখেছিল কোনোকালে।" এবার বউদি কথা বলেন—"আমি বলছি। চান তো লিখুন। কালো, শুটকোপ্যানা, মুখে বসন্তের দাগ, গায়ে নস্যিরঙ চাদর, সে ব্যাটা মোটরসাইকেলের পেছনে বসে চলে গেল। পরনে প্যান্টই ছিল, ঘন রঙ। অন্য ব্যাটাচ্ছেলের দিব্যি কার্তিকের মতন চেহারা, বেশ ফর্সাপানা, গোঁপ আছে, অল্প অল্প দাড়িও আছে। কালোরঙের লেদার-জ্যাকেট পরা, শাদাপ্যান্ট। ব্যাটারা কেউই হেলমেট পরে ছিল না। অথচ শুনেছিলুম নাকি মোটরসাইকেলে দুজনেরই হেলমেট পরা আইন? এইটারই মোটরসাইকেল মনে হলো, এটাই চালাচ্ছিল এবং আমার হাঁটুতে পাইপগান দিয়ে বারবার ঠোক্কর মারছিল। বেজায় রাগী। আলোয়ান গায়ে লোকটা ভোজালি হাতে হলেও অনেক ধীরস্থির। যা কিছু লুঠপাট অবিশ্যি সেই করেছে, ব্যাগ, পার্স, ঘড়ি-টড়ি। লেদার-জ্যাকেট কেবল গয়না-গয়না করেই মরছিল। বললুম নকল, তবুও নিয়ে নিলে। এমনই স্টুপিড। আংটিটা ঐ ফাঁকে কী গোলেমালে কখন যে ওদের কাছে চলে গেল, আমি লুকোতে চেষ্টা করেছিলুম ব্লাউজের মধ্যে। ঠিকমতো পেরে উঠিনি দেখছি।"

—"তা পারবে কেন? নকলগুলোর সঙ্গেই হ্যাণ্ডওভার করে দিয়েছ।"

—"চলুন, সাইটে যাই। পাড়ার লোকরা সাক্ষী ছিল?

—"ছিল। প্রচুর। বারান্দা থেকে মজা দেখছিল, জানলা দিয়ে মজা দেখছিল, ডাকাতরা ভেগে যাবার পরে সবাই বেরিয়ে এল, সড়কি-তীরধনুক নিয়ে। যেন বনবাসী রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।"

—"সড়কি? তীরধনুক? কী বলছেন আপনি?"

—"ঠিকই বলছি। চলুন স্বচক্ষে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসবেন। এক মহিলা ছুটে আসছিলেন ডাকাতদের বাধা দিতে, কিন্তু তার স্বামী দুহাতে বউয়ের কোমর চেপে ধরে 'ওগো যেও না, ওগো যেও না', ব'লে চীৎকার করছিল।"

—"যাঃ। হতেই পারে না। মহিলা ছুটে আসছিলেন, আর ভদ্রলোক—"

—"চলুন না, হতে পারে কি পারে না জেনেই আসবেন।" বউদির ইস্পাত স্বরে বিব্রত দাদামণি বাধা দেন—

—"না না, এখন কী করে যাবেন? রাত প্রায় একটা বেজে গেল। এখন তাঁদের বিরক্ত করা—"

—"পুলিশের ওসব টাইম-বেটাইম নেই বুঝলেন। রঘুবীর। চা কী হলো? ও, এই যে। নিন চা-টা খেয়েই চলুন যাই। ছোট্টু সিংকো বোলো, গাড়ি নিকালনা।

রামলাল আউর শম্ভু সাথমে চলেগা। সাইটমে যানা হ্যায়। সীরিয়াস কেস। জলদি করো।"

৬

খটাখট! খটাখট। খটাখট। দমাদ্দম।

—"কে? কে ওখেনে?" (স্ত্রীকণ্ঠ)

—"খুলো না বলছি। সাড়া দিও না। চুপ। চুপ।" (পুংকণ্ঠ)

—"সাড়া কেন দেব না? কে ওখেনে? দোর যে ভেঙে ফেলবে!"

—"খুলুন। খুলুন। পুলিশ।"

—"পুলিশ বলছে। খবদ্দার খুলো না। মিথ্যেকথা।" (পুং)

—"পুলিশই হও, আর ডাকাতই হও, দোর ভেঙে ফেলবার কী দরকার? কী চাই? এত রাত্তিরে হামলা কিসের?" (স্ত্রী)

—"দরজা খুলুন। ভয়ের কিছু নেই। পুলিশ।"

—"ভয়ের কিছু নেই, পুলিশ? পুলিশ মানেই ভয়ের কিছু।" (পুং)

—"আগে বলুন কোন থানা থেকে এয়েচেন, কী প্রয়োজন।" (স্ত্রী)

দমাদ্দম। দমাদ্দম। ঠাস্। দড়াম।

—"ওরে বাপরে। তাইলে ভেঙেই ঢুকুন। আমি খুলব না।" (স্ত্রী)

এবার দাদামণি বললেন বউদিকে, "তুমি কথা বলে দেখ না? ওরা ভয়ে খুলছে না।" বউদি গলা খাঁকারি দিয়ে—"দিদি? আমরা। আমার মোটে ইচ্ছে ছিল না মাঝরাত্তিরে এভাবে আপনাদের বিরক্ত করা। পুলিশব্যাটারা শুনলে না। দেখুন না, জোর করে ধরে নিয়ে এসে হামলা কচ্চে। সেই ছিনতাই কেস।" দোর খুলে গেল। ভদ্রমহিলা। পেছন পেছন পুংকণ্ঠ—

—"একটাও কথা বলবে না। কোনো স্টেটমেণ্ট দেবে না বলে দিচ্ছি. পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা—এক্কেবারে সাইলেন্স।"

—"কী ব্যাপার?"

—"আপনি ছিনতাই করা দেখেছিলেন?"

—"ঠিক দেখিনি. তবে টের পেইছিলুম। যখন পালাচ্ছিল তখন দেখেচি। দুটো লোক। মোটরসাইকেলে চড়ে পালালো।"

—"সময় কত? তখন?"

—"এই দশটা-সাড়ে দশটা হবে।"

—"দশটা, না সাড়ে দশটা? ঠিক করে বলুন।"

—"থামুন মশাই। আমি কি ঘড়ি দেকিচি? ওই দশটা-সাড়ে দশটাই লিখে নিন। খেয়ে উঠে পান সাজছিলুম।"

—"সোয়া দশটা লিখে নিন না।" (পুংকণ্ঠ)

—"মোটরসাইকেলের রঙ কী ছিল? নম্বর কত ছিল?"

—"কালোই তো রঙ মনে হলো। অন্ধকারে কী নম্বর দেখা যায়?

—"ছিনতাইকারীদের কেমন দেখতে?"

—"তারা কি আমার মেয়ের পাত্তর? যে যত্ন করে দেখব? ব্যাটারা হুশ করে বেরিয়ে গেল, পেছন থেকে দেখলাম। মুখটুকু দেখিনি। কালো-জ্যাকেট, শাদা পেন্টুলুন। আরেকটার গায়ে চাদর।"

—"যাদের ছিনতাই করা হলো, তাঁরা ক'জন ছিলেন?"

—"স্বামী-স্ত্রী দুজন। বাজার করে ফিরছিলেন। বললেন তো বাজারের থলেটাও নিয়ে গ্যাছে। আশ্চয্যি!"

—"হেঁটেই ফিরছিলেন? স্বামী-স্ত্রী?"

—"না না। রিকশোতে। এই তো, ইনি আর উনি।"

—"জায়গাটা চিনিয়ে দিতে পারবেন? যেখানে ছিনতাই"—

—"কেন পারবো না? কতক্ষণ ধরে আংটি খোঁজা হলো সেখেনে।"

—"মানে?"

—"মানে, উনি বলছিলেন হীরের আংটিটা ওদের হাতে খুলে দেননি, কিন্তু সেটা ওঁর হাতেও নেই। যদি পড়ে গিয়ে থাকে, তাই আমরা সবাই খুঁজছিলুম রাস্তায়।"

—"পাননি?"

—"নাঃ। টর্চ ছিল না অবিশ্যি কারুরই।"

—"জায়গাটা একবার যদি কাইণ্ডলি—"

—"এত রাত্তিরে বেড়িও না বলছি—" (পুং কণ্ঠ)

—"তবে তুমিই যাও।"

—"আমি তো শুয়ে পড়িচি।"

—"তবে বাকি্য কেন বেরুচ্চে? চলুন দেখিয়ে দিচ্চি।"

—"আর কে কে বেরিয়ে এসেছিলেন?"

—"ঐ তো ওইখেনে ফ্ল্যাটবাড়ির অনেকেই বেরিয়েছিল। একজন তো একটা বর্শা না বল্লম কী যেন অস্তর নিয়ে বেরুল। যেন যাত্রাপার্টি।"

—"শুনলেন তো? বউদি। সড়কি-বল্লম ছিল কিনা? শুধু তাই নয়। বারান্দায় তীরধনুকও ছিল। ছিল না?"

—"হ্যাঁ ছিল। এক ছোঁড়া তীরধনুক নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করছিল।" মহিলা সায় দেন।

—"আপনার নাম? আপনার স্বামীর নাম? বাড়ির ঠিকানা?" শ্রবণমাত্র পুংকণ্ঠ মশারির অন্তরাল থেকে কঁকিয়ে উঠল।

—"দিও না। দিও না! কিছু দিও না। কিছু তুমি বলতে বাধ্য নও। বলবে

আমার ল্যাইয়ারের পরামর্শ না নিয়ে একটা কথাও বলব না।"

—"আহা, কিছু ভয় নেই। আপনার নামতো মিসেস মিত্র—", ও. সি. বাড়ির বাইরে নেমপ্লেট পড়তে শুরু করে দেন। নাম-ঠিকানা আর গোপন করা গেল না। মহিলা বললেন—"চলুন চলুন, জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে ফিরে আসি। কাল সোমবার। আপিসের দিন। রাত বোধহয় দুটো বাজলো। তুমি শুয়ে থাকো। কড়া নাড়লে উঠে এসে দোরটা খুলে দিও দয়া করে।"

৭

জায়গা দেখাতে গিয়ে পুলিশ এতই চেঁচামেচি করলে, যে আবার প্রত্যেক বারান্দায় লোকজন বেরুলো। চেঁচিয়ে তাদের ডেকে পুলিশ বললে—"বল্লম নিয়ে কে নেমেছিলেন? শিগগির নেমে আসুন। বল্লমের লাইসেন্স আছে?" সমস্ত বারান্দা মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল।

—"রিকশো কোথায় ছিল?" বউদিকে প্রশ্ন করা হলো।

"এইখানে।"

—"আপনারা কে কোথায় বসেছিলেন? কে ডাইনে কে বাঁয়ে?"

—"উনি রাস্তার দিকে, আমি ফুটপাতের দিকে। ডাইনে-বাঁয়ে জানি না। নিজে হিসেব করে নিন।"

—"রিকশোর মুখ কোনদিকে ছিল? পুবে না পশ্চিমে?"

—"এইদিকে। পুব-পশ্চিম জানি না। ওসব আপনি বুঝুন।"

—"মোটরসাইকেল কোথা দিয়ে এল?"

—"ঐ গলি দিয়ে। এইখানে থামল। এই গাছের নিচে।"

পুলিশ ইতিমধ্যে বারান্দাবাড়িতে গিয়ে দমাদ্দম দমাদ্দম শুরু করেছে। দরজা খুললো, স্লিপিংস্যুটে কাঁপতে কাঁপতে ভদ্রলোক বেরুলেন। সঙ্গে স্ত্রী।

—"বল্লমের লাইসেন্স ছিল?"

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন।

—"দেখুন, ওগুলো শো-পিস। উনি আগে তো নাগাল্যাণ্ডে পোস্টেড ছিলেন, তাছাড়া পুরুলিয়াতেও ছিলেন। নানারকম ট্রাইবাল জিনিসপত্তরই কিউরিও হিসেবে আমরা কালেক্ট করি। এও তারই একটা। এটা তো অস্ত্র নয়। ধার নেই। কেউ কখনো কিউরিওর লাইসেন্স করায়? আপনিই বলুন।" স্ত্রীর মাথা খুবই ঠাণ্ডা।

—"তবে ওটা নিয়ে নেবেছিলেন কেন, ডাকাত মারতে?"

—"সে বিপদের সময়ে লোকে তো হাতা-খুন্তি-ছাতা নিয়েও ছোটে—তার জন্যে লাইসেন্স লাগে?"

—"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন! এমনই কাণ্ড করছে এই পুলিশগুলো যাতে পাড়াপড়শীরা আর ভুলেও অন্যের সাহায্যে না বেরোয়। যেন ওঁদেরই সব দোষ।

ছিনতাইটাই গেল চুলোয়, বল্লমের লাইসেন্স নিয়ে পড়েছে। বলি, আগে তো জিজ্ঞেস করবেন ছিনতাইয়ের কথাটা, এত রাত্তিরে সেইজন্যেই তো এসেছেন? না কি?" বউদির চাঁছাছোলা স্পষ্ট গলা ঝনঝন করে রাত্তিরের হিমেল বাতাস কেটে বেজে ওঠে।—"এমন করলে আর কী ওঁরা সাক্ষী দেবেন? ওঁরাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদর্শী—বারান্দা থেকে পুরোটা দেখেছেন—নেহাৎ সড়কি-বল্লমগুলো দড়ি দিয়ে দেয়ালের হুকে বাঁধা ছিল। খুলতে দেরি হয়ে গেল বলেই তাই সময় মতন নেবে এসে ডাকাতি থামাতে পারেননি—"

"কী কী দেখেছেন? কে কে দেখেছেন? দুজনেই দেখলেন?"

—"আগে আমিই দেখতে পাই। তারপরে খোকাকে আর ওঁকে ডেকে এনে দেখালুম—কালো রঙের মোটরসাইকেলে করে দুটো লোক ঐ গলি থেকে বেরিয়ে রিকশা থামিয়ে এঁদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিলে।"

—"যথাসর্বস্ব কেড়ে নিলে, আর আপনারা চুপচাপ দেখে গেলেন? বাধা দিলেন না?"

—"দোতলা থেকে কী করে বাধা দেবো? ঝাঁপিয়ে পড়বো?"

—"চেঁচাতে পারতেন তো? তাতেই পালিয়ে যেতো।"

—"আর যদি গুলি করে দিতো ওঁদের? পাইপগান ছিল। ঐ ভদ্রলোকের পেটে তো চেপেই ধরেছিল। চেঁচালে যদি ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিতো?"

ভুঁড়ির প্রসঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠে দাদামণি বললেন—"রাত দুটো বাজে মশাই। শুতেটুতে হবে না? আপনাদের উইটনেসের তো সব কথাই মিলছে। আর কতক্ষণ? এবার এঁদের ছেড়ে দিন?"

—"আর দুটো প্রশ্ন। টাইম ক'টা ছিল?"

—"এই দশটা-সাড়ে দশটা?"

—"দশটা, না সাড়ে দশটা?"

—"ধরে নিন দশটা পনেরো।" এতক্ষণে স্বামী কথা বললেন।

—"লোকগুলোর পরনে কী ছিল?"

—"একটা লোক চামড়ার কোট পরেছিল, অন্যটার গায়ে র‍্যাপার জড়ানো ছিল। ডার্ক-রঙের।"

"বয়স কত হবে?"

—"বুঝতে পারিনি। এটা তিন নম্বর প্রশ্ন হয়ে গেল কিন্তু।" মহিলা বললেন।

—"হোকগে। তীরধনুক নিয়ে কে বেরিয়েছিল?"

—"খোকা, খোকা। আমার ছেলে। ইস্কুলে পড়ে। খেলনার তীরধনুক। সে এখন ঘুমুচ্ছে। খেলনারও লাইসেন্স চাই নাকি?"

বউদি-দাদামণি জানেন, খেলনা নয়। তবুও চুপ করে থাকেন। কার্যত খেলনাই তো। অস্ত্রও তো নয়। জানেই না এরা ট্রাইবালদের তীরধনুক কীভাবে ছুঁড়তে হয়!

—"অঃ, তাই বলুন। বাচ্চাছেলের তীরধনুক? ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই তো বলি, তীরধনুক, সড়কি, বল্লম এসব এল কোত্থেকে? আপনাদের নাম-ঠিকানাটা? ইনভেস্টিগেশনে—"

—"ইনভেস্টিগেশনটা কি হবে বল্লম আর তীরধনুক কোথা থেকে এল, সেই বিষয়ে?"—মহিলার কাটাকাটা কথা।

—"না, না, না, ওসব চুকেবুকে গেছে। এঁরা আই. জি.-র ফ্রেণ্ড—বুঝলেন না, আপনাদের কোনোরকম ভয়ের কিছু নেই। ফরম্যালিটির জন্যে নেম-অ্যাড্রেসটা তো চাই-ই। উইটনেস তো আপনারা? ছিনতাই কেসেরই ইনভেস্টিগেশন—"

৮

সক্কালবেলাই বাচ্চুদার টেলিফোন। সঙ্গে সঙ্গে বউদি ডিটেলস দিয়ে দিলেন, কানে দেশলাইকাঠি থেকে শুরু করে বল্লমের লাইসেন্স পর্যন্ত। অর্থাৎ পুলিশের শ্রাদ্ধ করলেন, বাচ্চুদা অবিচলিত। হাস্য সহকারে বললেন, "থানা-টানায় ওরকম এট্টুআট্টু হয়ই। কাজের বেলায় ঠিকই করবে, যা যা করবার।—যাবো বিকেলের দিকে।"

দাদামণির গা-ম্যাজম্যাজ করছে। শুতে-শুতেই তিনটে বেজে গেছে। ফের সকালে উঠে বাজার করতে হয়েছে। কালকের দ্বিগুণ দামে। গা করকরও করছে। তাই দাদামণি অপিস না গিয়ে, এককাপ চা নিয়ে সোফায় শুয়ে আছেন। আজ বউদিও ইশকুলে যাননি, আসলে মনটাও খারাপ। যে আংটিটা ফুলশয্যায় বউদিকে পরিয়ে দিয়েছিলেন দাদামণি সেইটে আসলে দাদামণির ঠাকুরদাদা তাঁর নিজস্ব বউকে উপহার দিয়েছিলেন। ঠাকুমাই আদর করে বড়নাতির আঙুলে পরিয়ে যান নিজের বরের দেওয়া সোহাগের আংটিটি। বয়েস তো হচ্ছে, ছেলেরা বড় হয়ে গেছে। আজ দাদামণির ঠাকুমার দেওয়া আংটির জন্যে হু হু করে মন কেমন করছে। কীভাবেই জিনিসটা চলে গেল। কিছু শাকসব্জী আর আজেবাজে নকল গয়নার সঙ্গে। আশ্চর্য! ছেলেদের কপালে নেই আর-কি বংশের এয়ারলুম পাওয়া। ওর জন্যে আলাদা ভাগ্য করে আসা চাই!

এমন সময়ে ফোনটা গেল বিগড়ে।

হঠাৎ একটানা ক্রু-র-র করে বেজেই চলল, যেন জেলের পাগলাঘণ্টি। কেমন একটা অশুভ সংকেতের মতো, দাদামণির শ্যালক বিদেশে—কোনো দুঃসংবাদ নয় তো? বুক ধড়াস করে উঠলো। যদি—ফোনটা ঠিক একটা ডেনজার সিগন্যালের মতো শব্দ করছে, বুক ধড়ফড় করানো। তবু, না ধরেও আর উপায় নেই।

—"একী বিতিকিচ্ছিরি শব্দ কচ্চে ফোনটা?" এবার বউদি স্বয়ং রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছেন, হাতে একটা সিম। ফোন দাদামণি ধরেই ফেললেন—"হ্যালো!"

—"হ্যাল্লো! হ্যাল্লো! লালবাজার বলছি! লালবাজার!"

—"অ্যাঁঃ? লালবাজার? সর্বনাশ! কী হয়েছে?"

—"ডঃ চক্রবর্তী আছেন? ডঃ চক্রবর্তী? ডঃ চক্রবর্তী?"

—"আছি, আছি। কথা বলছি (খোকা-বাবলুর মুখগুলো চোখে ভেসে উঠেছে)।"

—"কমিশনার সাহেব কথা বলবেন। হোল্ড অন করুন। হোল্ড অন। এই যে।"

—"তারপর অনন্ত নৈঃশব্দ্য। অবশেষে একটি অশেষ মার্জিত কণ্ঠ ও-প্রান্তে শোনা গেল—"

—"হ্যালো, ডঃ চক্রবর্তী? আমি অনুপ বোস বলছি। বলুন তো কী ব্যাপার? কাল রাত্রে আপনাদের নাকি আংটি, ঘড়ি, পার্স, হ্যাণ্ডব্যাগ সব ছিনতাই হয়ে গেছে?"

—"কি আশ্চর্য। কে বললে? বাচ্চু নির্ঘাৎ? সত্যি—"

—"না, না, এই আজকে সকালে আমার টেবিলে যেসব ফাইল এসেছে, সবচেয়ে ওপরেই আপনার ফাইলটা। ঠিক আছে। ডোন্ট ওয়ারি, বেলা তিনটের সময়ে আসছি। দু'জনেই একটু থাকবেন কিন্তু।"

—"আপনি? নিজে আসবেন? তুচ্ছ ঘটনা, কী দরকার?"

—"না না তুচ্ছ নয়, মোটেই তুচ্ছ নয়, ইটস আ কোয়েশ্চেন অব ল অ্যাণ্ড অর্ডার—ওদিকটায় প্রায়ই ছিনতাই হচ্ছে, অলমোস্ট প্রতিদিনই—মাঝেমাঝে সরেজমিনে তদন্তে না গেলে হয় না, সাইটে একবার গিয়ে পড়াই দরকার এবারে—"

—"বেশ বেশ। চলে আসুন। এসে পড়ুন। কিন্তু সত্যিই কি স্বয়ং পরিদর্শনের মতো জরুরি এ ব্যাপারটা?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, জরুরি—তিনটের সময়ে আসছি তাহলে? ও কে?"

—"ও কে!...অ গিন্নি! কমিশনার সাহেব আসবেনই তিনটের সময়ে। আটকানো গেল না।"

—"আটকাচ্ছিলে কেন? আসুন না অনুপদা।"

—"ছিনতাই কেসের জন্যে কমিশনারকে—বুঝলে না? খুন নয়, রেপ নয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়, এই তুচ্ছ ব্যাপারে মানে, একটু লজ্জা করছে এই আর কি—"

—"তুচ্ছ বলে তোমার মনটা খারাপ-খারাপ মনে হচ্ছে?"

—"খুনজখম-রেপ হলেই যেন খুশি হতে? নিদেনপক্ষে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা—"

—"দাঙ্গাহাঙ্গামা তো ঘরেই টোয়েন্টিফোর আওয়ার্সই দেখছি, গিন্নি ওকথা হচ্ছে না। বলছি, তোমার অনুপদা আসবে, তোমাকেও বাড়িতে থাকতে বললে। তুমি আবার প্রাণের দুঃখ ভুলতে ম্যাটিনিতে অমিতাভ বচ্চনের খোঁজে বেরিয়ে যেও না যেন।"

—"যত্তো বাজে কথা।" বউদি নিজেই এবার দু'কাপ চা নিয়ে এসে বসলেন।

আরেক কাপ চা দেখেই দাদামণির বলবৃদ্ধি হলো—

—"টেক কেয়ার, টেক কেয়ার গিন্নি—ভেবেচিন্তে কথা বলো—সুপারস্টার নিয়ে কথা।"

—"অত ভাবনাচিন্তার কী আছে। যত্তো ধুমধাড়াক্কা আর মারদাঙ্গা!"

"আঃ আঃ!" দাদামণি সদ্য প্র্যাকটিস করা মার্কিনি কায়দা ছাড়লেন। "ওটি বোলো না গিন্নি, ইউ আর গিভিং অ্যাওয়ে ইওর এজ—ওটা বললেই ডেটেড হয়ে গেলে। কোনদিন বলবে ডগলাস ফেয়ারব্যাংকের কাছে কেউ লাগে না—"

—"লাগে নাই তো। দেখেছিলে, 'থীফ অফ বাগদাদ'?"

—"উঃ", যন্ত্রণাতাড়িত মূর্তি দাদামণি বলেন, "আর বোলো না গিন্নি! আমাকে একটুও ইলিউশান রাখতে দাও। বলো ডাস্টিন হফম্যান!"

"—তিনটের সময়ে আসবেন মানেই চা খাবেন। তা, কী করবো? ফুলকপির সিঙাড়া, না কড়াইশুঁটির কচুরি?"

—"সেসব তো ছিনতাই হয়ে গেছে।"

—"বাজারসুদ্ধু তো ছিনতাই হয়নি। পকেটের ন'শ টাকাও ছিনতাই হয়নি। যাও, কিনে আনোগে। কজনের মতন তৈরি করবো? ছ-সাত জন না দশ-বারো জন? জনাকুড়ির মতোই করি কি বলো?"

—"কী করবে অত দিয়ে? আসবে তো কমিশনার, সঙ্গে নিশ্চয় ও.সি. আসবে আরও দু'চারটে, চামচা-কনস্টেবল আসবে কয়েকটা, তা ডজনখানেক লোক হয়েই যাবে। আমরাও আছি চারজন। ব্যানার্জিকেও খাওয়ানো উচিত, ওঁর গাড়ি করে অত রাত্তিরে—ঐ ধরো, বিশ বাইশ-ই ধরো—"

—"কচুরি না সিঙাড়া? কড়াইশুঁটি, না ফুলকপি?"

—"তোমার যেটা তৈরি করতে সুবিধে—"

—"দুটোই অসুবিধের। যাই হোক, কড়াইশুঁটির কচুরিই হোক, ওটা খোকা-বাবলু ভালোবাসে। আর বেশি করে নলেনগুড়ের সন্দেশ এনো।"

—"ভালো চা আছে তো ঘরে?"

—"তবু, আট্টু ভালো চা এনো। অনুপদা এই প্রথমবার আসছেন।"

—"তোমার মাসতুতো বোনের ভাসুর বলেই—"

—"সেজন্যে নয়। কমিশনার অফ পুলিশ বলে কথা। আর শোনো, বাচ্চুদাকেও আসতে বলে দাও। উনি ফোন না করলে পুলিশ ব্যাটারা নড়ে বসত না। উনিই আমাদের বল-ভরসা।"

—"পুলিশ আসছে ইনভেস্টিগেশনে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ছিনতাইটাকে টি-পার্টি দিয়ে সেলিব্রেট করছ। এমন মেতে উঠেছ, ঠিক যেন কোনো উৎসব হচ্ছে। যেন হীরের আংটি খোয়া যায়নি, বরং লটারি পেয়েছো। বিচিত্র বটে

মেয়েমানুষের চরিত্র।"—দাদামণি থলে হাতে চটিতে পা গলান। মুখে যাই বলুন, পুরুষমানুষের চরিত্রও কিছু কম বিচিত্র নয়।

৯

ঠিক তিনটের সময়ে দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল। দু'জন কনস্টেবল। সেলাম করে বললে—"কমিশনার সাহাবনে গাড়ি ভেজা।"

—"তিনি কোথায়?"

—"সাইট মে হ্যায়। আপ উধর চলিয়ে। মেমসাবকো ভি যানা হ্যায়।"

—"কে নিয়ে গেল, সাইটে? জায়গা দেখাল কে?"

—"ও. সি. সাহাবনে দিখায়া।"

সাইটে পৌঁছে দেখা গেল হৈহৈ কাণ্ড, রৈরৈ ব্যাপার। পুলিশের জীপ থেকে দাদামণিরা যেই ভূমিষ্ঠ হলেন, সাঁইত্রিশজন খাঁকি-পরা পুলিশ একসঙ্গে তাঁদের স্যালুট দিল। দাদামণি সমাজে বেশ মান্যগণ্য ব্যক্তি বটে, কিন্তু এ-রকমটি জীবনে কদাচ হয়নি। খুন নয়, রেপ নয়, দাঙ্গা নয়, ছিনতাই-এর সাইট পরিদর্শনে কমিশনার স্বয়ং এসেছেন, এও তো এই থানার জীবৎকালে অন্তত কখনো ঘটেনি। অনুপ বোস অসামান্য ভদ্রলোক, বাচ্চুদাও আছেন। এক কোণে দাঁড়িয়ে আপনমনে সিগারেট খাচ্ছেন। পরনে সিবিলিয়ান ড্রেস। ডিউটিতে নেই, বোঝাই যাচ্ছে। অনুপবাবু বললেন যদিও সাইট দেখা হয়ে গেছে তবুও ফরমালিটির জন্য ওঁদের ডেকে আনা। একবার মিসেস চক্রবর্তীকে শুধু ক্রস-এগজামিনেশন করতে হবে। পাড়াপড়শী বলতে বল্লমধারী ভদ্রলোকের স্ত্রী ও সেই ডাকাত ধরতে ছোটা ভদ্রমহিলাও দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের কর্তারা অফিসে। গিন্নিদের ক্রস-এগজামিনেশন হয়ে গেছে। না, কোনো অমিল পাওয়া যায়নি, থ্যাংক গড। তাঁরা খুবই চালু ব্যক্তি দুজনেই। পুলিশের পরোয়া করেন থোড়াই। দাদামণি বললেন, "সকলে মিলেই চলুন, একটু আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। একটু চা খেয়ে যাবেন। চারটে বাজে, ইটস টি-টাইম।" বল্লমধারীর স্ত্রী আসবেন না বললেন, ছেলের ইশকুল থেকে ফেরার টাইম। অন্য মহিলাটি বললেন, "চলুন, চা-টা খেয়েই আসি।" কমিশনার বারকয়েক গাইগুই করলেও বাচ্চুদার উৎসাহে রাজী হয়ে গেলেন। পুলিশ কমিশনার কখনও একা আসেন? সঙ্গে দু'জন বিভিন্ন ডি. সি., একজন ডি. সি. ডি. ডি., একজন ডি. সি. (সাউথ), একজন এ.সি. (সাউথ), আরেকজন এ.সি. (কে যে কোথাকার) এবং প্রচুর পুলিশ, জনতা। সেই ও.সি.-ও আছেন। মোট সাঁইত্রিশ জন। বউদি ফিসফিস করে দাদাকে বললেন —"অতজনের কচুরি হবে না তো? দশজনের মতন কচুরি কিনে আনো।" দাদামণি ফিসফিস করে বউদিকে বললেন—"সবাই খাবে না, ওতেই হয়ে যাবে'খন..."

বাচ্চুদা আর অনুপবাবু বসে পড়বার পরে দেখা গেল ডি.সি.ডি.ডি. (সাউথ), এবং

এ. সি.রা দু'জনে, এঁরাই কেবল বসলেন। কমিশনার সাহেব এবং আই. জি. সাহেবের সামনে বসে পড়া সহজ নাকি? মহিলা রান্নাঘরে চলে এলেন বউদিকে সাহায্য করতে। বাকিরা সবাই দাঁড়িয়েই রইলেন। কেউ কেউ ঘরে, আর অন্যেরা সকলেই করিডরে। কিছুতেই তাঁদের বসানো গেল না। স্বয়ং কমিশনার, আই. জি.—ছি ছি ছি—এঁদের সামনে বসে থাকা? বউদি আর মিসেস মিত্র (সেই মহিলার নাম মিসেস মিত্র) চা-কচুরি-সন্দেশ নিয়ে এলেন। কমিশনার, আই. জি. ও ডি. সি.রা চা-কচুরি নিলেন। এ.সি.-রা কিছুই নিলেন না। এদিকে বউদি আশপাশের ফ্ল্যাট থেকে খোকন-বাবলুকে পাঠিয়ে নানারকমের কাপডিশ চেয়ে আনিয়ে সাঁইত্রিশ কাপ চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তাছাড়া নিজেরাও ক'জনে আছেন, খান-চল্লিশেক চা হবেই। কেউ চা খাবেন না শুনে বউদি ক্ষেপে লাল। "সে কী মশাই? আজকের দিনে দুধ সস্তা না চিনি সস্তা? এত গুচ্ছের চা করালেন কিসের জন্য? খেতেই হবে চা। আপনাদের আইন যা হোকগে—প্রোটোকলের নিকুচি করেছে—।" অনুপ বোস অতীব ভদ্রলোক। তিনিও বললেন—"খান না মশাই খান, কেন লজ্জা পাচ্ছেন? চায়ের সময়ে চা পাচ্ছেন, খাবেন না এ কেমন কথা?"

এ.সি.-রা অতএব গুটিগুটি চায়ের কাপ তুলে নেন। বউদি এবার খোকন-বাবলু সমেত দণ্ডায়মান পুলিশদের চা খাওয়াতে এইসা প্রচণ্ড জেদাজেদি শুরু করলেন যে ক্রমে-ক্রমে প্রত্যেকেই বাইরে করিডরে বসে গিয়ে চা খেতে থাকেন। ঘরে কেবল এ. সি., ডি. সি.-গণ, আই. জি. আর কমিশনার। কমিশনার বললেন —"মিসেস চক্রবর্তীকে এবার একটু ক্রস-এগজামিন করতে পারি কি?"

—"কচুরি খেতে খেতে করতে পারেন। যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায় না।" বললেন বউদি।

—"দিদি কি নিজেই করলেন? দারুণ হয়েছে কিন্তু!"

উচ্ছ্বসিত মিসেস মিত্রের কথার ওপরে হঠাৎ কথা বলে ওঠেন অনুপ বোস —তাঁরও উচ্ছ্বাস কম নয়—

—"থ্যাংকিউ মিসেস মিত্র। আপনাদের মতো সাহসী পাড়াপড়শী নেই বলেই এত ছিনতাই সহজ হয়েছে।"

—"কিন্তু আমাদের স্বামীদের তো দেখেননি? তাঁরা এখনও আপিসে। আঁচল ধরে টেনে না রাখলে ছিনতাইটা আটকানো যেত।"

লজ্জায় অনুপবাবু কথা পাল্টালেন—"মিসেস চক্রবর্তী, ঠিক ক'টা নাগাদ ঘটনাটা ঘটল? মনে পড়ে?"

—"এই দশটা-সাড়ে...", দাদামণি চোখ পাকাতেই বউদি সামলে নেন—"স্যার, ঠিক সোয়া দশটায়।"

—"ডক্টর চক্রবর্তী, আপনার স্ত্রীকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করবো দয়া করে তাঁর মুখে কথা জুগিয়ে দেবেন না যেন। উই নীড হার ওন রেসপন্সেস।"

—"আপনি তো আমার স্ত্রীকে চেনেন না। যদিও সম্প্রতি তিনি আপনার ছোটো ভাইয়ের মাসতুতো শ্যালিকা হয়েছেন। তাঁর মুখে কথা যুগিয়ে দেবার মতো ভাগ্য করে আমার জন্ম হয়নি। তিনি জিব নেড়েই ছিনতাই করতে পারেন। ভোজালি-বল্লম লাগে না।"

—"যতো বাজে কথা। তাহলে আর ছিনতাই হলো কেন? জিব নেড়েই তো ডাকাতদের তাড়িয়ে দিতুম।"

—"তারা তো তোমার হতভাগ্য স্বামী নয়।"

—"তা, হতভাগ্য স্বামীকেও তো তাড়াতে এখনো কৈ পারিনি। দিব্যি বহাল তবিয়তেই কড়াইশুঁটির কচুরি ওড়াচ্ছেন আর বউয়ের নিন্দে গাইছেন মনের আনন্দে। পঁচিশ বছর তো চেষ্টা কম করিনি।"

—অনুপ বোস যে কী করে পুলিশ হয়েছেন তা এক সরকার ভগবানই জানেন। স্বামী-স্ত্রীর এই নিঃশঙ্ক অসঙ্কোচ বিবাদে তাঁরই মুখ শরমে লাল হয়ে উঠল। তিনি কথা ঘোরাতে বললেন—

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা, মোটরসাইকেলটার কোন মেক ছিল?"

"সেই এককথা! রাজদূত: রাজদূত! উনি দেখেছেন, আমি অবিশ্যি চিনি না।"

—"চেনেন না?"

—"আমি মোটরসাইকেল, স্কুটার আর মোপেডের মধ্যে তফাৎই বুঝি না! তফাৎ আছে না কি কিছু?" নির্ভীক উত্তর।

—"আই সী!" অনুপবাবু হঠাৎই আর প্রশ্ন খুঁজে পেলেন না। তারপর বললেন, অনেক ভেবেচিন্তে:

—"গাছটা কী ছিল?"

—"আমি কি বটানিস্ট? না কি রাস্তার ধারের প্রত্যেকটা গাছপালার গায়ে আপনারা আজকাল লেবেল এঁটে রাখেন? এসব আজেবাজে প্রশ্ন কেন করেন? গাছ দিয়ে কী হবে বলুন তো? তবু গাছে ফুল থাকলেও যদিবা চেনা যেত। আপনিও তো এইমাত্র গাছটা দেখে এলেন। দিনের বেলায় কটকটে রোদে। কী গাছ বুঝলেন? বলুন তো কী গাছ?" আকর্ণ রক্তিম হয়ে অনুপ বোস অন্য প্রশ্ন করলেন—

—"অত রাত্তিরে হঠাৎ রিকশা করে ফিরছিলেন-ই বা কেন বাজার থেকে? জানেন তো ওতে ছিনতাই হবার চান্স থাকে।"

বউদি বললেন:

—"প্রথম কথা, বাজার থেকে ফিরছিলুম না। ফিরছিলুম বাপের বাড়িতে রুগী দেখে। পথেই সস্তায় পেয়ে বাজারটা করা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় কথা, রিকশা করে ফিরবো না তো কি পুলিশের জীপে চড়ে ফিরবো? যাতে ছিনতাই না হয়? ওঁকে তো বলছিই একটা হেলিকপ্টার কিনতে; তা আর কেনা হচ্ছে কই? দেবো, আরেকটি কচুরি?"

বোধহয় অনুপ বোস একটু বাকিহারা বোধ করছেন। তাই ঘাড় নেড়ে 'না' বললেন কি 'হ্যাঁ' বললেন ঠিক বোঝা গেল না। বউদি দুটো কচুরি দিয়েই দিলেন। এমন সময় দোরে কলিঙবেল। দাদামণি দোর খুলতেই তিনটি কিশোর ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কলকণ্ঠে বলে উঠল—"কী ব্যাপার কী, মেসোমশাই? চাদ্দিকে এত গুচ্ছের মামা যে? একগাদা খোচরও যেন দেখছি—যাঃ বাবা—ভ্যানতাড়া নিতে এসেছে তো? ওদের সঙ্গেই তো কমিশন সিস্টেম থাকে, মেসোমশাই! পুলিশকে বলে কী হবে? ওরা জীবনে ধরবে? বাবলু বলেছিল, আমরা খোঁজ নিয়ে এসেছি। পঞ্চাননতলা নয়, কেয়াতলাও না। ওদের সেদিনকে, মানে গতকালকে কোনো অ্যাকশনই ছিল না। যদ্দুর মনে হয় কাঁকুলিয়ার পার্টি"—

"এরা কারা?" হঠাৎ বাচ্চুদা চা সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করেন। দাদামণি ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, "ওরা? বাবলুর বন্ধু। ফুটবল কিনবে বলে চাঁদার পয়সা চেয়েছিল, সেই বিষয়ে কথা বলছে—"

—"পঞ্চাননতলা, কেয়াতলা, কীসব যেন বলল?"

—"ফুটবল ক্লাব, ফুটলব ক্লাব। সব পাড়ায়-পাড়ায় ফুটবল ক্লাব থাকে তো? সেইসব ক্লাবের কথা বলছে। রে বাছাড়া, তোরা এখন খেলতে যা। আর দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই, বরং পরে আসিস।"

ছেলেগুলো বেরিয়ে গেল। যাবার সময়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগাপাশতলা বিষনজর বুলিয়ে গেল পুলিশ কমিশনার, ডি. সি. আই. জি., এ. সি., সব্বার ওপরে। সে-নজরে শরীর বরফ হয়ে যায়।

দরজার দুধারে দুজন কনস্টেবল ছিল। একজনের গোঁফ দুধে-ধোয়া শাদা, চামড়ায় এত আঁকিবুকি, যে মনে হয় চাকরিতে ঢোকার সময়ে দু-কুড়ি বছর কম লিখিয়েছিল। সে হঠাৎ মহাউল্লাসে হাত শূন্যে নেড়ে বলে উঠল—

—"বাবু! ইয়ে চিসকো পাকড়া হ্যায় না আপ, ইয়ে খাসবাত্ত বাতা দেগা। হমসে বঢ়িয়া খবর ভেজেগা উও। সবসে আচ্ছা সোর্স হ্যায়—ছিনতাই-পাল্টিকো বাবালোগসে ইনকো দোস্তি হোতা—আজকাল তো ছিনতাইপাল্টি গরমিণ্ট কাটরমে বি বনতা—ট্যাবলিট খানেকো পৈসা উঠাতা হ্যায়, সারে ডাকুলোগ পরিলিখি বালোঁক-বচ্চো, আনপড় গরীব আদমি থোড়ী হ্যায় উও, ইয়ে যো বাবালোগ আয়া হায় না, একদম সাচ্চা খবর বাতা দিয়া, কাল রাতকো ইয়া পঞ্চাননতাল্লামে ইয়া কেয়াতাল্লামে—কোঈবি একসান নাহী থা—থানাকো খবর বি ওহী হ্যায়—উসকো কুছ পৈসা দেয়া করো, ওহী পকড় দেগা মাল—"

এবারে অফ-ডিউটি সিবিলিয়ান পোশাকের আই. জি. কড়াইশুটির কচুরি থেকে জেগে উঠে চেঁচালেন—

—"ফুটবল কিনতে এসেছে না ছাই! রামদেও। পাকড়ো পাকড়ো উসকো

—ভাগতা হ্যায়—উওবি ছিনতাই পার্টি—পাকড়ো—"

"হো সাকতা সাব, জরুর! লেকিন আব তো উসনে কুছ কিয়া নাহি—জী সাব —কৈসে পকড়ুঁ?"—রামদেও বিনীত হাতজোড় করে।

—"জ্বালিয়ে খেলে?" বউদি এবার ফিলডে নামেন—দুটো নলেনগুড়ের সন্দেশ আই. জি.র প্লেটে দিয়েই খিঁচিয়ে ওঠেন—"বাড়িতে কি লোকজন আসতে পারবে না? ওরা সবাই খোকন-বাবলুর বন্ধু।"

—"তবে তো খোকন-বাবলুকেও ধরতে হয়। হতেই পারে ওরা পাড়ার মাস্তানদের চেনে, তাব'লে ওরাও মাস্তান? আপনারাও তো সব চোর-ছ্যাঁচোড়দের চেনেন, আপনারাও কি চোর-ছ্যাঁচোড়?"

কমিশনার, বাচ্চুদার আকস্মিক কর্তব্যবোধে যত না বিচলিত, বউদির অকস্মাৎ এহেন "রূপ তেরা মস্তানা"— মূর্তি দেখে একেবারে ঘাবড়ে গেলেন। মরীয়া হয়ে কথা ঘোরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রামভদ্দর অনুপ বোস। বইয়ের র‍্যাক থেকে একটা পেন্টিংয়ের অ্যালবাম তুলে নিয়ে বললেন—"ফ্রেঞ্চ ইমপ্রেশনিস্টস? অদ্ভুত কালারের সেন্স ছিল সত্যি ওদের"—

অমনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন জাতীয় ঐতিহ্যবাদী বাচ্চুদা:

—"কেন? মধুবনী পেন্টার্সদের কালারের সেন্স নেই? সেও কি একেবারে আশ্চর্য নয়?" দাদামণি নিশ্চিন্ত হয়ে আড়চাউনিতে বউদিকে ইশারায় বললেন—"আরেক প্রস্থ চা হয় না?" বউদিও বিনাবাক্যে চক্ষুদ্বারা জানালেন—"না। মোস্ট ডেফিনিটলি হয় না।" ডাকাত ধরনেবালী মিসেস মিত্র এই বাক্যালাপ নির্বিবাদেই ফলো করতে পারলেন এবং সশব্দে রায় দিলেন—"চল্লিশ কাপ চা করবার পরেও যারা আবার বউকে চা করতে বলতে পারে, তারা ছিনতাইকারীদের চেয়েও সমাজের পক্ষে ভয়াবহ —তাদেরই পুলিশে দেয়া উচিত"—সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে আই. জি., কমিশনার, ডি. সি.-বৃন্দ এবং এ. সি.-বৃন্দ অবাক হয়ে আপত্তি করে বললেন—এমন ঐকতান ভুখামিছিলেও চট করে দেখা যায় না। "না, না, না, কে বলেছে ফের চা করতে? পাগল নাকি?" দাদামণি চোরের মতন বললেন—"না, এই মানে, আমিই একটু ভাবছিলাম যদি আরেকবার"—

এর ফল হলো টুপি মাথায় দিয়ে পকেটে হাত পুরে লম্বা হয়ে অনুপ বোস উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সব্বাই। খটাখট স্যালুট করলো চোর-ধরা দুই সেপাই।

—"আচ্ছা, আজকে তবে চলি। থ্যাংকিউ। লালবাজারে যখন আইডেনটিফিকেশন প্যারেড হবে, কষ্ট করে তখন একবার যেতে হবে কিন্তু।"

—"নিশ্চয়। নিশ্চয়। গিন্নি যাবেন।" দাদামণি স্মার্টলি বলেন।

—"আপনাকেও যেতে হবে যে"—

—"কিন্তু আমি কি পারবো? আমি অত ভালো করে দেখিনি।" হঠাৎ দাদামণির স্মার্টনেস উধাও।

—"খুব পারবে। লোকটা তোমার বুকে অতক্ষণ ভোজালি চেপে ধরে রইলো, আর তুমি তার মুখখানা ভুলে যাবে? আচ্ছা ক্যালাস মানুষ তো! আরেকজন তোমার ঠাকুদ্দাদার কমলহীরের আংটিখানা ছিনিয়ে নিলে। তাদেরকে চিনতে পারবে না? ডেনজারাস লোক বাপু তুমি।" বউদির এক ধমকেই শোনা গেল দাদামণি বলছেন —"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো।"

গণ্যমান্য পুলিশবাহিনী বেরুতেই, করিডরে সাঁইতিরিশজনের বুটে-বুটে স্যালুট। তারপরেও মজা ছিলো। নিচে নেমে যেই জীপে উঠতে যাচ্ছেন কমিশনার সাহেব, পার্কের গায়ে হেলান দিয়ে বিড়ি খাচ্ছিলেন, এমন কিছু আজেবাজে ফালতু লোক হঠাৎ অ্যাটেনশন হয়ে গিয়ে খটাখট স্যালুট মেরে দিলে। কমিশনার মৃদু হাসলেন, বউদি ও মিসেস মিত্র চোখাচোখি বিস্ময় বিনিময় করতেই দাদামণি নেহাৎ কৃপার চোখে তাকিয়ে তাঁদের জানালেন—

—"ওরা হচ্ছে প্লেনক্লোদসমেন। সাদাপোশাকের পুলিশ। এও বুঝতে পারলে না! এবার থেকে পাড়া পাহারা দেবে!"

১০

পুলিশের গাড়িগুলি চলে যেতেই বউদি পাড়াপড়শীর যত কাপডিশ ধুয়ে ফেরত দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঠিকের লোক মেনকা এসেছে। ঘরবাড়ি ঝাঁট দিয়ে দিচ্ছে। একগাদা বুটজুতোর ধুলো হয়েছে বসার ঘরে। শোবার ঘর ঝাঁট দিতে দিতে মেনকা চেঁচালো—"বউদিদি!—ইটি আবার কী? অ, বউদিদি? এটাই তোমার আংটি লয়? এই তো আঁল্লার নেচে পইড়েছিলো?" বলতে বলতে বউদির ছাড়া-ব্লাউজ ইত্যাদির বাণ্ডিল আর কমলহীরের আংটিটা এনে হাজির করলো রান্নাঘরে। মেনকার হাতে হীরের আংটি দেখেই বউদির চোখমুখে ভয় আর শোক উথলে উঠলো। কোথায় গেল তাঁর সেই বাঘিনীর মূর্তি—কোথায় গেল সেই সদা-সর্বদার অনমনীয় কনফিডেন্স—যা নিয়ে তিনি ছিনতাইবাজদের পেছনে চেঁচাচ্ছিলেন—"অন্তত মার্কসগুলো দিয়ে যাবেন তো?"

বামালসমেত ধরা পড়া চোরের মতো অসহায় চোখে বউদি প্রায় কেঁদে ফেললেন—"সর্বনাশ! এখন কী হবে? ওগো, থানায় চলো। রিপোর্টটা এক্ষুনি বদলে আসতে হবে। আংটিটা ঘরের ভেতরেই পড়ে যে? পুলিশে তো মিথ্যে রিপোর্ট করা যেতে পারে না, এক্ষুনি চলো। জামাটামার খাঁজে তখন কোথায় ঢুকে গেছলো। কিছুতেই খুঁজে পাইনি, জামার সঙ্গেই কখন পড়ে গেছে। ওদিকে এফ. আই. আর. হয়ে গেছে।"

—"থামো দিকিনি!" দাদামণির গলায় এতক্ষণে সুন্দরবনের যোগ্য হুংকার এসেছে।

—"আরো মোটা হও। আরো ঘুমোও রোববার দুপুরে। এরপর মুখ দেখাবে

কী করে? এফ. আই. আর. কেউ বদলায়? ও ঘড়ি-সঙ্গী কিছুই পাওয়া যাবে না, আংটি তো নয়ই—এখন রিপোর্ট বদলাতে গেলেই বরং প্রচণ্ড ঝামেলা হবে —একেবারে কমিশনার পর্যন্ত এমব্যারাসড় হবেন—স্রেফ চেপে যাও। কাউকে বোলো না, বাচ্চুদাকেও না—কীপ মাম্ এবং ও-আংটিটা আর পোরোই না। এই তোমার শাস্তি। ব্যাংকে রেখে এসো। খোকনের বউকে দিও।"

১১

গল্পটা এখানে শেষ হলেই ভালো হতো। কিন্তু তা হলো না। পরের দিনই দাদামণির ফোন ফের পাগলাঘণ্টির মতন বাজলো। তাঁকে লালবাজারে ডাকা হচ্ছে তিনশো দশটি ক্যাসিও ঘড়ি এবং একশো বাষট্টিটি ফেভার-লিউবা থেকে তাঁদের ঘড়িদুটিকে শনাক্ত করে নিতে। হীরের আংটিও আছে পাঁচটা। আসুন দাদা, দেখে যান। দাদামণি গেলেন। এবং একটি সস্তা ক্যাসিও ঘড়ি নিয়ে ফিরে এলেন। সবগুলোই একরকম। কিন্তু পঁচিশ বছরের নিত্যসঙ্গী সোনার ফেভার-লিউবাটি নিশ্চিত ওখানে ছিল না। (হীরের আংটিটাতো নয়ই)।

—"যাক! তবু তো একটা বস্তুও উদ্ধার হলো।" তৃপ্ত হেসে বলেছেন ডি. সি. ডি. ডি.।—"বাকিগুলোও পাবেন।"—দাদামণি তো জানেন ও-ঘড়ি দেখলেই বউদি ক্ষেপে লাল হয়ে উঠবেন। তাই ফিরেই বললেন:

—"বাবলু! খোকন। কে নিবি নিয়ে নে। এই যে, এই ঘড়িটা ফেরৎ পাওয়া গেছে।" ছেলেরা ছুটে এলো। বউদি দেখেই মুখ বেঁকালেন—"এর চেয়ে যে-কোনো একটা ফেভার-লিউবা নিয়ে এলে না কেন?" খোকন-বাবলু দুজনেরই ওর চেয়ে ভালো ঘড়ি আছে। তারা উদার সুরে বললে—"বাবা, তুমিই এই ঘড়িটা ততদিন পরো যতদিন না নেক্সট জাপানে যাবার নেমন্তন্ন পাচ্ছো।"

পরদিন সকালের কাগজে দাদামণি দেখলেন:

—"উত্তর কলিকাতা হইতে তিনশত পঞ্চাশজন ছিনতাইকারীকে লালবাজারে লক-আপে ভরা হইয়াছে। সমাজবিরোধীদের অত্যাচার দৃঢ়হস্তে দমনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা পুলিশের প্রশংসনীয় প্রয়াস।" বউদি বললেন—"বাঃ। দেখেছো? অনুপদার কাণ্ড?"

তার পরের দিন সকালের কাগজে চোখ রেখেই বউদি শিউরে উঠে দাদামণিকে দেখালেন—"ওগো, আরো সাড়ে চারশোজনকে ধরেছে—এবারে 'দক্ষিণ কলিকাতা হইতে'। তার মানে মোট আটশোজন ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে। যাক! এবারে রাস্তাঘাটে হাঁটাচলা করা যাবে। বাচ্চুদাকে একটা থ্যাংকস দিতে হবে।" দাদামণি দাড়ি কামাচ্ছিলেন। হাত কেঁপে গেল। গালে শাদা ফেনার ওপরে রক্তের দানা ফুটে উঠলো।

"ককীঃ? আ-ট-শো? চলো, আজই বিকেলের ট্রেনে শান্তিনিকেতনে পালাই। বাক্স গোছাও। কুইক। বাঁচতে চাও তো পালাও।"

—"কেন? হঠাৎ? এখন তো কোনো ছুটি নেই?"

—"সর্বনাশ হয়েছে...আট-শো ধরেছে? কেলেংকারি হবে! বুঝতে পারছো না কালকেই আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড হবে! আটশোজন ছিনতাইকারীকে রোদে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখবে। তাদের 'পরনে' সেই লেদার-জ্যাকেটও থাকবে না, সেই নস্যিরঙের র‍্যাপারও থাকবে না, সে-ভোজালিও থাকবে না, সে পাইপগানটাও থাকবে না, মুখে সে বুলিও থাকবে না, চোখে সে চাউনিও থাকবে না...কাউকে তুমি চিনতে পারবে না গিন্নি, বিশ্বাস করো, কাউকেই না। টোটালি কনফিউজড হয়ে যাবে। পালাও, গিন্নি, পালাও। ভুলভাল লোককে আইডেন্টিফাই করলে মহাপাপ হবে, আর ঠিকঠাক লোককে আইডেন্টিফাই করতে পারার প্রশ্নই উঠছে না! পুলিশের খপ্পরে একবার পড়লে আর রক্ষে নেই..."

পরদিন যখন দাদামণিদের টেলিফোনটা ফের পাগলাঘণ্টির মতন বেজে উঠলো, লালবাজারী কায়দায়, তখন তাকে থামাবার মতো কেউই ছিলো না বাড়িতে। বেজে বেজে আপনিই সে থেমে গেল ক্লান্ত হয়ে।

পরিশিষ্ট : কী কী জানতে চান, বলুন? হ্যাঁ, বৌদি এখন আটটার মধ্যেই বাপের বাড়ি থেকে ফেরেন। তাঁর বাবা মা-ই আর তাঁকে ও-পাড়ায় টিঁকতে দেন না সাড়ে সাতটার পর।

না, দাদামণির এখনও জাপান যাওয়া হয়নি। ক্যালকুলেটর, ঘড়িও কেনা হয়নি। ওই লালবাজারের ক্যাসিও ঘড়িটাও দারুণ সার্ভিস দিচ্ছে। (একবার ব্যাটারি বদলেছেন মাত্র)। ও, আংটিটা? ব্যাংকের ভল্টের মধ্যে তোলা আছে। সাবধানেই আছে।

সেটার কথা অবিশ্যি ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসে বাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে একফাঁকে পারমিতাকে বলেও রেখেছে খোকন। দারুণ পয়া আংটি। এয়ারলুম বলে কথা।

আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় ১৩৯২

সেদিন দুজনে

এক যে ছিলেন কত্তা, তাঁর ছিলো এক গিন্নি। কত্তাটি ফর্সা ধবধবে, লম্বা চওড়া —গিন্নিটি কালোকোলো, ছোটোখাটো। কত্তা স্বল্পভাষী, গিন্নি বাক্যিনির্ঝর। কত্তা যেমনই সভ্যভব্য, কেতাদুরস্ত, শান্তশিষ্ট, ভদ্রলোক—গিন্নি তেমনি ছটফটে, দুরন্ত, সভ্যতাবিবর্জিত,

বন্যপ্রাণী। দুর্ধর্ষ গিন্নিকে সামলাতে সামলাতে ভালোমানুষ কত্তার প্রাণ যায়-যায়। এহেন গিন্নিকে নিয়ে কত্তা সংসার পেতে বসলেন কোথায়? না সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে সেই মার্কিন মুলুকে। গিন্নি সেখানে ছাত্রী, আর কত্তা সেখানে মাস্টার। অবিশ্যি, কত্তার বাড়িটাই গিন্নির পক্ষে ইশকুল। গিন্নি দিবারাত্র উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলে ফেলছেন। ভুলভাল কাজকম্মো করে ফেলছেন, আর কত্তা বেচারা সেগুলো কারেকট করতে করতে নাজেহাল!

যেমন ধরুন—একজন অতিথি এলেন চমৎকার একটি নতুন কোট গায়ে দিয়ে। আসবামাত্র গিন্নি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—"আরে! আরে! এই কোটটাই বুঝি তুমি কিনেছ? বাঃ। অমুক দোকানের সেলে তো? আমিও এটা শো-উইণ্ডোতে দেখেছিলুম। নেব-নেবও ভেবেছিলুম—ইশ, কী সস্তাতেই দিচ্ছিল ওটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিলুম না, কেননা উনি বললেন রঙটা বড্ড ক্যাঁটকেটে, বাঙালমার্কা—। তাই না গো?"

কত্তা গোড়া থেকেই টেবিলের তলা দিয়ে গিন্নির শ্রীচরণে সতর্কতামূলক মৃদু ঠোক্কর দিচ্ছিলেন। এবারে বোধহয় ততটা মৃদু আর রইল না। কেননা গিন্নি ককিয়ে উঠলেন—"উহ্! ও কী হচ্ছে? লাগে না বুঝি? তোমার পায়ে শু-জুতো আর আমার পায়ে যে চটি?" অম্লানবদনে কত্তা বললেন—"ওহো, লেগে গেল নাকি? দুঃখিত।" কিন্তু গিন্নি তাতেই যে থামবেন, তাতো নয়।—"আহাহা, তখন থেকে ইচ্ছে করে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে এখন আবার বলছো—লেগে গেল নাকি? বা-রে মজা?"

এহেন ধর্মপত্নীকে জন্মের ভাত-কাপড় প্রমিস করে ফেলে কোন পতিদেবতার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে না? কখন যে গিন্নি কী করে বসেন। একদিন পাশের বাড়ির ডিনারসেট ধার করে এনে এক বিখ্যাত ব্যক্তিকে কত্তাগিন্নি নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছেন, মহামান্য অতিথি বাসনের প্রশংসা করতেই গিন্নি মুখ খুললেন, "এটা অবশ্য আমাদের জিনিস নয়। খুব সাবধানে ব্যবহার করবেন কিন্তু। স্মিথের বৌয়ের কাছে ধার করে এনেছি কিনা। আমাদের কাচের ডিনারসেট তো নেই, গত সেটটা উনি যে সাতদিনেই ভেঙে শেষ করে দিলেন। যাতে ওঁকে বাসনটা না মাজতে দেয়া হয়। আমিও তেমনি। ছাড়বার পাত্র নই। হুঁ হুঁ বাবা, এমন আনব্রেকেবল প্লাস্টিকের সেট কিনেছি। দেখি এখন কেমন না-মেজে পারেন?"

গিন্নির বাগবিস্তারে কত্তাবেচারার মুখের চেহারাটি তখন ভেঙেফেলা কাচের বাসনের মতোই; আর অতিথিদের মুখের চেহারা? ততোধিক করুণ! তাঁদের মুখে আনব্রেকেবল প্লাস্টিকের হাসি।

২

এহেন কত্তাগিন্নি একবার এরোপ্লেনে চড়ে আকাশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাড়ি দিচ্ছেন, হেনকালে বাধিল প্রলয়। অর্থাৎ ঝড় উঠল। ওঃ, সে কী তুমুল ঝড়। যার মার্কিনী নাম বৈদ্যুতিক ঝঞ্ঝাবাত্যা (ইলেকট্রিক স্টর্ম)। যাত্রীরা প্রত্যেকে

যে যার পেটে কোমরবন্ধ এঁটে ভয়ে কম্পমান—এমনকী স্টুয়ার্টদের পর্যন্ত সীটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বেল্টবন্দী করে। প্লেনটা নাগরদোলার মতো খেল দেখাচ্ছে উপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে। যেন স্বাধীনতা-দিবসে এয়ারফোর্সের শো দিচ্ছে। কখনো ঘাস-বিচালি, কখনো-বা দে দোল দোল। যাকে বলে—ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা। ঠিক তাই। জানলার বাইরে কালীপুজোর বাজীর মতন অঝোরে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে—যেন ডিজনিল্যাণ্ডের কোনো বানানো দুর্যোগের জগৎ। মিশকালো আঁধার ছিঁড়ে-খুঁড়ে জানলায় বিদ্যুতের শিখা লকলক করে উঠছে। ক্যাপ্টেন সবিনয়ে এবারে জানালেন প্লেনের রাডারযন্ত্র অকেজো হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক চাপে—এখন ভগবানই ভরসা। একবার তো প্লেনটা এমনই ওঠানামা শুরু করলো যে সীটের মাথার ওপরে সরু তাক থেকে ব্রীফকেস, হ্যাটকেস ইত্যাদি ধুপধাপ নিচে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখনকার দিনে ছোটো প্লেনে ওপরের তাকে ছোটো মালগুলো রাখতে দিতো। এখন অবশ্য আর দেয় না (ঠিকই করে)। এবারে প্লেনে মৃত্যুভয়ের হিম-শীতল আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে—গুনগুন করে ভ্রমরগুঞ্জনের মতো ইংরিজি প্রার্থনার মৃদুধ্বনি জমাট বাঁধছে বাতাসে। আমাদের কত্তাগিন্নিও বসে আছেন সেই প্লেনে। কত্তা একজন 'দায়িত্বশীল পুরুষ'। অতএব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেও সেটা চেপে রেখে 'ছেলেমানুষ' গিন্নির হাতটি নিজের শক্ত-মুঠোয় ধরে, নীরবে ভরসা যোগাচ্ছেন। মুখে বাক্য নেই। কামরার বাতাসে মেরজাপ টানলেই টং করে টংকার হবে, এমনই ঝনঝনে টেনশন। এই সংকটময় মুহূর্তেও শ্রীমতী বকতিয়ার খিলজির মুখে কথার যেন শেষ নেই। কত্তার মুখে শুধু মোনোসিলেবিক উত্তর। "ওগো, উঁর কী ভীষণ ঝড়, না? হুঁ।"

—"আচ্ছা, আমাদের পাসপোর্টগুলো কোথায় গো?"

—"কেন?"

—"ঠিক আছে তো?"

—"পকেটে? বলো না? কোনখানটাতে আছে?"

—"আছে, আছে।"

—"আছে আছে মানে? কই? বের করো না? বুকপকেটে?"

—"ব্রীফকেসে।"

—"শিগগিরি বের করো না গো, লক্ষ্মীটি। খুব দরকার।"

—"কেন?"

—"আমারটা আমাকে দাও। তোমারটা তোমার কাছে থাক।"

—"কেন?"

—"কেননা প্লেনটা তো ঝড়ে পড়েই যাবে বলে মনে হচ্ছে।"

—"সেক্ষেত্রে আর পাসপোর্ট...!"

—"বাঃ? পাসপোর্টটা সঙ্গে থাকলে তবেই না ওদের ডেডবডি আইডেনটিফাই

করতে সুবিধা হবে? তোমারটা তুমি রাখো, আমারটা আমি। পুড়ে-টুড়ে তো ছাই হয়ে যাবো সব্বাই! ওরা চিনবে কী করে কে কোনজন? বাড়িতে খবরই বা দেবে কী করে? বিদেশ বিভুঁইতে অকালে মরছি। একটা খবর তো অন্তত...''

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঘোর সংসারী লোকের হিসেবী সুরে গিন্নি কথাটা অসম্পূর্ণ রাখেন। এত উদ্বেগেও হেসে ফেললেন কত্তা। এবং ঝরঝর করে অনেকগুলো কথা বলেও ফেললেন একসঙ্গে, গিন্নির নিরেট নির্বুদ্ধিতায় চমৎকৃত হয়ে।

—''দূর পাগলি। মানুষ পুড়ে যাবে, আর পাসপোর্টগুলো বুঝি পুড়বে না? এমন কথা কে তোমাকে শেখালো? পাসপোর্ট বুঝি ফায়ারপ্রুফ মেটিরিয়ালে তৈরি হয়?''

—''ওহো, তাই তো?'' গিন্নি এবার খুবই লজ্জিত, যারপরনাই অপ্রতিভ। ''সত্যিই তো। আগুন লাগলে পাসপোর্টও তো পুড়েই যাবে। তবে? ইশ, কী বোকা আমি। ওই একটা ব্ল্যাকবক্স না কী যেন, কেবল সেটাই পোড়ে না, শুনেছি। তা তারমধ্যে তো ঢোকা যাবে না। যাকগে, তার চেয়ে ওসব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমি এখন বরং একটু ভগবানের নামই করি বাবা। কথায় বলে 'মরণকালে হরিনাম'। তাই করি। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।'' তারপরেই কত্তার কী করণীয়, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন গিন্নি।—''কিন্তু তুমি তো আবার ভগবানে বিশ্বাস করো না। তুমি তাহলে কী করবে এখন?'' গিন্নি ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে চশমা নাকে নামিয়ে খানিক ভাবলেন—''গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন'' বলা যায়। তারপরে ইউরেকা বলার মতো আবিষ্কারের আহ্লাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন—''এক কাজ করো। তুমি বরং লিটল রেডবুকের বাণীগুলো মনে করো।'' (ঐ বইটা ঠিক গিন্নীর খুদে লাল পকেট-গীতাটার মতোই মিষ্টি দেখতে, হুবহু এক সাইজেরও)।

কত্তা এবার তেড়েফুঁড়ে ওঠেন—''আজেবাজে ইয়ারকি রাখো তো? ইডিয়েটের মতো যত রি-অ্যাকশনারি রসিকতা। একটুখানি চুপ করে থাকবে? এ্যাঁ? একটু সিরিয়াস হও, ফর হেভেনস সেক।'' ''হোল্ড ইয়োর টাং—এ্যাণ্ড লেট মী?...হুঁ হুঁ কী? লেট মী...'কী'?'' চোখ গোল গোল করে, ফিক ফিক হেসে বোকা গিন্নী একা-একাই ইয়ারকি মারেন, বাইরে তখন অন্ধকার খানখান করছে, বিজলীর উদ্দাম ঝলক, বাতাসের গতি সাইক্লোনিক, গিন্নি বলছেন—''অবিশ্যি হেভেন্স সেক নয়, গডস সেক।'' এবার বিরক্তিতে চোখ বুজে ফেলে কত্তা বলেন—''ইনকরবিজিবল।''...কত্তার রাগে লাল মুখখানা দেখে গিন্নি এবার হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হন। যাক বাবা, এই তো কত্তার নরমল ভোকাবুলারি ফিরে এসেছে, আতঙ্কটা তাহলে কেটেছে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। গিন্নিই এবার কত্তার হাতটি মুঠোয় চেপে ধরেন। আকাশও কিছুটা সামলে ওঠে ইতিমধ্যে, আর কত্তাগিন্নির উড়োজাহাজ অচানক অন্য এক বিমানবন্দরে নেমে পড়ে ঝুপ করে। তক্ষুনি গিন্নি সুর পালটে ফেলে, ''এই তো আমরা ফিলাডেলফিয়াতে এলুম, অথচ, হায়রে—ডনামারিয়ার সঙ্গে দেখাটা করা হলো

না!''—বলে কত্তার কানের কাছে অবিশ্রাম ঝিঁঝিট রাগিণীতে শোকগাথা গাইতে লাগলেন। অবশেষে ''আমি ক্লান্ত প্রাণ এক''—স্টাইলে কত্তা এই সান্ত্বনাবাক্যটি উচ্চারণ করলেন—''নেকসট ইলেকট্রিক স্টর্মের সময়ে নেমে গিয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে গেলেই হবে।''—''এই বলে আমাকে তুমি ফাঁকি দিচ্ছ, হ্যাঁ।'' বলে গিন্নি ঠোঁট ফোলালেন। ততক্ষণে 'অল এ্যাবোর্ড' হাঁক পড়েছে। ঝড় থেমে এসেছে, প্লেন উড়তে রাজী।

৩

কত্তাগিন্নি যখন সংসারটি সদ্য পাতছেন তখন নিত্যি-নিত্যিই কিছু-না-কিছু ক্রাইসিস উৎপন্ন হতো। গিন্নি রান্নাবান্না শেখেননি তখনও, কিন্তু কত্তাকে দুটি রেঁধে-বেড়ে দিতে হবে তো? নইলে আর গিন্নি কিসের? অতএব ভাতের ডেকচি উনুনে চড়িয়েই টেলিফোন।

—''ললিতা? ছেড়ে দেবো এবার?''

—''কী ছাড়বি এবার? সিনে ক্লাবের টিকিট?''

—''দূর! চালরে, চাল। ভাত হচ্ছে না?''

—''জল ফুটেছে?''

—''মানে?''

—''মানে জোরে জোরে ধোঁওয়া বেরুচ্ছে? জলটাতে কি বেশ বুদ্বুদ হচ্ছে? ঢাকনাটা নজর করে দ্যাখ দিকি, ওঠাপড়া করছে কিনা—''

—''ওহো, সেই জেমস ওয়াট? ধর, দেখে আসছি।'' ফোন নামিয়ে গিন্নি হাঁড়ি পরীক্ষা করতে ছোটেন। কত্তাগিন্নির পবিত্র সংসারধর্ম তখন এই স্টেজে।

গিন্নিমার ছোটোবেলায় দেশলাই জ্বালাতে খুব ভয় করতো। এখন রান্নাঘরে ঢুকে সেই ভয়টা একটু একটু করে কমে আসছিল। কিন্তু একটা ঘটনায় আবার গিন্নি পুনর্মূষিক হয়ে গেলেন। সেই গল্পটাই বলি। আগাগোড়া কাঠের তৈরি তিনতলা বাড়ি। খুব পুরোনো। পুরোনো ধরনের গ্যাসের উনুন সেখানে, এ-দেশের মতোই দেশলাই জ্বেলে ধরাতে হয় (পাইলট ল্যাম্প নেই)। সদ্য-বিবাহিত কত্তাগিন্নি ''কপোতকপোতী সম উচ্চবৃক্ষচূড়ে'' বাস করবেন বলে তিনতলার চিলেকুঠরিটা অল্পস্বল্প টাকাতে ভাড়া নিয়েছেন। মাস্টারমশাই হলে কি হবে, কত্তার বয়সটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতো —তাই মাইনেও বেশ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতোই। তাই, ঘর সাকুল্যে মাত্র দেড়খানি। বড়ঘরটি পাঁচকোনা। পঞ্চম কোণে একটু রান্নার ব্যবস্থা আছে। এই ঘরটা গিন্নির দারুণ পছন্দ, কেননা ঘরের ঢালু ছাদ, অসম দেয়াল, এবং মেঝে প্রায়ই আশ্চর্য আশ্চর্য জায়গায় এসে পরস্পরের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ মিলেমিশে গেছে। বড়ো মজার, এবড়ো-খেবড়ো এই ঘরখানা—অদ্ভুত এলোমেলো তার গড়নপেটন। কখনো পুরনো হয়ে যায় না। কোণা-ঘুপচিতে ভরা। কত্তাটি লম্বা

মানুষ, কিন্তু সাবধানী। তাই যখন-তখন যেখানে-সেখানে নেমে আসা ছাদে তাঁর উঁচু মাথা কদাচ ঠুকে যায় না, অথচ, ছোটোখাটো গিন্নির মাথাটি অনবরত ঠুকে-ঠুকে যেন আলুকাবলির ঠোঙা হয়ে গেছে। এতোই তিনি অন্যমনস্কা। হরেকরকম রঙের টিন আর বুরুশ কিনে মনের সুখে আশা মিটিয়ে ছাদে, দেয়ালে, যত্রতত্র এতোল-বেতোল রঙ করেছেন গিন্নি, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে রঙ-বেরঙের কুশন কিনে এনে ঘরময় ছিটিয়েছেন আরামপ্রিয় কত্তা। ঘরখানাকে বড়োই সুখী-সুখী দেখায়। বড়ো হাসিখুসি।

জীবনের প্রথম সংসার। বড়ো যত্নে বড়ো আদরে দুজনে মিলে তাই দেড়খানি কামরা সাজিয়েছেন-গুছিয়েছেন মরা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড আসবাবপত্র আর জ্যান্ত কচি সবুজ গাছপালা দিয়ে। একটা গাছে মস্ত মস্ত চওড়া সবুজ পাতার বাহার—আরেকটা গাছে বেগুনী ফুল ফুটে আছে থোকা থোকা, একটা ক্ষুদে গাছে ক্ষুদে ক্ষুদে কমলালেবু টুনি-বালবের মতো জ্বলছে, আর একটা ছোট লঙ্কাগাছে লাল টুকটুকে লঙ্কা ঝুমঝুম করছে। বসার ঘরেই বাস। রান্না-খাওয়া, বাসনমাজা, পড়াশুনো, আড্ডা, আরাম—সব। আর আধখানা ঘরটাতে শোওয়া। প্রকৃত অর্থেই 'শয়নমন্দির' সেটা—জোড়া খাটটি ছাড়া আর কিছুই ও-ঘরে আঁটে না। অতি কষ্টে দেয়াল-আলমারির পাল্লাটা ফাঁক করা যায়। বাথরুমে একটা বাঘপেয়ে চটা-ওঠা বাথটাব আছে, যা কেবল জাংক ইয়ার্ডে আর মিউজিয়ামেই পাওয়া যায়। এখন সর্বত্র শাওয়ারের চল হয়েছে। আর বাথটাব মানেই টালি-পোর্সিলেনের রাজকীয় ব্যাপার। এমনি একখানা খুরোওলা বাথটাব দিয়েই দিব্যি বাড়িটার বয়স মাপা যায়। গোটা বাড়িটাই খুব ছোট্টো, দু-কামরার। তিনতলার চিলেকামরায় আমাদের বঙ্গজ কত্তাগিন্নি থাকেন, আর তাঁদের ঠিক নিচে দোতলার ফ্ল্যাটে দুজন ষণ্ডাগুণ্ডা মার্কিনী ছাত্রের বাস। তারা একটু একটু লরেল-হার্ডির মতো। একজন দৈত্যাকৃতি, ইয়া সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, অন্যজন বেঁটেখাটো, তারা একদম মিশুক নয়। দিনরাত্রি পড়াশুনো করে, আর ফাঁক পেলেই ভালো ভালো রাঁধে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে কত্তাগিন্নির ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম হয়ে যায়। সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা থাকেন সবচেয়ে নিচে, একতলায়, একা একা। এক থুনথুনে থুত্থুরে বুড়ি। তাঁর ফোকলা মুখের হাসিভরা 'গুডমর্নিং'টি গিন্নির বড়োই প্রিয়। বাড়িওলার নিজের বাসা চার্লস নদীর ওপারে, শহর বস্টনে। এই খেলনাবাড়িটি যতই ঝরঝরে হোক, কত্তাগিন্নির মনে দিব্যি ধরেছে, এবং পকেটেও!

সন্ধেবেলা কলেজ থেকে ফিরে কত্তাটি এককাপ গরম কফি আর একটি পড়ার বই হাতে করে, তিনতলার ছাদের আরামকেদারায় গা-এলিয়ে, পা দুটি দু-ডলার দামের টেবিলে তুলে দিয়ে, দেড় ডলার দামের স্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্পটির আলোর তলায় গুছিয়ে বসেন। আর গিন্নি রান্নাঘরে অর্থাৎ তিনগজ তফাতে রান্নাবান্নার কোণটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুটনো কোটেন কুটুর-কুটুর, বাসন মাজেন খুটুর-খুটুর, আর গড়গড় করে কথা বলেন। সারাদিন কলেজে কী হলো, সেইসব। কত্তা বই পড়তে-পড়তে

হুঁ-হ্যাঁ করেন। কখনো কখনো ভুলভাল জায়গায় 'হুঁ' বলে ফেল্লেই সর্বনাশ—তক্ষুনি গিন্নি পিছন ফিরে তাকান।—"ওঃ, তুমি বই পড়ছো? কিছুই শুনছিলে না?" কত্তার অমনি ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। কিন্তু সে-সব স্বীকার করার পাত্র তিনি নন। —"শুনব না কেন? তুমি জিজ্ঞেস কর না? প্রশ্ন করে দ্যাখো কী জানতে চাও? শুনেছি কিনা বুঝতে পারবে।"

গিন্নিও ছাড়বার পাত্র নন—

—"বলো তো, আজ প্রফেসর হ্যারি লেভিন কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন? এইমাত্র এটাই বললুম তোমাকে।"

—"কার সঙ্গে বলো তো?" অপ্রতিভ কত্তা শেষরক্ষা করতে পারেন না।

—"বলব না, যাও।"

—"দেখলে তো, কিচ্ছুই তার মানে শুনছিলে না!" অভিমানে গলা বুজে আসে, গিন্নি ঠোঁট ফোলান। কত্তার কফিও শেষ। অগত্যা বই নামিয়ে টেবিল ঠেলে কত্তাকে এবার উঠতেই হয়। সম্মুখে কর্তব্যপালনের গুরুদায়িত্ব। এখন আশু কর্তব্য: মানভঞ্জন।

পাঁচ মিনিট পরের দৃশ্য: গিন্নি আবার গুনগুনিয়ে গপ্পো করছেন, কত্তা আবার ভুরু কুঁচকে বই পড়ছেন, আর হুঁ-হুঁ করছেন। সামনে নতুন কফির ধোঁয়া।

৪

সেদিনও এমনিই চলছিল। গিন্নি একসময়ে বললেন—"দেশলাইটা একটু দাও তো?" কত্তা তিনইঞ্চি দীর্ঘ বিশাল কিচেনম্যাচেস দিয়ে অনবরত চুরুটটাকে ধরাচ্ছিলেন। আজকাল আবার কফির সঙ্গে এটা নতুন জুটেছে। কত্তা সিগারেট ছেড়ে চুরুট খেতে শিখছেন, কেননা চুরুট কত্তার কচিকচি চেহারায় বেশ একটা ওজন এনে দেয়, বেশ ভারি-ভারিক্কি দেখায়, মুখে মোটকা একখানা চার্চিলী চুরুট গোঁজা থাকলে। কিন্তু ঝামেলাও কম নয়। একটু অন্যমনস্ক হলেই অভিমানী চুরুট নিভে যেতে চায়। কিছুতেই চুরুটটাকে একটানা জ্বলন্ত রাখার কায়দাটা আয়ত্ত হচ্ছে না কত্তার। তাই অনবরত ফস ফস করে দেশলাই জ্বালাতে হয়, অন্তত দশটা কাঠি লাগে —পরে চুরুট! গিন্নি চাইতে, অন্যমনে দেশলাইটা ছুঁড়ে দেন কত্তা গিন্নির দিকে। কিন্তু গিন্নি তো তখন পেছন ফিরে পেঁয়াজ কুচোচ্ছেন, আর থেকে থেকে চোখ মুচ্ছেন। খানিকটা জল পেঁয়াজের জন্যে, আর বাকিটা সাতসুমুদ্দুর তেরোনদীর পারে ফেলে আসা দুটি বুড়োবুড়ির জন্যে।

—"আহা, সেই তো রাঁধতে শিখলাম। অথচ ওঁদের কোনোদিন রেঁধে খাওয়ানো হয়নি—কে জানে কবে পারবো"—গিন্নি এইসব ভাবছেন আর চোখ মুচ্ছেন, আর পেঁয়াজ কুচোচ্ছেন—মহামান্য দেশলাইয়ের শুভাগমন টের পেলেন না। আর—দেশলাই তো নয়, যেন স্বয়ং দুর্বাসা মুনি। বাপরে। প্রথমে ঠক—তারপরেই ফোঁসস। দুবার

দুটি মৃদু শব্দ, একমুহূর্ত আগুনের ঝলসানি, গিন্নি পেছন ফিরে একঝলক তাকালেন, কত্তা বই থেকে একপলক চোখ তুললেন—অমনি 'দুমম'—বিস্ফোরণের একটা চাপা গর্জন হয়েই বিপুল ধূম্রজালে বিশ্বচরাচর সমাচ্ছন্ন। ঘরের ও-প্রান্ত থেকে একটি আর্তরব উঠলো—

—"এই তো আমি। পারফেক্টলি অলরাইট!"

"তুমি?" বলতে বলতেই রামভক্ত গিন্নি এক লম্ফে সরু টেবিলটা ডিঙিয়ে কর্তার বক্ষোলগ্না হন। গিন্নির বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি না, স্বভাবটা ঠিক চড়ুই পাখির মতো চঞ্চল। কিন্তু নিজের সম্পর্কে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে তিনি আস্ত একটি বোধিবৃক্ষ, তাঁর তুল্য শান্ত, মাথাঠাণ্ডা, তথা প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যক্তি ত্রিভুবনে বিরল। ত্রিভুবনে দ্বিতীয় কেউই অবশ্য গিন্নির এই ওরিজিন্যাল ধারণাকে মদত দেন না। তাঁর আত্মীয়, গুরুজন, ইয়ার-বন্ধু কেউই না। বরং উলটে তাঁরা মনে করেন গিন্নি ট্যালা, ক্যাবলা, অকারণে মাথা গরম করেন, এবং কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। পাগল-ছাগলও বলে কেউ কেউ। বললে কি হবে, গিন্নি কিন্তু আত্মবিশ্বাসে অটল। অমন কাকে-কান-নিয়ে-যাওয়া প্রকৃতি তাঁর নয়। গিন্নি লোকের মন্দকথায় কদাচ কান দেন না। তিনি অনেকবার লক্ষ করে দেখেছেন, পদে-পদে মাথাটা গরম হলেও বিপদে-আপদে মাথাটা ঠিক ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যেমন সেবার এরোপ্লেনের বিজলী-ঝঞ্ঝার মধ্যে? এবারেও তাই হয়। কত্তাকে সান্ত্বনা দিয়েই নেকস্ট মুভ হিসেবে গিন্নি দৌড়ে নিজের ভারী ওভারকোটটি এনে ছুঁড়ে দেন আগুনে। অবশ্য আগুন-টাগুন দেখা যাচ্ছে না, ধোঁয়ায়-ধোঁয়া ঘর, দম আটকে আসছে। তবে কথায় বলে, 'যেখানেই ধোঁয়া আছে, সেইখানেই অগ্নি'। তারপর গিন্নির হাত ধরে টানতে টানতে কত্তা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়েন, যাবার আগে সাবধানে দোরগুলো সব টেনে দিয়ে যান—যাতে আগুনটা সারাবাড়িতে ছড়িয়ে না পড়ে। (যেন আগুনের অভ্যেস ভদ্রলোকের মতো দরজা দিয়ে বেরিয়ে কলিং বেল টিপে অন্যের বাড়িতে ঢোকে!) মুচমুচে পলকা কাঠের বাড়ি তো? জতুগৃহের দশা হতে সময় লাগবে না। চটপট অন্যান্য বাসিন্দাদের খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু তার আগেই আগুনে পশমের কম্বল চাপা দেওয়া নিয়ম। পশমের কম্বল বাড়িতে একটাও নেই। সেন্ট্রাল হিটিং আছে বলে, এ-বাড়ির কম্বলগুলো সমস্তই নাইলনের। নাইলন তো বেশি বেশি জ্বালানি যোগায়। সেটা খেয়াল করে গিন্নি সে কম্বল না-ছুঁড়ে কোট ছুঁড়েছেন, যেটা কিনা পিওর উলের, এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সিঁড়ি দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে গিন্নিকে একটু পিঠ চাপড়ে বাহবা না দিয়ে পারলেন না কত্তা। সেইসঙ্গেই বলে দিলেন—"দোতলায় গিয়ে কথাবার্তা যা বলবার সেটা আমিই বলবো কিন্তু।" কত্তার কাছে বাহবা পেয়ে গিন্নি খুব খুশি, তারই মধ্যে দুঃখু-দুঃখু প্রাণে একটু ভাবলেন, "আহা, অতো দামী কোটটা এতক্ষণে ছাই হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু প্রশ্নটা যেখানে মানুষের জীবন-মরণের সেখানে একটা তুচ্ছ কোটের মরণ-বাঁচন নিয়ে ভাবলে চলবে কেন!"

৫

দোতলায় নেমেই গিন্নি ভুলে ছাত্রদের বন্ধদুয়ারে দমাদম প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে গেলেন। বাড়ির জানলা-দরজা কেঁপে ওঠে ঝনঝনিয়ে। অমনি কত্তার মৃদু ধমক—"ছি, বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে? হাজার হোক ওদের সঙ্গে আলাপ নেই তো?" তিনি তো সামাজিক আদবকায়দাসম্পন্ন মার্জিত ভদ্রলোক? গিন্নি হলেনই বা বুনোপ্রাণী! কত্তা শত বিপদেও সৌজন্য হারিয়ে ফেলেননি।

কিঞ্চিৎ লজ্জা পেলেও গিন্নি বলতে ছাড়েন না—

—"আহা, ডাকাত না পড়ুক, আগুন তো লেগেছে? আমরা কি পাড়া বেড়াতে এসেছি নাকি?" অতিকায় দীর্ঘদেহ কিশোরটি দোর খুলে দেঁতো হাসলো—

—"হায়!" (হাহাকার নয় অবশ্য, প্রীতিসম্ভাষ।)

—"হ্যালো।" সহাস্যেই কত্তা বললেন।

—"ক্যান আই হেলপ ইয়ু?"

আরো হাসি।

কত্তাও আরো হাসেন। গিন্নি কেঁদে ফেলেন।

আর কি। ঘরে আগুন লেগেছে, সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়—এই সংকটের মুহূর্তে হায়-হ্যালো করে লোকলৌকিকতা করে কেউ? এই কি ভদ্রতার সময়? গিন্নির মুখের চেহারাতেই বোধহয় এস. ও. এস. বার্তা লেখা ছিল। অথবা তাঁর দোর ঠ্যাঙানির ধরনে। সাহেব ব্যস্তস্বরে নিজেই বললো—

—"ডু ইয়ু হ্যাভ এনি প্রবলেম?"

কত্তা ভদ্রতায় গলে গিয়ে বলেন—

—"ধন্য, ধন্য—ভয়ের যদিও কোনো কারণ নেই, কিন্তু —দো দেয়ার ইজ নো কজ ফর প্যানিক, বাট—"

অকস্মাৎ গোমড়া হয়ে গেল ব্যায়ামবীর ছেলেটার শ্মশ্রুগুম্ফহীন হাসিমুখ।

তারপর সাড়ে ছ'ফুট শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে মুখখানা কত্তার মুখের খুব কাছে নামিয়ে এনে ভুরু পাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠলো—

—"প্যানিক? হোয়াই শুড আই প্যানিক, ম্যান?" কত্তাটিও দমবার নন। হলেনই বা পাঁচফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি। হাস্যবদনে সংযতকণ্ঠে তিনি জবাব দেন—

—"দ্যাটস রাইট! ইউ শুড নট প্যানিক। বাট দেয়ার ইজ এ স্মল ফায়ার আপস্টেয়ার্স।" অর্থাৎ কিনা ভয়ের কিছুই নেই, বাড়িতে কেবল যৎসামান্য আগুন লেগে গেছে। এই সৌজন্যপূর্ণ সংবাদটি শোনবামাত্র ছেলেটার মুখের চেহারা পালটে যায়। ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে ওঠে :

—"কী বললেন? আগুন? ডিড ইউ সে আ ফায়ার? স্টীভি। স্টার্ভি। দেয়াজ্ আ ফায়ার আপস্টেয়ার্স। —এবং তৎক্ষণাৎ দমাদ্দম শব্দে ধরিত্রী প্রকম্পিত করে কাঠের সিঁড়ি প্রায় সে ভাঙতে-ভাঙতে ওপরে দৌড়তে থাকে। তার পেছন পেছন

কত্তাগিন্নিও সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওপরে ঊর্দ্ধপানে ছোটেন। আর তাঁদের পশ্চাতে ছুটতে ছুটতে আসে স্টীভি নামক বেঁটে ছাত্রটি। তার হাতে একটা খুন্তি। সেও ডিনার রাঁধছিল মনে হয়। উঠে গিয়ে জোর দোর-ঠেলাঠেলি শুরু করেছে দৈত্যাকৃতি ছেলেটা—দোর আর খোলে না। এদিকে অজস্র ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার ফাঁক দিয়ে। ছেলেদুটোর কাঁধের ধাক্কায় দোর যখন ভাঙো-ভাঙো, তখন সন্তর্পণে তাদের একটু ঠেলে সরিয়ে—"নাউ, প্লীজ লেট মী ট্রাই—" বলে কত্তা এগিয়ে যান, এবং পকেট থেকে চাবিটি বের করেন।

—"ও-ও-হ"...বলে একটা কাতর হাল-ছাড়া শব্দ বেরোয় ছেলেদুটির মুখ থেকে এবং খুট করে দরজা খুলে যায়।

—"জাস্ট ইম্যাজিন, স্টীভি,—অল দা হোয়াইল হি হ্যাড দ্যাট কী...! এ্যাণ্ড...!" অপ্রস্তুত স্বরে কত্তামশাই কৈফিয়ৎ দেন—"আমাকে তো আপনারা সুযোগই দিচ্ছিলেন না খুলতে—আমি কি করব।"

গিন্নি ভেবেছিলেন ঘরে ঢুকে দেখবেন সিনেমায় দেখা অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যের মতো ঘরময় লকলক করছে লাল-হলুদ আগুন, যাকে বলে 'লেলিহান অগ্নিশিখার খেলা', চেয়ার টেবিলগুলো পটপট শব্দে পুড়ছে—পর্দাগুলো দাউদাউ করে জ্বলছে আর ফোমের কুশনগুলো ধিকি-ধিকি।

আহারে—কমলালেবু গাছ আর লঙ্কা গাছটার জন্যে খুব মায়া হয় গিন্নির। —ওগুলো জ্যান্ত ফলন্ত জিনিস তো?

ওরই মধ্যে গিন্নি মনে মনে ভেবে নিচ্ছিলেন কেমন করে পাসপোর্টদুটো, কবিতার খাতাটা, আর কত্তার সখের টাইপরাইটারটি উদ্ধার করা যায়। গরীব মাস্টার-মানুষ, সদ্য কিনেছেন বড়ো সাধের যন্তরটি। ইনশিওর করানো হয়নি এখনো। সুখের কথা এই যে এগুলো সবই আছে শোবার ঘরের দেয়াল-আলমারিতে। কিন্তু আগুন পেরিয়ে সেখানে যাওয়া যাবে তো?

দরজা খুলে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শান্তিময় দৃশ্য। একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে। কেবল মেঝের একটাই জায়গা থেকে ঘোরতর ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। সেখানে মোটা শতরঞ্চিটা ক্রমাগত পুড়ছে। খুবই 'লোকালাইজড ধোঁয়া'। ঠিক তার পাশেই কোটটা শান্ত হয়ে শুয়ে আছে পোষা কুকুরের মতো। ঘরে কোনোই শান্তিভঙ্গের লক্ষণ নেই। সব ঠিকঠাক। প্লেটে কুচো পেঁয়াজের পাশে গিন্নির ছুরি মজুত, টিপয়ে কত্তার কফির পাশে খোলা অর্থনীতির বই। খুদে কমলালেবু, লাল লঙ্কা হাসি-হাসি মুখে যে যার টাব থেকে কত্তাগিন্নিকে অভ্যর্থনা জানাল—'হায়।' আহ্লাদে গিন্নির চোখে জল এসে যায়।

আঃ, জীবন কত সুন্দর। ভগবান কত ভালো! কপালের ঘাম মুছে ছেলেদুটো বলল—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কী বাঁচাটাই বেঁচেছেন। দয়া করে ভবিষ্যতে আর দেশলাই ছোঁড়াছুড়ি করবেন না, ওটি বড়ই বিপজ্জনক খেলা।—এদেশে কিচেনম্যাচেস

সেফটিম্যাচেস হয় না।" কর্ত্তা নাক কুঁচকে বললেন, "আমাদের দেশে কিন্তু সব দেশলাইই সেফটিম্যাচেস হয়।" ছেলেটি গিন্নির কোটটি মেঝে থেকে তুলে পি. সি. সরকারের মতো ঝেড়েঝুড়ে দেখালো যে এত আগুনেও তাতে একটি ফুটো পর্যন্ত হয়নি।

কোট পরীক্ষা করে নামিয়ে রেখে স্টীভি খুব গম্ভীর মুখে বলে—"নট শুড ইউ থ্রো ইওর কোটস ইন টু ফায়ার।" এই সময়ে দেখা গেল যে কোটের লাইনিঙটা নাইলনের। কর্ত্তাগিন্নিতে চোরাই চোখাচোখি হয়। নেহাৎ কপালজোরেই আগুনে পড়েনি লাইনিঙয়ের দিকটা। ভাগ্যিস! কর্ত্তাগিন্নি সেই ছেলেদের কিছুতেই চা-কফি-বিয়র-হুইস্কি-কোকাকোলা-সেভেন আপ, কারি-রাইস—কিছুই খাওয়াতে রাজী করাতে পারলেন না। নাঃ, এই গোবদা ছেলেদুটোকে মোটেই মিশুক বলা চলে না। পুরো এক বছরের মধ্যে কর্ত্তাগিন্নির সঙ্গে তাদের সামাজিক যোগাযোগ হয়নি।

৬

সামাজিক যোগাযোগ হয়নি, কিন্তু অসামাজিক যোগাযোগ একবার একটা ঘটেছিল। এতই মনুষ্যসমাজ-বহির্ভূত সেই বিরল সাক্ষাৎ, যে উভয়পক্ষেই তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ঘটনাটি চেপে না রেখে বলে ফেলাই ভালো।

মার্কিন দেশের লোকেরা সাত তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে নেয়, অফিস থেকে ফিরেই, ছ'টা নাগাদ। আর সূর্য ডোবেন তাঁর যখন খুশি, রাত্তির আটটা, ন'টা, দশটায়। খুব দীর্ঘ গোধূলি। সেদিন বড় সুন্দর বাতাস বইছে, দেশে যাকে বলে দক্ষিণা বায়, মন রয় না রয় না রয় না ঘরে, মন রয় না। যদিও তখন শীতকালই, কিন্তু বসন্ত এই আসে কি সেই আসে বলে দারুণ শাসাচ্ছে। আবহাওয়াটি বড়ো মনোরম। ললিতলতা লবঙ্গলতা। পরিশীলন কোমল সেই সময় সমীরণে মোটেই ঠাণ্ডার কামড় নেই, কর্ত্তাগিন্নি ভাবলেন, "অহো, কি অপরূপ বসন্ত-সন্ধ্যা। আজ আর রেঁধে কাজ নেই। একটু বাইরে থেকে খেয়ে আসা যাক।" কর্ত্তাগিন্নির এই ভাবনাটির মধ্যে অবশ্য বিশেষত্ব ছিল না। সপ্তাহে দু-একদিনই তাঁরা এরকম ভাবতেন। প্রত্যেকবার কারণগুলো ভিন্ন ভিন্ন তৈরি করে নিতেন। যথা: "আজ বড় সময় কম, অনেক পড়াশুনা আছে, রাঁধতে বসলে দেরি হয়ে যাবে," অথবা—"আজ হাতে ঢের উদ্বৃত্ত সময়, একটু ঘুরেফিরে খেয়েদেয়ে এলে কেমন হয়?" আসল কারণ দুটি। প্রথমত, গিন্নি সদ্য রান্না শিখছেন, তখনও ঠিক 'রন্ধনে দ্রৌপদী' হননি, একেকদিন রান্না ফেল করে যায়—মুখে তোলা যায় না। দয়ার সাগর কর্ত্তা যদিও তা স্বীকার করতে চান না, তবু তখন ডিম-রুটি-বেকন দিয়েই ডিনারের ফাস্ট ব্রেক করতে হয়। দ্বিতীয় কারণটি আরো জোরালো, বাড়ির পাশেই দুটি যারপরনাই সস্তা খাবারের দোকান আছে—একটি গ্রীক, অন্যটি চীনে। দোকানদুটি প্রধানত দেউলিয়া, ভবঘুরে, ভিখিরিদের জন্য হলেও গরীব কর্ত্তাগিন্নির মুখে সেই রান্না অমৃতসমান

লাগতো। বিশেষ বিলটা যখন আসত। দোকানদুটি প্রায় পাশাপাশি। পাঁচ মিনিটের হাঁটা রাস্তা। গিয়ে, খেয়ে, ফিরতে ঘণ্টাখানেক। অতএব কত্তাগিন্নি আজ আর কেউই ওভারকোটের অতিরিক্ত ভারবহন করলেন না, এই আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে। রাত তো হবে না, শীত পড়বার ঢের আগেই তাঁরা ফিরে আসবেন হালকা হৃদয়ে পলকা পায়ে। কুহু কুহু করে বেরিয়ে পড়লেন। কত্তার পকেটে পার্স আছে বলে গিন্নি তার অহং-থলিটিও নিলেন না। গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে গিন্নি বেরুলেন—কত্তার প্রাণে বেশি আনন্দ হলে আই. পি. টি. এ-র গান গাইতে থাকেন। দুজনে দু'রকম গান গাইতে গাইতে গ্রীক দোকানে ঢুকলেন।

সেখানে গ্রীক গান বাজছিল জ্যাক-বকসে। গিন্নি মেনু দেখতে দেখতে বললেন, "আহা, এখানে পয়সা ফেললে যদি রবীন্দ্রসংগীত হতো?"—"সেটা ভালো হতো না বিশেষ। বরং যদি 'পথে নামো সাথী' বাজতো কিম্বা 'ইণ্টারন্যাশনাল"—বলে কত্তা একটা বিয়র অর্ডার দেন। গিন্নি একটা কোকাকোলা। তারপর গ্রীক ল্যাম্বরাইস স্যালাড। গজার মতো বাকলাভা। তুর্কী কফি।

পেটপুরে প্রাণভরে খেয়েদেয়ে বাড়িতে ফিরে এসে তিনতলায় উঠে, পরিতৃপ্তি সহকারে ক্লোভ এবং কার্ডামম চিবুতে চিবুতে কত্তাগিন্নি আবিষ্কার করলেন—সর্বনাশই সমুৎপন্ন হয়েছে। এবং এই সর্বনাশে এমনকী পণ্ডিতের অর্দ্ধেক ত্যাগ করার উপায় নেই। পুরোটাই পরিত্যাগ করতে হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘরবাড়ি ফ্ল্যাটে নো এ্যাডমিশান—কেননা কত্তার চাবিটি আছে তাঁর ওভারকোটের পকেটে, গিন্নির চাবি তাঁর বটুয়ায়। এবং কোট-বটুয়া দুটোই ঘরের ভেতরে থেকে গেছে। ঘরে চাবিবন্ধ। অতএব আপন ঘরে পরবাসী—ঢুকতে আর পারিনে। এখন ঘরে ঢুকতে হলে এতগুলো কাজ করতে হয়: ১. বাড়িওয়ালাকে বস্টনে টেলিফোন করে একস্ট্রা চাবি প্রার্থনা করতে হবে। ২. সেটাও কোনো ফোন বুথে গিয়ে। ৩. তারপরে সে-ই বস্টনে ছুটতে হবে চাবিটি আনতে (যদি তৃতীয় চাবি থাকে। কেননা দুটি চাবিই দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি)। ৪. ইদিকে গাড়ির চাবিও তো রয়ে গেছে ঘরের মধ্যে—ঘরের চাবিরই সঙ্গে। অতএব টিউব ট্রেনে করে বস্টনে যেতে হবে। এবং ৫. ততক্ষণে শীত বেশ জাঁকিয়ে নেমে পড়বে। বসন্তকালের শীত নিশাচর, রাত হলেই ঝপাং করে তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়েন জনমনুষ্যের ওপরে, বাঘের মতো। অথচ ওভারকোটগুলোও ঘরের মধ্যে বন্দী। এই শীতে নদী পেরিয়ে বিনা-কোটে বস্টন যাওয়া...। কত্তার ফর্সা মুখটি শুকিয়ে বাসি বকুলফুল। এখন পাঁচদাগ সমস্যা সামনে—প্রত্যেকটাই খাঁটি।—হায়! হায়! কী গণ্ডগোলটাই যে পাকিয়ে গেল আজকে এই আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে!

হেনকালে গিন্নি লাজুক গলায় বেগনী-বেগনী মুখে কত্তাকে বললেন—"হ্যাঁগো, এদেশে রেইন-ওয়াটার পাইপ হয় না? আমি কিন্তু পাইপ বেয়ে উঠতে পারি।"

গিন্নির বাক্যংশ্রুত্বা চমৎকৃত কত্তার প্রথমে বাক্যরোধ হয়ে গেল। তারপরে সংবিত ফিরে পেয়ে তিনি ভাঙাগলায় বললেন—"সে কি!" তাতেই যথেষ্ট উৎসাহ পেয়ে

গিন্নি উবাচ—"অবিশ্যি এসব বাড়ির তো ঢালু ছাদ! রেইন-ওয়াটার পাইপ নাও থাকতে পারে। তা না-ই-থাকলো। চিমনির পাইপ-টাইপ যা হোক কিছু একটা থাকবেই নিশ্চয়?" বলেই নিচে ছুটলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। কত্তা আর কী করেন? তিনিও নিচে চললেন, ছায়া ইব। যেহেতু কোনো সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান সাপ্লাই করতে পারছেন না। আপাতত বিষয়টাই এমন স্থূল, আন-ইন্টালেকচুয়াল। অগত্যা গিন্নির সরল মোটা অ্যাপ্রোচটাই মেনে নেওয়া যাক।

বাড়ির পশ্চাদভাগে একটুখানি পোড়ো জমি। সেইখানে তিনটি ফ্ল্যাটের তিনখানি সুবৃহৎ আবর্জনা ভাণ্ড, মার্কিনী ভাষায় গারবেজ ক্যান, বসে আছেন কর্তাব্যক্তির মতো সারি সারি, সুগম্ভীর। এবং প্রায় অন্তঃসারশূন্যই, কেননা গতকালই পৌরসভার গাড়ি এক সপ্তাহের আবর্জনা কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। পাইপের সন্ধানে গিয়ে আরেকটি বস্তু আবিষ্কার করে ফেলেছেন গিন্নি এদিকে। করে তিনি আহ্লাদে আত্মহারা, আরে বাঃ, সমস্যার সমাধান! সামনেই কিনা একটি—অতি দীর্ঘ লোহার মই! দেওয়ালে চমৎকার প্রলম্বিত। ঠিক কত্তাগিন্নির চিলেকোঠার শয়নকক্ষের বাতায়নই উৎসমূল। এবং সেই জানলা, নিচে থেকেই দেখা যাচ্ছে। আজ শীত কম বলে ছিটকিনি দেওয়া নেই, এক-তৃতীয়াংশ খোলা। অর্থাৎ ওটাকে ঠেলে আরেকটু ওপরে তুলে দিতে পারলেই ঘরে ঢোকাটা তুচ্ছ। (ইংরিজি সিনেমায় দেখা বিদেশী জানলাগুলি পাঠকদের স্মর্তব্য : কুত্রাপি গ্রিল-গরাদের ঝামেলা থাকে না)।

পাইপের বদলে মই পেলুম টাক ডুমাডুম ডুম।

পরম উৎসাহে গিন্নি বললেন, কত্তাকে—"তবে আর ভাবনা কিসের? তুমিই উঠে পড়ো"—হাজার হোক গিন্নি এটুকু জানেন যে ভদ্রসমাজে পুরুষকেই প্রথমে 'পুরুষের ভূমিকায়' একটা চান্স দিতে হয়। এবং মই বেয়ে ওঠাটা ঠিক নতুন বউয়ের যোগ্য রোল নয়। সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ সুরে কত্তা বলেন, "সে তো উঠতেই পারি! এ আর কে না পারে? ফুঃ!" তারপর নিজের ঝাঁকড়াচুলে একটু বিলি কেটে নিয়ে ফের বলেন—"নো প্রবলেম। সহজপন্থা তো সামনেই। যে-কেউ উঠে পড়লেই হলো।" কিন্তু কার্যত মই স্পর্শ করার কোনোই লক্ষণ দেখালেন না। অধৈর্য গিন্নি এবার তাড়া লাগালেন—"কই, ওঠো?" বশংবদভাবে কত্তা বললেন—"এই উঠছি।" বলে গম্ভীরভাবে একবার বাঁদিক থেকে, আরেকবার ডানদিক থেকে সিঁড়িটাকে খুব যত্নসহকারে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। ধীর, সুস্থির, বিলম্বিত লয়ে পায়চারিপূর্বক। যেন বাঘের খাঁচার ব্যাঘ্র।

সরু আঠারো ইঞ্চি চওড়া লোহার শিকের তৈরি মই। বিপজ্জনকভাবে সিধে উঠে গেছে স্বর্গের সিঁড়ির মতো। ঠিক কত্তাগিন্নির জানলা পর্যন্ত। হাতল-টাতলের বালাই নেই। দেয়াল থেকেও ফুটখানেক দূরে। এবং মাটি থেকে প্রায় একতলা উঁচুতে নেমে এসে হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে। এর নাম 'ফায়ার এসকেপ'। বাড়িতে আগুন লাগলে এই মই বেয়ে বাইরে পালিয়ে আসতে হয়। শুধু নামবার জন্যেই

এই মই, ওঠবার জন্য নয়। বাড়িতে আগুন লাগলে, এই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে শেষ ধাপ থেকে ওরাংওটাংয়ের মতো দুই হাতে ঝুলে পড়লে, পা মাটি থেকে খুব বেশি ওপরে থাকে না। তখন দুগগা বলে ঝুপ করে লাফালেই হলো। কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে ঐ সিঁড়িতে নাগাল পাবার কোনো উপায় সাধারণ মানুষের নেই। নতুবা চোরেরা যে রেগুলারলি ওঠা-নামা করবে! মার্কিন দেশে প্রত্যেক বাড়িতে এই লোহার সিঁড়ি আইনত অপরিহার্য। এবং ধনীবাড়ির গিন্নির মতোই ধনীবাড়ির ফায়ার এসকেপের বেশ নধর, পুষ্ট, রেলিং-টেলিংওয়ালা দোহারা চেহারা হয়, আর গরীববাড়ির ফায়ার এসকেপের হয় রোগা, সরু, টিমসে। যেমন এইটে। এটার জন্ম হয়েছে যেন আইনের দৌলতে—নাম-কা-ওয়াস্তে। কাম-কা-ওয়াস্তে নয়।

কত্তার দ্বিধান্বিত দুশ্চিন্তিত পায়চারি দেখে গিন্নি ভাবলেন কত্তা নিশ্চয় ভাবছেন "অত ওপরে মইটা ফুরিয়েছে—এখন উঠি কী করে?" বুনোগিন্নির মাথায় চমৎকার দুর্বুদ্ধির বৈদ্যুতিক উদ্ভাস এসে গেল। তাঁর শরীরে তো ঘেন্নাবৃত্তি নেই! তিনি বল্লেন —"এসো আমরা একটা গারবেজ ক্যানের ময়লা আরেকটাতে ঢেলে নিয়ে খালি পাত্রটি উপুড় করে মইয়ের তলায় পাতি। তারপরে ওটার ওপরে চড়লে তুমি ঠিকই হাত পেয়ে যাবে মইতে। তুমি যা লম্বা!" বলে কত্তার পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যটিকে সপ্রশংস নয়নে বন্দনা করেন। আহা কী চেহারা—যেন শালপ্রাংশু। মহাভুজও কি নন? কত্তা তাতে ধন্য বোধ করলেও ডাস্টবিনে চড়বার কাজে খুব একটা উৎসাহ পেলেন বলে মনে হলো না। কিন্তু অধীর আগ্রহে প্রবলা সেই গিন্নিকে দমায় কে? অনতিবিলম্বেই একটা ময়লা ফেলার ড্রাম খালি করে ফেলে সেটা মইয়ের তলায় উলটিয়ে পাতা হয়ে গেল। মঞ্চ প্রস্তুত—এবার কত্তার তাতে উঠে পড়ারই অপেক্ষা।

হেনকালে গিন্নির অত্যুৎসুক আঁখিপল্লব এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে নিরুপায় কত্তা আমতা আমতা করে বলেই ফেলেন—"শোনো, একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি।" গিন্নির মুখটি শুকিয়ে গেল। বলা হয়নি এমন কথা এখনও আছে? এই পাককা সাড়ে সাতমাস পড়েও? অর্থাৎ তিরিশ ইনটু সাত দু-শো দশ প্লাস পনেরো রাত্রি একাদিক্রমে গুঞ্জনের পরেও?

কত্তা অপরাধীর মতো মাটিমুখো হয়ে যা-থাকে-কপালে-সুরে বলে ফেললেন, —"আমার ভার্টিগো আছে।" বিমর্ষ গিন্নি এবার আঁতকে উঠলেন। "এ্যাঁ...?" গিন্নি অকাতরে কাতরে ওঠেন—যেন সিফিলিস—"সে কি গো? সে তো একটা ভয়ংকর হিংস্র মনের রোগ, যা খুনীদের থাকে। শুনেছি হিচককের 'ভার্টিগো' নামে একটা ছবিতে এক স্বামীস্ত্রী...", কত্তাটি এবার হাঁ হাঁ করে ওঠেন—"ওরে নারে, খুনটুনের ব্যাপারই নয়, ভার্টিগো একটা তুচ্ছ অসুখ—অতি তুচ্ছ, অত্যন্ত সাধারণ, আ মোস্ট কমন প্রবলেম—যাতে ওপর থেকে নিচের দিকে তাকানো যায় না। দেশের বাড়িতে দ্যাখোনি, দেয়ালঘড়িতে বাবা দম দিতেন, ঠাকুর দম দিত, এমনকী মালীও দম

দিত, অথচ আমি কদাচ দিতাম না? আমি যে মইতে চড়তে পারি না। চড়লেই মাথা ঘোরে। বুক ধড়ফড় করে, বমি পায়, মনে হয় পড়ে যাব, অথবা লাফিয়ে পড়ি। এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে কুতুবমিনারে কিছুতেই চড়লুম না।"—"উঃ, কি সর্বনাশ। মনে হয় লাফিয়ে পড়ি?" গিন্নিই লাফিয়ে ওঠেন। কিন্তু গলা শুনে মনে হয় না সর্বনাশের গন্ধ পাচ্ছেন। লাফিয়ে গিন্নি একেবারে গারবেজ ক্যানের ওপরেই উঠে পড়েন। উঠে সোল্লাসে বলেন—"খবর্দ্দার, তোমার মইতে চড়ে কাজ নেই। আট্টু হলেই সর্বনাশ হয়েছিল আর কি! এতো আমার ডালভাত। এ আমি ইজিলি চড়তে পারি।" গিন্নির গলায় স্পষ্ট রিলিফ। বিয়ের পরেই দল বেঁধে সবাই কুতুবমিনারে গিয়ে গিন্নির সত্যি বড্ড মনে কষ্ট হয়েছিল। জেদ করে কত্তা নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন। একা-একাই। কিন্তু ওদিকে যে একটা ভীষণ সাজগোজ করা পাঞ্জাবী মেয়েও নিচে দাঁড়িয়েছিল! গিন্নি তাই মিনারে চড়ে মোটেও মনে শান্তি পাননি। আজ বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। এ-ই ব্যাপার ছিল তাহলে?

"সেই ব্যাপার নয়? তা-রা! জয় মা তারা (গিন্নি হঠাৎ মনে মনে তাঁর পিতৃদেবের মতো হুংকার দিয়ে ওঠেন) তারা ব্রহ্মময়ী মাগো। বাঁচা গেল।"

দেড়মাস আগেই কত্তাগিন্নির বিবাহের অর্ধবর্ষপূর্তি জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেছে বটে কিন্তু দেখা যাচ্ছে "এখনও গেল না আঁধার"—এখনও কত কি জানা বাকি। পরস্পরকে ভালো করে চেনাই হয়নি। এই সংকটমুহূর্তে গিন্নি প্রথম জানলেন তাঁর সর্বশক্তিমান কত্তা একটা জিনিস পারে না—আর কত্তা অবগত হলেন যে গিন্নি সেইটে তো পারেনই, পরন্তু আরেকটা জিনিসও পারেন। গিন্নি জানলেন তাঁর কত্তা মইতে চড়তে অপারগ—এবং কত্তাও এই প্রথম জানলেন যে গিন্নিটি রেইন-ওয়াটার পাইপ বাইতে ওস্তাদ, দুজনে দেখা হলো, মধুযামিনী রে।

৭

হলে কি হবে, গিন্নির আঙুলের ডগাটুকুও পৌছোলো না মইয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত। পায়ের তো প্রশ্নই নেই। তখন পুরুষজাতির সম্মানরক্ষার্থে কত্তাও উঠে পড়লেন উলটোনো আবর্জনা-পাত্রের পৃষ্ঠদেশে। কত্তাকে দেখে উদ্বিগ্ন গিন্নির মনে একটি ছবি ভেসে এলো—"আচ্ছা, একটু একটু কিষ্কিন্ধার রাজার মতো দেখাচ্ছে না তো গো আমাদের?" কিন্তু কত্তা কেজো-মানুষ। ওসব নান্দনিক অপভাবনার তাঁর সময় নেই।

"—দূর! যত্ত উটকো ভাবনা।" বলে কত্তা ততক্ষণে গিন্নিকে দুহাতে শক্ত করে শূন্যে তুলে ধরেছেন এবং টারজানের মতোই অবলীলাক্রমে গিন্নির শাঁখা-নোওয়া পরা হাতদুটি মই ধরে ঝুলে পড়েছে। তারপর কত্তার স্বেচ্ছা-নিবেদিত স্কন্ধদেশে পদস্থাপনপূর্বক নববধূ মইতে পা তোলেন—অনেকটা প্যারালাল বারের কায়দায়। বীরপুরুষ কত্তামশাইয়ের মুখ ফসকে এই সময় একটি মৃদু অস্ফুট আর্তনাদ নিষ্ক্রান্ত হলো। গিন্নি তাড়াতাড়ি জিব কাটলেন—"এই-যাঃ, লাগলো তো? পায়ে চটি যে!"

এমন সময়ে একটি ঝনঝন শব্দ শুনে কত্তাগিন্নির চোখ চলে যায় সামনের জানলার দিকে। একতলার বুড়িমার রান্নাঘরের জানলার পর্দা সরানো। সিঙ্কের সামনে বৃদ্ধাটি অবশ দাঁড়িয়ে—একহাতে বাসনমাজার বুরুশ, অন্যহাতের প্লেটটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। পুরু লেন্সের তলা দিয়ে তাঁর চোখ দেখা যায় না, কিন্তু খুলে যাওয়া ফোকলামুখের গোল হাঁটি কাতলা মাছের খাবি খাওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির মধ্যেই বিশ্বের বিস্ময় স্তম্ভিত।

গিন্নি এবারে একটু লজ্জা পান। সৌজন্যসূচক হাসি একটু করে ছুঁড়ে দিয়েই তিনি মই বেয়ে রাজমিস্ত্রির মতো স্বচ্ছন্দে উঠে যান—তারপর বুড়ির স্তব্ধ দৃষ্টির সামনে দুপাটি জরির চটি শূন্য থেকে পুষ্পবৃষ্টির মতো খসে পড়ে। কত্তা ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসেন একটু। পরমুহূর্তেই পুনরায় উর্ধ্বমুখে, দুই কোমরে দুই হাত, গিন্নির সশরীরে স্বর্গারোহণের পুণ্যদৃশ্য ধ্যানস্থচিত্তে নিরীক্ষণ করেন। গারবেজক্যানের ওপর থেকে নামবার কথাটা তাঁর মনেও পড়ে না। চেয়ে চেয়ে দেখেন, আর মনে মনে তারিফ করেন।—বাঃ! গিন্নি তো দিব্যি উঠছেন! পায়ে পায়ে তো মন্দ প্রগ্রেস হচ্ছে না। খাশা! ওকি! হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? গিন্নির হলো কী? কত্তার ভুরু কুঁচকে যায়।

৮

ওদিকে গিন্নির এই হলো। মই দিয়ে দিব্যি চড়ছিলেন উদবেড়ালের মতো তরতরিয়ে, সহসা সামনে পড়লো পর্দাসরানো দোতলার জানলা। ঘরে আলো জ্বলছে। বেঁটে স্টীভি চেয়ারে বসে নীচু হয়ে পা থেকে মোজা খুলছে, পরনে কেবল আণ্ডারওয়্যার। কাঁধে তোয়ালে। অবশ্যই স্নানে যাচ্ছে। এবং জানলার দিকে পিছন ফিরে সদ্যোস্নাত দৈত্যটি আয়নার সামনে বাহুমূলে সবেগে পাউডার মাখছে, পরনে কেবল জন্মসূত্রে প্রাপ্ত দু গজ দু ইঞ্চি অম্লান শাদাচামড়া। এমন সময়ে আয়নায় কিছু দেখে ভূত দেখবার মতো শিহরিত হলো সে, হাত কেঁপে উঠে পাউডারের পাফ পড়ে গেলো—মুখ থেকে শব্দও নির্গত হয়ে থাকবে, কেননা স্টীভি মুখ তুলে চাইল, দৃষ্টি বিস্ফারিত, ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত, যেন দুজনকেই ভূতে পেয়েছে। তারা দেখলো দোতলার বাতায়নপথে নিষ্পত্র মেপল গাছের উঁচু ডগার ফাঁকে ধূপছায়া রঙ সন্ধ্যামেঘের গায়ে হেলান দিয়ে মহাশূন্যে উদিত হয়েছে তিনতলার গিন্নির সহাস্য বেগুনী বদনচন্দ্রিমা। একজন দেখলো সেটা আয়নায়, থালার জলে সূর্যগ্রহণ দেখার মতো, আর একজন দেখলো সোজাসুজি। এবং একেই কবির ভাষায় বলা হয়েছে 'বিপথি বিস্ময়'। দৈত্যাকৃতি কিশোরটি লজ্জায় হঠাৎ বসে পড়লো। এইভাবে যে দোতলার জানলায় উঁকি দিয়ে কেউ কদাচ তাদের নির্জনতা ভঙ্গ করতে পারে—এ তাদের—বন্যতম কিশোর-কল্পনারও বাইরে।

অথচ গিন্নি বেচারী কী আর করবেন? এ তো আর ইচ্ছে করে নয়! তিনিই বা কেমন করে জানবেন যে এই নচ্ছার ছেলেরা অমন ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হবার মতো তক্ষুনি চান করে বেরোবে! বিপন্নতার ঘোর কাটতে না কাটতে ছেলেদুটি দেখলো শাড়ির পাড়ে-ঘেড়া দুটি মোজাপরা শ্রীচরণ তরতর করে তাদেরই জানলার বাইরে দিয়ে অনন্ত উধর্বলোকের দিকে উঠে গেলো।

যতক্ষণে তারা সামলে-সুমলে আত্মস্থ হয়ে জানলায় এসে কাঁচ তুলে চেঁচামেচি জুড়লো, "হে, হোয়াটস দা ম্যাটার," ততক্ষণে তিনতলার জানলা দয়া করে দ্বিধা হয়েছেন এবং গিন্নিও তাতে প্রবেশ করে ফেলেছেন। কেবল তখনও আনমন-মুগ্ধ-নেত্রে গারবেজক্যানের বেদীতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন কত্তামশায়। ওদের প্রশ্নের উত্তর, তিনি আপন পটভূমি বিস্মৃত হয়ে, স্বভাবসুলভ সন্ত্রান্ত গলায় দেন—"নাথিং রিয়্যালি, উই আর জাস্ট লকড আউট।" শুনে বালকদ্বয় বিস্ময়সূচক আওয়াজ করল—"জী-ঈ-ঈ-ঈ-ঈ। কিন্তু আপনি গারবেজক্যানের ওপরে দাঁড়িয়ে কেন? ওটা যে ভেঙে যাবে!" সহসা সচেতন হয়ে কত্তা তাড়াতাড়ি নেমে পড়েন, মুখে লাজুক হাসি। জো পেয়ে লম্বা ছেলেটা ধমকে ওঠে—

—"লকড আউট তো সকলেরই হয়, তাই বলে ঘরে ঢোকবার প্রকৃষ্টতম পন্থা কি এইটে? হা ঈশ্বর! আপনি নিজেই বা ওঠেননি কেন? মেয়েদের কি একাজে পাঠানো ঠিক?"

বাঁটকুল স্টীভি অমনি ফোড়ন কাটে—

—"আপনার স্ত্রী যদি পড়ে যেতেন? অত লং ড্রেস পড়ে কেউ কখনও মই বেয়ে ওঠে? গুডনেস গ্রেশাস!"

কত্তা প্রাণপণে ভদ্রতার কানা আঁকড়ে চুপ করে আছেন। মার্কিনী জ্ঞান বিতরণ আর শেষ হয় না। কে আর স্নান করে বেরিয়েই অরক্ষিত অবস্থায় সন্ধের আবছায়ায় দোতলার খোলা জানলায় শূন্যে উড়ন্ত নারীমূর্তি দেখলে খুশি হয়? স্টীভি বলে —"এর চেয়ে আপনারা একটা ডুপ্লিকেট চাবি নিচেরতলায় বৃদ্ধা মহিলার কাছে জমা রাখেন না কেন? জগতে আর-সবাই যা করে? আমরাও যা করেছি?"

কত্তা কোনো উত্তর ভাববার আগেই ঠং-করে একটা চাবি শূন্য থেকে এসে পড়ল গারবেজক্যানের মাথায়। তারপরেই ছিটকে গিয়ে মাটিতে। কত্তা চটপট কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ভরেন।

"জী-ঈ-ঈ-ঈ"!! আবার বিস্ময়ে হতচকিত হয় বালকবৃন্দ। এবং লম্বুটা আরেক প্রস্থ ধমক লাগায়—

—"আচ্ছা, এটার কোনো প্রয়োজন ছিল কি? যদি ওপাশের ওই গারবেজ-ক্যানটার মধ্যে গিয়ে পড়তো চাবিটা? তখন চাবি উদ্ধার করতে আপনারা টিনসুদ্ধ ময়লা ঘাঁটতে বসে যেতেন কি? হুমম? তার চেয়ে আপনি টুকটুক করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেই পারতেন? গিয়ে দোরে টোকা মারতেন, আপনার

গিন্নি তো ভেতর থেকে দোর খুলে দিতেন? উড নট দ্যাট বি বেটার?"

কত্তাটি জাতে মাস্টার, সাহেবপুত্তুরদের জ্ঞান দেওয়াই তাঁর স্বধর্ম—তাছাড়া ছাত্রবয়সে দুর্ধর্ষ ডিবেটারও ছিলেন,—কিন্তু আজকে কী যে হয়েছে তাঁর? এই অর্বাচীন অপোগণ্ড ষণ্ডামার্কা বোকা-পাকা দুটো পুঁচকে ক্রুকাটকুলো আকাট-মুখ্য আনডার-গ্রাজুয়েটের বোম বক্তিয়ারির উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না অমন দুর্দমনীয় উঠতি-পণ্ডিত কত্তামশাই। মনে মনে গাল দিতে থাকলেন। কিন্তু মুখে শব্দ যোগালো না—ওদেরই পক্ষে অকাট্য যুক্তি। কত্তা অযৌক্তিক এঁড়েতক্কো করতে পারবেন না একদম—সেটাতে গিন্নিরই মোনোপলি। কত্তা অগত্যা দুই পকেটে দু-হাত গুঁজে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একটা সাবানকাচা হাসি হেসে উর্ধ্বমুখে তাকিয়ে বললেন:—"তাই তো!" আর ভাবলেন, সিগারেট কই, সিগারেট?

ইতিমধ্যে ওপরের জানলার ফাঁকে গিলোটিনের আসামীর মতো করে মুখটি বাড়িয়ে ব্যাপার-স্যাপার সযত্নে শ্রবণ-পর্যবেক্ষণ করছিলেন গিন্নি। তাঁর ভালোমানুষ কত্তাটিকে বাগে পেয়ে এই দুটো ত্যাঁদড় ছোকরা যা-নয়-তাই বকুনি দিচ্ছে? এ কি গিন্নি সইতে পারেন? সায়েব-গুণ্ডা বলেই পার পেয়ে যাবে? কক্ষনো নয়। তৎক্ষণাৎ গনগনে লাভার মতো, অগ্ন্যুৎপাতের মতো, অথবা রাগী ভগবান জেহোভার দৈববাণীর মতো—গিন্নি ওপর থেকে গরম গরম শব্দবৃষ্টি করতে থাকেন:

—"অযাচিত উপদেশের জন্য অনেক ধন্যবাদ—এবার থেকে নিশ্চয়ই শখ করে ফায়ার এসকেপ বেয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকবো না আমরা—তবে চাবিটা কেন নিচে ফেলা হলো জানতে চাইলে, এই বলছি শুনে রাখো—যাতে উনি একতলার বৃদ্ধা মহিলার হাতে একেবারে চাবি জমা দিয়েই তবে ওপরে ওঠেন। জীবনে যাতে এরকম ভুল দ্বিতীয়বার না ঘটে। বুঝলে বাছারা? ও কে, কিডস? আর য়ু সাটিফায়েড?—"

দোতলার জানলা থেকে ডবল গিলোটিনের মতো দুই মুণ্ডু বাড়িয়ে থাকা দুই ছেলে বাক্যসুধা শুনলো। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরের দিকে চাইতে সাহস করলো না। সেই মুখ! সেই আলো-আঁধারিতে মুক্ত বাতায়নপথে দীর্ঘ মেপল গাছের নিষ্পত্র শাখার ফাঁকে সন্ধ্যা-মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে মহাশূন্যে অভ্যুদিত সেই অলৌকিক বাদাম-রঙা মুখচ্ছবি—সেকি আরো একবার দেখা সম্ভব? (তারা তো আর রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, প্রিয়ার ছায়াও যে আকাশে এক-একদিন ভাসে, তাদের সে তত্ত্ব জানা নেই)। ও বাবা! এতদশ্রুত্বা ছেলেরা নিচের দিকে চেয়ে চেয়ে ধরিত্রীর বুকে পীসফুলি অধিষ্ঠিত কত্তাকেই বলল:

—"তাই বলুন! ওয়েল, দ্যাট মেকস সেন্স। গুডনাইট।" এবং চটপট ঘরের মধ্যে মুণ্ডু টেনে নিয়ে জানলা নামিয়ে ফেললো। কী জানি আবার যদি মই বেয়ে নেমে আসে?

৯

বৃদ্ধার হাতে চাবিটি জমা দিয়ে, প্লেট-ভাঙার জন্য যারপরনাই দুঃখ জ্ঞাপন করে, অবশেষে নিজের ঘরে ঢুকে দু'ডলারের আরামকেদারায় গা এলিয়ে, পঞ্চাশ সেন্টের মাটির মগে করে গরম গরম কফি খেতে খেতে কত্তা ভয়ে ভয়ে কথাটা পাড়লেন: —"হ্যাঁগো, রমেশদের একটু ফোন করি? একটু আসতে বলি? বড্ড হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করছে। স্ট্রেনটা তো বড়ো কম গেলো না।" চোখ পাকিয়ে অদম্যস্পর্ধা গিন্নি বললেন—"স্ট্রেনটা কার বেশি গেছে শুনি? আমি মই বেয়ে তিনতলা উঠলাম, আর হুইস্কি খাবে তুমি?" তারপর মিষ্টি হেসে কৃপাবর্ষণ করেন—"ঠিক আছে, ফোন করে দিচ্ছি।—বেশি রাত করা চলবে না। কিন্তু আজকে! কাল ভোরবেলা ক্লাস আছে!"

প্রশ্রয় পেয়ে আহ্লাদে গদগদ কত্তা কৃতজ্ঞচিত্তে দু'হাত তুলে গিন্নির মইতে চড়ার কৃতিত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে থাকেন। এক সময়ে তারই ফাঁকে টুক করে বলে ফেললেন:

—"আচ্ছা, তুমি চাবিটা সত্যি সত্যি বুড়িকে জমা দেবার জন্যেই নিচে ফেলেছিলে?"

এতক্ষণে নিজের প্রশংসা শুনে খুশিবিগলিত গিন্নি খলবলিয়ে উঠলেন—"আরে দূর! তুমিও যেমন? ছোকরাগুলোর চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা শুনে মাথাগরম হয়ে গেলো, তাই ওরকম বলে দিলুম। আসলে আমার মোটে মনেই ছিলো না যে এসব ইয়েল লক, ভেতর-বাইরে দুদিক থেকেই খোলে। আমি ভেবেছি তালাবন্ধ ঘরে আটকে পড়েছি—বাইরে থেকে না খুললে বুঝি...তাইতো তোমাকে চাবিটা ফেলে দিলুম—"

হঠাৎ একটু ঘনিয়ে এসে, গিন্নির ডাঁশা গোলাপজামের মতো চিবুকটি ছুঁয়ে গলাটা বিরাট খাদে নামিয়ে কত্তা বললেন:

—"যাতে আমি গিয়ে আমার বন্দিনী কন্যেটিকে উদ্ধার করি?"

কত্তার গলায় কী যে ছিল, অমন গেছোগিন্নির মুখখানি হঠাৎ নিচু হয়ে যায় —অমন বাক্যবাগীশ জিভে কেবল একটিই শব্দ যোগায়:

—"য্যাঃ।"

এক মিনিটের স্তব্ধতা।

তারপরেই গিন্নি টংটরিয়ে ওঠেন—

—"ওই বেল বাজলো বলে, এক্ষুনি রমেশরা এসে পড়বে কিন্তু, হ্যাঁ।"

অমৃত, শারদীয় ১৩৮৫

চক্রবর্তী রাজশেখর,

H.O.D.H.S.

আর আধঘন্টা বাদেই শেষ হবে পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা একমনে কলম ছোটাচ্ছে, রেসের মাঠে লাস্ট লেগ-এর দৌড়। আমি পাহারা দেবার নামে মাঝে মাঝে ঘুরে আসছি আর বাকি সময়টা বসে পরদিনের লেকচার তৈরি করছি। হঠাৎ দরজা খুলে গেলো। দীর্ঘ, সৌম্যমূর্তি, নুনমরিচ-রঙ ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এবং ছাইরঙের সুটপরা এক বয়স্ক ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকলেন হলের মধ্যে। আমি ঠিক চিনতে পারছি না—কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তিনি ঢুকেই—"বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস! টাইম ইজ আপ! গিভ আপ ইওর পেপারস—" বলেই একজনের খাতায় হ্যাঁচকা টান মারলেন। আমি ছুটে যাই, "হাঁ হাঁ করেন কি, করেন কি, ওদের লিখতে দিন। এখন তো মোটে তিনটে!"

ছেলেরা প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। লেখা বন্ধ। চোখ বিস্ফারিত।

—"তিনটে? অর সাড়ে তিনটে?" তিনি হুংকার দেন।

—"তিনটে স্যার।" কোরাসে জবাব এল।

—"ও. কে. দেন। ক্যারি অন।" বলেই ভদ্রলোক একগাল হাসেন।

ছেলেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে খাতাতে চোখ নামায়। কেউ কেউ আবারও মুখ তুললো তারপরে। এবার ভুরু কুঁচকে। লোকটা কে? বিভাগের কেউ নয়। তবে কি এই 'কনট্রোলার অব এগজামিনেশনস' নামক অদৃষ্টপূর্ব প্রাণী? ছেলেরা তাঁকে দেখতে পায় না।

আমি এবার যুদ্ধে নামি।

—"চলুন, বাইরে চলুন। এটা পরীক্ষার হল।"

উনি চোখ মটকে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। ছোট ছেলেরা দুষ্টুমি করলে যেমনটা করে। ফিসফিসিয়ে বললেন—'আপনিই নবনীতা তো?" গলার সুরে ষড়যন্ত্র।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ—" একটুও যে ঘাবড়ে যাইনি, তা নয়, তবুও জোরসে বলি—"বাইরে গিয়ে কথা হবে—এখানে পরীক্ষা হচ্ছে—", আমি দরজা খুলে ধরি। উনি না নড়ে বলেন—"আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। অনেকক্ষণ বাইরে পায়চারি করতে করতে বোর হয়ে গেলাম। তারপর ঐ বুদ্ধিটা করে ঢুকে পড়েছি।" তিনি নিঃশব্দে মিষ্টি করে হাসলেন, ছেলেরা উচ্চৈঃস্বরে।

যারপরনাই রেগে গিয়ে আমি বলি—"একটা পরীক্ষা চলছে এখানে। দয়া করে সীন করবেন না। বাইরে চলুন। এখানে আপনার প্রবেশাধিকার নেই।"

—"কে বললে নেই? আমিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রীতিমতো সই করে মাইনে নিই। হুঁ।" বলতে বলতে উনি বেরিয়ে আসেন। পেছু পেছু বেরিয়ে এসে আমি বলি—"তবে তো আরো ভালো করেই জানেন যে পরীক্ষার হল-এ ঢোকা নিষিদ্ধ। ছেলেমেয়েরা কীরকম শকড হলো বলুন তো?"

হো হো করে হেসে উঠে উনি বললেন, "নাঃ মশাই, আপনি নেহাৎ বালখিল্য আছেন এই লাইনে। ছেলেমেয়েরা কি শকড হয়? নো। নেভার। আপনি যাই করুন, ওরা তাতে শক্ পাবে না। ছাত্ররা হচ্ছে শক-প্রুফ মেটিরিয়াল।"

—"আপনি কেন এসেছেন? কোনো প্রয়োজন আছে কি?"

—"খুবই জরুরি প্রয়োজন। সেলিমাকে চেনেন?"

—"বাঃ! চিনি না? আমার খুব বন্ধু।"

—"সেলিমা মৃত্যুশয্যায়। জানেন?"

—"অ্যাঁ।"

—"হ্যাঁ।"

—"সেকি? কী হয়েছে ওর?"

—"সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।"

—"আপনি দয়া করে আমার ঘরে একটু বসুন। আমি ডিউটি শেষ করে আসছি। আপনি চা খাবেন? আমি আসছি, ভবানী। একটু চা করে দেবে এই ভদ্রলোককে? উনি আমার ঘরে বসছেন।"

—"চা হইব না।" ভবানীর সাফ কথা। "আমার সময় নাই। খাতা সিলাই আছে না? কফি হইতাছে। দিতে পারি।"

—"দ্যাটস ফাইন, থ্যাংকিউ!" বলে ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকে যান। হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা সত্যিই শক-প্রুফ। তারা দিব্যি মন দিয়ে, মাথা গুঁজে লিখে যাচ্ছে। কিন্তু খাতা জমা দিয়েই হৈচৈ করে হেসে উঠলো ঘরসুদ্ধু সবাই—"উনি কে, দিদি? উনি কে?"

—"আমিও ওঁকে চিনি না।"

—"নির্ঘাৎ পাগল!"

—"হতেই পারে।"

পরীক্ষার খাতাপত্তর অফিসে জমা দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি ব্ল্যাকবোর্ডে এক জটিল গ্রাফ আঁকা হয়েছে। ভদ্রলোকের একহাতে খড়ি, অন্য হাতে ঝাড়ন। তাঁর সামনে আমার দুই ছাত্রী ভীরু কপোতীর মতো ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। এবং জুলজুল করে চেয়ে রয়েছে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। উনি চার্টটির ব্যাখ্যায় রত আছেন বলে মনে হলো। আমাকে দেখে মৃদুহাস্যে নড করে আমারই ঘরে ঢুকতে আমাকে অনুমতি দিলেন। বক্তৃতা অবশ্য বন্ধ হলো না। মেয়েরা কাতর নয়নে এবার আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কী জানি কী উপায়ে এদের গ্রেপ্তার করেছেন ভদ্রলোক! সুদর্শন, সুন্দর উচ্চারণ, চমৎকার কণ্ঠস্বর, সম্ভ্রান্ত বেশভূষা, সব মিলিয়ে ব্যক্তিত্বটি রীতিমতো আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। মেয়েদুটিকে মোহিত করতে সময় লাগেনি প্রাথমিকভাবে। তারপরেই হয়েছে গোলমাল, আর ছাড়ান নেই!

—"একসকিউজ মি, এদের সঙ্গে আমার একটু কাজ ছিলো। সেটা সেরে নিই?"

—"অফ কোর্স, অফ কোর্স। আপনার এই ইয়ং লেডিদের আমি একটু এণ্টারটেইন করছি মাত্র। তবে এদের খুব একটা ইণ্টারেস্ট দেখছি না। নন-অ্যানালিটিকাল মাইনডের এটাই দোষ। স্লাইটলি ডাল কিনা? সায়েন্সে এই ব্রেন চলতো না।" ভদ্রলোক ডাস্টারটি অল্প অল্প ঠোকেন। অল্প অল্প ধুলোর কুয়াশা ছড়ায়। আমি যারপরনাই বিব্রত। মেয়েগুলি চটে গেছে। নাকের ডগা লাল হয়েছে তাদের। টিউটোরিয়াল নিতে এসে এ কী বিপত্তি! যাবার সময়ে ভদ্রলোকের দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলো দুজনেই। হাসতে হাসতে ভদ্রলোক বললেন—"কীরকম চটেছে দেখলেন তো? ওঃ! কী এক-একখানা কটাক্ষ ছেড়ে গেলো সব! ওই যে, ডাল বলেছি কিনা? অন্ধকে অন্ধ বলা দোষ, খোঁড়াকে খোঁড়া বলা দোষ, কিন্তু ডালকে ডাল বলাটা হলো মহাপাপ। দি আলটিমেট ইনসালট। সকলেই ব্রিলিয়াণ্ট কিনা? সকলেই নিউটন-কোপারনিকাস। নিদেনপক্ষে বুদ্ধিজীবী।"

ততক্ষণে আমি জড়িয়ে গেছি ব্ল্যাকবোর্ডের প্যাঁচে। বিরাট জটিল এক গ্রাফ এঁকেছেন ভদ্রলোক। তার নিচে বাংলায় লেখা "হায়! ভূমণ্ডল!" ভুরু কুঁচকে গ্রাফের জট ছাড়াচ্ছি। ভদ্রলোক চুপচাপ নিরীক্ষণ করছেন।

—"বুঝলেন কিস্যু? মেকস সেন্স টু ইউ?"

—"বুদ্ধি বাড়াকমার হিসেব। বয়স অনুপাতে বুদ্ধির বৃদ্ধি।"

—"আজ্ঞে, ঠিক তাই। এটা কিন্তু আই. কিউ-র ব্যাপার নয়—সেটা জানেন তো? এ আমার নিজস্ব চার্ট। ইণ্টেলিজেন্স কোশেণ্ট-এর সঙ্গে যোগ নেই কোনো।"

—"জানি জানি। কিন্তু এর মানে কী? এটা এঁকেছেন কী করতে?"

—"একটা কথা বোঝাবো বলে। টু ইলাস্ট্রেট আ ফ্যাক্ট।"

—"কাকে বোঝাবেন বলে? স্বাতী-সুদক্ষিণাকে? না আমাকে?"

—"যে বুঝতে চায়, তাকে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যিনি চিন্তা করেন, তাঁকে। জীবনের গতিবিধি নিয়ে যাঁর চিত্তে দার্শনিক উদ্বেগের উৎপত্তি হয়, তাঁকে। এই গ্রাফ হলো সর্ববিদ্যার মূল। দাঁড়িপাল্লা। এই চার্ট দিয়েই আপনি জীবন ও জগতের প্রত্যেকটি কার্যকারণ মেপে ফেলতে পারবেন। এবং তার ফলেই, বুঝেও ফেলতে পারবেন। এবং বুঝে, ক্ষমাও করতে পারবেন। সো, এভরিথিং উইল ফল ইনটু প্লেস। দিস ডিলস উইথ দা বেসিকস।"

—"আচ্ছাঃ?"

—"বিশ্বাস হলো না?"

—"না না, মানে, ব্যাপারটা ঠিক—"

—"অনুধাবন করতে পারছেন না? স্টাডি করুন, স্টাডি করুন। একটু মন দিয়ে স্টাডি করুন, নিজেই ধরতে পারবেন। ইটস ভেরি সিম্পল, রিঅ্যালি!" ভদ্রলোক চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি যৎপরোনাস্তি অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলুম। টের পেলুম ক্লাসে যখন কোনো প্রশ্ন করে ছেলেমেয়েদের বলি—"চেষ্টা করো, নিজেরাই

পারবে—" তখন তাদের কেমন লাগে। বুঝি, না-বুঝি মরিয়া হয়ে বলে দিই—"সিম্পল তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এর সিগনিফিক্যান্সটা কী?"

—"গুড। দেখুন চার্টটাতে কী আছে। ও কী? চোখ পিটপিট করছেন কেন? ইমপেশেন্ট হবেন না, অধীর স্বভাব ভালো নয়। আপনার বয়েস কতো?"

—"আজ্ঞে?"

—"বলছি, আপনার বয়েস কতো হলো? যদিও জানি মেয়েদের বয়েস হয় না, এবং মেয়েদের বয়েস জিজ্ঞেস করতেও হয় না। কিন্তু চার্টটা যে বয়সানুপাতিক। তাই ওটা জানা অ্যাবসলুটলি এসেনশিয়াল। বেয়াদপি মাপ করবেন।"

—"ওই যে, আপনার চার নম্বরের কলামে দেখুন।"

—"ঠিক যা ভেবেছি তাই। আমার কত বলুন তো?"

—"আপনারও ওই চারের কলাম। থার্টি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ।"

—"আজ্ঞে না। আমি সিক্সটি। হাঃ। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট?"

এবার সত্যিই অবাক হই। ভদ্রলোককে ষাট ভাবা শক্ত।

—"এ ভেরি ইয়াং সিক্সটি, ইয়েস। আই নো ইট।" ভদ্রলোক একটু হাসেন। যে হাসিতে যৌবন উঁকি দিয়ে যায়। "বাট উইথ অল দা উইসডাম অফ মাই সিক্সটি ইয়ার্স। ইয়েস ম্যাডাম। ব্যাক টু দা চার্ট।"

আমার টেবিল থেকে ছাত্রীদের দেওয়া টিউটোরিয়াল খাতা তুলে নিয়ে রোল করে সেটা দিয়ে উনি ব্ল্যাকবোর্ডে পয়েন্ট করে ডেমনস্ট্রেশন শুরু করে দেন। ছাত্রী বলতে আমি একা।

—"এক নম্বর ঘর। এক থেকে বারো। লার্নিং পিরিয়ড। বারো বছর বয়েস পর্যন্ত মানুষ প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু শিখছে। বুদ্ধি কেবলই বাড়ছে। রাইজিং কার্ভ। ও. কে?"

—"ও. কে.।"

—"দু'নম্বর ঘর। বারো থেকে বিশ। এটাও লার্নিং পিরিয়ড। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এই সময়ে উচ্চতম শিখরে পৌঁছোয়—পীক লার্নিং পিরিয়ড। অর্থাৎ এ জীবনে আপনার বুদ্ধি যতটুকু বাড়বার তা ওই বয়েসেই বেড়ে গেছে। যেমন বডি হাইট। বুঝলেন? একুশের পরে মানুষ যেমন লম্বায় বাড়ে না, বুদ্ধিতেও বাড়ে না। ফুলস্টপ। আঠারোতেই অবশ্য সাধারণত বুদ্ধির বাড় বন্ধ হয়ে যায়। এও রাইজিং কার্ভ।"

—"আই সী!" মনটা অন্ধকার হয়ে গেলো। হায়, কতো বছর হয়ে গেছে, আমার বুদ্ধি বাড়েনি। এদিকে আমার মেয়েদের বুদ্ধি তরতরিয়ে বাড়ছে। দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

—"দেখুন, দেখুন, প্রাণভরে দেখুন, পেট ভরে দর্শন করুন। বাট ইউ ক্যাননট চেঞ্জ ইট। ইহাই জীবজগতে মনুষ্য নামধেয় প্রাণীটির শারীরিক কানুন। মগজের কোষগুলো। বিশ বছরের পরে আরও বেশি কর্মতৎপর হয় না। যেমন ছিল তেমনিই থাকে। স্টেটাস কু'ও অবস্থায়। বুদ্ধি আর বাড়ে না বটে কিন্তু বুদ্ধি পাকে। অভিজ্ঞতার আগুনে পরিপক্ক হতে থাকে। ওভারকুকড হবার ভয় নেই কোনো।"

—"বুঝেচি। এবার তিন নম্বরে চলুন।"

—"আঠারো-বিশ টু তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হচ্ছে থার্ড কলম। ওই যে বললাম স্টেটাস কুও। বুদ্ধি বাড়ছেও না, কমছেও না। ক্রেডিট ডেবিট কিছুই নেই।"

—"তার মানে আঠারোতে আর পঁয়ত্রিশে তফাৎ নেই? তার মানে পঞ্চান্নতেও নেই। সবার বুদ্ধি সমান?"

—"আহা, সমান কে বলল? বুদ্ধি না বাড়ুক, বোধ তো বাড়ছে? মূল্যবোধ তো বদলাচ্ছে? দৃষ্টিকোণ পালটে যাচ্ছে। জীবনবোধ আকৃতি নিচ্ছে। বুদ্ধির মাপটা সমান, তার ব্যবহারটা তো সমান থাকছে না?"

—"হ্যাঁ, জাজমেন্ট আসে, মেচিউরিটি আসে, ভ্যালুজ তৈরি হয়—তা বলে বুদ্ধি মাপে বাড়ে না?"

—"নো ম্যাডাম। আয়্যাম সরি। ভবানী আছে? এক পেয়ালা চা—"

—"চা দেয়নি?"

—"কফি দিয়েছিল কিন্তু।"

—"ভবানী খাতা জমা দিতে গেছে। চা তো এখন..."

—"থাক থাক, ওতেই হবে। থার্ড আর ফোর্থ কলামে একই ব্যাপার।" ভদ্রলোকের এক কথা। "বুদ্ধি কমেও না, বাড়েও না। কিন্তু গোলমালটা বাধে ফিফথ স্টেজে। মগজের মধ্যে ফিফথ-কলামনিস্টদের কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। মগজের কোষগুলো ক্ষয় পেতে থাকে, ভোঁতা হতে থাকে। পিটি, তাই নয় কি? বুদ্ধিই যদি কমে গেলো, মানুষের আর তবে রইল কী?"

—"তা যা বলেছেন। তবে বুদ্ধিটা কি একেবারে হুড়হুড় করে চৌবাচ্চার জল বেরুনোর মতন কমে যায়? না আস্তে ধীরে—"

—"আস্তে-আস্তে। এ আবার বলবার কী আছে? এজিং ইজ আ লিঙ্গারিং প্রসেস। ইট টেক্স ইটস ওন টাইম। আপনারও হবে। তখন আপনি টের পাবেন না অবশ্য। প্রথম স্টেজ কিনা কনফিউশন। আলটিমেট স্টেজ সেনিলিটি।"

—"কিছু মনে করবেন না, আপনি বললেন, আপনি ষাট। অর্থাৎ ঐ ফিফথ কলামেই পড়েন। আপনিও কি ওই স্টেজটা, মানে কনফিউশনটা টের পান?"

—"আয়্যাম আ ভেরি ইয়াং সিক্সটি। আমি তো আগেই বলেছি আপনাকে?"

—"আমি ম্যাট্রিকে প্রথম হয়েছিলাম। পরাধীন ভারতে ম্যাট্রিকে প্রথম হওয়াটা মুড়ি-মিশ্রী ছিল না। আমার মনের এজিং প্রসেস উইল টেক টাইম।"

—"তা বটে। হতেই পারে।"

—"পড়েননি, সম্প্রতি সালভাদর দালি কী বলেছেন? বলেছেন—'যেহেতু আমি একটি জিনিয়াস সেহেতু আমার মৃত্যু নেই।' আমিও একটি জিনিয়াস। দালির মতো নাই-বা হলাম। তাই আমিও চট করে জরাগ্রস্ত হবো না। আই'ল রেজিস্ট ইট উইথ অল মাই স্ট্রেংথ ফর শুয়োর।" ভদ্রলোক জানালা দিয়ে বাইরে চাঁপাগাছটার দিকে তাকান।

—"আমি দালি নই। মরতে আমাকে হবেই।" মুখ খুব বিষণ্ণ, চিবুক বুক ছুঁয়েছে। ঠুকঠুক করে উনি ডাস্টারটা ঠুকছেন।

আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘুরোই—"আচ্ছা, ওই স্তম্ভগুলোর নিচে ঘিঞ্জিমতো কথাগুলো কি? ব্যাখ্যা তো ওইগুলোকেই করতে বলছিলুম।"

—"ও হো, ওটাও তো সিম্পল। আপটু টুয়েলভ ওনলি লার্নিং প্রসেস। শিক্ষাগ্রহণ। বারো টু আঠারো-বিশ লার্নিং প্রসেস বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে চ্যালেঞ্জিং এভরিথিং ইউ হ্যাভ লার্নট। রেবেলিং আগেনস্ট ইওর ওন লার্নিং। এভাবে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানকে ভেরিফাই করে নিয়ে তবেই না মর্ডান ম্যান জীবনে কনফিডেন্স পায়? ইটস হেলদি টু বি আ রেবল। বুয়েচেন?"

—"বুয়েচি!"

—"ঠাট্টা করলেন? ভেংচি কাটলেন?"

—"আজ্ঞে আমিও ঘটি।"

—খানিক নৈঃশব্দ্য।

তারপর বললেন—"পরের কলামটাতেই জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন; সংঘর্ষের, সংঘাতের শুরু। রিঅ্যাল কনফ্লিক্ট—"

—"কোথায়? লিখছেন তো কম্প্রোমাইজ।"

—"সেই তো। অ্যাম্বিশান এবং কম্প্রোমাইজ। কম্প্রোমাইজ মানে কী?" হঠাৎ ভুরু পেঁচিয়ে ভদ্রলোক নিবিড়ভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি চুপ! উনিও চুপ। তারপর হঠাৎ মুখখানা নামিয়ে আমার কানের কাছে এনে বোমাফাটার মতো চেঁচিয়ে উঠলেন- —"কম্প্রোমাইজ মানে ডি-ফি-ট!"

আমি বেচারী চমকে, শিউরে, কেঁপে-টেপে একাক্কার। তিনি খুশি হলেন। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দুই পকেটে দু'হাত পুরে হাসি হাসি মুখে বললেন—"আর ডিফিট মানে? পুনরায় স্ট্রাগল! অতএব বুঝে নিন, বিশ থেকে পঁয়ত্রিশেই মানুষ ঈভিলের কাছে হার মানতে এবং তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে শিখে নেয়। বুঝলেন? যার অ্যাম্বিশান আছে, কম্প্রোমাইজ তাকে করতেই হবে। হবেই—"

—"কিন্তু চতুর্থ কলামেই তো পরিস্থিতিটা বিশ্রীতম মনে হচ্ছে। লোভ, কৃত্রিমতা, অত্যাচার—এসব—"

—"আপনার বয়েসটা এখন কতো বললেন?"

—"ওই তো ওইখানেই—"

"থার্টি-থার্টি ফাইভ টু ফিফটি-ফিফটি ফাইভ তো? ইয়েস, ওয়ার্স্ট অ্যাফেকটেড পিরিয়ড ওটা—অ্যাম্বিশান থেকে লোভ, লোভ থেকে কম্প্রোমাইজ, কম্প্রোমাইজের অবশ্যম্ভাবী ফল হিপোক্রিসি এবং তার পরিণতি টিরানিতে। মানুষ এই বয়েসেই সবচেয়ে দ্রুত অধঃপাতে যায়। সব মূল্যবোধ হারিয়ে ফ্যালে। নীতিবোধ পুটপুট করে ভেঙে পড়তে থাকে ঝাঁটার কাঠির মতন। আমার স্ত্রীও এখন এই কলামেই রয়েছেন। দি মোস্ট

ডেনজারাস ইয়ারস। লুক এ্যাট দি অনেস্টি কার্ভ, ওই যে সবুজ রেখাটা?"

—"আরে সবুজ চক পেলেন কোথায়?"

—"রাখতে হয়, বুঝলেন না? ভেরি ইউজফুল। সর্বদা সঙ্গে রাখতে হয়। বলতে বলতে উনি বিলিতি টুইডের জ্যাকেটের পকেটে হাত পুরে একমুঠো রঙিন চকখড়ি বের করে আনলেন।

—"এই তো আমি আপনার ছাত্রীদের প্রথমে এনজিনিয়ারিংয়ের একটা ছোট্ট ব্যাপার বোঝাচ্ছিলাম। এনজিনিয়ারিংও নয়, কোয়ান্টাম মেকানিকস। এটা সবারই জানা উচিত —কিন্তু ওরা একদমই বুঝতে পারছিল না। তখন ওটা মুছে এটা এঁকে দিলাম। এটার জন্য কোনো মেণ্টাল ট্রেনিং লাগে না। তারপর, যা বলছিলাম—"

—"আমাকে এবার যেতে হবে। সাড়ে চারটে বেজে গেছে—একটা কাজ আছে গড়িয়াহাটে—"

—"হবে, হবে, সব হবে। আগে অনেস্টি-কার্ভটা বুঝবেন না? সেটাই তো আসল! দেখুন, দেখুন, মানুষ কীভাবে নষ্ট হয়। জীবন কীভাবে পচে যায়—"

—"বেশ তো, একটু যদি চটপট করেন—"

"এই তো—ঐ যেটা আঁকা রয়েছে সেটা সাধারণ মানুষের অনেস্টি-কার্ভ। সাধারণ মানুষ আঠারো-বিশবছর বয়েস অবধি মোটামুটি সৎ থাকে। তারপরে পড়ে যায় উচ্চাশার ফাঁদে। আর শুরু করে নষ্ট হতে। পচন ধরে জীবনে। এই দেখছেন সততা রেখার অধঃপতন? তিরিশ থেকে পঞ্চান্নোয় ম্যাকসিমাম। তারপর থেকে ঐ একই থেকে যায়। এইবার দেখুন অন্যদের বেলায় কী হয়।" উনি আরেকটা রঙিন চক তুলে নিলেন। এবং যত্ন করে হিসেব করে আরেকটি রেখা আঁকলেন চার্টে।

—"এই হচ্ছে অনেস্টি-কার্ভ নাম্বার টু—সততা রেখা দুই নং—ব্যবসায়ী আর বুদ্ধিজীবীদের হিসেবটা দেখুন এবার। এদের নৈতিক অধঃপাত ঢের দ্রুতবেগে ঘটে এবং ঢের বেশিদিন ধরে চলতে থাকে। পঞ্চাশের কোঠায় থামে না, সত্তর-পঁচাত্তর পর্যন্ত অবারিত থাকতে পারে। এবং এরা সমাজের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা রাখে। রাখে কিনা বলুন? বিজনেসমেন অ্যাণ্ড ইণ্টেলেকচুয়ালস।"

—"ঠিক কথা। অ্যাঁ? কী বললেন? ব্যবসায়ী আর?"

—"বুদ্ধিজীবী। ইণ্টেলেকচুয়ালস। মানে এই যে আপনি-আমি। সত্যজিৎ রায়। সুকুমার সেন। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? উই আর হার্মফুল পিপল। এবার দেখুন সততা রেখা তিন, শেষ কার্ভ। এটাই সমাজে যারা সবচেয়ে শক্তিমান লোক তাদের হিসেব, অর্থাৎ পোলিটিশিয়ান এবং জার্নালিস্ট। সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদদের অধঃপতন অন্তহীন। কখনো থামে না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ এবং ততদিনই বাঁশ।" বলতে বলতে আরেকটি নতুন রেখা যত্ন করে আঁকছিলেন, যার দেখলুম অনন্ত অধোগতি। চার্ট থেকে বেরিয়ে লাইন বোর্ডের ফ্রেমে উঠে গেলো।—

—"এরাই সবার চেয়ে ভয়াবহ। আনস্ক্রুপুলাস। নীতিবোধের ধার ধারে না। বিবেক

পর্যন্ত নেই। কী? এগ্রি করছেন না?"

—"আমার এগ্রি করা না, করায় কী এলো-গেলো? আমি তো ওই এক নম্বর কার্ভের অন্তর্গত। যাদের কোনো ভালোমন্দের ক্ষমতা নেই। অল্পস্বল্প লোভ আছে।"

—"আজ্ঞে না। মাস্টার হওয়া অত সোজা নয়। সব শালা মাস্টার ইন্টেলেকচুয়াল মনে করে নিজেকে এবং যথেষ্ট ক্ষতি করার শক্তি রাখে। বললুম না এক্ষুণি উই আর হার্মফুল পিপল? এক নয়, সততা রেখা দু'নম্বরে পড়েন আপনি।" একটু থেমে সান্ত্বনার সুরে বললেন—"আমি অবশ্য আরো ডেনজারাস। আপনার চেয়ে ঢের বেশি কেপেবল অব হার্ম—ওয়ার্স্ট অব দ্য লট—বুঝলেন, শুধু তো মাস্টারই নই, আমি আবার একজন জার্নালিস্ট এবং পলিটিকসও করি।"

—"তাই নাকি? কী রকম? কী রকম?"

—"হিউম্যান সায়েন্স ক্রনিকল বলে আমি একটা ইন্টারন্যাশন্যাল বুলেটিন বের করি। একসঙ্গে দিল্লি, নাইরোবি, ক্যানবেরা, অটোয়া, ডাবলিন থেকে বেরোয়। প্রত্যেক কন্টিনেন্টে অফিস আছে। আমিই চীফ এডিটর। আগে ওয়াশিংটন থেকেও বেরোতো। রেগন বন্ধ করে দিয়েছে। আমি তো ওকে কনটেস্ট করেছিলাম গত প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশনে ইনডিপেনডেন্ট ক্যানডিডেট হিসেবে। হেরে গেছি বটে কিন্তু আবার দাঁড়াচ্ছি। এবারে আমার জোর ঢের বেশি।" ভদ্রলোক বিনয়ী হেসে সাহেবী কায়দায় নিচু হয়ে 'বাও' করেন।

আমার যেন মাথায় কেউ হাতুড়ির ঘা মেরেছে। এক ঝটকায় যেন ঘুম ভেঙে গেলো। মগজের মধ্যে জোর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সতর্ক হয়ে নড়েচড়ে বসি। ঘড়ি দেখি। বইপত্তর গোছাতে শুরু করি।

—"প্রেসিডেন্ট রেগন জীবজগতের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকর বস্তুপিণ্ড—আই মাস্ট ডেলিভার দি ওয়ার্লড ফ্রম হিজ ঈভিল গ্রিপস—বুঝলেন না?"

—"ঠিক কথা। কিন্তু আপনার অনেক দেরি হয়ে গেলো। আমাকেও এবার বেরুতেই হবে।"

—"না না, আমার দেরি কিসের? আমি তো এখন ভেকেশনে—আমার ফিরতে দেরি আছে।"

—"আপনি কোথায় থাকেন?"

—"এই যে, ঠিকানাটা রেখে দিন, প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।" আমি বাধা দেবার আগেই সেই টিউটোরিয়াল খাতা থেকে চড়চড় করে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিলেন। এবং নিজের পকেট থেকে দামী কলম বের করে লিখতে শুরু করে দিলেন। গোটা গোটা হরফে ইংরিজিতে লেখা হলো: ডক্টর চক্রবর্তী রাজশেখর, H.O.D.H.S. । রাঁচি মহাবিদ্যালয়, কাঁকে, বিহার, ইণ্ডিয়া, এশিয়া। মৃদু হেসে কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন,—"বিহার বড়ো ভালো জায়গা বুঝলেন? বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে। শ্রীহরির বসন্ত বিহারের স্থান কিনা, তাই নাম হয়েছে বিহার। এ থেকেই বুঝে নিন জয়দেব

বাঙালীও নয়, ওড়িয়াও নয়, বিহারী। একবার চলে আসুন না কাঁকেতে—জয়দেবের দেশ, ফাইন কান্ট্রিসাইড।"

—"আচ্ছা H.O.D.H.S. মানে কী?"

—"আশ্চর্য তো? H.O.D. জানেন না? হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট। আর সাহিত্য পড়ান H.S. জানেন না? অবাক করলেন, সত্যি!"

লজ্জা পেয়ে বলি,—" H.S. মানে কি হায়ার স্টাডিজ?"

—"আজ্ঞে না। আপনার মাথা।"

—"হেলফ সার্ভিসেস?"

—"আপনার মুণ্ডু।"

—"তবে কী?"

—"হিউম্যান সায়েন্সেস। হিউম্যান সায়েন্সেস জানেন না? অবিচারটা দেখুন একবার? ফিজিকাল সায়েন্স আছে, বায়ো-সায়েন্স আছে, সোশাল-সায়েন্স আছে, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স পর্যন্ত আছে, অথচ যার জন্যে এত সব সেই হিউম্যান সায়েন্সই নেই? নৃতত্ত্ব, অ্যানথ্রোপলজি মানে অবশ্য তাই, কিন্তু তার ব্যবহারটা হচ্ছে স্পেসিফিক অর্থে—জেনেরিক হেড নয় কোনো। বলুন দিকি লিটারেচার, ল্যাঙ্গুয়েজেস, ইয়োগা, মেডিটেশন, জ্যোতিষ, হিপনোটিজম, প্যারাসাইকোলজি এসব যাবে কোন হেড-এর তলায়? এইজন্যেই তো ইউ. জি. সি. এদের টাকা-পয়সা দিতে পারে না। বুঝচেন ব্যাপারটা?"

—"বুঝলুম।" উঠে পড়েছি। ঝোলা কাঁধে।

—"আগে অবিশ্যি পড়াতাম ইলেকট্রিক্যাল, কোলিগ ছিলাম আপনাদেরই। একটু প্রিম্যাচিওর রিটায়ারমেন্টের পর থেকেই রাঁচিতেই পোস্টেড। হিউম্যান সায়েন্সেস পড়াচ্ছি। আর এইসব রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত আছি। যেমন এই চার্ট-টা। আমার নতুন বইটা পেঙ্গুইন নিয়েছে।" কথা কইতে-কইতে ভদ্রলোক হাতের চকগুলো ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করছিলেন। এবার ডাস্টারের পিঠ দিয়ে সেগুলো টেবিলের ওপর বাটনা বেটে পিষে ধুলো-ধুলো করতে লাগলেন। তারপর কথা বলা বন্ধ হয়ে গেলো। পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে ঝুঁকে পড়ে মুঠো-মুঠো খড়ির গুঁড়ো তুলে নিয়ে তিনি টেবিলময় লেপতে শুরু করে দিলেন। টেবিল ধূসর হয়ে গেলো। তাঁর জ্যাকেট খড়ির গুঁড়োয় মাখামাখি হয়ে যেতে লাগলো। আমার উপস্থিতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে নিবিষ্টচিত্রে উনি টেবিলে চক মাখাতে থাকেন...চকের গুঁড়ো উড়তে থাকে হাওয়ায় চিতাভস্মের মতো, বাতাস ছেয়ে যেতে থাকে, দেখতে দেখতে ওঁর নাকে-মুখে-চুলে-চশমায়-গোঁফেতে-দাড়িতে-ভুরুতে দ্রুত চকের প্রলেপ পড়ে যেতে থাকে—ধুলোয় আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, ওঁর দৃষ্টি স্পষ্টতই উদভ্রান্ত—চকের গুঁড়ো দিয়েই উনি যেন জগতের সব অশুভ মুছে দেবার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর—আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম—"পাঁচটা বেজে গেছে। আমি যাচ্ছি।"

মুহূর্তেই নিজেকে ফিরে পেলেন রাজশেখর চক্রবর্তী। হাতজোড় করে বললেন —"নমস্কার। আমিও চলি।"

বুঝতেই পারছি বলে লাভ নেই তবু মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—"সেলিমার খবরটা?" হো হো করে অট্টহেসে উঠলেন ডঃ চক্রবর্তী। "হাউ গুড অফ ইউ টু রিমেম্বার ম্যাডাম। আপনাকে অযথা উদ্বিগ্ন করেছি বলে মাপ চাইছি। সেলিমা দিব্যি ভালো আছে। মোপেড কিনেছে। রোজ মোপেড চালিয়ে আপিসে যাচ্ছে।"

—"তবে যে বললেন—"

—"গুল। গুল দিলাম। ওটা তো আপনাকে টেস্ট করবার জন্যে।"

—"মানে?"

—"মানে আপনি কী মেটিরিয়্যাল সেটা আগে জানতে হবে না? খাঁটি না মেকি?"

—"অর্থাৎ-"

—"অর্থাৎ ছেলেবেলার বন্ধুকে যার মনে থাকে না, তার ভালোমন্দে যার কিছু এসে যায় না, তেমন লোকের সঙ্গে আমি সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলাম না। তাই পরীক্ষা করে নিলাম।"

—"আই সী।" রাগে গা জ্বালা করছে।

—"যাক পাস করে গেছেন। থ্যাংকিউ"—বললেন রাজশেখর, "আজকালকার দিনে কে আর কার কথা ভাবছে বলুন? কেই বা কাকে মনে রাখছে? হিউম্যান সায়েন্সেস সবচেয়ে নেগলেকটেড ডিসিপ্লিন নয় কি? থিংস ফল অ্যাপার্ট, দি সেণ্টার ক্যান নট হোলড—"

দীর্ঘ পা ফেলে সর্বাঙ্গ খড়ির গুঁড়োমাখা এক ধূলিধূসর প্রেতের শরীর আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যায়।

নবকল্লোল, শারদীয়া ১৩৯৩

চোর-ধরা

ইতুকে আপনি চেনেন। রেডিওতে তার গলা শুনতে পেলেই আপনার হাতের গ্রাস হাতেই থেকে যায়, একপায়ে জুতো পরে আপনি ভুলে অন্য পায়ে চটি গলিয়ে ফ্যালেন। আমার বোন ইতু এমনই গুণের মেয়ে। কিন্তু আমার বোনাইকে আপনারা

চেনেন না। তিনিও অনেক গুণের আধার। তাঁর নিজের বিশাল একটা আইন কোম্পানি আছে, যার তিনি ডিরেক্টর। অনবরত প্লেনে চড়ে হিল্লি-দিল্লী—ট্রম্বে-বম্বে চরকি ঘুরছেন। খুব রাশভারী, দিব্যি ধীর-স্থির দেখতে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্থির, অধৈর্য, আর একটু রাগী। তবে হ্যাঁ, মনটা উদার। বেশ দিলখোলা, দরাজহস্ত। লোকটা খারাপ নয়। সব্বাইকে চাঁদা দেন, চাইলেই বিজ্ঞাপন দেন, এমনকী বিনা পয়সায় ইতুর রেকর্ড পর্যন্ত বিলিয়ে দেন ভক্তদের মধ্যে। শুধু কি তাই? নিজের সলিসিটরস্ ফার্ম, অথচ বিনা পয়সায় যে-কোনো লোককেই আইনের মারপ্যাঁচ বাৎলে দেন, আর চেনা বেরুলে তো কথাই নেই। কেস পর্যন্ত লড়ে দেবেন ফ্রী-তে। ইতুই তাঁর জীবনসর্বস্ব, নয়নমণি। উঠতে ইতু, বসতে ইতু, খেতে ইতু, শুতে ইতু। মানুষটি ইতুসর্বস্ব। এই জাঁদরেল ব্যারিস্টারকে কোমরে গুঁজে রেখে অনায়াসে ইতু সংসার করে, ছেলেপুলে সামলায়, ছাত্রছাত্রী সামলায় এবং নিজের গানকে দিনকে-দিন উন্নত করে। কিন্তু একা স্বামীটিকে নিয়ে তার যত ঝামেলা; পনেরোজন বেসুরো ছাত্র, তিনজন অবাধ্য কাজের লোক, কোয়ার্টার ডজন অপোগণ্ড সন্তান নিয়েও তার আদ্ধেক গোলমাল নেই। ইতু দশভুজার মতো ছুটে ছুটে সবদিক সামলায়।

আমি দিদি বটে, মুগ্ধনয়নে ছোটোর করিৎকর্ম দেখি, আর অবাক হই। সেদিন রোববার। সকালবেলা ইতুর বাড়ি গেছি। রোববার দিন সকালে গানের ক্লাস থাকে সব গাইয়ের, কেবল ইতুরই থাকে না। তার আরো দশটা সংসারের কাজ থাকে। সোমদেবের ছুটি, ছেলেমেয়েদের ছুটি। সেদিন সকালে গিয়ে দেখি বাড়িতে ভীষণ অবস্থা। বসার ঘরের একদিকে ডাঁই-করা কেবল কুশনের স্তূপ। চেয়ার, সোফা, কৌচ সব পালিশ হচ্ছে। নেপথ্যে ইতুর "পারবো না", "হবে না", "এখন থাক" এইসব শুনতে পাচ্ছি। খাবার টেবিলে ইতু বসে আছে, হাতে ধোবার খাতা। ধোবার পাওনা মেলাচ্ছে। ওহো, আজ যে দোসরা। মেঝেয় ধোবার পুঁটলি রয়েছে, নীটলি বাঁধা। ধোবাও খুব নীটলি বসে আছে। উবু হয়ে। মেঝেয় আরো একজন লুঙ্গিপরা লোক থলে হাতে বসে আছে। উবু হয়ে। ইতুই এলোমেলো চুলে হাউস-কোট চড়িয়ে, ভুরু কুঁচকে, আঙুলের কর গুনছে। ভাবলাম, যাই রান্নাঘরে বরং একটু চায়ের খোঁজ করিগে যাই। গিয়ে দেখি ঝটিকার বেগে রান্না হচ্ছে—সুখদা (যাকে সোমদেব আবার 'শুকতারা' বলে ডাকে) হঠাৎ ভয়ানক ব্যস্তভাবে নড়াচড়া করছে। সাধারণত সুখদা অত্যন্ত ধীরগতি। সুধীরা নামই তাকে ভালো মানাতো।

—"কী ব্যাপার, সুখদা? এত তাড়া কিসের?"

—"ঝাবুনি? এক্ষুনি আমাকে ঝেতি হবে—টেরেনের টাইম হয়্যে গেল—"

—"কোথায় যাচ্ছ?"

—"ঘরে গো ঘরে। লাতিটার ভাত লয়? বড় লাতি বলে কথা! পাঁচ পাঁচটা মেইয়্যার পরে এই ছেল্যে। উপোর তৈরি বালা নিইচি, ছোড়দিদি গইড়ে দেছে। আজ ঝাবো, তা ঝামাইবাবু এখনো বেরুলোনি—আমারো দেরি—"

—"আজকে সোমদেব কোথায় বেরুবে? আজ তো রবিবার।"

—"কি জানি ডিল্লি না ম্যাড্ডাস কোথায় ঝ্যান ঝাবে। মক্কেলের নোক গাড়ি নে এস্যে বস্যে আছে। সোঙ্গে নে ঝাবে। ঝামাইবাবু ছোড়দির ওপর চোটপাট কত্তিচে বাক্স গুইচে দেয়নি বলে, ইদিগে একটুকু আগে আগে বললে তবে তো গুইচে আকবে?"

—"তোমরা চা খেয়েছো, সুখদা?"

—"দিচ্ছি, দিচ্ছি। ঝেক্ষুণি আন্নাঘরে এয়েচো, তেক্ষুণি বুজিচি, চা! হাতটোক খালি হলিই দেবো। ধৈর্যি ধরো বড়দিদি।"

এই সুখদাকে আমার মাই ইতুর সঙ্গে দিয়েছেন। বিয়ের দিন থেকে আছে। আমাদের কুটুম বলে গেরাহ্যি করে না।—হঠাৎ ইতুর ঝাঁঝালো গলা এলো—"তুমি এখনো বসে আছো? বলছি আজকে কাগজ বিক্রি করা হবে না! তবু যাচ্ছো না? কী আশ্চর্য! বলছি আমার আজ সময় নেই? না, খগেনেরও সময় নেই। না, না, না, সুখদারও একদম সময় নেই। আচ্ছা জ্বালালে তো?"

আর যাবে কোথায়? খুন্তি হাতে করে সুখদা তেড়ে বেরুলো—"ঝাও, ঝাও, বেশি ঝামালি কোরনি, কে তোমাকে ঢুকোলে ঘরের মদ্যি? খগেন! খগেন ছোঁড়ার কাণ্ড দ্যাকো?"

লোকটি সুখদাকেই যে ইতুর চেয়ে বেশি মান্য করে, সেটা স্পষ্ট বোঝা গেলো—থটে-টলে সুদ্ধু এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালো, এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো লুঙ্গিপরা ব্যক্তিটি। ধোবাও উঠে পড়েছে। ধোবা তার পোঁটলা-পুটলি সামলে নিয়ে বেরুতে না বেরুতে এসে পড়ল গয়লা। এসব তেঢ্যাঙ্গা দশতলা বাড়িতে চাঁদার অত্যাচার নেই, ভিকিরির অত্যাচার নেই, সেলস গার্লের অত্যাচারও ঢের কম। কিন্তু গয়লা, ধোবা, কাগজওলা—এরা তো আসবেই। কষ্ট করে এরা সারা মাস আসছে, এদের ন্যায্য পাওনা মেটাতে মাসে একটা সকাল এদের না দিলে চলবে কেন? ইতু মন দিয়ে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করতে লাগলো—"দিদি এসেছিস? আয় ভাই—তোর গেছোদাদা ভগ্নিপতির বাক্সটা গুছিয়ে দে না—"

—"ও বাবা, ও তুই করগে যা। আমি বরং তোর গয়লার হিসেবটা করে দিচ্ছি। দে, খাতা দে।"

—"ইতু! ইতু! ইতু! ইতু!"

—"ওই দ্যাখো! ষাঁড়ের মতো গর্জন শুরু হয়ে গেছে।"

—"এ বাক্সটা নয়, এ বাক্সটা নয়, অন্যটা! হলদেটা দাও! যাতে বাক্স ডেলিভারি নেবার জন্যে একঘণ্টা এয়ারপোর্টে আটকে থাকতে না হয়। হলদেটা ছোটো আছে, সঙ্গে নেয়া যাবে প্লেনের কামরায়।" পাজামা-পাঞ্জাবি ও একগাল ফেনা-সমেত সোমদেব এসে দাঁড়ালো চটি ঘষতে ঘষতে। হাতে দাড়ি কামানোর ক্ষুর। কাঁধে তোয়ালে।

—"আচ্ছা, তুমি চানটা সেরে নাও না। আমার এক্ষুণি হয়ে যাচ্ছে।" সোমদেব গয়লার ওপর চোখ পাকায় এবার।

—"কৌন হ্যায় তুম? গয়লা? আভি নেহী। আভি ভাগো। বাদমে আও। দুপহরমে। তিন বাজে আও।"

—"না! না! তিন বাজে খবদ্দার আসবে না। আমি তখন একটু শোবো। এই তো হয়ে গেলো। দাঁড়াও। পয়সা লে-কে যাও। এই, এই—যেও না—রামদেব। ও রামদেব—" ইতু চেঁচায়।

—"সবুজ স্লিপিংসুটটা দিয়ে দিও। আর সুতির ড্রেসিংগাউনটা। শীত কমে গেছে।" সোমদেব চলে যায়।

—"আচ্ছা বাবা আচ্ছা। দিচ্ছি, দিচ্ছি। দুধের হিসেবটা আগে করে নিই—", রামদেব ফিরে এসেছে লাজুক পায়ে।

—"দিদি, ছোড়দি, এই লাও চা। আমারটা এবারে বুজিয়ে-সুজিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ঝাই—"

—"বাঃ! সুখদা সত্যিই সুখদা। চা হয়ে গেলো?"

—"একটু সবুর করো। তোমার হিসেব রেডি হয়েই আছে—", চায়ে চুমুক দিতে দিতে গয়লার হিসেব শেষ, সে যেই টাকাপয়সা নিয়ে চলে গেলো, ইতু সুখদাকে ডাকলো। সঙ্গে সঙ্গে তুতু-মিতুর আবির্ভাব।

—"মা! মা! আমরা দক্ষিণী-তে চললুম—"

—"আরে? খেয়ে যা।"

সজোরে ঘাড় নেড়ে ওরা বলে :

—"খাওয়া হয়ে গেছে।"

—"কী খেলি? কখন খেলি?"

জুতো পরতে পরতে মেয়েরা কোরাসে উত্তর দেয়—

—"দুধ। আর জেমস। অনেকক্ষণ।"

—"জেমস্? জেমস্ মানে ঐ গুল্লিগুল্লি চকলেট? ওটা একটা খাবার?"

—"কী করবো? সুখুদিদি খাবার দেয়নি তো।"

—"সুখদিদির রান্না শেষ হয়নি যে।"

এবার মাসি হিসেবে আমি ফিলডে নামি।—"তাই বলে তোমাদের খাবার দেবে না! সুখদা!"—

ইতু কিন্তু সুখদাকে দোষ দেয় না—মেয়েদেরই বকে—

—"নিজে নিজে রুটি মাখন চীজ নিয়ে নিতে পারো না? এক-একদিন যদি অসুবিধে থাকেই! ফ্রিজে তো সবই আছে—নিজে হাতে বের করেও নিতে পারো না? এতো কুঁড়ে?" ইতু কথা বলতে বলতেই খাবারদাবার বের করে ফেলেছে, প্লেটও লাগিয়ে ফেলেছে, মেয়েরাও ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রুটিতে মাখন লাগাতে শুরু করেছে। এবার ইতু ছুটলো শোবার ঘরে। বাক্স গুছোতে হবে।

আমি দেখছি, আর মুগ্ধ হচ্ছি। এই সেই ইতু? মা ঠিক এই ভাষাতেই বকতেন আমাদের। আমরাও খাবার না খেয়ে, দুধ খেয়েই খেলতে পালাতুম। হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ।

বাক্স গুছোতে ইতুর বেশি সময় লাগলো না। বন্ধছন্দ করে বাইরে এনে রাখলো। সোমদেব যাবার সময়ে নিয়ে যাবে। অনবরতই তো সে বাইরে যাচ্ছে, ইতুর মুখস্থ হয়ে গেছে কী কী দিতে হবে। অটোমেটিক প্যাকিং সিস্টেম।

সবুজ স্লিপিংসুট ভিজে। লালটা দেয়া হলো।

—"সোমদেব ঠিক রেগে যাবে। যাকগে। স্লিপিংসুট নিয়ে কি কেউ মাথা ঘামায়? যত পাগলের কাণ্ড! দেখছিস দিদি?"

ইতিমধ্যে সুখদা দেখি ফর্সা ধুতিটি পরে বগলে চাদরটি নিয়ে এসে হাজির। ইতু এবার সুখদাকে নিয়ে পড়লো। দুই মেয়ে দক্ষিণীতে বেরিয়ে গেছে। ছেলে যায়নি, সে বারান্দায় বন্ধুদের সঙ্গে চেঁচিয়ে আড্ডা মারছে। গলা শুনতে পাচ্ছি। এটা ভালো লক্ষণ। আজকাল তো ছেলেরা যে যার দোর বন্ধ করে উচ্চগ্রামে বিলিতি মিউজিক চালিয়ে কী জানি কী গুজগুজ করে। ফুটবল খেলা নিয়ে তুমুল তর্ক, সিনেমা নিয়ে ফাটাফাটি ঝগড়া, এসব তো আজকাল দেখিই না। শুভটা এদিক থেকে ভালো। খেলাধুলো, চেঁচামেচি, সবই করে। ইতু সুখদাকে বোঝাচ্ছে—"এই যে ধরো তোমার নাতির রুপোর বালা, দু'গাছা, বুঝলে? এই যে, এই কাগজটা যত্ন করে তুলে রাখবে, ছেলেকে দিয়েও দিতে পারো—বুঝলে? এতেই সব হিসেব লেখা আছে—ওজন কতো, মজুরী কতো, কতটা রুপো আছে, সব। সবকিছু মিলিয়ে পড়েছে দেড়শো টাকা। আমার কাছে তোমার পাওনা ছিলো পাঁচশো। দেড়শো বাদ গেলে বাকি রইলো সাড়ে তিনশো। সাড়ে তিনশো এই ধরো। তিনটে একশো টাকার নোট এক্ষুনি তুলে রাখো। ট্যাঁকে অতটা গুঁজো না একসঙ্গে। যদি হারিয়ে যায়?" ইতুর হিসেবে বোরড হয়ে গিয়ে আমি একবার শুভর কাছ থেকে বারান্দায় ঘুরে এসে দেখি সুখদা রান্নাঘরে চলে গেছে। পিছু পিছু ইতুও ছুটেছে—এবং তার বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে—

—"কাগজটা সেই ট্যাঁকেই রাখলে? বালার সঙ্গে মুড়ে ওটাও তোমার ঝোলাতে রাখা উচিত ছিলো। আর এই আলাদা খুচরোটা রাখো বাসভাড়ার জন্যে, এটা ট্রেনভাড়ার জন্যে। অতো টাকা যেন বের করবে না—"

উঃ—সুখদাকে নিয়ে ইতু যেন মেতে উঠেছে। কার যে নাতির ভাত, বোঝা দায় হয়েছে। সুখদা এবারে বললে—"হয়েচে, হয়েচে। সব বুজিচি, এই কি আমি পেরথম ঘরে যাচ্চি ছোড়দি? তুমি যেন আমাকে ছোটোছেলে ঠাউরেচো।"

—"কিন্তু তোমার সঙ্গে কেউ নেই, অতগুলো টাকা, পায়ে বাতের ব্যথা—আমার ভাবনা হবে না? সুখদা, দেখো ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো বাপু সামনের রোববার। দেখছো তো আমার কী অবস্থা—"

—"সে আসবুনি? নিচ্চয় আসবো।"

ইতিমধ্যে একফাঁকে সোমদেব এ-ঘরে এসে হাত নেড়ে টা-টা করে চলে গেছে। তার মক্কেলের তরফে যে লোকটি ওকে নিতে এসেছিলো, সেও এলো সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক চামচার মতো। পেছু পেছু এলো। আবার পেছু পেছু গেলো।

এবার ঠাকুর নমস্কার করে, রান্নাঘর বন্ধ করে, খগেনের কাছে বিদায় নিয়ে, শুভকে বলে-টলে, সুখদা খাবার ঘরে এসেই চীৎকার করে উঠলো।—

—"অ খগেন, আমার পোঁটলাটা কী করলি?"

—"তোমার পোঁটলা? তোমার পোঁটলা আমি কি করবো? সেই তো সক্কাল থেকেই এইখানে পড়ে আছে। বুড়ো হয়েচো বলেই এতো ভুলো হতে হয়? নিজের জিনিস নিজে খেয়াল করবে না—" বলে গজগজ করতে করতে খগেন ঘরে এসে টেবিলের ওপাশে গিয়েই অবাক!

—"আরে? নেই তো? গেলো কোথায় সুখুদিদির পোঁটলাটা?"

সবাই হতবাক। সত্যিই তো? সুখদা মাথা চাপড়ে কেঁদে উঠলো।—"হায়, হায়, হায়। কে লিয়ে পালালে গো আমার পোঁটলা।"

—"বুঝিচি! বুঝিচি! ওই খবরের কাগজওলাটার কাণ্ড! লিচ্চয় ওর থলেতে পুরে নিয়ে চলে গেছে। ওইখানেই তো বসেছিলো লোকটা।"

খগেন চেঁচিয়ে ওঠে..."সত্যি। লোকটা ঠিক ওইখানেই বসেছিলো। আর চুপচাপ বসেছিলো অনেকক্ষণ। ঐজন্যই, তাক খুঁজছিলো আর কি!"।"

ইতু একবার ধোবাকে নিয়ে ব্যস্ত, একবার গয়লাকে নিয়ে ব্যস্ত, কেউ তো ওকে মোটে দেখছিলোই না। নির্ঘাৎ ওই কেটে পড়েছে সুখদার পোঁটলা নিয়ে। পালিশমিস্ত্রি চুপচাপ কাজ করছিলো, এবার সেও যোগ দিলো—

—"কিন্তুক ও তো থলে খোলেইনিকো মোটে! মা, ধোপাটাই হয়তো ভুল করেছে। ওর দু'চারটে ছোটো ছোটো পোঁটলা ছিল তো ওখানে, অন্য অন্য ঘরের কাপড়ের বাণ্ডিল,—হয়তো বা তাদেরই সঙ্গে—"

—"না, না, সে কী করে হবে?" হাত পা নেড়ে নিজেই সুখদা বললে—"আমার তো পেলাস্টিকের পোঁটলা—হলদে রঙের। ঝিপ লাগানো। কাঁধে ঝুলোনোর দড়ি-দেওয়া 'বেগ'। ধোপা আমার বেগ লেবে কী ঝন্যি?"

চেঁচামেচিতে উৎসাহিত হয়ে শুভ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

বললে—"হলদে? হলদে ব্যাগ? এইমাত্র দেখলাম একটা হলদে ব্যাগ বাবা ঐ কালো গাড়িতে তুলে দিলো।"

—"সেটা তো তোর বাবার নিজেরই ফ্লাইট ব্যাগ রে!"

—"দাদাবাবুর ব্যাগ? সে তো আমি কখন ওদের গাড়িতে দিয়ে এসেছি—আপনি যেক্ষুনি বের করে দিয়েছেন"—খগেন জানালো।

—"আমি স্বচক্ষে দেখলাম, বাবা নিজের হাতে এক্ষুনি একটা হলদে ব্যাগ—"

—"সর্বনাশ! তাহলে তোর বাবাই নিয়ে গ্যাছে রে সুখদার পোঁটলা—শুভ, ছোট ছোট—আমাদের ড্রাইভারকে ধর—এয়ারপোর্টেই চলে যা—এতক্ষণে হয়তো দিল্লিই চলে গেলো সুখদার নাতির বালা—অনেকক্ষণ তো বেরিয়ে গেছে ও—"

—"কে বললে অনেকক্ষণ? এতক্ষণ তো বাবা লাইব্রেরিতে ছিলো। এইমাত্র গাড়িতে উঠলো, আমরা দেখলাম।"

—"তবে যা খগেন, মোড়ের পানের দোকানে ছুটে যা—নিশ্চয় ওখানেই পাবি—কোথায় বেরুলেই আগে গাড়ি থেকে নেমে ওখানে পান কেনে—বেশ কিছু পান নিয়ে যাবে নিশ্চয় প্লেনের জন্যে—দৌড়ে যা—"

—"কিন্তু লিফটটা নেমে গেছে যে এক্ষুনি—আর তো আসবে না—"

—"যাগগে, তুই হেঁটেই যা বাবা খগেন—ও লিফট ফেরৎ আসার জন্যে দাঁড়াসনি—সুখদার নাতির বালাটা—", খগেন তবু গাঁইগুঁই করছে দেখে ততক্ষণে শুভ ছুটেছে সিঁড়ি বেয়ে—সাততলা দৌড়ে নেমে পানের দোকানে যাবে বাবাকে ধরতে। সঙ্গে সঙ্গে দুড়দাড় করে ছুটলো তার সাঙ্গপাঙ্গরা। মুহূর্তের মধ্যেই বাড়ি ফাঁকা। নিস্তব্ধ। কেবল দেয়ালঘড়িটা উদ্বেগে টিকটিক করে যাচ্ছে।

সুখদা তারই মধ্যে মৃদু মৃদু নাকিসুরে কেঁদে চলেছে—"হায়, হায়, হায়! ঝামাইবাবু কিনা আমার পোঁটলা নে' ডিল্লি চলে গ্যালো গো—আমার আ—র লাতিটার ভাতে ঝাওয়া হলুনি!"

—"কে বলেছে দিল্লি যাচ্ছে তোমার ব্যাগ?" ফোড়ন কাটে খগেন—"বাবু তো নিজের ব্যাগটাই প্লেনে হাতে নিয়ে উঠবেন, আর ঐ ব্যাগটা ওঁর নয় বলে যেই বুঝতে পারবেন, কিছুতেই নেবেন না। মক্কেলের গাড়িতেই পড়ে থাকবে। ও ব্যাগসুদ্ধু সব মাল সুখুদিদির খোওয়া গেলো!"

খগেনের ভাষা শুনে সুখদার শোক আরও উথলে ওঠে।—"আমি তো ট্যাঁকেই নিইছিলুম বালা আর টাকা সবই—ছোড়দিদি আমারে ঝোর করে পোঁটলাতে আখালে। আমি আখতে চাইনি—ওরে আমার অতগুলো ট্যাকা! আমার লাতির উপোর বালা দুখান!—হায় ভগবান! হায় কপাল!"

ইতু খুবই লজ্জিত। আমি এক ধমক দিই—

—"গেলে গ্যাছে। আবার হবে। জিনিসপত্তর কি যায় না? তোমার জামাইবাবুকে বোলো। রুপোর বালা গড়িয়ে দেবে, তিনশো টাকাও দিয়ে দেবে—এখন চুপ করো দিকি?"

ইতু তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। উদগ্রীব। সাততলা দৌড়ে দৌড়ে নামা তো সোজা নয়, শুভর দল যতোই জোরে নামুক। তারা আর পথে বেরুচ্ছে না! একটা কালো গাড়ি মোড়ের পানের দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বটে—কিন্তু ওটাই ওর মক্কেলের গাড়ি কিনা কে জানে? নিজেদের গাড়ি তো নয়। ঈশ! গেলো সুখদার সর্বস্ব! কী জানি আরও কতো কিছু সম্পত্তি শখ করে জমিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো ওতে!

বেচারী! মনিব নিজেই পুঁটলি নিয়ে ভেগেছে! এমন দুর্ভাগ্য ক'জনের হয়?

এমন সময় একটা প্রচণ্ড হুংকার কানে এলো। ঐ যে—শুভর দলবল রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। এবং সমস্বরে চেঁচাচ্ছে—"চিন্তামণিদা, গাড়িটা আটকাও।" চিন্তামণি পানওয়ালার নাম। চিন্তামণির সাদা মুণ্ডু পানের দোকান থেকে উঁকি মারলো। এবং পানের দোকানের ওপাশ থেকে হেঁটে এলো সোমদেব। এতক্ষণে ছেলেগুলো এমিল জ্যাটোপেকের মতো দৌড়ুচ্ছে। সাততলার ওপর থেকে আমরা দেখলাম: গাড়ির সামনে জটলা হচ্ছে। সোমদেব হাত পা নেড়ে ছেলেদের ওপর রাগারাগি করছে। মক্কেলের চর বেরুলো। বুট খুললো। শুভ ছোঁ মেরে বুট থেকে সুখদার ব্যাগ তুলে নিলো। এবং তারপরেও কিছু কথাবার্তা হলো। অতঃপর ড্রাইভার উঠলো, সোমদেব উঠলো, মক্কেলের চর উঠলো—সবাই উঠে পড়লো, গাড়ি চলে গেলো। সুখদার পোঁটলা-কাঁধে বিজয়-মিছিল করে শুভর দলবল বাড়ির দিকে আসতে লাগলো হেসে গড়াতে গড়াতে। তাদের সেই আহ্লাদে এবং অহংকারে রাস্তাটাই আনন্দে ঝলমল করে উঠলো—সরস্বতীপুজোতে রঙীন আলোর সারির মতনই সেই হাসির চমকানি।

বীরগর্বে ঝোলাটি এগিয়ে দিয়ে শুভ বললো—

—"এই নাও সুখুদিদি! হলো তো তোমার পোঁটলা উদ্ধার? হুঁ হুঁ বাবা, সোজা চোরের পাল্লায় পড়েছিলে? এক্কেবারে দিল্লী পাচার করে দেবার তালে ছিলো—"

সুখদা লজ্জা লজ্জা হেসে শুভর গালটা টিপে দিয়ে (শুভকে প্রচণ্ড লজ্জা পাইয়ে দিয়ে) বললে—"ভাগ্যে আমার দাদাভাই ঘরেই ছেল? লইলে আমার লাতির ভাতে যাউয়াই হতুনি!" বাধা দিয়ে বেরসিক খগেন বললে—"চলো চলো, আর দেরি কোরো না। টেরেন পাবে না এর পরে।"

ওরা বেরুতে, নিশ্চিন্ত হয়ে আরেকবার চায়ের জল চাপিয়ে খাটে উঠে পা গুটিয়ে আরামসে বসে ইতু বলল, "বাবাঃ, বাঁচা গেলো, কী কাণ্ড হতো বলো তো, না-পেলে? শুভ, তোর বাবা কী বললো রে তোদের দেখে?"

—"প্রথমেই রেগে গেলো। 'আবার কী চাই? ব্যাপার কী? তোমার মা পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই?' যেই বলেছি—'সুখুদিদি পাঠিয়েছে, তার পোঁটলা নিয়ে তুমি দিল্লি চলে যাচ্ছো', বাবা তো ক্ষেপেই লাল—'আর ইউ কিডিং? ইয়ার্কি হচ্ছে? আমি আনবো সুখদার পোঁটলা? কেন? অ্যাম আই ক্রেজী? নাকি আমি ক্লেপটোমেনিয়াক? আমি কি চোর, না পাগল? কী ভাবিস তোরা আমাকে? অনেস্টলি! সুখদার ভিমরতি ধরেছে—' আমি তাও ইনসিস্ট করলাম, তখন রেগে-মেগে ড্রাইভারকে বললো, 'বুট খুল তো।' তখন ব্যাগও বেরুলো।"

—"তারপরে? তারপর কী বললে তোর বাবা?" ইতু উদগ্রীব। আমিও।

—"ব্যাগ দেখে তো বাবা একদম অবাক! কেবল বলে—'আরে? এটা আবার কোত্থেকে এলো? ধ্যাৎ, আমি কক্ষনো তুলে আনিনি—হাউ স্ট্রেঞ্জ!' শেষকালে মিনমিন করে বললে—'ঐ হলদে রঙটা দেখেই হয়তো,'...বাবা খুব লজ্জা পেয়েছে মনে হয়—"

—এবার ইতুর গর্জে ওঠার পালা—"লজ্জা পেয়েছে না হাতি! হলদে রঙটা দেখেই হয়তো? অ্যাঁ? একটা ধর্মতলার ফুটপাতের মাল, আরেকটা খোদ স্যামসোনাইটের ফ্লাইট ব্যাগ—দুটো এক হলো? এই বুদ্ধি নিয়ে যাচ্ছে মামলা লড়তে? আসুক তোর বাবা ফিরে—", কে বলবে এই গলাই আপনি রেডিওতে শুনে মূর্ছা যান?

নবকল্লোল, বৈশাখ ১৩৯৩

মহানায়ক সুরজিৎদা

"শ্রীমতী কোথায়? শ্রীমতী পাপীয়সী দেবী? হাই! ডার্লিং?" "—জ্বালাবে না বলছি, বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই শুরু হয়ে গেল? উঃ! ছেলেমেয়ের কী শিক্ষাই যে হচ্ছে—"

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসে দোর খুলে দেন পাপিয়াবৌদি।

সুরজিৎদার নাইট ডিউটি ছিল কাল। হাতের ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপরে ফেলে দিয়ে একটা জুতো পা ছুঁড়ে দরজার সামনে, অন্যটা পা থেকে ঝেড়ে খাটের কাছে কোনোরকমে খুলে ফেলেই চিৎপটাং হয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়ে..."আ-আ—আহ্..." বলে একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, তারপর সুরজিৎদা চোখের কোণ দিয়ে বৌদিকে মিটির মিটির দেখতে থাকেন।

এভাবে জুতো খোলা বৌদির একদম পছন্দ নয়। তিনি খেপে যাবেন বলেই সুরজিৎদার এইগুলো করতে ভালো লাগে। পাপিয়াবৌদির সঙ্গে সুরজিৎদার খুনসুটি দেখলে কারুর বিশ্বাস হবে না সুরজিৎদার বেশ বড়সড় দুটো ইস্কুলে পড়া ছেলেমেয়ে আছে।

ঘুমঘুম চোখে পাপিয়াবৌদি কিন্তু রাগ করেন না। জুতো দুটি গুছিয়ে রেখে বলেন—"শুয়ো না, ওঠো, আগে মুখে চোখে জল দিয়ে পোশাকটা বদলে ফ্যালো, আরাম পাবে—ইস, কাল থেকে এই জামাকাপড় পরে আছ!"

"হবে, হবে, পরে হবে। আগে দু'কাপ চা করে ফ্যালো দিকি?" বলতে বলতে শয্যাশায়ী সুরজিৎদা একহাত বাড়িয়ে বৌদির কোমর ধরে হ্যাঁচকা টান দেবার চেষ্টা করেন।

বৌদিও কায়দা করে একপাক ঘুরে নাগাল এড়িয়ে হাসতে হাসতে রান্নাঘরে পালিয়ে যান—"ইস, ন্যাকা, মুখ ধোয় না, নোংরা, আবার বাসিমুখে বউকে আদর করা চাই—হুঁঃ, বয়েই গ্যাছে—!"

জল চড়িয়ে দিয়েই সাবিত্রী বেরিয়েছিল। সুরজিৎদার ফেরার টাইম তার হিসেব করা। ট্রেতে বিস্কুট আর চা নিয়ে বৌদি ঘরে ঢুকতেই একটি কাপ তুলে নিয়ে সুরজিৎদা হঠাৎ উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েন। ভারী বেডকভারটি তুলে খাটের তলায় উঁকি মেরে বলেন—"এই যে মিস্টার মিত্তির! গুড মরনিং! এবারে বেরিয়ে আসুন, এই যে আপনার মরনিং টী রেডি হয়ে গেছে। আর লুকিয়ে থেকে কী করবেন, লেট যখন করে ফেলেছেন। থ্যাংকিউ ফর লুকিং আফটার মাই ওয়াইফ! কী? কী হলো? বেরুচ্ছেন না কেন? ডাক্তার ডাকতে হবে নাকি?"

"যাঃ, কী হচ্ছেটা কী? অসভ্য কোথাকার। আসেও বাবা মাথায়। কুবুদ্ধির ঢিপি!" অন্য কাপ চা-টা হাতে করে হাসতে হাসতে খাটের ওপর বসে পড়েন বৌদি —"বেশ হয় যদি মিত্তিরমশাই এসে পড়েন সত্যি সত্যি"—বলতে বলতেই দরজায় বেল বেজে উঠলো।

সুরজিৎদা তখনও মাটিতে উপুড়। চমকে গিয়ে মেঝে থেকে ঝটপট ভরাভর্তি চায়ের পেয়ালা সমেত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে, মেঝেয় এবং শার্টে চা ছলকে ফেললেন। বৌদি দোর খুলে দিলেন, ঘরে ঢুকলো সাবিত্রী। হাতে দুধের বোতল।

"যাক বাবা, বাঁচালে! আমি ভাবছি বুঝি সত্যি সত্যিই—" গা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সুরজিৎদা বলেন, "ওফ!"

"ওফ কী? বেশ হতো, বেশ হতো যদি সত্যি সত্যিই মিত্তিরমশাই আসতেন। এই যে তোমার বদ রসিকতা ওঁকে নিয়ে, বেচারা ঘুণাক্ষরেও যদি টের পেতেন, ক—বেই আমাদের তাড়িয়ে দিতেন—এত খারাপ কথা তুমি বল—"

"খারাপ কথা মানে? আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। ওঁর ক্ষেত্রে আমি থাকলে যা করতাম, আমি তাই বলি। উনি যে রাতবিরেতে চলে আসেন না, এটা তো ওঁরই বুদ্ধির দোষ—এমন সুন্দরী মেয়ে একা থাকলে—"

"একটা কাজ করো না? নাইট ডিউটিতে বেরুবার আগেই বলে কয়ে যেচে সেধে ছাপানো নেমন্তন্ন পত্তর দিয়ে ওঁকে ডেকে এনে এ-ঘরে মোতায়েন করে গেলেই পারো। তুমিও নিশ্চিন্তি, আমিও নিশ্চিন্তি—"

"ওভাবে বলে কয়ে কী আর রোমান্স হয়? আয়্যাম সরি পাপীয়সী দেবী, কিন্তু ব্যাচেলর বুড়ঢারা বেজায় ভীতু হয় আমি দেখেছি। রোমান্সের কোনো সেন্সই থাকে না ওদের। আমি তো বাবা ঠিকই করে রেখেছি যখন নিজের বাড়ি বানাবো, ভাড়াটের সঙ্গে চুক্তিই থাকবে, খোলাখুলি লীগ্যাল এগ্রিমেণ্ট যে, ভাড়াটের বউয়ের সঙ্গে আমরণ প্রেম করার পূর্ণ অধিকার আমার থাকা চাই। এই রাইট না পেলে বাড়িভাড়া দেব না। ব্যস।"

"হ্যাঁ, ওই শর্তে রাজি হয়ে যে তোমার বাড়ি ভাড়া নেবে তার বউও দেখবে তেমনি তেমনি হিড়িম্বা রাক্কুসী হবে!"

"হিড়িম্বা? হিড়িম্বা পেলে তো বর্তে যাবো গো? ওরা সব ট্রাইবাল বিউটি, ওদের মোটেই ফ্যালনা ভেবো না! পরমাসুন্দরী না হলে রাজার ছেলেকে ভোলাতে পারে?"

"কেন? হিড়িম্বা চাই কেন? আমাকে আর মনে ধরছে না?"

"আঃ—হাঃ! কী যে বলো? দ্রৌপদী কি সুন্দরী ছিলেন না? পড়েছ তাঁর বর্ণনা? অমন পদ্মগন্ধা রূপসী ঘরে থাকতেও অর্জুনের কী উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, টু নেম আ ফিউ—"

"ও, তুমি অর্জুন বুঝি? কবে থেকে অর্জুন হলে?"

"তবে কি আমি যুধিষ্ঠির? তুমিই বা কবে থেকে আমাকে যুধিষ্ঠির ঠাওরালে? ওঃ, এতবড়ো কমপ্লিমেন্ট ওয়ালর্ডে কেউ কারুর বউয়ের কাছে পায়নি, আয়্যাম সিওর—"

"যাও, তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না—"

"আমি বাবা চিরকেলে রোমান্টিক হিরো! একটু-আধটু সুইট রোমান্স না হলে আমার দিনই চলে না। যতই সুন্দরী হও, নিজের বউকে নিয়ে তো আর রোমান্স হয় না! হয় কি? তুমিই বলো ডার্লিং? একটু রস না হলে জীবন চলে?"

"অ! আবার রসও চাই? রোমান্সও চাই? এই যে সারা গায়ে চা পড়ে চিটচিট করছে, তাতে তো বেশ একটা রসালো রোমান্স হলো। হলো না?"

"সাবিত্রী! সাবিত্রী! বোঝো ঠ্যালা! তোমার বৌদির মিষ্টিকথার চোটে আমার জামাকাপড় রসে চিটচিট করছে, মেঝেতেও পিঁপড়ে থিকথিক করলো বলে! শিগগির ন্যাতা নিয়ে এসো দিকিনি—"

সুরজিৎদা এইরকমই। যতক্ষণ যেখানে থাকেন, চেঁচামেচি হৈ-হুল্লোড়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখেন। আর বেরিয়ে গেলেই বাড়ি নিঃঝুম। নিশুত পুরী। করিৎকর্মা মানুষ না হয়েও সুরজিৎদা রেজাল্টের জোরে ইংরিজি কাগজে চাকরিটা যোগাড় করে ফেলেছিলেন এবং পাপিয়াবৌদিকেও। সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকুরিয়াতে তখন সদ্য বানানো এই বাড়ির দোতলা। এখানেই তাঁর দুটি ছেলে-মেয়ে জন্মেছে, বড় হচ্ছে। বাড়িওলা মানিক মিত্তির ব্যাচেলর মানুষ। বৃদ্ধা মাকে নিয়ে নিচে থাকেন। নিতান্ত ভদ্রলোক। বয়েসও হয়েছে। নানা সমাজকল্যাণ সংঘের সঙ্গে জড়িত। সময় পেলেই সুরজিৎদার সঙ্গে এসে আড্ডা মারার চেষ্টা করেন। আর সুরজিৎদার চুলদাড়ি পঞ্চাশ ছুঁলেও স্বভাব পঁচিশের কোঠা ছাড়ায়নি। হাতে ফাঁক পেলেই বউয়ের সঙ্গে খুনসুটি করে সময় কাটাতে চান, বউ পাত্তা না দিলে ছেলেমেয়েদের পেছনে লাগেন। মানিক মিত্তিরের সঙ্গে গল্পে তাঁর মন নেই। কিন্তু মিত্তিরমশাই সরল মানুষ, তিনি অতশত বোঝেন না। একা একা থাকেন, সুরজিৎদা ফিরেছেন টের পেলেই সময় নেই অসময় নেই, সুড়সুড় করে উনিও চলে আসেন সঙ্গ পাবার আশায়। পাপিয়াবৌদির বেশ

মায়াই পড়ে গেছে এই ভালোমানুষ ভাসুর টাইপের ভদ্রলোকের প্রতি। কিন্তু সুরজিৎদা বিরক্ত। 'ব্যাটা বোর'! বলে আড়ালে গজগজ করেন।

সেদিনও গরম চায়ের পেয়ালাটি, খবরের কাগজটি, তাজা টাটকা সকালটি এবং পাপিয়াবৌদির হাসিমুখ যেই সুরজিৎদার কপালে একত্রে জুটেছে, তক্ষুণি মানিক মিত্তিরের গলাখাঁকারি শোনা গেল দরজার কাছে। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকেই তিনি বললেন —"এই যে সুরজিৎবাবু, আছেন তাহলে? বাঁচালেন মশাই!"

সুরজিৎদার মুখ সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষ হয়ে পড়লো। বৌদি তাড়াতাড়ি মুখে হাসি এনে বলেন, "চা এনে দিই, মিত্তিরমশাই?"

"না, না, বউমা, এক্ষুণি চা খেয়ে এলুম। আজ আমি বড্ড বিপদে পড়ে এয়েচি বউমা, মালগোবিন্দপুরে, মানে ঐ চম্পাহাটির ওদিকে আর কি, একটা ক্লাবের বার্ষিক উৎসব, মানে অ্যানুয়াল ফাংশান আছে এই রোববার। সভাপতি না হয় ওই ক্লাবের প্রেসিডেন্টই হবেন, কিন্তু প্রধান অতিথিই যে পাওয়া যাচ্ছে না? আমাদের সুরজিৎবাবু তো সাংবাদিকতায় বেশ নাম করেছেন, কী বলো ? টিভিতেও মাঝেমাঝেই সাক্ষাৎকার নেন কত সব বিখ্যাত লোকেদের, সেই সূত্রে ওঁর নামটাও লোকে জেনে গেছে —ইংরিজি কাগজের রিপোর্টার হওয়াটা গাঁয়ে একটা বিরাট ব্যাপার—ভাবছি ওঁকেই ধরে নিয়ে যাবো। হাতের পাঁচ বলে কথা। না বলো না বউমা, উপরোধে লোকে তো ঢেঁকিও গেলে। এ তো কেবল প্রধান অতিথি হওয়া! তুমিই সুরজিৎবাবুকে রাজি করাও!"

প্রস্তাব শ্রবণে পাপিয়াবৌদির মুখ হাঁ! বাকরহিত।

"আপনাদের সভায়? ওঁকে? প্র-প্র-মানে চীফ গেস্ট?"

"হ্যাঁগো, হ্যাঁ, আর যে কাউকে পাচ্চিনি, আপত্তি আছে নাকি তোমাদের? এই উবগারটুকু করো বউমা!"

আপত্তি? এই প্রস্তাবে সুরজিৎদার সদাই স্মার্ট মুখেও হঠাৎ কেমন যেন বিব্রত ভাব এসে পড়েছে, খানিকটা 'কিন্তু-কিন্তু' আর খানিকটা অভাবিত খুশির ককটেল।

"না না। আপত্তির কী আছে? কিন্তু, আমি তো কখনো—মানে, জীবনে কখনো এসব প্রধান অতিথি-টতিথি তো—এসব ফরম্যাল অনুষ্ঠানে আমাকে কেন, আর কারুকে বরং—আবার বক্তৃতাও দিতে হবে নাকি রে বাবা?"

খুশির চোটে অজস্র বাক্য অসম্পূর্ণ রেখেও কোনোরকমে একটি বাক্য সম্পূর্ণ করতে পেরে সুরজিৎদা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বৌদি হাসি চাপতে অন্যদিকে মুখ ফেরান।

"থ্যাংকিউ, থ্যাংকিউ! আপনাকে ধরিচি কি আর সাধে?" মিত্তিরমশাই সুরজিৎদাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বৌদির দিকে ফিরলেন। নেবা বিড়িটা আরেকবার ধরিয়ে নিয়ে বললেন—"সুরজিৎবাবু ছাড়া হাতে আর কেউই নেই বলে! আর বলো

কেন? এক্সপিরিয়েন্সড় চীফ গেস্টরা কেউ কি এমন হুট করে আসবে? তাদের একটা প্রেস্টিজ আছে না?"

"তাহলে আপনাদের আগে থেকেই কাউকে ঠিক করা উচিত ছিল।" বৌদি একটু অপমানিত গলায় বলেন।

"করিনি কে বললে? কবি হেরম্ব চৌধুরীকে তো ঠিক করা হয়েছিল। ওদিকে ভুল করিনি বাবা! চীফ গেস্ট ফিক্স করে তারপরে তো অন্য প্রোগ্রাম! কিন্তু এমনই কপাল। কবি হেরম্ব চৌধুরীই যে বসিয়ে দিলেন, লাস্ট মোমেন্টে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দিলেন। রোববার ফাংশন, আর কাল বেস্পতিবারে বললেন, 'যেতে পারবো না'! ভেবে দ্যাখো কাণ্ডটা? আজ শুক্কুরবার। পরশুদিনের জন্যে কোনো ক্লাস ওয়ান প্রধান অতিথিকে অ্যাপ্রোচই করা যাবে না। দেয়ার ইজ নো টাইম! মান্যগণ্য অতিথিদের তো একটা মানসম্ভ্রম আছে? আগে থেকে দিনক্ষণ ঠিক করে ওঁদের এনগেজ করতে হয়। কত ব্যস্ত মানুষ সব!"

"হেরম্ব চৌধুরী কেন গেলেন না?" বৌদির ভুরু-পেঁচানো প্রশ্ন।

"প্রিন্সিপল-এর প্রশ্নে। উনি ভেবেছিলেন কেবল রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদযাপিত হচ্ছে, আসলে তো উৎসবটা হচ্ছে চারটে আইটেম একসঙ্গে জড়িয়ে। যেই বলেছি চারটে সাবজেক্ট নিয়েই একটু একটু বলা চাই, অমনি উনি ক্যানসেল করে দিলেন।"

"চা-রটে আইটেম?" সুরজিৎদাই মুখ খুললেন এবার, "কী কী আইটেম শুনতে পারি?"

"ও কিছু না! খুব সিম্পল! ঐ তো—রবীন্দ্র-সপ্তাহ, মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ দিবস, মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মজয়ন্তী আর ব্যায়ামাগারের প্রয়োজনীয়তা। দু'কথা বলা, এই তো ব্যাপার। ওঃ, আরও একটা বিষয় আছে। ভারতবর্ষে হোমোপ্যাথি চিকিৎসার দেড়শো বছর নিয়েও কিছু বলতে হবে ভাই—"

"ওরে ববাবা"—সুরজিৎদা-পাপিয়াবৌদির কণ্ঠে যুগলবন্দী বিস্ময়রাগিণী বেজে ওঠে।

"ওরে ববাবা মানে? হেরম্ব চৌধুরী না হয় কবি, তিনি এতসব নিয়ে বলতে না চাইতেই পারেন। কিন্তু সুরজিৎবাবু, আপনি তো সাংবাদিক, আপনাকে তো ভাই এর প্রত্যেকটাই কভার করতে হয়। অন গ্রাউণ্ডস অব প্রিন্সিপল আপনার কোনোই ওজর-আপত্তি থাকা উচিত নয়। বলো বউমা, উচিত কি?"

"কিন্তু—কিন্তু এতগুলো বিষয় একসঙ্গে উদযাপন না করলেই কি চলতো না? এগুলো একসূত্রে গাঁথা—"

"কী করে আলাদা উদযাপন করলে চলে, বলো বউমা? চাঁদা উঠবে কেন? যদি এটাকে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ দিবস না বলি, গাঁ-গঞ্জের জনসাধারণ চাঁদা দেবে কেন? তারা রবীন্দ্রনাথ কী-বা বোঝে? আবার বৈশাখ-শ্রাবণ বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-সপ্তাহটা গতবছর থেকে শীতকালেই করা ঠিক হয়েছে, ঐ গ্রীষ্মে কেউ গ্রামে আসতে চায়

না, ফ্যান-ট্যান নেই তো! হোমিওপ্যাথির ব্যাপারটা রাখতে হলো আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ডক্টর ব্যানার্জির জন্যে। উনি গ্রামে প্রচুর গরিবলোককে বিনামূল্যেও চিকিৎসা করেন তো? দারুণ পসার জমেছে ভদ্রলোকের—বড় ছেলেকেও এখন প্র্যাকটিসে নামাচ্ছেন। ওটা রাখতেই হবে, সময়ে-অসময়ে মোটা চাঁদা দিয়ে উনিই রক্ষে করেন ক্লাবকে—আর কী? আর তো শুধু ব্যায়ামাগারটা? একটু বলতেই হবে তো ক্লাবটার চরিত্র বিষয়ে? এক এক করে বেশি হয়ে গেছে।"

"উত্তমকুমার এলেন কেমন করে?"

"ও বাবা, মহানায়ক উত্তমকুমারের নামেই তো সভাতে অডিয়েন্স হবে? লোকে আসবে কেন সভায়?"

"মল্লিকপুরে যেতে হয় কেমন করে? কদ্দুর ওটা এখান থেকে?"

"মল্লিক নয় বউমা, মালগোবিন্দপুর। চম্পাহাটি স্টেশনে নেমে ক'মাইল ইন্টিরিয়ারে—ওসব নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না, বউমা। ছেলেমেয়েরাও যায় যেন। আমি তো যাবোই, কোনো অসুবিধাই হবে না। আমি ওদের গত দশবছর ধরে ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড কিনা?"

"তবু মানে—", পাপিয়াবৌদির মনের খুঁতখুঁতুনি যাচ্ছে না।

"ইয়েস বলে দাও বউমা, তাহলেই সুরজিৎবাবু যাবেন—ইয়েস তো? থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ—কাল তবে ছেলেরা এসে নেমন্তন্নপত্র দিয়ে যাবে। পরশুই মিটিং, মনে থাকে যেন। সকাল দশটায়। ঘণ্টা দুই হাতে নিয়ে বেরুনোই ভালো। ট্রেনের কথা কিছু বলা যায় না।"

পরদিন তিনটি ছেলে এলো। চোঙাপ্যান্ট, চক্রাবক্রা বুশশার্ট, হাতকাটা সোয়েটার, একগাল হাসি।

"জয়মাকালী বডি বিল্ডারস থেকে আসছি। সুরজিৎবাবু আছেন? কাল সোকালে গাড়ি নিয়ে আসবো আমরা। ঠিক আটটার সোমায় তৌরি থাকবেন কিন্তু বৌদি। বাড়িসুদ্ধু সব্বাই যাবেন কিন্তু, সব্বার নেমতন্নো, হ্যাঁ। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবেন, ছেলেদেরই তো ব্যাপার।"

সুরজিৎদার পঞ্চাশ বছরের জীবনে এই প্রথমবার প্রধান আতিথ্য গ্রহণ। হোক না সেই ক্লাবের নাম 'জয়মাকালী বডি বিলডারস অ্যাসোসিয়েশন', তবু তো তারা ওঁকেই ডেকেছে? ছেলেমেয়েরও প্রচুর উৎসাহ—গ্রামে আউটিং হবে। রোববার যারা কিছুতেই বিছানা ছাড়তে চায় না, আজ, ভোরে উঠে তারা রেডি। বৌদির আগ্রহও মোটেই কম নয়। চুল বেঁধে লিপস্টিক মেখে রেশমী শাড়ি পড়ে ৮টার ঢের আগে বাড়িসুদ্ধু সবাইকে প্রাতরাশ খাইয়ে তিনিও রেডি। যে সুরজিৎদাকে ছুটির দিনে বেলা দুটোর সময়েও স্নানপর্বে পাঠানো যায় না আজ তাঁর স্নান, দাড়ি-কামানো সব সারা, আধহাত মুগার ধাক্কা দেওয়া শাড়ি-মার্কা ভাইফোঁটায় প্রাপ্ত ধুতি আর 'র' সিল্কের পাঞ্জাবি

পরে বিয়ের শাল কাঁধে নিয়ে পামশু পায়ে তিনি বসে বসে একমনে একখানা খুদে টুকরো কাগজ পড়ছেন, রবিবারের খবরের কাগজ নয়। ঐ কাগজে তাঁর ভাবী বক্তৃতার পয়েন্টগুলি তিনি লিখেছেন। পাপিয়াবৌদি সাবিত্রীকে বারংবার লাস্ট মোমেন্ট ইন্সট্রাকশন দিচ্ছেন। বিকেলে ফিরবেন। দুপুরে বাড়িতে খাওয়া বন্ধ। রাঁধতে হবে না ভেবেই যেন বৌদির উৎসাহটা বেশি। ৮টা অনেকক্ষণই বেজে গেছে। ছেলেদের দেখা নেই। তবে কি? সুরজিৎদার উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। এমন সময়ে—"গাড়ি এসে গেছে স্যার, রেডি তো, বৌদি? চলুন, চলুন, বাচ্চারা কই?" বলতে বলতে দুটি ছেলে এসে পড়লো। মিত্তিরমশাইও বললেন—"চলুন, গাড়ি রেডি!"

রাস্তায় এসে দেখা গেল তিনটি সাইকেল রিকশা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেদুটো একটায় উঠলো। সুরজিৎদাকে নিয়ে মিত্তিরমশাই একটাতে, অন্যটাতে, পাপিয়াবৌদি ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে উঠে পড়লেন। রিকশা চললো ঢাকুরিয়া স্টেশনে।

স্টেশনে নেমে রিকশাভাড়া মিটিয়ে দিল ছেলেরা। সুরজিৎদা খুবই আরাম বোধ করলেন। রিকশাওলাদের সঙ্গে তক্কাতক্কি না করেই সপরিবারে রিকশা চড়ে এই স্টেশনে আসা, জীবনে প্রথমবার এতবড়ো আরাম পেলেন। বৌদিকে একবার দেখে নিলেন। ভারি সুন্দরী বউ তাঁর সত্যি। ছেলেমেয়েদুটোও হয়েছে তেমনি। কুমোরটুলিতে অর্ডার দেওয়া প্রতিমার মতো মুখ। ছেলেটা ছোট, এখনো মেয়েলি দেখতে। নাঃ, বেশ প্রাউড হবার মতোই ফ্যামিলি তাঁর—প্রধান অতিথির যোগ্য ফ্যামিলি। কোমরে হাত বুলিয়ে একবার ওপর থেকেই দেখে নিলেন, ধুতির ওপরে পাপিয়া যে শক্ত করে একটা সায়ার দড়ি বেঁধে দিয়েছিল সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা। উনি বেল্ট বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন তাতে নাকি অনেক রিস্ক। আর যাই হোক, প্রধান অতিথির তো ধুতি খুলে গেলে চলবে না।

ক্লাবের ছেলেরা গেছে টিকিট কাটতে। মিত্তিরমশাই বকে যাচ্ছেন। সুরজিৎদা অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। ট্রেনে করে অবশ্য প্রায়ই তাঁকে যাতায়াত করতে হয়। কখনো বালিগঞ্জে, কখনো শেয়ালদা, কখনো ক্যানিং, কখনো বারুইপুর। কিন্তু টিকিটঘরের দিকে কোনোদিন দৃষ্টিপাত করেননি। ছেলেগুলি টিকিট কেটে এনে সবিনয়ে বললে—"চলুন স্যার—আর দেরি নেই, ট্রেন এল বলে।"

সুরজিৎ ভাবলেন—জীবনে এই ফার্স্ট টাইম টিকিট কেটে এ লাইনে ট্রেনে চড়ছি! নাঃ, আজকে সত্যিই একটা ভেরি স্পেশাল ডে। অনেকগুলো 'জীবনে প্রথমবার' এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে।

ট্রেনে অবিশ্যি সেই একই ভিড়—তবে বসবার সীট পেতে কিছুমাত্র অসুবিধে হলো না। চোঙাপ্যান্ট ছেলেগুলি হালুম-হুলুম করে লোকজন সব হটিয়ে তাঁদের পাঁচজনকেই বসবার জায়গা তো করে দিলেই, নিজেরাও হাঁটু ফাঁক করে করে যথাসাধ্য জায়গা নিয়ে বসে পড়লো। ট্রেন চলছে, থামছে। বাণ্টি-বুলটু খুবই উত্তেজিত, জানলা

দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—কী সুন্দর সুন্দর নাম সব গ্রামের, মল্লিকপুর, রাজপুর, কালিকাপুর, পিয়ালী—কত সবুজ গাছপালা, পুকুর, কলাবাগান, ধানক্ষেত, কুঁড়েঘর। বৌদিও মুগ্ধ। চম্পাহাটি না আসতেই উঠে পড়লো ছেলেরা। ট্রেন থামতে-না-থামতেই কায়দা করে ছেলেমেয়েদের সোজাসুজি কোলে তুলে, আর পাপিয়াবৌদিকে প্রায় কোলে করে এবং সুরজিৎদা-মানিকবাবুকে আলতো গোত্তা মেরে ট্রেন থেকে ঝেড়ে প্ল্যাটফর্মে ঠিকঠাক নামিয়ে ফেললে। প্ল্যাটফর্মে আবার রিকশা।

ঝোপঝাড়, ধানক্ষেত, কলাবাগান, এঁদোপুকুর, কলসী কাঁখে অবাক বধূ, ঘুনসিপরা বাচ্চারা, পশ্চাদ্দেশ-উন্মুক্ত জঙ্গলে উপবিষ্ট নিঃসঙ্কোচ কৌতূহলী গম্ভীর ভদ্রলোক, অনেকের মুগ্ধ দৃষ্টি সার্থক করতে করতে রিকশার কনভয় চললো। চম্পাহাটি তো নয়, মালগোবিন্দপুর। আরো ক'মাইল দূরে। বেশ রোদটা চড়া হয়ে উঠেছে মাথার ওপরে। "আপনাদের সব্বার নেমতোন্ন" বলেছিল ছেলেগুলো। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়, দশটায় মিটিং যখন। কী কী খাওয়াবে, সুরজিৎদা ভাবতে ভাবতে যান। কত কথাই মানিক মিত্তির বলে যাচ্ছেন, ওই ব্যায়ামাগার ক্লাবের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল ফিলসফি। খরায়-বন্যায়-আর্তত্রাণে-নির্বাচনে-দাঙ্গায় এই ছেলেদের স্বতঃস্ফূর্ত জনসেবামূলক বিবিধ কর্ম-কৃতির ফিরিস্তি। আগে আগে কারা এসেছেন। কী অসামান্য যোগব্যায়ামের ক্লাস হয় এখানে। এই সেদিনও এসেছিলেন যোগ প্রয়োগে রোগারোগ্যের স্বামী শংকরানন্দ। শ্রদ্ধেয় বিষ্টু ঘোষমশাই, বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়, এঁরা তো বারবার এসেছেন, ক্লাবের কত রমরমা ছিল একসময়ে, কবিশেখর কালিদাস রায় এসে খাতায় তারিখ সমেত সই করে গেছেন।

এখানে নস্করদের জমিজমা ছিল প্রচুর। তাঁরাই কলেজ ইস্কুল তৈরি করে দিয়েছেন পাশের গ্রামে। কীভাবে একবার এক নস্কর মন্ত্রীমশাই ধুতিটিকে শাড়ির মতন করে পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বিধবা সেজে খুনীদের এড়িয়ে পালিয়েছিলেন, প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। তাঁকে কীভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিল গাঁয়ের মেয়েরা, সেই গল্প সাতখানা গ্রামের লোক এখনো করে—এইসব শুনতে শুনতে মাঠটা শেষ পর্যন্ত এসেই পড়ল। একটা চৌকোমতন স্টেজ বাঁধা হয়েছে। সামনে খটখটে রোদের মধ্যে ধূলিমলিন শতরঞ্চি পাতা। তাতে কিছু লোক বসে আছে। বালক-বালিকারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলা করছে। সুরজিৎদার মনে হলো গাঁসুদ্ধই যেন রিকশার পেছু পেছু ছুটছে। বাচ্চারা ছুটছে, নেড়ীকুকুর ছুটছে—বেশ একটা জরুরি আবহাওয়া। রিকশার কনভয় দেখতে পাওয়া মাত্রই অন্তরীক্ষে তীব্র সিটি বেজে উঠলো। বেজে উঠলো বিউগিল, ড্রাম এবং বাঁশিও। মঞ্চের ওপাশ থেকে লাইন বেঁধে মাঠে বেরিয়ে এলো ড্রাম বাজাতে বাজাতে সাদা শার্ট আর খাকী হাফপ্যান্ট পরা ছেলের দল। একজনের হাতে ক্লাবের নাম লেখা সবুজ সাটিনের পতাকা। ক্লাবের ব্যাণ্ডপার্টি এসে বাজনা বাজিয়ে সসম্মানে প্রধান অতিথির পার্টিকে রিকশা থেকে রিসিভ করলে। বাণ্টিবুলটুকে ফিসফিস করে বললে, "কী গান বাজাচ্ছে বুঝেছিস?" বুলটু বললে

—"যিসকি বিবি মোটি। কিন্তু মা তো মোটেই মোটা নয়?" পাপিয়াবৌদি মুগ্ধ। একদিন নিজেদের জীবনেও যে এমনটা হবে, কে ভেবেছিল? একটা বাচ্চামেয়ে এসে সুরজিৎদার কপালে চন্দন তিলক পরিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, সবাই চেঁচাতে লাগল —"ওকেও লাগিয়ে দে, ওকেও, ওকেও"—তখন সে মানিকবাবুকেও একটা চন্দনের টিপ লাগিয়ে দিলে।

"আহা-হা ওকে নয়, উনি তো আমাদেরই নিজের লোক। ওই ম্যাডামকে লাগা —যাচ্ছেতাই একেবারে—তখনই বলেছিলাম ববিতাকে দিসনি—" মেয়েটা বৌদির কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগাতে এসেছিল, এবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে দিয়ে পালিয়ে গেল। বৌদিও বেশ ইন্দিরা গান্ধী স্টাইলে নিচু হয়েছিলেন বাচ্চার হাতের টিপটা গ্রহণ করবার জন্যে, এবার সোজা হলেন। বান্টি-বুলটু হেসে দিল। সেই হাসির ভাষা—"হলো না তো? যাঃ, ফসকে গেল!"

বৌদি খুব অপমানিত হয়ে ওদের দিকে অগ্নিগর্ভ এক দৃষ্টি হানলেন। যেটা দেখে তাদের কেন, স্বয়ং সুরজিৎদারও সব হাসি মুহূর্তে উবে যায়। সদলবলে সুরজিৎদাদের নিয়ে গিয়ে প্রথমে বসানো হলো ক্লাবরুমে। টিনের ছাদওলা মাটির ঘরে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা আছে। আর একধারে নানারকমের মুগুর বারবেল ডাম্বেল জড়ো করা। যত্ন করে বেঞ্চিতে বসিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে নোংরা মতন কিন্তু ধোওয়া চায়ের পিরিচে দুটো করে ঠাণ্ডা, রোগা, ফ্যাকাসে, অ্যানিমিক চেহারার চিমড়ে সিঙাড়া, আর দুটো ময়লা ময়লা রসগোল্লা, আর দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট এনে দেওয়া হলো। তার সঙ্গে কাচের গেলাসে করে চা। সুরজিৎদা মহা আহ্লাদে খেতে লাগলেন। পাপিয়াবৌদি প্রবল দুঃখের সঙ্গে দেখলেন তাঁর দুই ছেলেমেয়ে যারা এমনিতে কিছুতেই কিছুই খেতে চায় না, তারা, এমনকী সেই থিন অ্যারারুট বিস্কুট যা তাদের দুচক্ষের বিষ, সেগুলো পর্যন্ত সোনামুখ করে চেটেপুটে খেয়ে নিচ্ছে। বৌদির মনে হলো—"ইস, কী লোভী দ্যাখো! বাপের তো ঐ ঠাণ্ডা সিঙাড়া খেলেই অম্বল হবে। আর ছেলেমেয়েদের আরো ভয়ের ব্যাপার হলো, ঐ বাসি রসগোল্লার রসে নির্ঘাৎ টাইফয়েডের জার্ম না থেকেই পারে না।"

বৌদি কিছুই ছুঁলেন না। শুধু চা। গরম চায়ে কোনো দোষ হয় না। গেলাসগুলো মোটামুটি পরিষ্কারই। চা শেষ হতেই তাঁদের সযত্নে স্টেজে নিয়ে যাওয়া হলো। দুটি চেয়ারে মানিক মিত্তির আর সুরজিৎদা, তৃতীয় চেয়ারে সেই ডাঃ ব্যানার্জি হোমিওপ্যাথ-কাম-ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। বৌদিকে আর বাচ্চাদের স্টেজের সামনে পাতা খানকুড়ি চেয়ারে গাঁয়ের জমায়েৎ হওয়া গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সসম্মানে বসানো হলো। শতরঞ্চিতে বাচ্চারা বসে চেঁচামেচি করছে। শতরঞ্চির পিছনদিকে কিছু মেয়ে, বউ, গিন্নিরাও বসেছে এসে। একপাশে কয়েকটি বাচ্চা মাটিতে ছক কেটে এক্কাদোক্কা খেলছে। তাদের হুল্লোড়ে বান্টি-বুলটুর কেবলই ওদিকে মন চোখ চলে যাচ্ছে। চেয়ার থেকে গম্ভীরভাবে উঠে গিয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক

কোণার দিকে হিসি করতে লাগলেন, মঞ্চেরই দেওয়ালের গায়ে। আহা, বুড়োমানুষ, আরো বেশিদূরে যাবার ধৈর্য ছিল না। অন্য কোনো আড়ালও নেই মাঠে। সুরজিৎদা মঞ্চ থেকে দেখেই সহানুভূতি সহকারে ভাবলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখলেন, পাপিয়াবৌদি ভুরু কুঁচকে খুব ডিসঅ্যাপ্রুভিং দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাচ্ছেন, আর বান্টি-বুলটু গা ঠেলাঠেলি করে হাসছে।

প্রথমেই সভাপতি, প্রধান অতিথি বরণ। এবার একটি কিশোরী মেয়ে এসে দুটি গাঁদাফুলের মালা পরিয়ে গেল সুরজিৎদা আর ডক্টর ব্যানার্জিকে। সঙ্গে সঙ্গে মালা খুলে সামনের চাদর ঢাকা দেওয়া টেবিলে রেখে দিলেন ডক্টর ব্যানার্জি এবং সুরজিৎদা। এটাই নিয়ম। মেয়েটা আরেকটু ছোট হলে তাকেই পরিয়ে দেওয়া যেত। শাড়িপরা মেয়ের বেলায় সেটা হয় না। দু'তিনটি মেয়ে এসে এবার টেবিলের পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়ালো। একটি ভদ্রলোক টেবিলের ওপর একটা হারমোনিয়াম এনে রাখলেন। তারপর সমবেত সঙ্গীত শুরু হলো—"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী—"

অনেকদিন পরে গানটা শুনে ভালোই লাগলো সুরজিৎদার। গানের পরেই পুরস্কার বিতরণ—গত বছরের স্পোর্টসের। প্রধানত ব্যায়ামাগার, তাই বেশিরভাগ পুরস্কারই ব্যায়াম সম্পৃক্ত। যাঁরা পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের স্বাস্থ্য দেখলে মনে হয় না দেশে ব্যায়াম বলে কিছু আছে। প্রত্যেকেরই জীর্ণশীর্ণ দীনপ্রাণ মূর্তি দেখে সুরজিৎদার খুব মনে দুঃখু হতে থাকে। পুরস্কার বিতরণান্তে সেক্রেটারির লিখিত রিপোর্ট পেশ করা হলো। তারপর প্রধান অতিথির ভাষণ। সুরজিৎদা পকেট হাতড়ালেন। সেই নোট লেখা কাগজটা চাই। এ পকেট, ও পকেট, নাঃ—পাঞ্জাবির দুটোই মাত্র পকেট। কোনোটাতেই ওটা নেই। টেবিলেই ফেলে এসেছেন নির্ঘাৎ, সকালে যখন প্র্যাকটিস করেছিলেন স্পীচটা। খুব ঘাবড়ে গেলেও, ব্যাপারটা তো বেশ কয়েকবার ভাবা হয়ে গেছে। স্মার্ট সুরজিৎদা নিজেই নিজেকে বললেন— "ঘাবড়াও মাৎ, সুরজিৎ, ঠিকই উৎরে দেবে। ভুলো না, তুমি প্রায় পঁচিশ বছর সাংবাদিকতার লাইনে রয়েছ। যে-কোনো সাবজেক্টেই আধঘণ্টার মধ্যে একটা চলনসই ছাপার যোগ্য 'কপি' নামিয়ে দিতে পারো। আর এ তো সবই জানাশোনা বিষয়। আগে থেকে ভাবাও আছে। রবীন্দ্রজয়ন্তী, মহানায়ক উত্তমকুমার, ব্যায়ামাগারের উপকারিতা—এই তো? আর, আর, আরেকটা যেন কী? চতুর্থটা?"

সুরজিৎদার এই শীতকালেও অল্প অল্প ঘাম হতে থাকে—চতুর্থ আইটেমটা কী? যাকগে, শুরু করে না দিলেই নয় এবার। ঘোষণা হয়ে গেছে—সবাই উৎকর্ণ। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে, "নমস্কার"-টা বলে নিয়ে, সুরজিৎদা শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই। "আজ এই রবীন্দ্রজয়ন্তী সপ্তাহে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভালো, সুস্থ দেশ ও দশের পক্ষে উপকারী কবিতা কেবলমাত্র মস্তিষ্কে স্বাস্থ্যবান এবং হৃদয় তাজা থাকলেই লেখা সম্ভব। সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হতে পেরেছিলেন। কেননা তিনি কবি হলেও প্রত্যেকদিন ভোরবেলা ছাদে গিয়ে পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি প্র্যাকটিস করতেন,

যোগব্যায়াম করতেন। দেহকে দুর্বল করে মনকে সবল করা যায় না। আর কি কোনো ভারতীয় কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন? পাননি, কেননা দেহচর্চা ও মননচর্চার মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সবল শরীর সুস্থ মানসিকতার আধার, বলিষ্ঠ কল্পনার জনক। তাই দেশের ব্যায়ামাগারগুলি জাতীয় সম্পদ।" এই বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ বলার পরে হঠাৎ ডাঃ ব্যানার্জি সভাপতি মশাই কাশলেন। আর তক্ষুনি ম্যাজিকের মতো সুরজিৎদার মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথি! তাই তো! সঙ্গে সঙ্গে কনফিডেন্সের প্রত্যাবর্তন—"রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলবার একাধিক কারণ ছিল। কবিগুরু কেবল কবিতাই লিখতেন না, দুঃখী, অসহায়, আর্ত মানুষের ত্রাণে তিনি চিকিৎসক হয়েও এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি স্বহস্তে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের হোমিওপ্যাথি এবং বায়োকেমিক ওষুধ দিতেন। এভাবে তিনি কত রোগীই যে আরোগ্য করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। অতএব আমরা দেখছি যুগে যুগে পণ্ডিতরাই হোমিওপ্যাথির প্রকৃত গুণাগুণ চিনেছেন। তাঁদের চিকিৎসায় নিশ্চয় জ্ঞান, বুদ্ধি, বিশ্বাস, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জগৎকে আন্তর্জাতিক সংহতির পথ দেখিয়েছে। ইংলণ্ডের লোক হলেও হানিম্যান (অডিয়েন্স থেকে পাপিয়াবৌদি চেঁচালেন—'জার্মানীর! জার্মানীর!') সাহেব জার্মানী থেকে—"

সুরজিৎদা একটু ঘাবড়ে গেলেন দেখে বৌদি প্রম্পট করলেন, "আমেরিকা থেকে, আমেরিকা!" অমনি সুরজিৎদা শুরু করলেন: "জার্মানীর হানিম্যান অ্যামেরিকা থেকে যে ওষুধের প্রচার করলেন; আজ প্রায় দেড়শো বৎসর ধরে ভারতবর্ষে তা নিরলসভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই গরিব দেশের অর্থনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার, বিশ্বাস, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা, মানত-মানসিক, যোগবলে, রোগবিয়োগের সঙ্গে হোমিওপ্যাথি সত্যি অতি চমৎকারভাবেই খাপ খেয়ে গেছে।" এতদূর বলেই সুরজিৎদা ভাবলেন এবার মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের দিকে চলে যাওয়া উচিত।—"হোমিওপ্যাথি ওষুধের আরেকটা বিরাট গুণ, তার দাম বেশি নয়। আজকের এই অর্থনৈতিক মহাসংকটের দিনে, জীবন মানেই যখন জীবনসংগ্রাম, রুইমাছের দর ত্রিশ টাকা, চিংড়ি চল্লিশ, ট্যাংরা পর্যন্ত পঁচিশ টাকা, মানুষ খাবেই বা কী, পরবেই বা কী? বাঙালীজাতি ভাতে-মাছে মানুষ, মাছ তো ছোঁয়াই যায় না, ছুঁলেও তেলে ছাড়া অসম্ভব। তেলের দাম যে-রেটে বাড়ছে! বাড়ছে শাকসবজি, মশলাপাতি, সাবান, মাজন, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর দাম, বাড়ছে জর্দা সিগারেট দেশলাই কেরোসিনের দাম, সরকারী দুধের পর্যন্ত দাম বেড়ে যাচ্ছে, আর শিশুর খাদ্য! শিশুর টিনের দুধ বেবিফুড স্ক্যানডালের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। এই মূল্যবৃদ্ধি অহেতুক, এই মূল্যবৃদ্ধি রুখতে না পারলে কালোবাজারীদের কালো হাত রোখা যাবে না। এবং দেশের উন্নতির পথে চিরন্তন অন্তরায় সরানো যাবে না। আসুন, আজ আমরা এই শুভদিনে সবাই মিলে শপথ গ্রহণ করি, যেমন করে পারি এই অহেতুক অগ্নিমূল্য

রোধ করবই (এখানে চটাপট প্রচুর হাততালি পড়ল)! এমনকী লাইফসেভিং ড্রাগসের পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি আর কালোবাজারী চলছে, হোমিওপ্যাথি সেদিক থেকেও রক্ষে, লাইফসেভিং ড্রাগ বলে আলাদা তার কোনো ওষুধ নেই, তাইজন্যই সেগুলি হঠাৎ হঠাৎ বাজার থেকে উধাও হয় না—”

এখানে সভাপতি হঠাৎ গলা খাঁকারি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরজিৎদাও সুর পালটে নিলেন—“এই যে প্রাত্যহিক নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েই চলেছে—অন্নবস্ত্র, জমিজমা, সিনেমার টিকিট, ট্রেন-ট্রাম-বাসের ভাড়া, বাড়িভাড়া, ওষুধের দাম (আই মীন অ্যালোপ্যাথিক), পাঠ্যপুস্তক, শারদীয় সংখ্যা, যা কিছু অপরিহার্য বাঁচার জন্যে স-ব।—এই অযৌক্তিক অপ্রাকৃত অন্যায় রোধ করার জন্য আজ যে ধরনের কঠিন মহৎ শক্তিধর মানুষদের থাকা দরকার ছিল, এদেশে আর তেমন কেউ নেই। দেশের বিরাট পুরুষরা আজ কোথায়? কোথায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, কোথায় মহানায়ক উত্তমকুমার, কোথায় মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ? (বিশাল হাততালি পড়ল)। আজ যদি মহানায়ক উত্তমকুমার বেঁচে থাকতেন, তাহলে, তাহলে আজকের এই সভাতে হয়তো আমার বদলে আপনারা তাঁকেই দেখতে পেতেন। তিনি ছিলেন নিরভিমান নিছক ভালোমানুষ, নিরহংকার, নিঃশব্দ দেশপ্রেমিক। কত মানুষকেই যে তিনি নিঃশব্দে নীরবে অর্থ সাহায্য করেছেন, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি তা জানে। কত যে এই ধবনের ব্যায়ামাগারেও তাঁর অকৃপণ দান ছিল, ভবানীপুর পাড়া তা জানে। তিনি নিজেও নিয়মিত দেহচর্চা করতেন বেলভিউ ক্লিনিকে গিয়ে। যোগব্যায়াম করতেন। তাই তো তাঁর ওই মধুর মোহিনী হাসিটি, ওই চিরতারুণ্য বজায় ছিল ষাট বৎসর বয়সেও। কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর মৃত্যুর করাল গ্রাস তাঁকেও রেহাই দেয়নি! সঙ্গে সঙ্গে মুছে নিয়ে গেছে আমাদের আশা-আনন্দ, চোখের আলো, হৃদয়ের জ্যোতি। ‘তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো’ বলে আমরা আজ কাঁদছি।” (এখানেও প্রবল হাততালি)। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সুরজিৎদা নবোদ্যমে আবার শুরু করবেন, হঠাৎ দেখলেন মাঠে পাপিয়াবৌদি ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন, আর ঠোঁট গোল করে করে বলছেন—“চল্লিশ মি-নি-ট—”, ফলে সুরজিৎদা পাকা বক্তৃতাবাজদের মতোই বাক্য শুরু করলেন—“কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। আয়ু ফুরোলে আমরা কাউকে আটকাতে পারি না, কিন্তু জীবনকে দীর্ঘায়ত করতে পারি। ব্যায়াম চর্চা, আগেই বলেছি কেবলমাত্র পেশীকেই সবল করে না, দেয় সুস্থ মগজ, সবল মানসিকতা, তাজা হৃদয়বৃত্তিও। তাই তো বলি, জয়মাকালী বডি বিলডারস অ্যাসোসিয়েশন আজ যা করছেন, যেভাবে দেশের সেবা করছেন, তা তো কেবলমাত্র বডি বিলডিংই নয়, তাকে আমি বলবো নেশন বিলডিংয়ের কাজ। তাঁরা গড়ে তুলছেন সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ (এখানে প্রচণ্ড হাততালি) দেহ-মন-চরিত্র।”

এবার ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, মহাকবি, মহাযোগী, মহানায়ক ও হানিম্যান সাহেবকে প্রণতি জানিয়ে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার শপথ আরেকবার স্মরণ

করিয়ে দিয়ে নমস্কার করে বসে পড়লেন প্রধান অতিথি সুরজিৎদা। নেহাৎ মাঠ, তাই। "হল" হলে ফেটে যেত এমন হাততালি পড়ল। পাপিয়াবৌদির, বান্টি-বুলটুর মুখ গৌরবে উদ্ভাসিত। গলার কাছে মেরুন কাজকরা সাদা পাঞ্জাবি পাজামা পরা একটি ছেলে এসে টেবিলের হারমোনিয়াম নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা গান ধরল মহানায়ক উত্তমকুমারের মৃত্যুজয়ন্তীর উদ্দেশে—"ইস ধরতীপর ঘোর অন্ধেরা—" বলে। আরেকটি নীল পাঞ্জাবি সাদা পাজামা পরা তারই মতো ছেলে দাঁড়িয়ে তবলা বাজাল। বেশ গাইল বটে. কিন্তু বেশি লোক ছিল না। শতরঞ্চি প্রায় খালি—রোদ চড়া হয়েছে। শুধু কয়েকটি উলঙ্গ বাচ্চা শতরঞ্চিতে এদিক ওদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে। চেয়ারে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবৃন্দ অবিশ্যি সকলেই গম্ভীর মুখে তখনো স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। এই সম্ভ্রান্ত অনুষ্ঠানের সম্ভ্রম রক্ষায় তাঁরা বিলক্ষণ অভ্যস্ত। এবার ডক্টর ব্যানার্জি সভাপতির অভিভাষণ (লিখিত) পড়লেন। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। এবার তো সভা শেষ। খাওয়া-দাওয়াটা এবারেই হবে নিশ্চয়। ভাষণান্তে সমাপ্তি সঙ্গীত হলো, "জনগণ", তখন সকলের মুখে আন্তরিক আহ্লাদ। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী মুক্তি পেলে যেমনভাবে হাঁটে তেমনি পায়ে সুরজিৎদা মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। গাঁদাফুলের মালাটা আনতে ভুললেন না। তাঁর প্রথম প্রধান আতিথ্যের অমূল্য স্মৃতির সঞ্চয়। বৌদিও উঠে এসেছেন, বান্টি আর বুলটুর মুখে আসন্ন বায়নাক্কার মেঘ জমতে শুরু করেছে—সকলেরই খিদে পেয়েছে খুব। ফাংশন দশটায় ছিল, আটটার আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে রেডি ছিলেন সবাই. দেড়টা বেজে গেছে. প্রায় দুটো বাজে। ভাগ্যিস রসগোল্লা সিঙ্গাড়াগুলো সময়মতো পেটে পড়েছিল। এখন খাওন-দাওনটা কোনদিকে যে হবে—সুরজিৎদা চারদিকে তাকিয়ে তেমন ধরনের কোনো লক্ষণই দেখতে পেলেন না। ধু ধু মাঠ। ভাত মাংস, কি মাছের ঝোলের গন্ধ হাওয়ায় নেই, শুধুই পাকা ধানের গন্ধ। শীতের শুকনো বাতাস।

পাপিয়াবৌদি এদিকে ওদিকে তাকিয়ে অনিশ্চিত গলায় বলেই ফেললেন—"তাহলে—মিত্তিরমশাই—বেলা দুটো বাজে যে?"

মানিক মিত্তির যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। হন্তদন্ত হয়ে তিনি সুরজিৎদার দিকে এগিয়ে এলেন. ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—"চলুন স্যার. চলো বউমা, বড্ডই বেলা হয়ে গেল, ছেলেমেয়েগুলোর সত্যি খিদেয় মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে"—অমনি ব্যায়ামাগারের সব ছেলেরাও হাজির—"থ্যাংকিউ স্যার, থ্যাংকিউ, দাঅরুণ বোলেছেন কিন্তু দাদা, ফাটিয়ে দিয়েছেন এক্কেবারে—চার চারটে আইটেমকে এমন ফাইনভাবে একসঙ্গে গেঁথেছেন না? এ কোনো কবি সাহিত্যিকের কম্মো ছিল না! এ কেবল জার্নালিস্টেই পারে—অনেক ধন্যবাদ দাদা, আবার ডাকলে আসবেন তো? এই জো এদিকে, বৌদি, আপনাদের চম্পাহাটি যাবার গাড়ি এসে গেছে।" শূন্য রিকশার কনভয় সামনে। দেখেই হঠাৎ সুরজিৎদার মাথায় একটা চকিত বুদ্ধি খেলে গেল। এরা তাহলে দুপুরে খাওয়াচ্ছে না, সন্দেহ নেই।—"তোমরা আবার

কষ্ট করে সেই চম্পাহাটি যাবে কেন ভাই? তার চেয়ে এদের রিকশভাড়াটা বরং এখানেই আগাম মিটিয়ে দাও, আর আমাকে রেলভাড়াটা আর ঢাকুরিয়ার রিকশভাড়াটা দিয়ে দাও—আমি, মিত্তিরমশাই—আমরা নিজেরাই চলে যাব। এই দুপুরে আবার কলকাতা যাতায়াতে অনেক সময় লেগে যাবে, তোমাদেরও নাওয়া খাওয়ার প্রচুর দেরি হয়ে যাবে, তার চেয়ে—"

ছেলেরা একটুখানি পরামর্শ করে নিয়ে সুরজিৎদার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। "আপনি যদি কিছু না মনে করেন স্যার, তাহলে এই পনেরোটা টাকা রাখুন, রেলভাড়া, আর ওপারের রিকশাভাড়া, এদেরটা এখানেই দিয়ে দিচ্ছি আর এই মিষ্টিটুকুন নিয়ে যান বৌদি, গাড়িতে খাবেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে—" বলে একটা তেলতেলে কাগজের বাক্সও ধরিয়ে দিলে ওরা পাপিয়াবৌদির হাতে। এবারে একটা রিকশা কম নেওয়া হলো। একটাতে সুরজিৎদা আর মিত্তিরমশাই, অন্যটায় বৌদি, বাচ্চাদের নিয়ে। বাচ্চারা এক্ষুণি মিষ্টির বাক্স খুলতে চায়। মাথার ওপর গনগনে রোদ্দুর। শীতকাল, তাই রক্ষে। এখন যে কোন হিসেবে রবীন্দ্রসপ্তাহ হয় তা ঈশ্বরই জানেন। তবে হ্যাঁ, ছেলেগুলি ভালো। অযত্ন করেনি। বৌদি আর বাচ্চাদের শীতকালেও ডাবের জল খাবার ইচ্ছে হয়েছিল, অর্থাৎ তেষ্টা পেয়েছিল। ওখানের পুকুরের জমা জলে কতরকমের বীজাণু কে জানে? ডাব সর্বদাই বীজাণুমুক্ত পানীয়। বৌদি বুদ্ধি করে চাইতেই ছেলেরা তক্ষুণি ডাব এনে দিয়েছিল। বৌদির তেমন খারাপ লাগেনি ছেলেদের। কেবল ওই লাঞ্চের ব্যাপারটাই যা এখন—দুপুরের খাওয়াটার ব্যবস্থা তো করে আসেননি বাড়িতে! বান্টি-বুলটু একটু হতাশ। আউটিং অথচ পিকনিকই হলো না, শুধুই বক্তৃতা হলো, এ আবার কী! তখন ও-রিকশায় মানিক মিত্তির বলছেন —"ছেলেরা দারুণ ইমপ্রেসড আপনার গভীর জ্ঞানের পরিধি দেখে। কত বিষয়েই যে আপনি জানেন। কত সহজেই যে লিংক-আপ করলেন এতগুলো বিচিত্র বিস্ময়, সত্যি মার্ভেলাস হয়েছে—কী উবগারটাই যে আপনি করলেন সত্যি সুরজিৎবাবু, বড্ড সামলে দিয়েছেন—"

আর সুরজিৎদা? সুরজিৎদার কোলে গাঁদাফুলের মালা, মুখে মৃদুহাস্য। মনে মনে তিনি ভাবছেন—"মন্দ কি? এই ক্যানিং-লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে তো টিকিট কাটতে হয় না। সে খরচ নেই। ঢাকুরিয়া স্টেশনে নেবেই দশ-বারো টাকার দিব্যি হিঙের কচুরি ভেজিটেবল চপ খেয়ে নেবো সবাই মিলে, দুটো রিকশার জন্যে তিন টাকা রেখে দিয়ে, নট ব্যাড! যথা লাভ! প্রধান অতিথি বলে কথা! কে জানে এটাই এক দীর্ঘ কেরিয়ারের শুরু কিনা?"

নবকল্লোল, পৌষ ১৩৯১

ভালোবাসা কারে কয়

জগতে যতই অপ্রেম বাড়ছে প্রেম নিয়ে বাড়াবাড়ি ততই বাড়বাড়ন্ত। 'প্রেম' এখন খুবই টপিকাল বিষয়। প্রায় 'সতী' কিংবা 'বধূহত্যার' মতোই। হয়তো পরস্পরের মধ্যে যোগও থাকতে পারে। 'প্রেমসংখ্যা' বেরুচ্ছে পত্রপত্রিকায়। বিশ্বপ্রেম ছড়িয়ে পড়ছে পেরেস্ত্রয়িকায়। বোফর্স কেলেংকারি মেটাতে না পারুন রাজীব গান্ধী দিল্লি-বোম্বাইতে দু'জোড়া প্রেমে তাপ্পি লাগিয়ে দিয়েছেন। রাজারাজড়ার ছেলেমেয়েরাও গরিবগুরবোদের মতোই ঝপাঝপ প্রেমে পড়ে যাচ্ছেন, কাশ্মীরের সঙ্গে যেমন গোয়ালিয়র। "তরুণ বিপ্লবী মুখ্যমন্ত্রী" প্রেমের ম্যাজিকে "তরুণ সংসারী মুখ্যমন্ত্রী" হয়ে নাড়ু খাওয়াচ্ছেন নিমন্ত্রিতদের। যেদিকে তাকাই প্রেমের ছড়াছড়ি। খবরের কাগজে প্রেম, দূরদর্শনে প্রেম। চিত্রহারে প্রেম, চিত্রমালায় প্রেম। যাত্রা থিয়েটারে প্রেম, পানমশালায় প্রেম, বিড়ি সিগারেটে প্রেম, লোহার আলমারিতে প্রেম, মশার ধূপে প্রেম, এমনকি গেঞ্জি আণ্ডারওয়্যারেও প্রেম। প্রেম বিনে বিজ্ঞাপন নেই। প্রেমের অথই বন্যায় ভাসতে ভাসতে আমরা মানিব্যাগ সামলাচ্ছি। এত প্রেম দশদিকে, অথচ যেই একজন সম্পাদক আমাকে একটি প্রেমবিষয়ক নিবন্ধ লিখতে আদেশ করলেন, আমার মনে হলো, জগৎ আলোবাতাস শূন্য হয়ে যাচ্ছে। প্রেম বিষয়টি সরল নয়, জটিল। প্রেম বিষয়টি খোলাখুলি ঢালাও আলোচনারও নয়, চুপচাপ, ফিসফাসেই তার শোভা। এখন যেন সবকিছুই কেমন খোলামেলা হয়ে যাচ্ছে। আদুড়-গা যেমন ফ্যাশন হচ্ছে, আদুড় মনপ্রাণও তেমনি যুগের ধর্ম হয়ে উঠছে। এরপর জগতে প্রেম বেচারী টিঁকবে কোথায়? সে বাঁচবে কেমন করে? তার একটু ছায়া চাই যে, একটু আড়াল চাই. একটু আঁধার, সে যে বিজন বিলাসী। প্রেমের নিবন্ধ? আমার তো মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। প্রেম বিষয়টিকে কাগজেকলমে আমি, যতদূর সাধ্য পরিহার করে চলি। প্রেমের মূলতত্ত্বই হলো, যা বালকেও বোঝে, শতং বদ, মা বলো। আর বলাই বাহুল্য কদাচ মা লিখ। অথচ সম্পাদকরা ঠিক সেটাই করিয়ে নেন।

শেষটা আমার মনে হলো, চ্যালেঞ্জটা ছাড়বো কেন? নিয়েই নিই। প্রেম বিষয়ে তিন পুরুষের জ্ঞানসঞ্চয় করে ফেলতে হবে—সম্পাদক বলেছেন তিন প্রজন্মে প্রেমের বিবর্তন নিয়ে প্রবন্ধ চাই। এও বলেছেন. ইচ্ছে করলে নিজদেরই পরিবারের তিন প্রজন্মের প্রেমকথা লিখতে পারি। হ্যাঁ, বাবা-মায়ের প্রচণ্ড প্রেম-বিবাহ হয়েছিল বটে সেকালে। সংবাদপত্রে দারুণ দামামা বেজেছিল। দাদু-দিদিমার, ঠাকুর্দা-ঠাকুমার প্রেমজ বিবাহ নয়, কিন্তু বিবাহজ প্রেমে শুনি দুই দম্পতিই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আমার নিজের বিবাহটাও অবিশ্যি বেশ ঘনঘটার, "প্রেমের-বিয়েই" হয়েছিল, কিন্তু শেষ দৃশ্যে কিঞ্চিৎ লঘুক্রিয়া হয়ে গেছে। ওটা

নিয়ে আর ঢাক পেটানোর কিছু নেই। তবে আমার প্রজন্মের অন্য অনেকেরই অটুট, অমোঘ, অবিরল প্রেমের উদাহরণ আমার সামনে। হাতের ওপর হাত রেখে চলার অসহজ কর্মটি যাঁরা খুব সহজভাবেই করে চলেছেন। কিন্তু আমার পরের প্রজন্মটাই ঝামেলা করেছে। আমার মেয়েদের প্রেমজ বিবাহ বা বিবাহজ প্রেম কোনোটাই এখনও হয়নি, ফলে ওদের যুগচরিত্রটা ঠিকমতো আমার নজরে আসেনি এখনও। তাঁদের বধিবেন যাঁরা, তাঁদের কে যে এখন কোন গোকুলে বর্ধমান তা কি আমি জানি? না তাঁরাই জানেন?

কিন্তু আমেরিকা থেকে আমি একটা জরুরি কথা শিখে এসেছি: 'নো প্রবলেম'। কোনো সমস্যা নেই। সেইমতো কোমর বেঁধে নেমে পড়লুম ফিলডে। নো প্রবলেম। বাড়িতে যেই মেয়ের বন্ধুবান্ধব কেউ বেড়াতে আসবে, তক্কে তক্কে থেকে, ক্যাঁক করে চেপে ধরলেই হলো। তাদের প্রজন্মের কথা তাদের মুখেই শোনা যাবে। এবং সেটাই হবে নির্ভরযোগ্য তথ্য।

আমার পূর্বপ্রজন্মের কাছে তথ্য সংগ্রহের আশায় 'বাংলার ব্রাউনিং দম্পতির' কপোত-কপোতীর অবশিষ্ট অঙ্গ, কপোতীকে, অর্থাৎ আমার গর্ভধারিণীকে ধরেছিলুম। মা বললেন—"প্রেম শুধুই দেয়। চায় না কিছুই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ। দুয়ের বেলাই এক। দিয়েই আনন্দ। প্রেমকে বিনষ্ট করতে হলে বিয়েটা করে ফেলা উচিত। সংসারের গরম বাতাসে রোমান্টিক প্রেমের সুকুমার তন্তুগুলি শুকিয়ে যায়। খসে পড়ে প্রেমের লজ্জাবস্ত্র। কেবল প্রেমহীন কর্তব্যের হিশেব-নিকেশ, সামাজিক চুক্তির দেনাপাওনার জাবদা খাতা নিয়ে খাড়া থাকে বিবাহের দরোয়ান।—প্রেমকে যদি ধরে রাখতে চাও, বিয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যেও না। একটু দূরত্ব ভালো। স্বার্থহীন না হলে প্রেম থাকে না। বিয়ে মানেই স্বার্থ। দুটো পরস্পর বিরোধী। রাধা কি শ্যামের বউ ছিলেন? ছিলেন না। থাকতে পারেন না।"

ও বাবা! এ তো ভীষণ মডার্ন! এর চেয়ে আর আলাদা কী বলবে পরবর্তী প্রজন্ম? তবু বড় মেয়েকে গিয়ে ধরলুম। কলেজে পড়ছে। তরুণ-তরুণীরা এ বাড়িতে স্রোতের মতো আসে-যায়। ও জানবে।

"ধ্যাৎ তেরি।" মেয়ে তেড়ে এলেন।—"পারোও বটে মা তোমরা! আচ্ছা একটা জেনারেশন বটে! উপন্যাসে, গল্পে, যাত্রায়, সিনেমায়, কবিতায়, গানে—এতদিন কেবলই প্রেম চলছিল। এবারে প্রবন্ধেও প্রেমের প্রবেশ? সর্বনাশ করেছে। বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা?" কচি মুখখানিকে সাধ্যমতো গোমড়া করে কন্যা বলেন —"জীবনে, জগতে, কতোকিছুই রোজ ঘটে চলেছে মা, যা প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। সেইসব নিয়ে লিখলে পারো না? আমার অন্য কাজকর্ম রয়েছে, আমি যাই। তুমি বসে বসে প্রেম নিয়ে ভাবো।" বকুনি খেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

যা বাবা। তাহলে এটাই এই জেনারেশনের অভিমত? প্রেম তুচ্ছতাচ্ছিল্যের

জিনিস? ভাবনাচিন্তারও যুগ্যি নয়? নাকি আরো অন্য মতামত, ভিন্নরুচির তরুণ-তরুণীও আছে? পড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে, তরুণ-তরুণীদের সঙ্গেই আমার চব্বিশ ঘণ্টা ওঠাবসা। কিন্তু সে তো বাইরে থেকে চেনা। চোখে যা দেখি, তাতে তো হামেশাই তাদের হাবভাব, চাউনি, অনেকটা প্রেমের মতোই দেখায়। সেসব কি তাহলে আমার চোখের ভুল? বা বোঝার ভুল? সেসব কি তাহলে প্রেম নয়, অন্য কিছু? সন্তোষকুমার ঘোষের সেই 'কবিতা' নয়, কিন্তু 'কবিতার প্রায়' যেমন, তেমনি এও কি ঠিক 'প্রেম' নয়, কিন্তু 'প্রেমের প্রায়' কোনো সম্পর্ক? কিন্তু যাই হোক, খোলসা করে বলবে তো কেউ আমাকে? একটা জিনিস বুঝেছি। আমাদের জেনারেশনেই স্ত্রী-পুরুষে 'বন্ধুত্ব' শুরু হয়েছিল। ছেলে-মেয়ে জুটি মানেই প্রেমিক-প্রেমিকা নয়। স্রেফ বন্ধু হতেই পারে। কিম্বা রাজনৈতিক সহকর্মী। কিম্বা ফটোগ্রাফি ক্লাব। মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব। ফিল্ম সোসাইটি। কত রকমের 'কমন ইন্টারেস্টের' জন্য একসঙ্গে ঘোরে ছেলেমেয়েরা। দেখে কি বোঝা যায়?

এইরকম ভাবনাচিন্তা করছি, এই সময়ে হঠাৎ আমার এক প্রাচীন সহকর্মী উত্তেজিত হয়ে এসে জানালেন ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস নেবার সময়ে বাইরের করিডরে গীটার বাজিয়ে এমনই "জুলি আই লাভ ইউ" গান হতে লাগলো যে তাঁর সন্দেহ হলো ক্লাসেই হয়তো জুলি বলে কেউ থাকতে পারে। "জুলি বলে কেউ কি আছো? তাহলে বাইরে গিয়ে কথাটা সেরে এসো"—বলতে, জুলিয়েট ডিসুজা বলে গোয়ার মেয়েটি কাঁদোকাঁদো মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি ওকে সত্যি সত্যি চিনি না স্যার! আমি নতুন মেয়ে, সবে ভর্তি হয়েছি!" তখন মাস্টারমশাই উঁকি মেরে ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলেন। চেনা ছেলে স্বরূপ সরখেল। জিভ কেটে, "এই যে স্যর, গুড মর্নিং" বললে সে গীটার নামিয়ে, ডান হাতে সেলাম করে। পিছু পিছু বেরিয়ে এসে জুলিয়েট বললে—"আপনি কি আমাকে দাদার মতো ভালোবাসতে পারেন না? আমার সত্যিই কোনো দাদা নেই—বাট আই ডু হ্যাভ আ বয়ফ্রেণ্ড অ্যাট হোম।" স্বরূপ হাস্যবদনে বললে—"হোয়াট আ শেম! কুছ পরোয়া নেই, সিস্টার! এভরিথিং উইল বি অলরাইট!" তারপর পিড়িং পিড়িং করে বাজাতে বাজাতে অন্যদিকে চলে গেল। আমার সহকর্মী রীতিমতো বিচলিত। "এসব কী কাণ্ড বলুন তো?" বাড়িতে এসে মেয়েকে বললুম।—"এসব কী হচ্ছে তোদের?"—"ওঃ স্বরূপ? স্বরূপের কথা বাদ দাও। ও একটা পাগলা। সেদিন দেখলুম করিডরে চেঁচাচ্ছে: 'ওরে ববি, ববি রে আমার, স্যান্সক্রিটের ঐ মেয়েটার নাম কী যেন?'—'মন্দাক্রান্তা?' ববি বলে দিল।—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিমেমবার—ওকে প্লীজ একটু প্রক্সি দিয়ে দে না? আমি জিওলজির মেয়েটাকে একটু অ্যাটেনড করেই আসছি—ওকে বল—' " —"কি আশ্চর্য!" আমি বাকরুদ্ধ। "আশ্চর্য কিছুই নয়। স্বরূপের ছ'টা গার্লফ্রেণ্ড। ওপন সিক্রেট। সবাই হাসে। আর প্রশ্রয় দেয়। স্বরূপ ছ'জনকেই বাই টার্ন সিনেমা দেখায়, আইসক্রিম খাওয়ায়। এই তো? আপত্তির কী আছে? লুকিয়ে

চুরিয়ে তো কিছু করেনি। সবাইকে জানিয়ে শুনিয়েই ডেটগুলো ফিক্স করে। হি মীনস নো হার্ম। সবাই সেটা বোঝে।"

"তাহলে প্রেমটা করে কার সঙ্গে?"

"প্রেম আবার কি? মোটেই প্রেম নয়।"

"তাহলে বিয়ে? বিয়েটা করবে কাকে? ছ'টা মেয়ের মধ্যে?"

"এরা কেউই স্বরূপ পাগলাকে বিয়ে করবে নাকি? মেয়েগুলোর কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই? দে আর হ্যাভিং ফান। ওর মোবাইকে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। ছ'জনেই ছ'জনকে চেনে। নো ওয়ান কেয়রস ফর হিম।"

"সে কি রে? মেয়েগুলোও এমনি হয়েছে আজকাল?"

"হবে না কেন? তাদের কেরিয়ার নেই? প্রেম করলেই চলবে? স্বরূপ যদি ভালো পাত্র হতো তাহলে অবশ্য অন্য কথা। তাহলে হয়তো একটু প্রবলেম হতো, হয়তো কেউ কেউ সিরিয়াসলি ভবিষ্যতের কথা ভাবতো, কিন্তু অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স, স্বরূপও সিরিয়াস নয়, ওরাও নয়। যে-যার মা-বাবার পছন্দ-করা বর-বউদেরই বিয়ে করবে বোধহয়। আমরা সবাই যে চালু পার্টি মা। আজকাল কেউ আর তোমাদের মতো বোকা নেই।" কেউ আর আমাদের মতো বোকা নেই শুনে তো আমার খুব দুশ্চিন্তা হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী? বেশিরভাগ জোড়া-কে দেখে তো মনে হয় প্রেমিক-প্রেমিকাই? অবশ্য অনেক সময় যে উল্টোও হয় না, তাও নয়। দিব্যি হাবভাব দেখে এবং কথাবার্তা শুনে মনে হয় দুটি ভাইবোন, অথচ আসলে তারা কিন্তু ডিক্লেয়ার্ড, রেজিস্টার্ড প্রেমিক-প্রেমিকা। এমন জুটি অন্তত আধ ডজন তো ভালোভাবেই চিনি যারা বিয়েও করে ফেলেছে, আজও তুই-তোকারি চালায়। আরও একজনকে জানি, যারা বিয়ে করেনি অথচ মনে হয়েছিল, করলো-বলে। অতএব এই প্রজন্ম বড়ই প্রহেলিকাময়। কে যে কার সঙ্গে কখন প্রেমের দ্বারা যুক্ত, তা হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত। বন্ধুদলের অন্তরঙ্গ সদস্যরাই একমাত্র জানে। দৃশ্যত সকলেই সমান। 'একত্রে ঘোরাঘুরি' ছাড়াও আমাদের সময়ে কিছু টেল-টেল সাইনস ছিল। 'তুই' বা 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে সরে আসা তার মধ্যে প্রধান লক্ষণ বলে পরিগণিত হতো। এখন ওটাও মুছে গেছে। 'আপনি' মানেই যেমন শ্রদ্ধা-সম্মান দেখানো নয়, 'তুমি'ও তেমনি অন্তরঙ্গতার পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করে না। আবার 'তুই' মানেই নয় ভাই-বোনের অনাবিল প্রীতি। আর প্রেম মানেই নয় বিবাহ। আমাদের সময়ে একটা কুকথা ছিল, "প্রেম করবো যেথা সেথায়, বিয়ে করবো বাপের কথায়।" কেবল বদ ছেলেরাই ঐ পন্থা অবলম্বন করে থাকে, এমনতর ধারণাও চালু ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে কি ছেলে কি মেয়ে এটা অনেকেরই স্বাভাবিক কর্মপন্থা, প্রেম করাটা মোটে 'প্রেম'ই নয়, একরকমের বিনোদন মাত্র। উত্তেজনায়, আনন্দে সময় কাটানোর সহজ উপায়। "হ্যাভিং ফান।" ইংরিজি ইশকুল, বাংলা ইশকুল, যে-কোনো পটভূমি থেকে এসেই কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে এই ব্যাপারটি শিখে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা।

প্রেমে-পড়া নয়। প্রেম-করা। আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাব না। এঁদের এই প্রেম-করা মোটেই আমাদের সেই প্রেমে-পড়া নয়। এবং অবশ্যই নয় ইংরিজি 'লাভ-মেকিং'ও। একেবারে অন্য হালকাহালকা ব্যাপার। দিশি 'ফান'। মোটামুটি হার্মলেস। ইংরিজি ভাষাটা এই প্রেম-ভালোবাসার প্রসঙ্গে কিন্তু যারপরনাই দীনদরিদ্র। স্নেহমমতা, ভাব-ভালোবাসা, প্রেমকাম, সব এক। সব 'লাভ'। মা-বাবা, কুকুর-বেড়াল, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ঠাকুর-দেবতা সবার সঙ্গে সবার একটাই শব্দের সম্পর্ক। কী গরিব, কী গরিব ভাষা রে বাবা! আর ওরাই নাকি ডিভেলপড নেশন?

সে যাই হোক, সাহেবদের দৈন্য সাহেবরা বুঝুক, আমি প্রেম বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের অধীর পিপাসায় কর্মযজ্ঞে অবতীর্ণ হই। হাতে-কলমে অবশ্য এখনই নয়। প্রথমে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আগ্রহ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, সাক্ষাৎকারভিত্তিক, পরিচ্ছন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়। তবে হ্যাঁ, এলেবেলে হলে চলবে না। 'বিজনেস-লাইক' হওয়া দরকার। এই প্রজন্মটার মধ্যেই কেমন একটা 'বিজনেস-লাইক' ভাব আছে। কাঠখোট্টা, হিসেবী (কেমন-যেন)। এদের হ্যাণ্ডল করতে হলে এদের মতনই হতে হবে আমাকে। কাঠখোট্টা তো আছিই, কেবল হিশেবের ব্যাপারটায় কাঁচা। প্রথমে চাই সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু।—প্রেম। তারপর প্রশ্নমালা। ওটা বরং একটু খোলামেলাই থাকুক। বাঁধাধরা লিখিত প্রশ্নমালা বড্ড বোরিং। এবার স্থানকালপাত্র ঠিক করে নিতে হবে।

স্থান, এই বাড়ি। কাল, যে-কোনো ছুটির দিন। পাত্র, আমার কন্যার বন্ধুর স্রোতের মধ্যে যে সামনে পড়বে সে-ই। ছুটির দিনে ডজনে ডজনে আসে তারা। তাদের খালি-করা চায়ের কাপে ঘরবাড়ি ছেয়ে যায়।

যেই না রবিবার আসা অমনি আমিও রেডি। ভোরে উঠে স্নান করে খাতা বগলে ঘাপটি মেরে কলিংবেলের অপেক্ষায় কান পেতে রই। দুরুদুরু বক্ষ। কৃষ্ণের বাঁশির জন্য শ্রীরাধিকার আকুল প্রতীক্ষাও এই আমার কাছে তুশ্চু! নিজেই গোলমালটা স্বয়ং পাকিয়েছি। পিকোর পরীক্ষার জন্য ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ করে বন্ধুদের মার-মার-কাট-কাট শব্দে তাড়িয়েছি ক'দিন যাবৎ। বন্ধুর ফ্লোটা তাই একটু কমে গেছে। আহা তখন কি ছাই জানতুম, যে...?

তবে আজ ছুটির দিন। আজ নিশ্চয়ই আসবে ওর রেজিমেন্ট। কিন্তু কই? বেল তো বাজছে না? এমন সময়ে...বাজিল কাহার বীণা?

অবশেষে বেল বেজে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে, "পিকো আছে?" শোনবামাত্র আমার অন্তরাত্মায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। এই তো সে! এসে গেছে। পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি! এক্ষুনি চেপে ধরতে হবে। যেন ফসকে না যায়।

"কে? টুবলু? আয় বাবা আয়। হ্যাঁ, আছে পিকো। তা টুবলু, তুই প্রেম নিয়ে ইদানীং কী ভাবছিস?"

টুবলুর গোলগোল নাদুসনুদুস নধর মুখখানি যেন এক মিনিটে শুকিয়ে গেল।

খুবই চালাকচতুর চটপটে ছেলে সে, প্রাইজ পাওয়া ডিবেটর, সুন্দর বলিয়ে কইয়ে, ফূর্তিবাজ, আড্ডাবাজ, হাসিখুশি ছেলে। টুবলুর শুকনোমুখ কখনো দেখিনি। তাকে নিরুত্তরও দেখিনি কখনো। খানিক চুপ থাকার পরে শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে টুবলু বেশ আস্তে আস্তে কথা বলল। টুবলু বলল—"মানে, নবনীতাদি, আমি কিন্তু...পিকোর কাছে"...গলা বুজে এল তার। গলা ঝেড়ে নিয়ে টুবলু বলল—"আমি ঠিক পিকোর কাছে, সেভাবে...কোনোদিনই...মানে আপনি হয়তো ঠিক জানেন না আমাদের মধ্যে কিন্তু ঐসব, মানে একটুও কিন্তু,...ক্কীইই আশ্চর্জ!" টুবলু হঠাৎ চুপ করে গেল। যাকে বলে "চুপ মেরে যাওয়া" তাই। এবং টুবলুর উজ্জ্বল তরুণ মুখখানি বিষাদে স্পষ্টতই প্রাণশূন্য বিবর্ণ দেখালো। তারপর টুবলু আবার বললো—"প্লীজ! বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু কোনোদিনই পিকোর কাছে এইসব উদ্দেশ্যে—আমি ভাবতেই পারিনি...", এতক্ষণে আমার কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। হাঁহাঁ করে শুধরে নিই নিজের ভুল। যদিও হাসি আটকাতে পারি না।

"ওরে, নারে, তোর সঙ্গে যে পিকোর প্রেম হয়নি তা তুইও যেমন জানিস আমিও তেমনি জানি—"

তুচ্ছ বাক্য! কিন্তু কী বৈপ্লবিক তার শক্তি। মুহূর্তের মধ্যে টুবলুর অন্য ব্যক্তিত্ব এসে গেল। রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠলো সাগ্রহে—"শুধু আমি কেন? কারুর সঙ্গেই হয়নি! হবে কী করে? যা দজ্জাল কন্যাটি আপনার! বাপরে!"

"আহা! সে কথাও হচ্ছে না। কে কার সঙ্গে প্রেম করছে-না-করছে সেসব পার্সোনাল ডিটেইলস আমি চাইছি না, আমি জানতে চাই প্রেম বিষয়ে তোর ধারণাটা কী? জেনারেলি? ইন থিওরি? অ্যাজ আ মেম্বার অব ইওর জেনারেশন?"

ইতিমধ্যে সিঁড়ির বাঁকে পিকো অবতীর্ণ হয়ে সস্নেহে টুবলুকে জানালো—"মাকে প্রেম বিষয়ে আর্টিকেল না গল্প কী যেন লিখতে হবে অথচ সেই বিষয়ে মা কিছুই জানেন না। একবার দিম্মাকে, একবার আমাকে অসম্ভব বিরক্ত করছেন, ফর ইনফরমেশন, ফর ডেটা। তুই পারলে দু'একটা পয়েন্ট দিয়েই দে না বেচারীকে।" এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে টুবলুর অট্টহাস্য।

"প্রেম নিয়ে আর্টিকেল? আপনি?" যেন এর চেয়ে আজগুবি আর আবোলতাবোল জগতে কিছু হতেই পারে না। যেন আমার ত্রিভুবনে প্রেম নিয়ে কোনো অন্বেষণ থাকা অসম্ভব। হায় রে। যদি জানতিস! প্রেম বিষয়ে না হয় তাত্ত্বিক জ্ঞানটাই আমার কমসম, তা বলে প্রযুক্তিগত বিদ্যা কতটা, তা তো তোরা কেউ জানিস না? না হয় প্রেমের গল্পই আমি লিখি না, তা বলে কি প্রেমের গল্পরা আমার জীবনে ঘটে না? কিন্তু এ-সব কথা পত্রিকায় ছেপে না বলাই ভালো। কে আবার কী বুঝবে?

অতএব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ছোটো করে গর্জে উঠি—"অত হেসে কাজ নেই। কাজের কথাটা বল। প্রেম বিষয়ে তোর কী ধারণা?"

"ওহো, তাই তো, 'কাজের' কথাটা?" (টুবলু গলা খাঁকারি দেয়। আজকালকার ছেলেগুলো মহা শয়তান)—"ইয়ে, 'কাজের' কথাটাই তবে হয়ে যাক। অর্থাৎ প্রেম তো? প্রেম অতি ভয়ানক। অতীব ভয়াবহ বস্তু। বন্ধুবান্ধবরা প্রেম করা মানেই আমার ভয়ংকর খরচা বেড়ে যাওয়া। তাদের চা-অমলেটের জন্য সিনেমার টিকিটের জন্য ট্যাক্সিভাড়ার জন্য কেবলই ধার দিতে হয় (যেহেতু তাদের টিউশনি করার সময় থাকে না। আমি টিউশনি করি।) সেসব ধার কদাচ শোধ হয় না। তাছাড়া পড়াশুনোরও ভীষণ ক্ষতি হয়। বন্ধুরা এসে এসে অনবরত প্রেমের প্রগ্রেস রিপোর্ট শোনায়। বন্ধুরা জড়ো হয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের নোটস এক্সচেঞ্জ করে, রীতিমতো বুলেটিন বের করে, এবং আমার কাছে কেন জানি না, কেবলই উপদেশ চায়। সর্বদাই আর্জেন্ট পরামর্শ দরকার হয় তাদের। সবসময়েই একটা পিরিয়ড অফ এমার্জেন্সি চলে প্রেমে। আর আমার ভালো-লাগুক না-লাগুক খুব ধৈর্য ধরে সহানুভূতি নিয়ে সেইসব কাহিনী শুনতেই হয়। না শুনলে হয় হার্টলেস, নইলে হিংসুটে ভাববে। সাকসেসফুল প্রেমে কেস ততটা খারাপ হয় না আনসাকসেসফুলে যতটা। 'ব্যর্থ-প্রেম' হলে আর রক্ষে নেই। রাতের পর রাত সেও ঘুমোবে না, আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। জানালায় টোকা মেরে পায়ের বুড়ো আঙুল নেড়ে ঘুম তাড়িয়ে ঘরে ঢুকে এসে দুঃখের পাঁচালি শোনাবেই। সব বন্ধুই এক। আমার পড়াও শেষ। ঘুমও শেষ। পয়সা তো শেষ আগেই হয়েছিলো। বন্ধুরা প্রেম করল, আমি ফেল করলুম, এ তো কাজের কথা নয়? নাঃ নবনীতাদি, প্রেম ইজ ভেরি ডেনজারাস। ভেরি হার্মফুল টু সোসাইটি। আনপ্রডাকটিভ—এক্সেপ্ট ইন আ হার্মফুল বায়োলজিক্যাল ওয়ে। প্রেম বড়ই সর্বনেশে, বড়ই ভয়ানক। বন্ধুরা প্রেমে পড়লেই যদি এই অবস্থা হয়, তবে নিজে যদি প্রেমে পড়ি? তাহলে তো প্রাণেই মারা পড়বো? ওরে বাবারে। কী ভয়ংকর জিনিস! আই উইশ টু হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ ইট। পরে হবে। পাস-টাস করে গিয়ে।" দুটো করে সিঁড়ি টপকে ওপরে ছুটলো টুবলু, "পিকো!" "পিকো!" হাঁক দিতে দিতে।

টুবলু ওপরে গেছে। আমি ঘরে এসে নোট নিচ্ছি এমন সময়ে ফের বেল বাজবামাত্র আমার প্রাণে কী আনন্দ! রে! রে! করে ছুটে গেছি।

"কে রে? পিকোর বন্ধু নাকি রে? আয় আয়—"

"নবনীতা দেবসেন আছেন?" দূর! ভুল লোক? অসম্ভব বিরক্ত গলায় বলি, "আছে। কেন?"

"একটু দরকার ছিল। একটা পত্রিকা থেকে এসেছি।" অগত্যা, "ওপরে আসুন।" একটি অল্পবয়সী ছেলে। পিকোর বয়সীই হবে। গ্রাম থেকে কবিতার লিটলম্যাগ বের করে। দিতে এসেছে। অভিমত চায়। কবিতাও চায়। উল্টেপাল্টে দেখলুম, অনেক প্রেমের কবিতা আছে।

"তুমি যে প্রেমের কবিতা লেখো, নিজে প্রেমে পড়েছো?"

"আজ্ঞে?"

"তোমারই তো নাম বললে অমুকচন্দ্র তমুক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এটা তোমার লেখা তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে তো তুমি প্রেমে বিশ্বাসী?"

"আজ্ঞে?"

"তুমি তো প্রেমে বিশ্বাস করো দেখছি। এসব প্রেমের কবিতা তো তুমিই লিখেছো বললে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! ভালো হয়েছে?"

"তোমার সঙ্গে প্রেম নিয়ে একটু কথা বলতে চাই।"

"আজ্ঞে কী বললেন?"

"বলছি, প্রেমে পড়েছো তো? প্রেমের অভিজ্ঞতা বিষয়ে আমি তোমার মতামতটা চাইছি। মন খুলে বলো দিকিনি?"

"প্রে...প্রেমের...আমার মতামত? আজ্ঞে আমি ঠিক, ঠিক বুঝতে পারছি না!"

"আঃহা, এতে না-বোঝার কী আছে? আমি প্রেম বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করতে চাইছি। প্রেম বলতে তুমি কী বোঝো?"

"কী বুঝি? তার মানে?" ভয়ে তার মুখ শুকনো।

"তার মানেটাও বলে দিতে হবে? কবিতা তো দিব্যি লিখতে পেরেছো। আর প্রেম কী বস্তু বোঝো না? আমি তোমাকে বলে দেবো?"

"প্রেম? কী বস্তু? আপনি বলে দেবেন? আমাকে?"

"আরে, নাঃ। আমি নয়। তুমি, তুমি। তুমি বলবে। আমাকে। আহাঃ, এতে এত লজ্জা করবার কী আছে? আশ্চর্য! তোমার বয়েস কত?"

"আমার বয়েস কত? য্যাঃ। আপনার চাইতে অনেক কমই হবে। দিদি যে কী বলেন?" ছেলেটা কী বুঝলো কে জানে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তক্ষুনি—"আমি বরং আজ উঠি, দিদি। কবিতাটা পরে বরং কখনো এসে—", কোনোরকমে, যেন প্রাণটা হাতে করে পালিয়ে বাঁচবার মতন দৌড়ে নিচে নেমে গেল চব্বিশ পরগণার গ্রাম থেকে আসা তরুণ কবি সম্পাদক। কি ভয়ানক শহুরে কবিনীর পাল্লাতেই না পড়েছিল সে আজ। এমন জানলে আসে কখনও? রামোঃ!...এতক্ষণে সবটা সরল হলো। বেশ বুঝতে পারছি গ্রামে গিয়ে সে কী গল্প করবে।...

"প্রেমের আলোচনা করতে চাইছিল! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তবে কী আর বলছি? আমার সঙ্গেই। রসিয়ে রসিয়ে। কিছুতেই ছাড়বে না। ডবল বয়সী ভদ্রমহিলার লজ্জাশরম বলে কিছু নেই। আবার আমাকে বলছে, 'লজ্জা করবার কী আছে?' বলছে, 'মন খুলে বলো, প্রেম কী বস্তু!' এদিকে কেদারবদ্রী-কুম্ভমেলা লিখছে, পেটে পেটে এত? আমাকে একা বাড়িতে পেয়েই,...বলে, 'তোমার বয়েস কত?' মানুষ বড় আশ্চর্য হয়রে ভাই!"...বলে উদাস হয়ে যাবে। বলুকগে। তীর এখন বেরিয়ে গেছে। এর পরেব বার থেকে সতর্ক হতে হবে। অমন খপাৎ করে ছেলেধরার মতন ধরলে, আর কাজের কথায় নেমে পড়লে চলবে না। ধীরে সুস্থে, রইয়ে সইয়ে। চা খাইয়ে।

কবি-তরুণের দোষ নেই। দোষ আমারই।

আবার রিং। এবার অন্য স্ট্র্যাটেজি। সচেতন পদক্ষেপ।

"কে রে? সুদীপ? আয় আয়। বোস। কিরে, কাজকর্ম কেমন? হ্যাঁ, আছে পিকো। একটু ব্যস্ত আছে। বরং দশ মিনিট পরে যাস ওপরে। একটু চা খেয়ে যা নিচেই। ততক্ষণে বরং আমার সঙ্গেই একটু গল্প কর। হ্যাঁরে সুদীপ, এই যে তোরা এই বইপত্তর পড়িস, ছবিটবি দেখিস, ফিল্ম তুলিস, জীবন সম্পর্কে, বিশেষভাবে এই প্রেম সম্পর্কে তুই কী মনে করিস রে? মানে, ইন জেনারাল তোদের জেনারেশনটা কী ভাবছে? একটু খুলে বল তো বাবা? আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই।

সুদীপ কলেজ শেষ করে ফেলেছে। এদের চেয়ে সামান্য বড়ো। ফিল্মটিল্ম তোলে। বিদেশী বইপত্তর পড়ে, 'চট করে অবাক হই না' টাইপ। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পার্থিব জগতে সে যথেষ্ট চালুপার্টি। 'রাফ-টাফ-মাচো' সুদীপ জামার বোতাম লাগায় নাভির কাছে, কলম গোঁজে হিপ পকেটে, মোটরবাইকে পাড়া কাঁপিয়ে বেড়ায়। যেন মোটেই ঘাবড়ায়নি, এমনভাবে সুদীপ একটা কাঠের চেয়ারে বসে পড়ে। এবং টেরচা চাউনিতে আমার দিকে তাকাতে থাকে। একে বলে 'মাপ-নেওয়া', আমি জানি। অর্থাৎ 'মেজার' করা হচ্ছে 'সিচুয়েশন'-টাকে। হিন্দি সিনেমাতে ভিলেনই হোক, হিরোই হোক এমনি একটা সময়ে নিজেই নিজের দু'গালে বাঁ-হাত বুলোতে থাকে। তারপর ডান হাতে হঠাৎ ঘুঁষি মারে। ('শাহেনশা'তে অবশ্য উলটো।)

সুদীপ ঘুঁষি মারবে না, জানি।

আমিও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি। ভাবতে টাইম নিচ্ছে, ভালো। ভেবেচিন্তে উত্তর দিক। আমিও তো তাই চাই। সুদীপ সিরিয়াস ছেলে। ভালো রোজগারপাতি করছে। পরিশ্রমী। বাইরে ভাবখানা যাই হোক, ছেলেটা আন্তরিক প্রকৃতির। রোজ নাকি বাড়ির বাজার করে দেয় মোটরবাইকে চড়ে। ওর মতামতে কাজ হবে।

সুদীপ গালে হাত বুলোয় না। দু'হাতে চেয়ারের দুটো কাঠের হাতল চেপে ধরে টেরচা চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। বোতাম খোলা জামার মধ্যে থেকে তার ছ'টা পাঁজরাও আমার দিকে স্পষ্ট, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। রোগা হওয়ার সঙ্গে 'মাচো' ইমেজের যোগ নেই। ইন্টেলেকচুয়াল 'মাচো'রা রোগাই হয়। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখে অপলকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুদীপ ঘাড় সোজা করে। নড়েচড়ে বসে। চোখ নামিয়ে এক মুহূর্ত কী ভেবে নেয়। তারপর মাথা তুলে বলে "প্রেম?" একটু ফর্সা করে হাসে। "ধুস। প্রেম দিয়ে কী হবে? আমি প্রেমে বিশ্বাসই করি না! ওসব প্রেমট্রেম আজকাল আর চলে না, নবনীতাদি, ওসব আপনাদেরই টাইমের জিনিস ছিল। এখন অবসোলিট হয়ে গেছে। গপ্পো-উপন্যাসে-ফিলিমেই শুধু পাবেন। লাইফে নেই। আমরা র‍্যাশনাল জেনারেশন। আমরা অবজেকটিভলি লাইফটাকে দেখি। লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষি। আমরা অ্যামবিশাস। কই? চা তো বললেন না? প্রেম ব্যাপারটা এখন ঠিক চলে না। কেরিয়ারটাই সবার আগে। আপনি বাঁচলে প্রেমের নাম। প্রেমের জন্য আমরা কেউ তো কেরিয়ার স্যাক্রিফাইস করবো না? না মেয়ে, না ছেলে। কেউ কিছুই স্যাক্রিফাইস করবো না—এখন সবাই স্বার্থপর। বুঝলেন তো নবনীতাদি এখন যে যার, সে তার। ছেলেমেয়ে সবাই সেলফ-সীকিং হলে আর প্রেমটা হবে কেমন করে? কে করবে? কার সঙ্গে করবে? প্রেমে কেউই আর বিশ্বাস করে না, এক বোকারা আর ন্যাকারা ছাড়া। ওটা আউটডেটেড

কনসেপ্ট এখন। আমাদের এটা প্রয়োজনভিত্তিক সোসাইটি। নবনীতাদি, এখানে বিনা প্রয়োজনের কোনো জিনিস চলে না।" সুদীপ আমার সামনেই একটা সিগারেট ধরিয়ে কেমন একটু জেনুইন মমতার সঙ্গে হাসলো। চা এসে গেছে।

আমি চা, আর অ্যাশট্রে এগিয়ে দিলুম। মনে মনে নোট করতে গিয়ে আমি বোকা হয়ে গেলুম—সুদীপ আসলে কী বললো? ও কি প্রেমে বিশ্বাস করে, না করে না?

নেক্সট যেই-না বেল বেজেছে আমিও ঠিক স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো দালানে ছিটকে এসেছি এবং ভাঙা গলাকে যথাসম্ভব মিষ্টি করে বলেছি—

"কে রে? পিকোর বন্ধু কেউ এলি নাকি রে?" ভয়ে-শীতল কচিগলায় কোরাসে উত্তর হলো নিচে থেকেই—

"ইয়ে, হেঁ-এঁ! মানে, না, না! আসলে আমরা টুমপার...মানে, আর কি, আমরা থাকতে আসিনি। কেবল এক মিনিট, এক্ষুনি চলে যাবো। একটা জরুরি কাজে। এই পিকোদির কাছে। শুধু এক মিনিটের জন্যে। সত্যি সত্যি।" কেউ উপরে এলো না। পিকো একদম পড়ছে না, সামনে পরীক্ষা, আমি চাই প্রায়ই রৈ-রৈ শব্দে ওর বন্ধুদের ভাগিয়ে দিই। বুঝতে পারি, এটা তারই ফলশ্রুতি। (আজকাল কেউ 'ফল' লেখে না। 'ফলশ্রুতি' লেখাই নিয়ম।) এই পার্টি তারই প্রতিক্রিয়ায় ভুগছে। অতএব আমি তাদের মধ্যে মনোবল সঞ্চার করতে চেষ্টা করি।

"ভয় কিসের? ওপরে আয় না! কে রে তোরা?" "পিকোদি বাড়ি আছে।" আস্তে আস্তে সিঁড়িতে শব্দ হয়। দুটি কচিমুখের আবির্ভাব ঘটে সিঁড়ির মাথায়। 'হে মাধবী-দ্বিধা-কেন-আসিবে-কি-ফিরিবে কি,-র মতো করে আমি বলি—"কি ব্যাপার? এত কিন্তু-কিন্তু কিসের? এই কি নতুন আসছিস? নাকি তোরা রিমঝিম? আর প্রতিম? আয় না ওপরে আয়, শুধু শুধু অত ভয় পাচ্ছিস কেন? বোস এখানে। (আমি আছি গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে!) হ্যাঁ, পিকোদিকে ডেকে দিচ্ছি। আচ্ছা রিমঝিম-প্রতিম, তোরা কি এখনও প্রেমে বিশ্বাস করিস?" বলেই 'এখনও' কথাটা নিজেরই কানে খাপছাড়া লাগে।

"প্রেম?" সমস্বরে উচ্চারিত শব্দটি হাঁফ ছাড়ার মতো শোনালো। ততক্ষণে পায়ে পায়ে কাছে এসেছে দুটো ছেলে। একটার এখনও গোঁফদাড়ি গজায়নি তেমন, আরেকটার মুখভর্তি কচিকচি ঘাসপাতার মতো দাঁড়িগোঁফ। ক্ষুর চলেনি। বড়ো বড়ো চোখ। দুটো নেহাৎ ছেলেমানুষ ছেলে। কিশোর বলাই যথার্থ। একটা ওদের মধ্যে একটু বড়ো। সদ্য যুবা। রিমঝিমটা আমার ছোটো মেয়ে টুম্পার সতীর্থ। ছোটো মেয়ে এখন কলকাতার বাইরে পড়ছে। হস্টেলে থাকে। কুড়ি হয়নি।

"প্রেম? মাসি?"...শুধু এইটুকুনি বলেই ভয়ে-বলি-না-নির্ভয়ে-বলি মুখ করে হঠাৎ চুপ করে গেল দুজনে। এবং পরস্পর নিদারুণ চোখাচোখি করতে লাগলো।

"ভয় কি? বল না?" আমি যথাসাধ্য মাভৈঃ প্রদান করি। "তোরা প্রেমে বিশ্বাস করিস তো? অ্যাঁ? প্রেম নিয়ে ভাবনাচিন্তা করিস?" দাড়িওয়ালা মুণ্ডুখানি প্রতিম সজোরে নাড়ালো ডাইনে-বাঁয়ে। অর্থাৎ না। করে না। স্বল্প গোঁফের রেখা-ওঠা মুখখানি প্রবলভাবে হেলিয়ে কানটা একদিকের কাঁধের সঙ্গে ঠেকিয়েই ফেললো রিমঝিম। অর্থাৎ করে। খুব করে। আরে? এদের যে দেখি একযাত্রায় পৃথক ফল! ঠিক হ্যায়, আগে অবিশ্বাসীকেই 'হ্যাণ্ডল' করা হোক।

"প্রতিম? তুই বিশ্বাস করিস না প্রেমে? কেন? কী হয়েছে? তোদের না অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা টেক্সট?"

"রেপ অফ দ্য লকও টেক্সট। তারপর, টেক্সটের মধ্যে"—প্রতিম অকস্মাৎ সিলেবাস নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে দেখে, তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিই।

"থাক, টেক্সটের কথা থাক। তোর নিজস্ব ফিলসফিটা কী? জীবনদর্শন? প্রেমে বিশ্বাস নেই কেন রে? এই বয়েসে?"

"এই বয়েস বলেই। বড্ড টাইম কনজিউমিং। ভীষণ সময় নষ্ট হয়ে যায়।" প্রতিম আড়চোখে একবার রিমঝিমের দিকে তাকায়। রিমঝিমের চোখমুখে মোটেই সাপোর্টের চিহ্ন নেই। ভুরু কুঁচকে যুদ্ধং দেহি ভাবে চেয়ে আছে সে।

"এই স্টুডেন্ট লাইফে প্রেম করাটা ঠিক নয়। আগে পড়াশুনোটা শেষ করে নিয়ে, যখন হাতে সময় থাকবে"—প্রতিমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হঠাৎ রিমঝিম বলল—"একদম রিটায়ার-টিটায়ার করে গিয়ে, তখন বরং প্রেমটা তুই করিস। বুঝলি প্রতিম? তখনই হাতে প্রচুর, অঢেল অনন্ত সময় থাকবে।" বেশ নিরীহভাবেই এটা বলল রিমঝিম।—"এখন তোর পড়াশুনো, তারপর তোর চাকরিবাকরি—"

"ইয়ারকি মারিস না, রিমঝিম। কী বুঝিস তুই প্রেমের? যা জানিস না সেই নিয়ে কথা বলবি না।" প্রতিম একটু রেগে গিয়ে সিরিয়াসলি বলে—"প্রেম তো করলেই হলো না? গার্লফ্রেণ্ডকে টাইম দিতে হয়, সমানে পারসিউ করতে হয়, জানিস? প্রেমের জন্য কিন্তু প্রচণ্ড সময় লাগে, নইলে প্রেম ছেতরে-মেতরে যায়। প্রেমে পড়লে পড়াশুনো, আড্ডা, থিয়েটার সবই মাটি। শুধু ওই একজন মেয়েকে নিয়েই সবটা সময় কেটে যায়। খেলা দেখা হয় না। অন্য, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলেই গার্লফ্রেণ্ড চটে যায়। তাকে খাওয়াতে, তাকে সিনেমা দেখাতে, অনবরত ধারকর্জ করতে হয়, ফলে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যায়।—রোজ রোজ বাড়ি ফিরতে দেরি হয়, মা-বাবাও ক্ষেপে যায়—মহা প্রবলেম। যেমন সময় নষ্ট, তেমনি পয়সা নষ্ট, —পড়াশুনোও ইনরমাসলি সাফার করে।—একদম কনসেনট্রেশন থাকে না, পড়ায় কিছুতেই মনে বসে না—ওঃ সো ডিস্টার্বিং—নাঃ। প্রেম একদম ভালো না"—

"শুনে তো মনে হচ্ছে বেশ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকেই কথা বলছিস। রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স বলেই মনে হচ্ছে? তুই তো এ'বছর ড্রপ দিলি? না রে?"

"হি হি, এসব কী আন-এথিক্যাল প্রশ্ন? আউট অব সিলেবাস হয়ে যাচ্ছে যে। নো পার্সোন্যাল ইনফর্মেশন—আমি কেবল জেনারেল থিওরি দিচ্ছি!—আমার থিওরি ছাত্রকালের প্রেম খুব খারাপ জিনিস, করলেই সমূহ বিপদ—সব দিক দিয়ে লোকসান। কেবল যদি কেউ স্বরূপের মতন ভেরি স্পেশাল পার্সন হয়, উইকলি ডাইরি মেনটেন করে, লাইব্রেরি ওয়ার্ক, রেস্তরাঁ ওয়ার্ক, সবকিছু কাজকর্ম, হার্ট অ্যাণ্ড হেড, ডেইলি রুটিনে একদম ভাগ করে ফেলে, তবেই সম্ভব। নাঃ। ও একা স্বরূপই পারে। আমাদের মতো জনসাধারণের পক্ষে লে-মেনদের পক্ষে প্রেম ইজ নট প্র্যাকটিকেবল—নট আ প্র্যাকটিক্যাল প্রপোজিশন অ্যাট অল!"—

প্রতিমের মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে রিমঝিম মেঠো বক্তৃতার সুরে বলে—"আমি কিন্তু মোটেই মনে করি না প্রেম শক্ত কিম্বা প্রেম খারাপ। প্রেম খুব ভালো জিনিস। আমি খুব প্রেমে বিশ্বাস করি—আমি খুবই প্রেম করতে চাই। কিন্তু আমাকে কেউই যে কেন প্রেম করতে চায় না—"

"সে তোর গোঁফদাড়ি বেরুলেই ঠিক দেখবি মেয়েরা দুড়দাড় প্রেমে পড়বে। আসলে এখনও তোকে ওরা বাচ্চা ভাবে—" নিজের কচি কচি দাড়িগোঁফের গায়ে হাত বুলিয়ে, দাম্ভিক হাস্য দেয় প্রতিম।—"কেন? কেন ভাববে বাচ্চা?" রিমঝিমের ক্রুদ্ধ উত্তর। —"ভাবলেই হলো? আমিও যে-ক্লাসে পড়ি, ওরাও তো সেই ক্লাসে, তবে?—তবুও আমি বাচ্চা? বললেই হলো যা হয় একটা কথা?" রিমঝিমের অভিমানে ভাঙা গলা বুজে আসে। বেশ তো মিষ্টি দেখতে রিমঝিমকে, কেন প্রেমে পড়ে না মেয়েগুলো? 'মণ্ডলকিশোরে'র সেই আইডিয়াটা আর বাংলার মাটিতেও চলছে না তাহলে? সব ব্যাম্বো? অমিতাভ আর মিঠুন?

"হবে রে, হবে রে, তোরও হবে," মূর্তিমতী সান্ত্বনার মতো এবার পিকোদি আবির্ভূত হয়, "বিশ্বাসে কৃষ্ণ পর্যন্ত মিলে যায়, আর তোর একটা প্রেম হবে না?" তাই কখনও হয়?"

"তোর সেই বেগুনি সোয়েটার পরা গুণ্ডা মেয়েটার সঙ্গেই হয়ে যাবে, দেখিস, একটু ধৈর্য ধর"—রহস্যময় হেসে প্রতিম বলে। "সবুরে মেওয়া ফলে! মেলা তড়বড় করিসনি!"—দৌড়ঝাঁপ করতে করতে তিনজনে মিলে ওপরে উঠে যায় এবার। "চলি, মাসি?"—আমার মাথা আবার গুলিয়ে যায়। এরা তবে কে কোন দলের?

আপনারা ভাবতে পারেন মেয়েদের দেখা নেই কেন? কেননা মেয়েদের আমি প্রশ্ন করছি না। সম্প্রতি একটি নয়, দুটি মেয়েদের পত্রিকাতে কলকাতা ও যাদবপুরের ছাত্রীদের স্পষ্টবাদী সাক্ষাৎকারে তাদের মতামত পড়ে জেনে গিয়েছি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে ৯৯% প্রেমে উৎসাহী নয়। সবাই কেরিয়ারে উৎসাহী, যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছে। প্রেমকে কেরিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখছে তারা। অথবা একটি বিকল্প কেরিয়ার। প্রেম মানেই বিবাহ, বিবাহ মানেই কর্মজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা-বঞ্চিত জীবনযাপন। বেশিরভাগ সাক্ষাৎদাত্রী চায় মুক্ত জীবন, স্বাধীন উপার্জন, কর্মজীবন। প্রেমে, বিবাহে জড়িয়ে পড়তে রাজী নয় তারা। আরেকদল বিবাহোন্মুখ। তারা বিবাহের প্রতি আগ্রহী, কিন্তু প্রেমের প্রতি নয়। সবাই চায় নিরাপত্তা। ইতিমধ্যে, যদি ইচ্ছে করে তবে প্রেম-প্রেম-খেলায় ('হ্যাভিং ফান') তেমন আপত্তি নেই কয়েকজনের। কিন্তু প্রেমে-পড়া? নৈব নৈব চ। মেয়েরা 'প্রেম' থেকে পালিয়ে গিয়ে 'কেরিয়ার' বাঁচাতে চায়, তাই সে-'কেরিয়ারে' 'চাকুরি'ই হোক, আর 'বিবাহ'ই হোক। প্রেমটা মেয়েদের ক্ষেত্রে কেরিয়ারের বালাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছেলেদেরও কি তাই নয়? ছেলেদের কথা শুনেও তো তাই মনে হচ্ছে আমার। এইসব ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা। খুব ব্রাইট ছেলে। একটা ফার্স্ট-ক্লাস পেয়েছে, আরেকটার জন্য তৈরি হচ্ছে। দেখবামাত্র আমার মুখ থেকে প্রশ্ন ছুটে গেছে—

"এই যে কুনাল! এক মিনিট দাঁড়াও তো? প্রেম কী জিনিস? একটা ডেফিনিশন দিতে পারো আমাকে?" সে-ছাত্রও সোজা পাত্র না। সুদীপেরই মতো, 'কিছুই আমাকে-অবাক-করে না' আঁতেলে টাইপ। ঝোলা গোঁফ। প্রশ্ন শুনে, যেন-এটাই-আশা-করছিল-এমনিভাবে বিনা বিস্ময়ে, বইখাতা বগলে পুরে প্রথমে কিছুক্ষণ, মিনিটখানেক হবে, উটমুখো হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। ভাবছে। ভাবুক। ভেবেচিন্তে বলুক।

তারপর কুনাল তর্জনী তুলে বললো—

"ইলেকট্রিকের বালবের মধ্যে যে সূক্ষ্ম তারটা আছে, 'ফিলামেন'টা, যেটা কেটে যায় আর কি, দেখেছেন তো দিদি? প্রেম হলো ঠিক তাই। অথবা, ধরুন এই প্রদীপের সলতেটা। তা বলে কিন্তু মাইনড ইউ, প্রদীপের তেলটা, কিম্বা বালবের ইলেকট্রিসিটি, ওগুলো প্রেম নয়। ওটা আবার অন্য জিনিস। বুঝেছেন তো?" বেশ অন্তরঙ্গভাবে চোখ মটকালো ছাত্রটি। এবার আমার ঘাবড়াবার পালা।

"অন্য জিনিস? কী জিনিস বাবা? ঠিক বুঝিনি।"

আমার সরল প্রশ্নে প্রশ্রয়ের হাসি হেসে ছাত্র আমাকে বলে, "বোঝেননি? তাহলে আরেকদিন বুঝিয়ে দেবো দিদি, আজ হাতে সময় নেই, লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবে—" ছুটতে শুরু করেই থেমে পড়ে, নাটকীয়ভাবে হাতজোড় করে জ্যাকি শ্রফ মার্কা গোঁফের তলায় নকল করে মিষ্টি হেসে কুনাল বলে—"আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা"—বলেই লাইব্রেরির দরজায় সেঁধিয়ে যায়। অদূরেই মনে হলো যেন একটি অপেক্ষমানা সালোয়ার-কুর্তা নড়ে উঠলো, একটি ওড়না দুলে উঠে কুনালের দিকেই এগিয়ে এলো বালবের ফিলামেন অথবা প্রদীপের সলতের মতো।

দূর হোকগে ছাই সম্পাদকীয় ফরমাশ। প্রেমের আবার এ প্রজন্ম-সে প্রজন্ম কি? কেবল বাজে কথা। প্রেম তো জন্মজন্মান্তর ধরেই। যে-কে-সেই। প্রেম সব যুগেই প্রেম। প্রেম সব দেশেই প্রেম। আমিও যেমন! তিনপুরুষ আর চোদ্দপুরুষে কিছু তফাৎ নেই। যাঁহা শাজাহান, তাঁহা এলিজাবেথ টেলর, টাইপগুলো কেবল আলাদা, কেউ ম্যারাথন, কেউ রিলে রেস। ছোটে সবাই প্রাণপণে। যে যেটুকু রাস্তা পারে। বাবা-মা ছুটেছেন তাঁদের মতন। আমরা আমাদের মতন। এরা ছুটবে এদের মতন।

বাড়িতে ফিরতেই করুণাসিন্ধু হয়ে এসে পিকো নিজেই বললো—"মা, দিবাকর এসেছে। ভাটপাড়ার বামুন। ওকে নিয়ে তোমার স্পেসিমেন স্যাম্পলিং করবে না?"

"ও, দিবাকর এসেছিস? শোন বাবা," আমি বসে পড়ে জুতো খুলতে-খুলতেই বলি—"বল দিকিনি তুই প্রেম বিষয়ে কী ভাবিস?"

"কিস্যুই ভাবি না!" হাস্যবদনে দিবাকর বললে ধুতিপরা পা নাচাতে নাচাতে। "ভাববার আছেটা কী?"

"মানে?"

"মানে কক্ষনোই ভাবিনি। ভাববার কী আছে এতে?"

"প্রেমে বিশ্বাস করিস?"

"বাঃ, অবিশ্বাস করলেই হলো? এত কীর্তন, বৈষ্ণব গীতিকবিতা, মেঘদূত, গীতগোবিন্দ লেখা হয়ে গেল, রবিঠাকুর এত গান লিখলেন, অবিশ্বাস করলেই হলো? ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। ফ্যাক্ট থাকলেই ভাবতে হবে? পিপীলিকাভুকও তো ফ্যাক্ট। জগতে আছে—আমি কি তাই নিয়ে ভাবি?"

"কিন্তু প্রেম আর পিপীলিকাভুক—"

"থাকুক, তাতে আমার কি? আমার ওসব নিয়ে ভাবার টাইমও নেই, ইনক্লিনেশনও নেই।"

"তোদের তো বৈষ্ণববাড়ি।" ভয়ে ভয়ে বলি।

"তাতে কি হলো?" দিবাকর বলে। "বৈষ্ণববাড়ি বলে জীবহিংসা হয় না।

নির্বিমিষ্যি খাই। ব্যস। ঐ পর্যন্তই যা। প্রেম। জীবে প্রেম নিয়ে ভাবনা বলতে পারেন।"

"তোর বন্ধুবান্ধবেরা তো খুব ভাবে। ঊষা তো এনগেজড হয়ে গেল।"

"ওঃ ঊষা? ঊষার প্রেম? তাও জানেন না বুঝি? শুনুন তবে! ঊষা আর রমেশের ব্যাপারটা হচ্ছে সিম্পল! টিউশনের এম্পায়ারটা ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছিল। এ পায় ছ'হাজার, তো ও নিয়ে নেয় পাঁচ হাজার। তার চেয়ে বিয়ে করে ফেললে জয়েন্ট টিউটোরিয়াল হোম খুললে বিশ পঁচিশ হাজার তুলতে পারবে। তাই প্রেম। একে আপনি প্রেম বলবেন?"

আমি নির্বাক। আমাকে নির্বাক করতে পেরে দিবাকর খুব খুশি। বেড়ালের মতন গোঁফ নাচিয়ে হাসলো।

"এসব আপনি বুঝবেন না। এরা যে-যার বিজনেস ইন্টারেস্টে পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়। আপনারা ভাবেন, প্রেম। এর বাবার টাকা দেখে, ওর বাবার নাম-যশ-প্রতিপত্তি দেখে, কারুর ফর্সা রঙ দেখে, আরেকজনের মার্কশিট দেখে— হুঃ, এই তো এদের প্রেমের সব উৎস। দূর। ওসব আবার প্রেমে পড়া নাকি? ওতে ভুলবেন না দিদি।" দিবাকর সাবধান করে দেয়, কচি গোঁফ নেড়ে, হুলো বেড়ালের মতন।

"এ প্রেম সে প্রেম নয়। আপনারা যাকে প্রেম বলতেন। এ হচ্ছে অন্য মেজারমেন্টের। আমাদের যুগের আসলে মেটিরিয়ালটা আলাদা। ঐ হয় স্বার্থের হিসেব, আর নয় তো খেলা। প্রেম বলে কিছুই এখন প্র্যাকটিসড হয় না। যা হয় সেটা একটা পাসটাইম। প্রেম-প্রেম খেলা। লাইক এনি আদার প্রেম। সময় কাটানোর প্রণালী। যেমন ক্রসওয়ার্ড পাজল। শব্দসন্ধান। শিকার। মৃগয়া। ক্রিকেট। তেমনি। উত্তেজনা আছে। হারজিৎ আছে। কংকোয়েস্ট-এর মজা আছে। সবই আছে। কেবল প্রেম নেই। ও আপনাদের সময়েই ফুরিয়ে গেছে। আমাদের যুগে ছিটেফোঁটাও নেই।"

"তুমি একটা এতবড় পণ্ডিতবাড়ির ছেলে হয়ে, দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র হয়ে এমন বলছ? ছিঃ।"

"ছিঃ তো কি। যা বুঝেছি অনেস্টলি তাই তো বলবো? নাকি বানিয়ে বানিয়ে কাব্য করতে হবে?"

মন খারাপ হয়ে যায়। একের পর এক নবীন যুবক এসে প্রেমকে নস্যাৎ করে যাচ্ছে। বিশ্বের ভবিষ্যৎ তবে কী? আমার কাতরতা আর চাপতে পারি না। বলে ফেলি: "তোরা কী রে? যাকেই ধরি, সেই বলে প্রেমট্রেম সব বাজে কথা। তোদের জেনারেশনটাই—"

"আপনার যে গোড়ায় গলদ! আপনার স্যাম্পলিংয়েই ভুল হচ্ছে। র‍্যানডম তো হচ্ছে না। সবাই তো পিকোরই বন্ধু। কিছু একটা মিল না থাকলে বন্ধু হয়েছে কেন এরা? এটাই মিল। সবাই একরকম কথা তো বলবেই। আপনি বড় রাস্তার মোড়ে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে এভ্রি থার্ড পথচারীকে ধরুন। সেই স্যাম্পলিং-এর রেজাল্টটা নির্ভরযোগ্য হবে। যদি সায়েন্টিফিক মেথড ফলো করতে চান।"

"আমি বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে এভ্রি থার্ড পথচারীকে ধরব? ধরে জিজ্ঞেস করব—আপনি প্রেমে বিশ্বাস করেন? তারপর আমাকেই ধরে মারবে না তো তারা?

নইলে সলিসিটিংয়ের জন্য পুলিশ আমাকে জেলে পুরে দেবে না?"

দিবাকর একটু লজ্জিত হয়। আঙুল কামড়ে চিন্তিত মুখে জানায়: "সেদিকটা অবশ্য আমার স্ট্রাইক করেনি।"

"তারপর, বরং ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা স্টেনসিল কেটে কোয়েশ্চেনেয়ার বিলিয়ে দিন—সেটাই ভালো হবে।"

"কেউ ফেরৎ দেবে না। কে কালেক্ট করবে? তুই করবি?"

"ওরে বাবা!"

"তবে? দ্যাখ তোদের মুখেই যত বড় বড় কথা। কেউ কোনো ভার নিতে চাস না।" বকতে-বকতেই টের পেলুম হঠাৎ আসল কথাটা বলে ফেলেছি। এটাই এদের এই প্রেম-বিমুখতার মূল কারণ। দায়হীনতার লোভ। নিদায়, নির্ভার, স্বাধীন, মুক্ত জীবন এদের কাম্য, কর্মময় হলেই ভালো, আলস্যময় হলেও ক্ষতি নেই (যতদিন ক্ষতি না থাকে)। প্রেম মানেই বন্ধন। মানেই দায়দায়িত্ব। হৃদয়ের, জীবনের। মর্মের, কর্মের। এরা জীবনে দেয়াল তুলতে চায় না।

এটা কি আদর্শবাদ? নাকি একেই বলে স্বার্থপরতা? প্রেমের মূলে আছে অংশগ্রহণ, 'শেয়ার' করা, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, হার-জিৎ—সব ভাগ করে নেয় প্রেম। এ প্রজন্ম বোধহয় ভাগ নেওয়াতে বিশ্বাসী নয়। সবাই যার-যার তার-তার। কে যেন বলেছিল না? যে যার সে তার? সুদীপ কি? না টুবলু? না প্রতিম? না দিবাকর? সবই একরকম শোনাতে শুরু করেছে আমার মনের মধ্যে এবারে। সত্যিই কি বদলে গেছে এই প্রজন্মে ভালোবাসার মূল্যবোধ?

ভাবছি, এমন সময়ে দিবাকর ফিরে এলো। নিচে নেমে এসে দিবাকর নিজেই বললো, "আপনি কি মন্দার সঙ্গে কথা বলেছেন? মন্দাকিনী রায়?"

"না তো?"

"বলে দেখবেন। অন্য একটা অ্যাংগেল পাবেন। ওই তো ওপরে বসে আছে। ডাকবো?"

"ডাকবো? তা, পিকো তো ওকে ডাকেনি?"

"ডাকবে কেন? আপনি তো মেয়েদের মতামত চাননি? এর প্রবল ওপিনিয়ন আছে!"

"এই কি কবিতা লেখে? কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলো, দান্তে আর বিয়াত্রিচে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেই। মন্দা! মন্দা! নিচে আয়। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে! ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু!"

পরমা সুন্দরী একটি ছবির মতন মেয়ে এলো।

"কী পড়ো?" মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললো,—"এম. এ. ফার্স্টইয়ারে ঢুকেছি।" গলাটিও মধুর।

"তুমি কি প্রেমে বিশ্বাস করো, মন্দা?"

একটুও না ঘাবড়িয়ে নাম ঠিকানা বলার মতো সহজে—"নিশ্চয়ই!" বেশ জোরের সঙ্গেই মন্দাকিনী জানায়।

"মানে?" আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

"মানে? আমি মনে করি প্রেমই সব। প্রেমের জন্যেই মানুষ বাঁচে। বাঁচতে

হলে তো একটা মোটিভেশন লাগে? কেউ টাকা রোজগারের জন্যে বাঁচে, কেউ নামযশ করবে বলে, আমি বাঁচি প্রেমের জন্যে।”

“প্রেম মানে? জীবে প্রেম? গান্ধীজী, বুদ্ধদেব...”

“না না, প্রেম মানে এমনি প্রেম। একজন মানুষের জন্যে আরেকজন মানুষের ব্যাকুলতা। তাকে কাছে পাওয়ার জন্য, তাকে চোখে দেখার জন্য, তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য, তার স্পর্শ পাবার জন্য—এইসব। দিবাস্বপ্নে, নিশাস্বপ্নে, সব সময়ে তারই কথা ভাবা। সেই প্রেম।”

“আই সী।” আমি কেমন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। মন্দাকিনী অত্যন্ত স্পষ্টবাদিনী রোমান্টিক।

“হাতে এসে গেলেই কিন্তু গেল!” মন্দা বলে।

“অ্যাঁ, কী বললে?”

“বলছি, প্রেম যতদিন অপূর্ণতার মধ্যে, অতৃপ্তির মধ্যে, আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকে ততদিনই প্রেম বেঁচে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যেই প্রেমে প্রাপ্তি এল, তৃপ্তি এল, অমনি সুপ্তিও চলে আসে। তারপরে প্রেম শুকিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়। তখন জীবন খুব বোরিং।” মন্দা হাসে। এ তো একেবারে আমার মার কথাই বলছে! কোথায় জেনারেশন গ্যাপ?

“ঘুম থেকে উঠতেই ইচ্ছে করে না। যতদিন না আবার প্রেমের উদয় হচ্ছে।” মন্দা আরো জানায়।

“আবার উদয় হয়?”

“বাঃ! হবে না? প্রেম তো সূর্যের মতো। অনবরত অস্ত আর উদয়। উদয় আর অস্ত। পার্মানেন্টলি এমন সময় তো আসবে না, যখন সূর্য নেই। সেটা রাত্রি। রাত্রি কেটে যায়। প্রেমের ভোর হয়। প্রেমের সূর্যোদয় হয়। নতুন প্রেম আসে জীবনে।”

—“তুই বুঝি অনবরত প্রেমে পড়িস মন্দা?”

—“অনবরত। আমার তো প্রেমময় জীবন!”

হাসতে হাসতে মন্দাকিনী বলে—“শ্রীচৈতন্যদেবের টাইপের। মেরেছে কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না? আমি সেই টাইপ। আপাতত দিবাকরদা কিছুতেই অ্যাটেনশন দিচ্ছে না সেটাই মুশকিল। বলুন তো একটু দিবাকরদাকে? বলছি এত করে—”

“ও, এই ব্যাপার? দিবাকর!”

“মাপ করবেন, দয়া করে মন্দাকিনীর সঙ্গে প্রেম করতে আদেশ করবেন না। প্রেম আমার লাইন নয়। মন্দাকিনী আমাদের পাল্টি ঘর, চমৎকার মেয়ে, ছোড়দার সঙ্গে সম্বন্ধ করছি, হয়ে গেলে হয়ে যাবে। আমাকে কেন? ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।”

আমিও মত বদলে ফেলি।

“তুমি বরং ওর ছোড়দাকেই—”

“ছোড়দা বিলেতফেরৎ, পাত্র ভালো, চাকরি করে, মাছ মাংস খায়, দেখতেও ভালো, মন্দার সঙ্গে ওকেই মানাবে।—তখন থেকে এটাই বোঝাচ্ছি ফের প্রেমের সূর্যোদয় হবে। এবারকার মতন এ সূর্যটাকে অস্তেই নামিয়ে দে!”

আমিও বলি, "দিবাকর সুবিধের পাত্র হবে না। ছোড়দাই বেটার মনে হচ্ছে।"

মন্দাকিনী মিষ্টি হাসলো। প্রশ্রয়ের সুরে বলল: "ওভাবে তো হয় না? যতদিন দিবাকরদা এই...এরকম করবে, ততদিনই আমারও যে—"

"তার চে, দিবাকর তুই ওর প্রেমে পড়ে যা—তাহলেই চোঁচা পালাবে মন্দাকিনী! ওর সবই ওই রোমান্টিক অপ্রাপ্তি"—এবার পিকো গভীর উপদেশ দেয়। — "প্রাপ্তির একটু লক্ষণ দেখালেই মন্দা আর সেখানে নেই। ভয়ানক prude মেয়ে! মুখেই যত!" মন্দা মিষ্টি মিষ্টি লজ্জা লজ্জা হাসে।

অস্বীকার করে না। দিবাকর বলে, "দাঁড়া, তোকে কালই নিয়ে যাচ্ছি সায়েন্স কলেজে ছোড়দার ল্যাবে"—

আরেকটা দৃষ্টিকোণই বটে। মেয়েদের পত্রিকার সাক্ষাৎকারে এটা ছিলো না। না। এটা কি প্রেমে বিশ্বাস? না প্রেমে অবিশ্বাস? মোদ্দা কথাটা ঠিক ধরা গেল কি? ও কি আমাদের ছোটবেলার মতন...ও কি সত্যিই রবীন্দ্রনাথের গানের মতন...রিমঝিম এক প্রবল প্রেমিক, আর এই মন্দাকিনী আর এক। অতিবড় ঘরণীরা না পায় ঘর। মন্দার প্রেমে বিশ্বাসটাকে কিন্তু 'প্রেমে-অবিশ্বাস' বলেই সন্দেহ হতে থাকে আমার। ওই, যাকে দিবাকর বলছিল 'পাসটাইম', সেরকম লাগছে না কি মন্দার এই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের ব্যাপারটা?

তা কেন? অনেকেই আছে প্রেমে বিশ্বাসী। আগের মতোই। রূপোলি যেমন। মস্ত ধনীর একমাত্র আদরিনী সন্তান, স্বেচ্ছায় নিম্নমধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু একান্নবর্তী পরিবারের এক দোকানীর বড় ছেলেটিকে বিয়ে করে বাঘাযতীনে খুবই শান্তিতে ঘরকন্না করছে। কে বললে প্রেম নেই? স্যাক্রিফাইস নেই? রূপোলিকে আমি দেখিনি? ওকে প্রশ্ন করতে হয়নি প্রেম সম্পর্কে ওর ধারণা কী। নওরোজকেও দেখেছি। ওই যে থাইরয়েডের অসুস্থতার কারণে স্থূলাঙ্গিনী কিন্তু বুদ্ধিমতী গুণবতী চৈতালীকে বিয়ে করলো। পাঁচবছর বাগদত্ত থাকার পর, বিলেত থেকে ফিরে এসে চৈতালীকে নিয়েই ঘর বেঁধেছে নওরোজ। ওরাও তো আমারই ছাত্রছাত্রী। সুদীপ-দিবাকরের প্রজন্ম। আর যাই হোক সাক্ষাৎকারে কেউ সত্যি কথা বলে না। খবরের কাগজকেও না, বন্ধুর মাকেও না, মাস্টারমশাইকে তো নয়ই। প্রশ্ন করে কিছু হবে না। চোখই একমাত্র সাক্ষী, চোখটাকে তীক্ষ্ণ করতে হবে। এই সুদীপকেই তো পাঁচবছর ধরে একটাই মিষ্টি মতন মেয়েকে মোবাইকে করে নিয়ে ঘুরতে দেখছি। সুদীপের গার্লফ্রেণ্ড। গার্লফ্রেণ্ড কাকে বলে এরা? এদের মুখের ভাষা, আর কাজের ভাষা আলাদা। দিবাকরকে ছেড়ে আমি ঘরে যাই। নোটবই খুলে প্রবন্ধ লিখতে বসি। সঞ্চিত ডেটা অ্যানালাইজ করে দেখি, আরে, মা-জননীর ঘোষিত মতামতের সঙ্গে স্বরূপের কর্মকাণ্ডের বা সুদীপের, কি দিবাকরের বজ্রনির্ঘোষের তো বিশেষ পার্থক্য নেই? কেবল মার স্টেটমেণ্টটা পজিটিভ, ওদেরগুলো নেগেটিভ। দু'দলের বক্তব্যই মূলত 'প্রেম'-বিষয়ে এক—যথা: প্রেম অতি মূল্যবান, সূক্ষ্ম, দুরূহ, মহার্ঘ, সুকুমার, দুষ্প্রাপ্য। প্রেমকে হতে হবে নিঃস্বার্থ, নিষ্কারণ। প্রেম প্রয়োজনের চাপে বাঁচে না। প্রেম মূলহারা ফুল, ভাসে জলের 'পরে। হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে, ধরা দেবার ধন সে তো নয়—অধরা মাধুরী। মোটামুটি বিভিন্ন বিপরীত অ্যাঙ্গেল থেকে এই কথাই বলা হয়েছে। প্রেম অধরা মাধুরী।

মা বলছেন প্রেমকে বাঁচাতে হলে বিয়ে কোরো না। এরাও আরেকভাবে সেটাই বলছে। এদের বক্তব্য: এই অতিবাস্তব অতিস্বার্থ সংঘাতময় জীবনে প্রেমকে ধরা যাবে না। ধরতে যেও না। মানুষ বেঁটে হয়ে গেছে। প্রেম জিনিসটা আর আজকের পার্থিব মানুষের হৃদয়ের নাগালে নেই। যেমন বুকের মধ্যে ভগবানের নাগাল না পেলেই লোকে বলতে থাকে ভগবানে বিশ্বাস করি না। অথচ যন্ত্রণা, অপমান, পরাজয়ের মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে দৈবের নাগাল পেতে চায় অবিশ্বাসীও। এরাও তেমনি। তাহলে খুব কি একটা ফারাক হয়েছে? বদল হয়েছে প্রেমের তত্ত্বে? বোধহয় না। তত্ত্বটা একই আছে। তফাৎ হয়েছে প্রযুক্তিতে। প্র্যাকটিসটা বদলে যাচ্ছে। আমাদের প্রজন্ম আকছার 'প্রেমে-পড়ত'। 'প্রেম-করত' কম। এরা প্রেম করে, প্রেমে 'পড়ে' না। 'প্রেম'-কে ভয় পায়। দায়িত্বকে ভয় পায়। হালকা হয়ে বাঁচতে চায়। এমন সময়ে একটা ফোন এল।

এই ফোন, আর কলিং বেল। কলম ধরেছি-কি-ধরিনি, অমনি দুদিক থেকে এই সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। আর যেদিন বোর হয়ে একা একা ঘরে বসে থাকি, সেদিন দুটোই নিস্তব্ধ! উঠে গিয়ে ফোন ধরি।

"হ্যালো, আন্টি? এনি নিউজ অব টুমপা?"

এই তো। সেধে এসে জালে ধরা দিয়েছে। আরো এক ধাপ নিচের প্রজন্ম, আমার ছোটো মেয়ের বন্ধু। রিমঝিমের সঙ্গে পড়ে। ছোটো মেয়ে কলকাতার বাইরে পড়ছে। আমি খপ করে ধরি:

"হ্যালো, গীতু? তুই প্রেম বিষয়ে কী ভাবছিস?"

"হোয়াট? আর ইউ সিরিয়াস?"

"ভীষণ। প্রেম বিষয়ে তুমি কিছু ভাবছো কি?"

"প্রেম বিষয়ে কী ভাবছি? ডিড ইউ সে দ্যাট?"

"আজ্ঞে হাঁ। প্রেমে বিশ্বাস করিস? না করিস না?"

"ও শিওর। আন্টি! হু ডাজন্ট?"

"সাম সে দে ডোন্ট।"

"দে ওনলি সে সো। ইভন দে ডু।" বলল গীতু সিং। এখনও কুড়ি হয়নি ওদের। "ইউ ডোন্ট বিলীভ দেম, ডু ইউ আন্টি? জগতে কেউ নেই যে সত্যি সত্যি প্রেমে বিশ্বাস করে না। নো ম্যাটার হোয়াট দে সে!"

"বলছিস তুই?"

"নিশ্চয়। পৃথিবীতে প্রত্যেকে প্রেমে বিশ্বাস করে। ডোন্ট ইউ?"

"আমি তো করিই।"

"তবে? তুমিই বরং নাও করতে পারতে। তোমার তো, এক্সকিউজ মাই সেইং দিস, কিন্তু তোমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা তো প্রেমের খুব ভালো হয়নি, উইথ আংকল রানিং অ্যাওয়ে উইথ অ্যানাদার লেডি? স্টিল তুমিও যদি প্রেমে বিশ্বাস করো, অন্যেরা কেন করবে না? দোজ হু সে দে ডোন্ট, লাই। খবরদার বিশ্বাস কোরো না। ইটস ফ্যাশনেবল টু সে দ্যাট। বুলশিট!"

"ল্যাংগুয়েজ, ল্যাংগুয়েজ!"

"হোয়াট, ল্যাংগুয়েজ? যত মিথ্যেবাদী, ওদের কথা কানে তুলো না। তুমিও যেমন!"

"তাহলে তুই বলছিস যারা বলে প্রেমে বিশ্বাসী নয় তারাও আসলে বিশ্বাস

করে?"

"অফ কোর্স! দে আর ওনলি ওয়েটিং ফর ইট টু হ্যাপেন টু দেম! লুক, আন্টি! সবার জীবনে তো প্রেম আসে না? ইটস আ রেয়ার ইভেন্ট। তাই না? আ মেনি সপ্লেনডারড থিং। তুমিই বলো? ইউ আর দা পোয়েট!"

"আর তুই মনে হচ্ছে প্রেমে পড়েছিস?"

"কে বলল?"

"কে আবার বলবে? তুইই বলছিস! তোর কথাবার্তা!"

"ওয়েল? ইউ মে বি রাইট!" সলজ্জ মৃদুহাস্যের ঝংকার শোনা যায়।

"ছেলেটা ভালো তো?"

"আই থিংক সো।"

"প্রেমে বিশ্বাস করে তো?"

"হোয়াট ননসেন্স—তখন থেকে বলছি সব্বাই করে, এভরি ওয়ান, তোমাকে মুখে যে যাই বলুক, মনে মনে সক্কলেই প্রেমে বিশ্বাস করে আন্টি। কে-না-কে তোমাকে এসে গ্রেপস আর সাওয়ারের গল্প বলে দিল, আর তুমিও সেটা দিব্যি শুনে নিলে! ওসব গুল খেতে নেই! খেতে নেই! ইউ পিপল আর অ্যাবসার্ডলি গালিবল! সত্যি তোমরা বাবা-মায়েরা না,—অ্যাতো সিম্পল!"

"আমরা সিম্পল, গালিবল, আর তোরা পাকাবুড়ি?"

"কোয়াইট। লোকের মুখের কথায় কক্ষনো বিশ্বাস করবে না। কাজটা দেখবে। ট্রাস্ট ইওর কমনসেন্স, নট ইওর ইয়ার্স, যতসব আঁতলামির কথা! কে? কে বলেছে? শুনি? নামটা বলো তো? দেখিয়ে দেবো মজা।"

গীতুর মুখখানা খুবই মিষ্টি, কিন্তু স্পষ্টবাদী। লড়াকু স্বভাব। একহাত লড়ে নিতে পারবে। সুদীপ, প্রতিম, দিবাকর, পিকো, কাউকেই তোয়াক্কা করবে না। কাউকে রেয়াৎ করবে না। যা গুণ্ডা মেয়ে গীতু! হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মাথায় খেলে গেল।

"আচ্ছা, গীতু, তোর কি একটা বেগুনীরঙের সোয়েটার আছে?"

"বেগুনী? মভ আছে। একটু লাইট বেগুনীর মতোই। কেন?"

"ও কিছু না। হঠাৎ এমনি মনে হলো।"

এমন সময়ে নিচে আবার রিং হলো। পিকো খোঁচা মারলো, "ওই নাও, ফোন ছাড়ো, হয়তো আবার তোমার কোনো শিকার এসে গেছে। যাও, ঝাঁপিয়ে পড়ো।"

সত্যিই একটি সুদর্শন তরুণ সরলবিশ্বাসে ওপরে উঠে এলো। একে আগে কখনও দেখিনি। লিটল ম্যাগাজিন, না পিকোর বন্ধু, ভাবছি, হঠাৎ পিকো চেঁচিয়ে ওঠে—

"শৈবালদা। শৈবালদা! মা ফোন ছাড়বার আগেই চটপট ওপরে পালিয়ে এসো, আমার মায়ের পাল্লায় পড়ে যেও না যেন! মা তোমাকে দেখলেই প্রেমের কথা বলতে শুরু করে দেবেন কিন্তু...মার দারুণ প্রেমরোগ হয়েছে।"

অপরিচিত তরুণের চোখের সেই উদভ্রান্ত দৃষ্টি আমি জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

দেশ, শারদীয় ১৩৯০